প্রকাশক :
ভারতী দত্ত
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

মুদ্রাকর :
সুকুমার দে
বাসন্তী প্রেস
১৯এ, ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার
মহাশয়ার করকমলে—

প্রথম পর্বের সূচীপত্র

বই কেনা ১

কাইরো ৭

পুলিনবিহারী ১১

আহারাদি ১৪

নেতাজী ১৭

রোগক্ষয়-শিক্ষালাভ ২

ইস্কিলাস-শেলি-স্পিটলার ২৭

মোপাসাঁ-চেখফ্-রবীন্দ্রনাথ ৩১

অনুবাদ সাহিত্য ৩৪

'কলচর' ৩৭

বর্ষা ৪০

প্যারিস ৪৩

আজব শহর কলকেতা ৪৫

কিসের সন্ধানে ? ৪৭

ভক্তি ৫৫

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে' ৫৯

মার্জারনিধন কাব্য ৬৫

বেদে ৭০

ভাষাতত্ত্ব ৭৩

সিনিয়র এপ্রেন্টিস্ ৭৬

দাম্পত্য জীবন ৭৯

পঁচিশে বৈশাখ ৮২

তোতা-কাহিনী ৮৫

ত্রাহি বিশ্বকর্মা ৮৮

রেডুকৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম। ৯১

ইয়োরোপ ভারতীয় [illegible]

চরিত্র পরিচয়   ৯৭
আড্ডা   ১০০
ধূপ-ছায়া   ১০১
মেশেদিনী   ১১৪
কোন্-ভিনারের মা   ১১৯
কোনও মুখহানা   ১২৭
মাদ্রাজ উপকণ্ঠের বেলাভূমি   ১৫৫
আনিকি পাসিকিভি   ১৫৭
বিদেশে   ১৬০

দ্বিতীয় পর্বের সূচীপত্র

ঐতিহাসিক উপন্যাস   ১
কচ্ছের রাণ   ৫
দর্শনাতীত   ১০
মা-মেরীর রিস্টওয়াচ   ১৪
অনুবাদ সাহিত্য   ১৮
বাবুর শাহ্   ২২
ফের্ডিনান্ট্ ডাওয়ারক্রথ   ২৫
হিভজিভাই পি মরিস্   ৩০
'আধুনিক' কবিতা   ৩৬
মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ   ৪১
আলবের্ট শোয়াইৎসার্   ৪৯
মরহুম ওস্তাদ ফৈয়াজ খান   ৫২
'পঞ্চাশ বছর ধরে—'   ৫৬
ইন্টারভ্যু   ৬০
অর্থং অর্থং   ৬৬
'অদ্যাপিও সেই খেলা—'   ৭০

সাবিত্রী ৭৬

আধুনিকা ৮০

কয়াইজ্ ৮৩

চোখের জলের লেখক ৮৭

ছাত্র বনাম পুলিশ ৯১

রাসপুতিন ১১০

বিষ্ণুশর্মা ১২৮

বার্লাম ও য়োসাফট্ ১৩২

রবি-মোহন-এনড্রুজ ১৩৬

'ইজরায়েল বিশ্বের প্রবাদ-সত্য রূপে গণ্য হবে' ১৪২

এমেচার ভার্সস স্পেশালিস্ট ১৪৯

মিজোর হেপাজতী ১৫৪

গাড়োলস্য গাড়োল ১৬১

ভাষা ১৬৬

কবিগুরু ও নন্দলাল ১৬৯

খেলেন দই রমাকান্ত ১৭২

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময় উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায় আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এক সঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমত—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল

বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভবযন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন ফুরিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

> **Here with a loaf of bread**
> **beneath the bough,**
> **A flask of wine, a book of**
> **verse and thou,**
> **Beside me singing in the wilderness**
> **And wilderness is paradise enow.**

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'অল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—*The Book.*

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্। এর বেশি আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশি বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ, ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেণ্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে producer এবং consumer—তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগরেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer: আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি

একখানা বই produce করেছি—কেউ কেনে না বলে আমি consumer. অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

*　　　*　　　*

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে; আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত। তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর। আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হ'ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ, ই, ডি দিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমায় জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে তাহা বেইজ্জৎ করতে চায়, তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েননি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু ওগুলোই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল!)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

* * *

আর কত বলবো? বাঙালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে! বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোন দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে?

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন ব'লে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

কাইরো

কাইরো যাওয়ার জন্য আলাদা করে কাঠখড় পোড়াবার প্রয়োজন হয় না। ইয়োরোপ যাবার সময় জাহাজ সুয়েজ বন্দরে থামে। সেখানে নেবে সোজা কাইরো চলে যাবেন। এদিকে আপনার জাহাজ অতি ধীরে মন্থরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে পোর্ট সইদের দিকে রওয়ানা হবে। খালের দুদিকে বালুর পাড় যাতে ভেঙে গিয়ে খালটাকে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য কড়া আইন, জাহাজ যেন গরুর গাড়ির গতিতে এগোয়। কাজেই জাহাজ সইদ বন্দর পৌঁছতে না পৌঁছতে আপনি কাইরোতে ঢুঁ মেরে ট্রেনে করে. সেই সইদ বন্দরেই পৌঁছে যাবেন। সেই জাহাজেই চেপে, সেই কেবিনেই শুয়ে ইয়োরোপ চলে যাবেন—ফালতো কোনো খরচা লাগবে না।

অবশ্য তাতে করে কাইরোর মত শহরের কিছুই দেখা হয় না…আর কাইরোতে দেখবার মত জিনিস আছে বিস্তর। পিরামিড দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এইটুকু যা সান্ত্বনা। জাহাজের অনেকেই আপনাকে বলবেন, ঘণ্টা দশেকের জন্য কাইরোতে ওরকমধারা ঢুঁ মেরে বিশেষ কোন লভ্য নেই। আমারও সেই মত; কিন্তু তবু যে যেতে বলছি তার কারণ যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, তবে হয়ত বিলেত থেকে ফেরার মুখে ফের কাইরোতে নেবে দু'চার সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে পারেন। ইয়োরোপে তো দেখবেন কুল্লে এক ইয়োরোপীয় সভ্যতা (ফরাসী, জর্মন, ইংরেজ যত তফাৎই থাক না কেন, তবু তো তারা আপোসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলছে), আর দেখছেন ভারতীয় সভ্যতা—তার উপর যদি আরেক তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা হয়ে যায়, তবে তাতে নিশ্চয়ই বিস্তর লভ্য।

আমার লেগেছিল কাইরো দেখতে পাক্কা একটি বছর। অতদিন আপনি থাকবেন না সে আমি জানি। আপনার অতটা সময় লাগবে না—সে কথাও জানি। কারণ আমি কাটিয়েছিলুম প্রথম ছ'টি মাস শুধু আড্ডা মেরে মেরে—

বাড়ির ছাতের উপর থেকে পিরামিড স্পষ্ট দেখা যায়, ট্রামে করে হুশ করে সেখানে যেতে কোনোই বাধা নেই, পূর্ণিমায় আবার ইস্পিশল সার্ভিস, তৎসত্বেও ছ'টি মাস কেটে গেল এ-কাযে ও-কাযে করে করে, পিরামিড দেখার ফুরসৎ আর হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা কেউ জিজ্ঞেস করলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতুম, 'সবই ললাটস্য লিখন। কলকাতায় দশ বছর কাটিয়ে 'গঙ্গাস্তান' যখন হয়ে ওঠেনি, তখন বাবা-পিরামিড দর্শন কি আমার কপালে আছে?' (আসল কারণটা চুপে চুপে বলি; —এক গাদা পাথর দেখায় যে কি তত্ত্ব তা আমি পিরামিড দেখার আগে এবং পরে কোনো অবস্থাতেই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারিনি)।

সে কথা থাক; সভ্যতা, পিরামিড এ-সব জিনিস নিয়ে অন্ত জায়গায় পাণ্ডিত্য ফলাব। 'বসুমতী'র পাঠকরা এতদিনে আমাকে বিলক্ষণ চিনে গিয়েছেন, আমার মুখে পাণ্ডিত্যের কথা শুনলে ঠা ঠা করে হেসে উঠবেন। তাই সেই আড্ডাতেই ফিরে যাই।

আমি ভালোবাসি হেদো, হাতীবাগান, শ্যামবাজার। ও-সব জায়গায় তাজমহল নেই, পিরামিড নেই। তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদও নেই। আমি ভালোবাসি আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিই, পাড়ার পটলা, হাবুল আসে, সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে শুচিমুখ অনুভব করি আর উজির-নাজির মারি। আমার যা কিছু জ্ঞান-গম্যি তা ঐ আড্ডারই ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।

তাই যখন কপালের গর্দিশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল, তখন আড্ডা-ভাবে তিনদিনেই আমার নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। ভূতের মত শহরময় ঘুরে বেড়াই আর পটলা-হাবলু-বসন্ত-রেস্টুরেন্টের জন্য সাহারার উষ্ণ নিশ্বাসের সঙ্গে আপন দীর্ঘ নিশ্বাস মেশাই। এমন সময় সদ্গুরুর কৃপায় একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—পাড়ার কফিখানাতে রোজই দেখতে পাই গোটা পাঁচেক লোক বসন্ত-রেস্টুরেন্টেরই মত চেঁচামেচি কাজিয়া-ঝগড়া করে আর এন্তার কফি খায়, বিস্তর সিগারেট পোড়ায়।

দিন তিনেক জিনিসটা লক্ষ্য করলুম, কখনো কফিখানায় বসে, কখনো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। নূতন শহরের সব কিছুই গোড়ার দিকে সুর-রিয়ালিস্টিক ছবির মতো এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়। অর্থ খাড়া হতে হতে কয়েকদিন কেটে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তখন আয়েস করলুম, আমাদের বসন্ত-রেস্টুরেন্টের আড্ডা যখন গুরুচণ্ডাল সকলের জন্যই অবারিতদ্বার, তখন এরাই বা আমাকে

ব্রাত্য করে রাখবে কেন? হিম্মৎ করে তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে বসলুম আর করুণ নয়নে তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকালুম। শকুন্তলার হরিণও বুঝি ওরকমধারা তাকাতে পারত না।

দাওয়াই ধরলো। এক ছোকরা এসে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নিল এবং জানালো তাদের আড্ডায় বিস্তর সীট ভেকেণ্ট, আমি যদি ইত্যাদি। আমাকে তখন আর পায় কে? ভাঙা ফরাসী, টুটাফুটা আরবী, পিজিন্ ইংরিজী সব জড়িয়েমড়িয়ে দু'মিনিটের ভিতরেই তাঁদের সবাইকে বসন্ত-রেস্টুরেণ্টে নেমন্তন্ন করলুম, পটলা-হাবলুর ঠিকানা দিলুম, বসন্ত যে ভেজাল তেল আর পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায় তার বর্ণনা দিতেও ভুললুম না।

কিন্তু কোথায় লাগে আমাদের আড্ডা কাইরোর আড্ডার কাছে? বাঙালী-আড্ডার সব কটা সুখ কাইরোর আড্ডাতে তো আছেই; তার উপর আরেকটা মস্ত সুবিধার কথা এই বেলা বলি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে ভূমিকা দিলুম।

দুনিয়ার যত ফেরিওলা কাইরোর কাফেতে চক্কর মেরে যায়। টুথব্রাশ, সাবান, মোজা, আরশি, চিরুনি, নোটবুক, পেন্সিল, তালাচাবি, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি—হেন বস্তু নেই যা ফেরিওলা নিয়ে আসে না। আমি জানি, আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ধর্মসাক্ষী, দর্জি পর্যন্ত বস্তা বস্তা কাপড় মুটের ঘাড়ে চাপিয়ে কাফের ভিতর চক্কর মেরে যায়। কাইরোর লোক দোকানে যেতে ভালোবাসে না। তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়, আর দোকানী একা পেয়ে আপনাকে ঠকাবেও নিশ্চয়। আড্ডাতে বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন। পাঁচজনে মিলে বরঞ্চ ফেরিওয়ালাকে ঘায়েল করার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

একপ্রস্থ সুট বানাবার বাসনা ছিল। আড্ডাতে সেটা সবিনয় নিবেদন করলুম। পাশ দিয়ে দর্জি যাচ্ছিল—ডাক দিতে সবাই 'হাঁ হাঁ, করো কি করো কি!' বলে বাধা দিলেন। 'ও ব্যাটা সুট বানাবার কি জানে? প্লাস্তিরাস আসুক। গ্রীক বটে, ঠকাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরাও তো পাঁচজন আছি। ও কাপড় আনে ঠকিয়ে, কাস্টম না দিয়ে। আমরা ওকে ঠকাতে পারলে টাকায় আট আনা লাভ। ঠকলে দু'আনা লাভ, অথবা কুইট্স্।' তারপর আড্ডা আমায় বুঝিয়ে বলল, যে সুট বানাতে চায় সে যেন বর। তার কথা কওয়া ভালো দেখায় না। সে কনেপক্ষের প্যাঁচে পড়ে বানচাল হয়ে যাবে, গয়নাগুলো যাচাই না করে নিয়ে ফেলে আখেরে পস্তাবে।

প্লাস্তিরাস এল। তারপর বাপরে বাপ! সে কী অসম্ভব দরদস্তুর, রকাবকি,

—শেষটায় হাতাহাতির উপক্রম। আড্ডা বলে, 'ব্যাটা তুমি দুনিয়া ঠকিয়ে খাও, তোমাকে পুলিসে দেব।' প্রান্তিরাস বলে, 'ও দামে স্যুট বানালে আমাকে আপন পাতলুন বন্ধক দিয়ে কাচ্চা-বাচ্চার জন্য আণ্ডারুটি কিনতে হবে।'

পাক্কা তিনঘণ্টা লড়াই চলেছিল। এর ভিতর প্রান্তিরাস তিনবার রাগ করে কাপড়ের বস্তা নিয়ে চলে গেল, তিনবার ফিরে এল। আড্ডাও দল বাড়াবার জন্য কাফের ছোকরাকে পাঠিয়ে আমাদের গ্রীক সভ্য পাউলুসকে ডেকে আনিয়েছে। তখন লাগল গ্রীকে গ্রীকে লড়াই। সুড-এটেন্ নিয়ে হিটলার চেম্বারলেনে এর চেয়ে বেশি দর-কষাকষি নিশ্চয়ই হয়নি। যখন রফারফি হল তখন রাত এগারোটা। আমি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিলুম—আড্ডা তাতে আপত্তি জানায়নি, বরের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কাফের ছোকরা আমাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গেল। মাপ দেওয়া হল। তিন দিন বাদে পয়লা ট্রায়েল—অবশ্য কাফেতেই।

তিন দিন বাদে আড্ডা ফুল স্ট্রেন্থে হাজির। আমি কাফের পিছনের কামরায় গিয়ে নূতন স্যুট পরে বেরিয়ে এলুম। সর্বত্র চকের দাগ আর তাঁতী-বাড়ির মত আমার সর্বাঙ্গ থেকে সুতো ঝুলছে। স্যুটের চেহারা দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মার লাগাও ব্যাটা প্রান্তিরাসকে; এ কি স্যুট বানিয়েছে না মৌলবী সাহেবের জোব্বা কেটেছে? ও কি পাতলুন না চিমনির চোঙা? প্রান্তিরাস দর্জি না হাজাম?' ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কটুকাটব্য। প্রান্তিরাসও হেঁকে বলল, সে স্বয়ং বাদশার স্যুট বানায়। সবাই বললে, 'কোন্ বাদশা? সাহারার?'

তারপর এ বলে আস্তিন কাটো, ও বলে কলার ছাঁটো। কেউ বলে পাতলুন নামাও, কেউ বলে কোট তোলো। প্রান্তিরাসও পয়লা নম্বরের ঘড়েল—সকলের কথায় কান দেয় আবার কারো কথায় কান দেয়ও না, অর্থাৎ যা ভালো বোঝে তাই করে।

এই করে করে কাফেতে আড্ডা জমানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ট্রায়েল পেয়েলুম। স্যুট তৈরি হল। আমি সেইটে পরে বরের মত লাজুক হাসি হেসে সবাইকে সেলাম করলুম। স্যুট দীর্ঘজীবী হোক বলে সবাই আশীর্বাদ করলেন। কাফের মালিক পর্যন্ত আমাদের পরবে শামিল হল। আমি সব্বাইকে একপ্রস্থ কফি খাওয়ালুম। সে-স্যুট পরে আজও যখন কার্পোতে যাই গুণীরা তারিফ করেন।

ছেলেবেলায় যে-রকম গলাজল ঠেলে ঠেলে খাল পেরতুম, ঠিক সেই রকম পূবের হাওয়া ঠেলে ঠেলে সমুদ্রপারে পৌঁছতে হল।

অন্য দিন সমুদ্র থেকে থেকে এক একখানা করে ঢেউ পাঠায়। সে অনেক দূর থেকে ..য়তারা কষে কষে দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে কোমর বেঁধে শেষটায় পাড়ে এসে আছাড় খায়। আজ বিশাল আয়োজন। এক সঙ্গে অনেকগুলো পালোয়ান, একজনের পিছনে আরেকজন পাঁয়তারা কষে কষে আসছে। তারপর পাড়ে এসে হুটোপুটি—দোস্ত-দুশমনের সনাক্ত হওয়ায় গোলমালে আপোসে হানাহানি। শেষটায় কোলাকুলিতে মিলে গিয়ে ছোট ছোট দ'য়ে ম... যাওয়া।

সমস্ত আকাশ জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন মেঘ—এলোমেলো যেন আর্টিস্টের পেলেটে, এলোপাতাড়ি হেথা হোথায় এবড়ো-খেবড়ো রঙ। কিন্তু তবু সবসুদ্ধ মিশে গিয়ে যেন কেমন একটা সামঞ্জস্য রয়েছে—মনে হয় না, অদলবদল করলে কিছু ফেরফার হবে।

বসেছিলুম জলের আর জেলেপাড়ার মাঝখানে। পিছনে নারকেল বন—তাতে আগুন লাগিয়ে সূর্য প্রচণ্ড মহিমায় অস্ত গেলেন—গরবিনীর সতীদাহ। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ে ভেসে আসা পোনা মাছ, লুব্ধ কাকের কর্কশ চিৎকার, নারকেল গাছের উস্কোখুস্কো মাথার অবিশ্রান্ত আছাড় খাওয়া—অশান্তির চরম আয়োজন।

তাই বোধ করি একটি জেলে-ডিঙিও জলে নামেনি। লম্বা সারি বেঁধে কাৎ হয়ে পড়ে আছে ডাঙায়, যেন ডিসেকশান টেবিলে সারি সারি মড়া। সমস্ত তীরে মাত্র দু'টি জেলে সুতো ফেলে গভীর ধৈর্যে মাছ ধরার চেষ্টাতে আছে। জোয়ারের জোর টোপ ধুয়ে নিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে, নূতন টোপ সাজতে হয়—তবু তাদে.. ধৈর্য অসীম। বাদবাকি ছেলেবুড়ো বালুপাড়ে বসে আছে—এত মেহন্নত করে লাভ নগণ্য।

অন্ধকার নামল অতি ধীরে ধীরে। পাটরানী তো চিতের উঠলেন লাল টক টক হয়ে! আকাশ সিঁদুর মুছলেন অতি অনিচ্ছায়—এ-মেঘে ও-মেঘে হাত বুলিয়ে

বুলিয়ে। সন্ধ্যের শেষ পান্না জল লালে-নীলে মেশা বেগুনি ঝিলিকটুকু মুছে ফেলে আস্তে আস্তে শ্যাওলা সবুজ হলেন।

কোনদিন আবার রঙের রাজা মাত্র তিনটি রঙ নিয়ে খেলায় বসেন। সমুদ্র আর পূবের আকাশকে যেন কালো নীল, পশ্চিম আকাশকে একটুখানি গোলাপী আর মাথার উপর বাকি সমস্ত আকাশ পায় ফিকে ফিরোজা। যতক্ষণ না কালো পরদায় সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়, ততক্ষণ শুধু এই তিন রঙের ফিকে ঘন'র খেলা। তাতে কতই না কারচুপি। এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগল, ওদিকে তেমনি গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরিষ রঙের আমেজ নিতে আরম্ভ করল। মাঝখানের আকাশ ফিরোজাতে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিন স্বর নিয়ে খেলা। আর তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুত লয়ে রঙ বদলান তবে পূবও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জনে যেন তানপুরোর আমেজ।

সমে এসে যখন পূব-পশ্চিম মিলে গেল অন্ধকারে, তখন তানপুরোর রেশটুকুমাত্র রইল সাগরপারে। মশালচি এসে আসমানের ফরাশে এখানে-ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেল। এবার রাত্রির মুশায়েরা (কবি সঙ্গম) বসবে। নারকেল মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নূপুর বাজিয়ে নাচবে, পূবের বাতাস সভার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে। তারপর দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে মাতাল চাঁদ উঠবেন ধীরে ধীরে গা টেনে টেনে, একটুখানি কাৎ হয়ে। মে'সাহেবদের মুখে হাসি ফুটবে—অন্ধকারে যারা গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল, তাদের সবাইকে তখন চেনা যাবে।

* * *

সমুদ্রপারে, নীল গম্বুজের তলে, বিশ্বসংসারের ঠিক মাঝখানে যখন বসি তখন মনে হয়, যেন সার্কাসের গোল তাঁবুর মাঝখানে আমাকে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে আর চতুর্দিকে গ্যালারিতে লাল হলদে সোনালি মেঘের পাল অপেক্ষা করছে আমি কখন বাঁদর-নাচ আরম্ভ করব।

ভারি অস্বস্তি বোধ হয়।

এই সব রঙচঙা মেঘের দল অত্যন্ত অভদ্র চার-আনী দর্শক।

হঠাৎ একজন যেন হেসে হেসে লাল হয়ে ফেটে পড়ার যোগাড় করে পাশের আরেক চার-আনীকে কি বলে। সেও তখন লাল হয়ে উঠে তার পাশের জনকে সে কথা বলে—দেখতে দেখতে দেখতে সমস্ত তাঁবুর সবাই লাল হয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই হাসির লুটোপুটি।

লুকোবার জায়গা নেই।

বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলুম বিরক্ত হয়ে।

কিন্তু তবু সেই মাঝখানেই। তবু যেন তার চার-আনীর দলকে সঙ্গে নিয়ে আমারই চতুর্দিকে ঠিক তেমনি ঘিরে দাঁড়াতে চায়।

বিশ্বসংসার আমাকে বাঁদর-নাচ না নাচিয়ে ছাড়বে না!

* * *

দু'জোড়া কপোত-কপোতী নিত্যি নিত্যি দেখতে পাই। একে অন্যকে পেয়েই তারা খুশি। সে খুশি তাদের বসাতে, চলাতে, তাদের হাত-পা নাড়া-চাড়াতে যেন উপছে পড়ে। এক জোড়া সমুদ্রের পারে পারে পা-চারী করে—ছেলেটা যেমন ছ'ফুট ঢ্যাঙা, মেয়েটিও তেমনি পাঁচ ফুটের কমতি। ছেলেটার কর্ম, মেয়েটার দুই জুতো এক ফিতেতে বেঁধে কড়ে আঙুলে ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলা; মেয়েটা শুধু-পায়ে ভিজে বালির উপর দিয়ে চড়ুই পাখির মত লাফ দিয়ে দিয়ে নেচে যায়—ঢেউ তাড়া করে এলে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে যায়, চলে গেলে বেঁকে গিয়ে জলের দিকে এগোয়। খাটো করে পরা ফ্রক, পা দু'টি সুডৌল ঘন শ্যামবর্ণ। কথাবার্তা কখনো কইতে শুনিনি—একে অন্যের দিকে তাকায় পর্যন্ত না। এগুতে এগুতে তারা আন্ডাবায় পর্যন্ত চলে যায়, তবু দূর থেকেও তাদের চেনা যায়—ঢ্যাঙা আর বেঁটে। ঢ্যাঙা নাক-বরাবর সোজা চলেছে, মেয়েটি এঁকে বেঁকে।

আরেক জোড়া সমস্তক্ষণ বসে থাকে ডাঙায়-তোলা একটা নৌকোর আড়ালে কুণ্ডলী-পাকানো জালের বস্তায় হেলান দিয়ে। সমুদ্রের দিকে তাকায় না, পিছনের সূর্যাস্তও জালের বস্তায় ঢাকা পড়ে। সমস্তক্ষণ গুজুর গুজুর। কখনো খুব পাশাপাশি ঘেঁসে বসে, ছেলেটা মেয়েটির কোলে হাত রেখে, কখনো দেখি মেয়েটির হাত ছেলেটির কোমর জড়িয়ে। বেড়ায় না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় না। রাত ঘনিয়ে এলে একই সাইকেল চড়ে উত্তর দিকে চলে যায়।

* * *

দূর থেকে রোষে-ক্রোধে তর্জন-গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে অবশেষে এ কী বিগলিত আত্মনিবেদন!

তাণ্ডবের ডমরু-বাজিয়ে, ছিন্নমস্তার আত্মঘাতে নিজেকে বারে বারে দ্বিখণ্ডিত করে, পাড়ে এসে অবশেষে লক্ষ্য কিঙ্কিণীর এ কী মৃদু শান্ত নূপুর-গুঞ্জরন!

সূর্যোদয়ের লোহিতোজ্জ্বল রক্ত-টিপ, দ্বিপ্রহরের অতি ঘন নীলাম্বরি, সিন্ধুপারে মৃদুপদসঞ্চারণ!!

আর আপনার বন্ধু যদি ন'সিকে গুণী ''ন এবং সেই গুলাশের সঙ্গে খেতে কেন 'ইতালিয়ান রিসোত্তো', তাহলে আপনাকে হাতি দিয়ে বেঁধেও সেই রেস্তোরাঁ থেকে বের করা যাবে না। ই ্যারোপের বাকী ক'টা দিন আপনি সেই রেস্তোরাঁর টেবিল বেড়ালছানার ''ত আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চাইবেন। কারণ বহুকাল যাবনিক আহারাদির পর মাংসের ঝোল আর রুটি মুখরোচক বটে, কিন্তু তার সঙ্গে কি পোলাও আর মাংসের ঝোলের তুলনা হয়? ঘড়েল পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন যে, 'ইতালিয়ান রিসোত্তো' মানে পোলাও, তবে ঠিক, ভারতীয় পোলাও নয়। কোপ্তা-পোলাওয়ের কোপ্তাগুলোকে যদি ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করে পোলাওয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাই হবে রিসোত্তো।

অথবা মনে করুন, দেশে ফেরার সময় আপনি একদিনের তরে কাইরোতে ঢুঁ মেরে এলেন। কিছু কঠিন কর্ম নয়। পোর্ট সইদে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে কাইরো, সেখানে ঘণ্টা বারো কাটিয়ে মোটরে করে সুয়েজ বন্দরে পৌঁছে ফের সেই জাহাজই ধরা যায়—কারণ জাহাজ সু ্র খাল পেরোয় অতি ধীরে ধীরে।

কাইরোতে খেলেন মিশরী রান্না! চাক্তি চাক্তি মাংস খেতে দিল, মধ্যিখানে ছ্যাঁদা। দাঁতের তলায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বটে, কিন্তু সোওয়াদ খাসা। খাচ্ছেন আর ভাবছেন বস্তুটা কি, কিন্তু কোন হদিস পাচ্ছেন না। হঠাৎ মনে পড়ে যাবে, খেয়েছি বটে আমজাদিয়ায় এইরকম ধারা জিনিস—শিককাবাব তার নাম! তবে মসলা দেবার বেলা কঞ্জুসী করেছে বলে ঠিক শিককাবাবের সুখটা পেলেন না।

এতক্ষণে আপনার শাস্ত্রাধিকার হল। এই যে মসলার তত্ত্বটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এরই খেই ধরে আপনি রান্নার শ্রেণী বিভাগ নিজেই করে ফেলতে পারবেন।

পৃথিবীতে কুল্লে দুই রকমে রান্না হয়। মসলাযুক্ত এবং মসলাবর্জিত। মসলা জন্মে প্রধানত ভারতবর্ষে, জাভায়, মালয়ে। ইয়োরোপে মসলা হয় না। তাই ইয়োরোপীয় রান্না সাধারণত মসলাবর্জিত।

এবার ঈষৎ ইতিহাসের প্রয়োজন। তুর্ক পাঠানরা যখন এদেশে আসে তখন পশ্চিম এবং উত্তর ভারত নিরামিষ খেত। তু পাঠানরা মাংস খেত বটে, কিন্তু সে রান্নায় মসলা থাকত না। তুর্ক-পাঠান-মোগলরা যে রকম ভারতবর্ষের অলঙ্কার কারুকার্যের সঙ্গে তুর্কিস্থানী ইরানী স্থাপত্য মিলিয়ে তাজমহল

আহারাদি

যে লোক উদ্ভিদতত্ত্ব জানে না, সে দেশী-বিদেশী যে কোন গাছ দেখলেই মনে করে, এও বুঝি এক সম্পূর্ণ নতুন গাছ। তখন নতুন গাছের সঙ্গে তার চেনা কোনো গাছের কিছুটা মিল সে যদি দেখতে পায় তবে অবাক হয়ে ভাবে, এই চেনা-অচেনায় মেশানো গাছের কি অন্ত নেই। কিন্তু শুনেছি, উদ্ভিদবিদ্যা নাকি পৃথিবীর বেবাক গাছকে এমন কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলেছে যে, নতুন কোনো গাছ দেখলে তাকে নাকি কোনো একটা শ্রেণীতে ফেলে নামকরণ পর্যন্ত করা যায়। আশ্চর্য নয়, কারণ ধ্বনির বেলা তো তাই দেখতে পাচ্ছি। ইংরিজী শুনে মনে হয় যে, এই বিকট ভাষার স্বরব্যঞ্জন বুঝি অন্ত নেই। কিন্তু ডেনিয়েল জোন্‌স্ এবং পূর্বাচার্যগণ এমনি উত্তম শ্রেণীবিভাগ করে ফেলেছেন যে, আজ আমরা বাপঠাকুরদার চেয়ে বহু কম মেহন্নতে ইংরিজী উচ্চারন শিখতে পারি।

আহারাদির বেলাও তাই। আপনার হয়ত কোনো কাবুলীওয়ালার সঙ্গে মিতালি হল। সে আপনাকে দাওয়াতে করে খাওয়াল। প্রথমটায় আপনি হয়ত ভেবেছিলেন যে, হাতুড়ি বাটালি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে দেখেন, খেতে দিল তোফা পোলাও আর খাসা মুর্গীর ঝোল। তবে ঠিক জাকারিয়া স্ট্রীটের মত রান্না নয়, কলকাতাবাসী পশ্চিমা মুসলমান যে রকম রান্না করে ঠিক সে-রকম নয়। কেমন যেন একটুখানি আলাদা, কিন্তু খেতে উম্‌দা।

অথবা মনে করুন আপনাকে প্যারিসের কোনো রেস্তোরাঁয় আপনার ভারতীয় বন্ধু 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' খেতে দিলেন। হয়ত আপনি ইয়োরোপে এসেছেন মাত্র কয়েকমাস হল—নানা প্রকার যাবনিক খাদ্য খেয়ে খেয়ে আপনার পিত্তি (উভয়ার্থে) চটে আছে। তখন সেই 'গুলাশ' দেখে আপনি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবেন। সেই রাত্রেই আপনি গিন্নীকে চিঠি লিখলেন, 'বহুকাল পরে মাংসের ঝোল খেয়ে বিমলানন্দ উপভোগ করলুম।' কারণ 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' আর সাদা-মাটা মাংসের ঝোলে কোনো তফাৎ নেই।

বানালো, ঠিক সেইরকম ভারতীয় মসলার সঙ্গে তাদের মাংস রান্নার কায়দা মিলিয়ে এক অপূর্ব রান্নার সৃষ্টি করল। আপনারা তাজমহল দেখে 'আহা আহা' করেন, আমি করি না। কারণ তাজমহল চিবিয়ে খাওয়া যায় না আর খাস মোগলাই রান্না পেলেই আমি খাই এবং খেয়ে 'জিন্দাবাদ বাবুর-আকবর' বলি—যদিও তাঁরা বহুকাল হল এ জিন্দেগীর খাওয়াদাওয়া শেষ করে চলে গিয়েছেন।

এই 'মোগলাই' রান্না ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের তাবৎ মাংস-খেকোদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। (বাঙালী আর দ্রাবিড়ের কথা আলাদা; এরা মাংস খায় কম, আর খাস মোগল-পাঠানের সংস্পর্শে এসেছে তারও কম। পিয়ালী ঠাকুরবাড়ি ব্যত্যয়, তাঁরা মোগলের সঙ্গে খানিকটা মিশেছিলেন বলে তাঁদের রান্নায় বেশ মোগলাই খুশবাই পাওয়া যায়।) এমন কি মোগলের দুশমন রাজপুত মারাঠারা পর্যন্ত মোগলাই খেতে আরম্ভ করল। এখনো রাজপুতানা, বরোদা, কোলহাপুর রাজ্যের সরকারী অতিথিশালায় উঠলে বাবুর্চি প্রথম দিনই শুধায় 'মোগলাই' না নিরামিষ খাবেন। আমার উপদেশ—মোগলাইটাই খাবেন—তাতে করে পরজন্মে অজ শিশু হয়ে জন্মালেও আপত্তি নেই।

মোগল-পাঠানরা এই রান্না আফগানিস্থান-তুর্কীস্থানে প্রচলিত করল। আস্তে আস্তে সেই রান্নাই তাবৎ মধ্য-প্রাচ্য ছেয়ে ফেলল! তবে যত পশ্চিম পানে যাবেন, ততই মসলার মেকদার কমে আসবে। অর্থনীতিতে নিশ্চয়ই পড়েছেন, উৎপত্তিস্থল থেকে কোন বস্তু যত দূরে যাবে ততই তার দাম বেড়ে যায়। আফগানিস্থানের রান্নায় যে হলুদ (কাবুলীরা বলে 'জরদ্-চোপ' অর্থাৎ হলদে কাঠ) পাবেন, ইস্তাম্বুল পর্যন্ত সে হলুদ পৌঁছয়নি।

তুর্করা বল্কান জয় করে, হাঙ্গেরি পেরিয়ে ভিয়েনার দরজায় হানা দেন। হাঙ্গেরিতে মোগলাই মাংসের ঝোল 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশে' পরিবর্তিত হল এবং মিশরী এবং তুর্কদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভেনিসের কারবারীরা 'মিন্‌স্‌ট-মীটের' পোলাও বা রিসোত্তো বানাতে শিখল। গ্রীস সেদিন পর্যন্ত তুর্কীর তাঁবেতে ছিল, তাই গ্রীসের পোশাকী রান্না আজও চোগা-চাপকান পরে থাকে।

পৃথিবীতে দ্বিতীয় উচ্চাঙ্গের রান্না হয় প্যারিসে কিন্তু মসলা অতি কম, যদিও ইংরিজী রান্নার চেয়ে ঢের ঢের বেশি। এককালে তামাম ইয়োরোপ ফ্রান্সের নকল করত, তাই বল্কান গ্রীসেও প্যারিসী রান্না পাবেন। গ্রীস উভয় রান্নার সঙ্গমস্থল। বাকি জীবনটা যদি উত্তম আহারাদি করে কাটাতে চান, তবে আস্তানা গাড়ুন গ্রীসে (দেশটাও বেজায় সস্তা)। লঞ্চ, ডিনার, সাপার

খাবেন ফরাসী, মোগলাই এবং ঘরোয়া গ্রীক কায়দায়। ভুঁড়ি কমাবার কোমরবন্দ সঙ্গে নিয়ে যাবেন—গ্রীসে এ জিনিসের বড্ড বেশি চাহিদা বলে বস্তুটা বেজায় আক্রা।

সুশীল পাঠক, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। আপনার মনে আঁকুবাঁকু প্রশ্ন, রান্না জগতে বাঙালীর অবদান কি ?

আছে, আছে। মাছ, ছানা এবং বাঙালী বিধবার নিরামিষ রান্না।

কিন্তু তার আগে তো চীনা রান্নার বয়ান দিতে হয়। মোগলাই, ফরাসী এবং চীনা এই ত্রিমূর্তির বর্ণনা না করে আমি 'প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা'র প্রশ্রয় দিতে চাইনে।

আরেকদিন হবে। বৈদ্যরাজ বলেছেন, দীর্ঘজীবী হয়ে যদি বহুকাল ধরে উদরমার্গের সাধনা করতে চাও, তবে বীজমন্ত্র হচ্ছে 'জীর্ণে ভোজং'। অর্থাৎ হজম না করা পর্যন্ত পুনরায় আহারে বসবে না। তাও যদি না মানেন, তবে চটে গিয়ে সুকুমার রায়ের ভাষায় বলব (দোষটা তাঁর, কটুবাক্যটা তিনিই করেছেন)—

এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা ॥

নেতাজী

আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মত মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অন্ধের হস্তী-দর্শনের ন্যায়। তৎসত্ত্বেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছি তার প্রধান কারণ, আমাদের মত অর্বাচীন লেখকেরা যখন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য ঐ একমাত্র পন্থাই খোলা পায়, তখন তার শ্রদ্ধাবেগ তাকে অন্ধত্বের চরমে পৌঁছিয়ে দেয়—শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে সহস্রগুণে উত্তম লেখককেও বাচাল করে তোলে।

দ্বিতীয় কারণ, এক চীনা গুণী জনৈক ইংরেজকে ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'সরোবরে জল বিস্তর কিন্তু আমার পাত্র ক্ষুদ্র। জল তাতে

ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নেই—মাই কাপ্ ইজ্ স্মল—বাট আই ড্রিঙ্ক অফতেনার (My cup is small but I drink oftener)।'

আমাদের পাত্র ছোট, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে আমরা সে পাত্র ঘন ঘন ভরে নিই তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোবর নিঃশেষ হোক আর নাই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আমার পাত্রে উঠেছে দুই গণ্ডূষ জল, অথবা বলব, আমি অন্ধ, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্রমে দুটি দাঁতেরই উপর। অবশ্য সব অন্ধই ভাবে, সেই সবচেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত দিয়ে ফেলেছে, কাজেই এ-অন্ধের অভিমত আত্মম্ভরিতাপ্রসূতও হতে পারে।

প্রথম, বর্মায় সুভাষচন্দ্র কি কৌশলে হিন্দু-মুসলমান-শিখকে এক করতে পেরেছিলেন? এবং শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে ফেরার পরও এঁদের অধিকাংশ অখণ্ডবাহিনীরূপে আত্মপরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি, সুভাষচন্দ্রের সাইগণ আসার বহুপূর্বে রাসবিহারী বসু অনেক চেষ্টা করেও কোনো আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে পারেন নি। অথচ রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের তুলনায় জাপানীদের কাছে অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন—জাপানফের্তা ভারতীয়-দের মুখে শুনেছি রাসবিহারী বসুকে জিজ্ঞাসা না করে জাপান সরকার কখনো কোনো ভারতীয়কে জাপানে থাকবার ছাড়পত্র মঞ্জুর করত না।

একদিকে যেমন দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ' নামটি অনায়াসে সর্বজনপ্রিয় করে তুললেন, অন্যদিকে দেখি, কৃতজ্ঞ মুসলমানেরা তাঁকে 'নেতাজী' নাম দিয়ে হৃদয়ে তুলে নিয়েছে—'কাইদ-ই-আকবর' বা ঐ জাতীয় কোনো দুরূহ আরবী খেতাব তাঁকে দেবার প্রয়োজন তারা বোধ করেনি। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, তখন এ-দেশে হিন্দু-উর্দু সমস্যা কংগ্রেসকে প্রায়ই বিচলিত করত, অথচ দেখি সুভাষচন্দ্রকে এ সমস্যা একবারের তরেও কাতর করতে পারেনি। বেতারে আমি সুভাষচন্দ্রের প্রায় সব বক্তৃতাই শুনেছি এবং প্রতিবারই বিস্ময় মেনেছি হিন্দী-উর্দুর অতীত এ ভাষা নেতাজী শিখলেন কি করে?—নেতাজী তো শব্দতাত্ত্বিক ছিলেন না, ভাষার কলাকৌশল আয়ত্ত করবার মত অজস্র সময়ও তো তাঁর ছিল না। এ-রহস্যের একমাত্র সমাধান এই যে, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে মহাত্মার থাকে, দেশকে সত্যই যিনি প্রাণ মন সর্বচৈতন্য সর্বানুভূতি দিয়ে ভালবাসেন, সাম্প্রদায়িক কলহের বহু উর্ধ্বে নির্দ্বন্দ্ব পুণ্যলোকে যিনি অহরহ বিরাজ করেন, যে মহাপুরুষ দেশের অখণ্ড সত্যরূপ ঋষির মত দর্শন করেছেন, বাক্যব্রহ্ম তাঁর ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করেন। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন,

সে-ভাষা সত্যের ভাষা, ন্যায়ের ভাষা, প্রেমের ভাষা। সে-ভাষা শুদ্ধ হিন্দী অপেক্ষাও বিশুদ্ধ হিন্দী, শুদ্ধ উর্দু অপেক্ষাও বিশুদ্ধ উর্দু। সে-ভাষা তাঁর নিজস্ব ভাষা। এই ভাষাই মহাত্মাজীর আদর্শ ভাষা ছিল।

নিজের মনকে বহুবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, সুভাষচন্দ্র না হয় সর্বদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উড্ডীয়মান ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৈন্যকে তিনি কি করে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করলেন? যে উত্তর শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছি, সেটা ঠিক কিনা জানি না; আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র শুদ্ধ মাত্র সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য কখনো কোমর বেঁধে আসরে নামেননি। আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র এমন এক বৃহত্তর জাজ্বল্যমান আদর্শ জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন, এবং তার চেয়েও বড় কথা, এমন এক সর্বজনগ্রহণীয় বীরজনকাম্য পন্থা দেখাতে পেরেছিলেন যে, কি হিন্দু, মুসলমান, কি শিখ সকলেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র বলছেন, 'আগুন লেগেছে, চল আগুন নেভাই, এই আমার হাতে জল। তোমরাও জল নিয়ে এসো।' সুভাষচন্দ্র কিন্তু এ কথা বলছেন না, 'আগুন নেভাতে হলে হিন্দু-মুসলমানকে প্রথম এক হতে হবে, তারপর নেভানো হবে। এস প্রথমে মিটিং করি, প্যাক্ট বানাই, শিলমোহর লাগাই, তারপর স্বরাজ।'

বৃহত্তর আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেছে,—তা সে ব্যক্তিগত স্বার্থই হোক আর সাম্প্রদায়িক স্বার্থই হোক—এ তো কিছু অভূতপূর্ব জিনিস নয়। স্বীকার করি এ জিনিস বিরল—তাই এ রকম আদর্শ দেদীপ্যমান করতে পারেন অতি অল্প লোকই, তাই সুভাষচন্দ্রের মত নেতাজী বিরল।

দ্বিতীয় যে গজদন্ত আমি অনুভব করতে পেরেছি, সেটি এই :—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি তিনজন নেতা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন-ইংরেজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ডমুফতী এবং দ্বিতীয় ইরাকের আবদুর রশীদ। এঁদের দুজনই আপন আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের নেতাজী। তিনি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন না!

তিনজনই কপর্দকহীন, তিনজনই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন আপন যশ এবং চরিত্রবল। প্রথম দুজনের স্বজাতি ছিল উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই কোনো সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুনিসিয়া

আলজেরিয়ায় ইংরেজের সঙ্গে লড়তে পারলেন না ; শুধু তাই নয়, জর্মন রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযানে বেরুলেন, তখন এঁদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন না। এঁদের কেউই জর্মন সরকারকে আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিভূত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের গতি হল আর পাঁচজনের মত ইতালি থেকে বেতারযোগে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে 'প্রোপাগ্যাণ্ডা' করার !

অথচ, পশ্য, পশ্য সুভাষচন্দ্র কি অলৌকিক কর্ম সমাধান করলেন ! স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, ইংরেজের 'গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের' এক করে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্মা-মালয়ের হাজার হাজার ভারতবাসী সর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যগণ যেন জাপানী ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতী এবং আবদুর রশীদ জর্মনীকে সে সুযোগ দিতেও বাধ্য করাতে পারেন নি)। সুভাষচন্দ্র কবুল জবাব দিয়ে বলেছিলেন 'আমি আজাদ হিন্দ ও তার ফৌজের নেতা। আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে-রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম। যদি চাও, তবে সে-রাষ্ট্রকে স্বীকার করার গৌরব তোমরা অর্জন করতে পারো। যদি ইচ্ছা হয়, তবে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিতে পারো—এক স্বাধীন রাষ্ট্র যে রকম অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয়, কিন্তু আমি কোনো ভিক্ষা চাই না এবং আমার সৈন্যগণ 'আজাদ হিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ করবে না।'

এ ইন্দ্রজাল কি করে সম্ভব হল ? সুভাষচন্দ্রের আত্মাভিমান যেমন তাঁকে বাঁচিয়েছিল জাপানের বশ্যতা না করা থেকে, তেমনি তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, জাপান তাঁর কথামত চলতে বাধ্য হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কত গুণ, কত কূটবুদ্ধি, কত দুঃসাহস কত নির্বিকার ধৈর্য কত চরিত্রবলের প্রয়োজন হয়েছিল, আমাদের মত সাধারণ লোক কি তার কল্পনাও করতে পারে ?

কপর্দকহীন, সামর্থ্যসম্বলহীন সুভাষচন্দ্র টোকিয়োতে একা দাঁড়িয়ে—প্রথম দেখি এই ছবি। তারপর দেখি সেই সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে ভারতেরই এক কোণে।

যতই বিশ্লেষণ করি না কেন, এই দুই ছবির মাঝখানের পর্যায়গুলো ইন্দ্রজাল

—ভানুমতীই থেকে যায়। এ যুগে না জন্মে এ কাহিনী ইতিহাসে পড়লে কখনই বিশ্বাস করতুম না।

"জিন্দাবাদ নেতাজী।" ॥

রোগক্ষয়—শিক্ষালাভ

মানুষ যেমন বিষের ধুঁয়ো এটম বম বানিয়ে তার আপন ভাইকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে মারতে শিখেছে—ঠিক তেমনি এমন মানুষেরও অভাব নেই যাঁরা মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য সমস্ত কল্পনাশক্তি, সর্বশেষ রক্তবিন্দু ক্ষয় করতে প্রস্তুত আছেন। কেন জানিনে, আজ হঠাৎ, এঁদেরই একজনের কথা মনে পড়লো। এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের নাম মসিয়ো লুই ভোতিয়ে।

আমি তখন জিনীভায়: এই অচেনা ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করলেন, লেজাঁয় তাঁর যক্ষ্মারোগীর সানাটরিয়ামটি আমি যদি দেখতে যাই তবে তিনি অত্যন্ত খুশী হবেন। ফ্রান্স, জর্মনি, সুইটজারল্যাণ্ডে বিস্তর সানাটরিয়া দেখেছি, সর্বত্রই সব গুণীর মুখে একই কথা, 'যক্ষ্মার বিশেষ কোনো চিকিৎসা নেই, তবে রোগী যদি মনস্থির করে ফেলে যে, যমকে চোখের জলে নাকের জলে না করা পর্যন্ত সে মরবে না, অর্থাৎ বিছানায় শুয়ে শুয়েই যে হিম্মৎ নামক অস্ত্রখানি দিয়ে তার সঙ্গে লড়াই দেবেই দেবে, তবে হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই সে বীরকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

আমি ডক্টর ভোতিয়েকে এ-কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভারী খুশি হলেন। বললেন, 'আপনি যখন এ তত্ত্বটা জানেন তখন আপনারই বিশেষ করে লেজাঁতে আসা উচিত।' তবু আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না; কারণ যক্ষ্মার হাসপাতাল দেখা কিছুমাত্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু ভোতিয়ে সেই শ্রেণীর লোক যাঁরা খানিকটে হেসে, খানিকটে যুক্তিতর্ক দিয়ে, খানিকটে অনুনয়-বিনয় করে গররাজি নিমরাজি লোককে নিজের পথে পটিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। আমি খানিকটে ধস্তাধস্তি করেছিলুম, কিন্তু তখন যদি জানতুম যে ভোতিয়ে মুসসোলীনি এবং লয়েড জর্জের কাছ থেকে আপন হাসপাতালের

জন্য টাকা বাগাতে সমর্থ হয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপত্তি না করে সুবোধ ছেলেটির মত সুড়সুড় করে লেজাঁ চলে যেতুম।

লেজাঁ যেতে হয় চেন-রেলওয়ে ধরে। এমনই ভয়ঙ্কর খাড়া পাহাড়ের উপর যক্ষ্মা সানাটরিয়ামগুলো বানানো হয়েছে যে সাধারণ ট্রেন, এমনকি মোটরও সেখানে পৌঁছতে পারে না।

হোটেল আছে; কিন্তু যখন নিতান্ত এসেই গিয়েছি তখন সানাটরিয়ামের ভিতর থাকলেই তো দেখতে পাবো বেশি।

মসিয়ো ভোতিয়ে, মাদাম, এমনকি বাচ্চা দুটো পর্যন্ত আমাকে দিল-খোলা অভ্যর্থনা জানালেন। বাচ্চা দুটোর বয়স ছয় আর আট। এদের জন্ম হয়েছে এই সানাটরিয়ামেই। তারা সুস্থ। শ'খানেক যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে তারা খায়-দায় খেলাধুলা গল্পগুজোব করে—বাপ-মা'র তাতে কোনো ভয় নেই। আমিই তাহলে ভয়াব কেন?

মসিয়ো ভোতিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, যক্ষ্মা রোগটা ছেলেছোকরাদেরই হয় বেশি। এবং এ রোগটার সবচেয়ে বড় ডেরা থাটানো রয়েছে স্কুলেজে কলেজে। কলেজের ছোকরারা এ রোগে মরেও সবচেয়ে বেশি; অপেক্ষাকৃত বয়স্ক রোগী কিংবা নিতান্ত বাচ্চাকে বাঁচানো অনেক সহজ।

'তার প্রধান,—প্রধান কেন, একমাত্র কারণ, যক্ষ্মা হলেই তাদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। তারা তখন ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে। ভাবে, পড়াশোনা যদি নাই করতে পারলুম তবে দু'পাঁচ বৎসর পরে সেরে গিয়েই বা করব কি? খাবো কি? সংসারই বা পাতবো কি দিয়ে?'

'তাই তারা রোগের সঙ্গে লড়বার আর কোনো প্রয়োজন দেখতে পায় না, সব হিম্মৎ হারিয়ে ফেলে, এগিয়ে মৃত্যুর হাতে আপন জানটি ভেট দেয়।'

মসিয়ো ভোতিয়ে বললেন, 'যবে থেকে আমি যক্ষ্মা রোগ নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছি তখন থেকেই আমি কাজে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অবসর সময়ে অহরহ ভেবেছি এর কোনো প্রতিকার করা যায় কিনা? শেষ পর্যন্ত আমি যে প্রতিকার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি তারই ভিতরে আজ আপনি আমি বসে কথা বলছি—তার নাম 'সানটারিয়াঁ ইউনিভের্সিতের', অর্থাৎ 'বিশ্ববিদ্যালয়-আরোগ্যায়তন'।

'এখানে শুদ্ধমাত্র কলেজের ছেলেমেয়েদের নেওয়া হয়। এবং জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের বন্দোবস্ত যেন আমাদের রোগীদের টার্ম হিসেবে

নেওয়া হয়—অর্থাৎ এরা জিনীভায় ক্লাস না করে ক্লাস করছে এই সানা[illegible]।
এরা এখানেই পড়াশোনা করে, সুইট্জারল্যাণ্ডের সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপকরা এখানে এসে মাঝে মাঝে লেকচার দিয়ে যান, তাছাড়া যক্ষ্মাবৈরী বহু নিমন্ত্রিত রবাহুত গুণী এখানে এসে দু'দশ দিন থেকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় নানাপ্রকারে সাহায্য করে যান।

'বুঝতেই পারছেন, যে-সব বিষয় নিলে ভয়ঙ্কর বেশি খাটতে হয়, সেগুলোর ব্যবস্থা এখানে নেই। তাই নিয়ে ছেলেমেয়েরাও বেশি কান্নাকাটি করে না, তারা জানে, সে ধরনের পড়াশোনা করলে তাদের শরীর কখনো সারবে না। তারা খুশি, কোনো কিছু একটা নিয়ে পাস দিতে পারলেই; কাজেই বিজ্ঞানের ছেলে দর্শন নিতে আপত্তি করে না, ইঞ্জিনিয়ারিঙের ছেলে ইতিহাস উৎসাহের সঙ্গেই পড়ে।

'অবশ্য স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর পড়াশোনার মেকদার নির্ভর করে। আমাদের সব সময় কড়া নজর, কেউ যেন বড্ড বেশি না খাটে। কিছুদিন থাকার পর রোগীরা ও তত্ত্বটা বুঝে ফেলে, আর নূতন রোগীদের ধমক দিয়ে ব্যাপারটা তাদের কাছে জলের মত তরল করে দেয়। আমাকে তো আজকাল এ-নিয়ে বিল্‌কুল মাথা ঘামাতে হয় না। ওদের চিকিৎসার দিকে এখন আমি আরো বেশি সময় দিতে পারি।'

একটুখানি চোখ টিপে, মুচকি হেসে বললেন, 'পড়াশোনা বিশেষ হয় না, সে তো বুঝতেই পারছেন। তা নাই বা হল। ছেলেমেয়েরা সাহস তো পায় বেঁচে থাকবার, সেইটেই হল আসল কথা। জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ও আমার কলটা বেশ বুঝতে পেরেছেন,—আমিই তাদের খোলাখুলি বলে রেখেছি, এখানে মধ্যযামিনীর তৈল ক্ষয় নিষিদ্ধ, বেশি পড়াশোনা এখানে হতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা তো হৃদয়হীন পাষাণ নন; এখানে থেকে যারা পরীক্ষা দেয়, তাদের প্রতি তাঁরা সদয়, আর যারা সেরে উঠে বাকী টার্মগুলো জিনীভায় কাটায় তাদের প্রতিও মোলায়েম ব্যবহার করেন।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কিন্তু টাকা পাই কোথায়? অঢেল টাকার দরকার। আমি পনেরো বছর ধরে তামাম ইয়োরোপ চষে বেড়াচ্ছি টাকার জন্য। মুসোলীনি, লয়েড জর্জ থেকে আরম্ভ করে যেখানে যে আমাকে সামান্যতম সাহায্য করতে পারে তারই দরজায় হ্যাট পেতে ভিক্ষা মেঙেছি।

'এখন আমার ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটিকে ইণ্টারন্যাশনাল—সর্বজনীন সার্বভৌমিক

করার। ভারতবর্ষ থেকে যদি রোগী ছাত্র আসে তবে তার জন্যও যেন এখানে ব্যবস্থা করতে পারি, সেও যেন নিরাময় হয়, সঙ্গে সঙ্গে জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে দেশে ফিরতে পারে। আপনাদের দেশে তো আজ মহারাজাদের অনেক টাকা—দানখয়রাতও তাঁরা করেন শুনেছি।

আমি মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'এককালে রাজ-রাজড়ারা বিস্তর দান-ধ্যান করতেন এ-কথা সত্যি, আজকালও যে একেবারে নেই সে-কথা আমি বলব না। আপনি যদি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসেন তবে একটা চেষ্টা দিয়ে দেখতে পারি। আমার দ্বারা যোগসূত্র স্থাপনের যেটুকু সামান্য সাহায্য সম্ভবপর—'

ডক্টর ভোতিয়ে আমার দু'খানা হাত চেপে ধরে নীরবে আমার চোখের দিকে সকৃতজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

আমি দেশে ফিরে এলুম। তারপর লেগে গেল ১৯৩৯-এর লড়াই। সুইট্জারল্যাণ্ড ছোট্ট দেশ। সীমান্ত রক্ষার জন্য ভোতিয়ের মত ডাক্তারকে উর্দি পরে ব্যারাকে ঢুকতে হল—অবশ্য ডাক্তারের উর্দি। কিন্তু তাঁর এ-দেশে আসাটা আর হয়ে উঠল না।

* * *

মসিয়ো লুই ভোতিয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডের লেস্য নামক স্থানে যে 'আরোগ্যায়তন বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানে যক্ষ্মা সারানোর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখানোর অভিনব সমন্বয় বহু সুইট্জারল্যাণ্ডবাসীর হৃদয়মন আকৃষ্ট করেছে। তাঁরা অকৃপণ হস্তে এ প্রতিষ্ঠানে অর্থদান করেছেন এবং তাঁদেরও ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে ক্রমে বিশ্বজনের সম্পদ হয়ে উঠুক কিন্তু উপস্থিত জাতীয়তা-বাদ নামে যে বর্বরতা পৃথিবীকে শতধা বিভক্ত করে দিচ্ছে, তার সামনে মসিয়ো ভোতিয়ে নিরুপায়। তাই আমার বিশ্বাস যতদিন সুইট্জারল্যাণ্ডে বিশ্বকল্যাণের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা না হয়, ততদিন এ-দেশে আমাদেরও চুপ করে বসে থাকা অনুচিত হবে। লেজ্যাঁতে যে প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর হয়েছে, এদেশের বা তা হবে না কেন? বরঞ্চ এদেশে তার প্রয়োজন অনেক বেশি; কারণ এদেশের ছাত্র-সমাজে যক্ষ্মারোগের যে প্রসার তার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের তুলনা হয় না। অস্মদেশীয় যক্ষ্মাবৈরী সজ্জন সম্প্রদায় আশা করি কথাটা ভেবে দেখবেন।

কিন্তু এ-হেন গুরুতর বিষয় নিয়ে সাদৃশ অর্বাচীন জনের অত্যধিক বাগাড়ম্বর অশোভনীয়। আমার উচিত যোগাযোগের ফলে আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

হয়েছে সেইটে পাঁচ জনকে শুনিয়ে দেওয়া। তারপর কে কি করল না করল তা নি য় আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

লেজাঁয় যক্ষ্মারোগের জন্য কি চিকিৎসা করা হয়, সে সম্বন্ধে সালঙ্কার বিবৃতি দেবার প্রয়োজন নেই। দক্ষিণ ভারতের মদনপল্লীর 'আরোগ্য বরমে' যে-সব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো ত আছেই তার উপর লেজাঁ এবং ডাভোসের অন্যান্য মামুলি সানাটরিয়াতে যক্ষ্মারোগ বাবদে যে-সব গবেষণা অষ্টপ্রহর করা হচ্ছে, তার ফলও মসিয়ো ভোতিয়ে অহরহ পাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান। এবং তার এক প্রধান অঙ্গ নানাদেশের নানা গুণীকে লেজাঁতে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করা। তার জন্য ভোতিয়ের প্রতিষ্ঠানে একটি চমৎকার লেকচার থিয়েটার আছে। অন্যান্য সানাটরিয়াতে এ রকম হলের প্রয়োজন হয় না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি লেজাঁ পৌঁছবার ঠিক কয়েকদিন আগে দু-তিনজন বড় বড় পণ্ডিতের গুরু গুরু ভাষণের গুরুভোজনের ফলে ছেলেমেয়েরা ঈষৎ কাতর হয়ে পড়েছিল। তাই বোধকরি, মসিয়ো ভোতিয়ে একটা জব্বর রকমের জোলাপের ব্যবস্থা করছিলেন।

মসিয়ো ভোতিয়ে আমাকে সোজাসুজি বললেন, 'আপনি একটা লেকচার দিন। জর্মন কিংবা ফ্রেঞ্চ, যে-কোনো ভাষায়।'

আমি বললুম, 'আপনি যদিও জাতে সুইস, আপনার মাতৃভাষা ফরাসী এবং আপনি ফরাসী ঐতিহ্যে গড়ে-ওঠা বিদগ্ধজন। কাজেই আপনিও নেপোলিয়েনের মত 'অসম্ভব' কথাটায় বিশ্বাস করেন না এবং তাই আপনার পক্ষে এ অনুরোধ করাটা 'অসম্ভব' নয়; আমি কিন্তু ফরাসী নই, আমি 'অসম্ভব' কথাটা জানি এবং মানি। আমার পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব।'

এগারো বৎসর হয়ে গিয়েছে, সম্পূর্ণ কথোপকথনটা আমার আজ আর মনে নেই। তবে চোখ বন্ধ করলে যে ছবিটি এখনো মনের ভিতর দেখতে পাই, তাতে আছে—এক বিরাট ফ্রাঙ্কেনস্টাইন যেন আমার দিকে দু'বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে আর আমি ক্রমেই পিছু হটে শেষটায় দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আর পিছু হটবার জায়গা নেই। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দু'হাত আমার গলা টিপে ধরেছে। হাত দুখানি বলছে, এতগুলো রোগীকে আপনি নিরাশ করবেন?'

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলুম,

'পড়েছি যবনের হাতে
খানা খেতে হবে সাথে।'

* * *

ঝটপট্ ইশ্‌তিহার বেরিয়ে গেল 'ভারতীয় অমুক কাল সন্ধ্যায় লেজাঁর 'সানতরিয়োঁ ইউনিভেসিতের হলে' একখানা ভাষণ দেবেন। বিষয়····। লেজাঁর তাবৎ সানাতরিয়োঁর অধিবাসীবৃন্দকে সাদর নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ভোতিয়ে সায়েবের প্রতিষ্ঠানের পাঁচজন তো আসবেই, অন্যান্য সানাতরিয়োঁর আরো বহু ডুশ্‌মনকে ডাকা হয়েছে আমার মুখোশ খসাবার জন্য—কিন্তু ধর্ম সাক্ষী, আমি অনেক মুখোশ পরেছি বটে, পাণ্ডিত্যের মুখোশ কখনো পরিনি।

ভোতিয়ে বললেন, 'চলুন, হলটার ব্যবস্থা কি রকম হল দেখবেন।'

লোকটা নিশ্চয়ই স্যাডিস্ট। এই যে সামনে পুজো আসছে, আমরা তো কখনো বলির মোষটাকে হাড়িকাঠ দেখিয়ে চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ করে ঠোঁট চাটিনে।

গিয়ে দেখি মধ্যিখানে বেশ খানিকটে জায়গা ফাঁকা রেখে চতুর্দিকে চেয়ার বেঞ্চি পাতা হয়েছে। তবে কি আমাকে ওখানে ফেলে জবাই করা হবে —আমার ছটফটানির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে? কি হবে বৃথা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে? গর্দিশ, গর্দিশ, সবই কপালের গর্দিশ।

ভোতিয়ে ব্যবস্থাটা দেখে চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ করলেন, অদৃশ্য সাবানে হাত দুটো কচলালেন। বুঝলুম, আমার অনুমান ভুল নয়। জবাইটা জব্‌বর ধরনেরই হবে।

ক্রম থর্ন টু থর্ন অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় ভোতিয়ে আমাকে সেই হলে নিয়ে ঢোকালেন।

দেখি ফাঁকা জায়গাটা ভরে গিয়েছে বিস্তর হুইল চেয়ারে। যে-সব রোগীর পায়ের হাড়ে যক্ষ্মা অথবা যাদের নড়াচড়া করা বারণ, তাদের আনা হয়েছে হুইল চেয়ারে করে। জন দুই শুয়ে আছে লম্বা লম্বা কৌচ সোফায়। পরে জানলুম, যারা নিতান্তই খাট ছাড়তে পারে না তাদের জন্য ঘরে ঘরে 'ইয়ার ফোনের' ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একজন দেখি হুইল চেয়ারে বসে পাইপ টানছে। তখন আমার গর্দানে ঘি মালিস করা হচ্ছে—অর্থাৎ কে যেন যা-তা আবোল-তাবোল বকে আমার পরিচয় দিচ্ছে। ভোতিয়ে আমার পাশে বসে—পাছে আমি শেষ মুহূর্তে পালাবার চেষ্টা করি। কানে কানে জিজ্ঞেস করলুম 'পাইপ-সিগারেট খাওয়া যক্ষ্মারোগীদের বারণ নয়?' ভোতিয়ে বললেন, 'ভিতরে তামাক না থাকলে নিশ্চয়ই বারণ নয়। আমি

বললুম, অর্থাৎ?' 'অর্থাৎ বেচারীর যক্ষ্মা হওয়ার পূর্বে সে দিনরাত পাইপ টানত। অভ্যাসটা সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেনি বলে এখন খালি-পাইপ কামড়ায়। ধুঁয়ো বেরুচ্ছে না বলে দাঁত কিড়িমিড়ি খায়, আর হরে দরে প্রতি মাসে গোটা সাতেক ভাঙে। কিন্তু ছেলেটা পাইপ বাবদে জউরি। 'ব্রায়ার' ছাড়া অন্য কোনো পাইপ চিবোতে রাজী হয় না।'

আপনি ভাবছেন, শ্রোতারা যক্ষ্মারোগী, তাই তাদের বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখ-চোখ। আদপেই না। আপেলের মত লাল গাল প্রায় সব্বায়ের, চোখে মুখে উৎসাহ আর উত্তেজনা। যার দিকে তাকাই সেই যেন আমায় হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছে, সবাই যেন বলছে, 'কি ভয় তোমার? এত দূর দেশ থেকে এসেছো, যা-ই বলো না কেন আমরা কান পেতে শুনবো।'

তবু আমি মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করলুম আমাকে ত্রাণ করার জন্য।

তারপর কি হল?

তারপর কি হল? ভয়ে আমার হাত পা পেটের ভিতরে সেঁধিয়ে গিয়েছে; আর আজ যদি আপনাদের কাছে স্বীকারও করি যে তারা বক্তৃতা শেষে আমার দিকে পচা ডিম আর পচা টমাটো ছুঁড়েছিল, তাহলেও আপনাদের চারখানা হাত গজাবে না!

আমি কি বলেছিলুম?

সে বকবকানি আপনারা তো প্রতি হপ্তায় শোনেন। নূতন করে বলে আর লাভ কি?

ইস্কিলাস—সেলি—স্পিটলার

বিদ্রোহী মানুষকে সমাজের কড়া বাঁধন মেনে নেবার জন্য গ্রীক নাট্যকার ইস্কিলাস যে নাটকখানি লেখেন তার নাম প্রমিথিয়ুস বাউণ্ড—শৃঙ্খলবদ্ধ প্রমিথিয়ুস। ইস্কিলাস ইচ্ছে করেই নাটকের পাত্র-পাত্রী দেবসমাজ থেকে বেছে নিয়েছিলেন। ভাবখানা অনেকটা এই;—খুদ দেবতারাই যখন নিয়ম-কানুন না মেনে চলতে পারেন না তখন তুমি আমি কোন্ ছার। নাটকের

মূল গল্প হচ্ছে ; প্রমিথিয়ুস দেবতাদের পরম যত্নে লুকিয়ে-রাখা-সাত-রাজার-ধন-মানিক অগ্নি জিনিসটি চুরি করে মানুষের হাতে তুলে ধরেন, তাই দিয়ে মানব-সভ্যতা গড়ে ওঠে। দেবরাজ জুপিটার ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে প্রমিথিয়ুসকে পাহাড়ের গায়ে পেরেকে পুঁতে বেঁধে রাখলেন, শকুনি দিয়ে বুকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ালেন, যাতে করে প্রমিথিয়ুস আপন পাপ স্বীকার করে সোজা রাস্তায় চলেন। প্রমিথিয়ুস সে নিপীড়ন সহ্য না করতে পেরে শেষটায় হার মানলেন। জুপিটার খুশি, ইস্কিলাস আরো বেশি খুশি—স্বর্গরাজ্য ধর্মরাজ্যে পরিণত হল।

আমাদের কবিগুরু রামায়ণে এরকম কোনো ধর্মনীতি প্রচার করতে চেয়েছিলেন কিনা জানি না কিন্তু সেখানেও রাবণকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছিল।

তারপর প্রায় দু'হাজার বছর কেটে গেল। দেবতাদের হুমকির ভয়ে কি গ্রীস, কি ভারতবর্ষ কেউই প্রমিথিয়ুসের মত তাঁদের সামনে মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে সাহস পেল না। কিন্তু তবু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, এই দু'হাজার বৎসর ধরে যাদের বুকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ান হল ; তারা কি সব সময়ই ভিতরে বাইরে দু'দিকেই আপন 'পাপ' স্বীকার করে নিয়েছিল ? তাদের ভিতর কি এমন কেউ ছিল না যে বাইরে ক্ষমা চেয়েছে হয়ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মরেছে যে দেবতার অনুশাসনই চিরন্তন ধর্ম নয় ; যেখানে নিপীড়ন দিয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা বের করতে হয় সেখানে নিশ্চয়ই কোনো দুর্বলতা, কোন ত্রুটি লুকনো রয়েছে।

এই কথাটি জোর গলায় বলবার মত সাহস প্রথম দেখালেন ইংরেজ কবি শেলি। তখনকার দিনে রূঢ়ার্থে ভগবান বলতে যা বোঝাত শেলি সে পুরুষকে অস্বীকার করলেন, আর সেই ভগবানের নামে গড়া তখনকার দিনের সমাজের আইন-কানুন ভাঙতে কসুর করলেন না। ভগবানের পুলিসমেন, অর্থাৎ পাদ্রী পুরুতরা তখন শেলির পিছনে জুপিটারের মতনই শকুনি লাগিয়ে দিলে, শেলির অনেকখানি কলিজা খাওয়ান হল, শেলি অসহ্য যন্ত্রণায় বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন, শেলিরও চোখের পাতার অনেকখানি শকুনির পেটে গিয়েছিল। কিন্তু তবু শেলি হার মানেন নি।

এবং সেই না-মানা অজরামর রূপ নিয়ে বেরল তাঁর নাট্যকাব্য 'প্রমিথিয়ুস আনবাউণ্ড'—মুক্ত প্রমিথিয়ুস। শুনেছি, এক জাপানী চিত্রকর নাকি

তার বুকের জখমের রক্ত দিয়ে তুলি ভিজিয়ে ভিজিয়ে ছবি আঁকতেন বলে তাঁর ছবি সমস্ত জাপানের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। হয়ত রূপক, হয়ত সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, শেলির প্রমিথিয়ুস নাট্য বুকের রক্ত দিয়ে আঁকা। অত্যাচার জর্জরিত মানবাত্মার তীক্ষ্ণতম চিৎকার, ধর্মপ্রতিষ্ঠান সমাজবিধির বিরুদ্ধে মানবের গম্ভীরতম হুঙ্কার এ কাব্যে যে রূপ, যে রস পেয়েছে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত দ্বিতীয় বাক্য তো সহজে খুঁজে পাইনে।

(আর পাঁচজন হয়ত স্বীকার করবেন না, কিন্তু আমার মনে হয় মধুসূদনের রাবণ চরিত্রে যেন আমি খানিকটা সেই সুর শুনতে পাই। কিন্তু হিন্দু সমাজ তো মধুসূদনের উপর কোনো অত্যাচার করেননি—তাঁর তুলনায় হিন্দু ঈশ্বরচন্দ্রকে তো অনেক বেশি কটুবাক্য শুনতে হয়েছে—তখনকার দিনের কলকাতার বিদগ্ধ ইতর কোনো সমাজই তো মধুসূদনের পিছনে শকুনির পাল চালিয়ে দেননি। তবু হয়তো হৃদ্যতার অভাব দেখতে পেয়েছিলেন এবং হয়তো মনে মনে আপন সত্য ধর্মবর্জন সম্বন্ধে ঈষৎ বিবেকদংশনে কাতর হয়েছিলেন। তাই বোধহয় তিনি অন্য চরিত্র না দিয়ে রাবণকে বেছে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ রাবণের যে গোড়ার দিকে খানিকটা দোষ আছে এ কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই হয়ত প্রমিথিয়ুস ও রাবণ এক পাত্র নয়। শেলির প্রমিথিয়ুস বলে, আমি কোনো দোষ করিনি। মধুসূদনের রাবণ বলে, 'একবার দোষ করেছিলুম বলেই কি আমাকে বিনষ্ট করার জন্য দেব-নর-বানর সবাই একজোট হয়ে সর্ব ধর্ম সব ক্ষাত্রনীতি বিসর্জন দেবে?')

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেল, এমন কি বড় বড় শহরে সমাজের তিরস্কারও গাড়িঘোড়ার শব্দের নীচে চাপা পড়ে গেল। প্যারিস তো এমন জায়গায় গিয়ে পৌছল যে, সেখানে যে শুধু সমস্ত পৃথিবীর মুক্তিকামী নর-নারী সম্মিলিত হল তাই নয়, আধা-পাগল বদ্ধপাগল এমন সব চিত্রকর কলাবৎকে প্যারিস সয়ে নিল যাঁরা আপন দেশে থাকলে আর কিছু না হোক অন্ততঃ পাগলা গারদের ভিতরে জীবনের বেশির ভাগ কাটাতেন।

কিন্তু এসব মুক্তির বদলে মানুষ তখন আরেক দেবতার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। অর্থের এবং সঙ্ঘের অত্যাচার।

না খেয়ে মানুষ যে পূর্বে কখনো মরেনি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এবারে কলকারখানার জোরে, মানুষের পয়সা কামাবার হাতিয়ার কেড়ে

নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান যে সঙ্ঘ গড়ে উঠল তার অত্যাচার দেশ-বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লুণ্ঠন যে আগে ছিল না তা নয়, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যবাদের নামে যে শোষণ আরম্ভ হল তার আর শেষ নেই। চেঙ্গিস নাদির আট্টিলা আসত দু'দিনের তরে; কিন্তু এখন যে পাদ্রী কামান রাজপুরুষ বণিক পুলিস আসতে লাগল তার আর অন্ত নেই। তাদের শোষণ দিনযামিনী, সায়ং প্রাতঃ, শিশির বসন্ত, যুগ যুগ ধরে। জমিদার ব্যারণ যে সুন্দরী ধরে নিয়ে যেত সে তো অজানা নয়। কিন্তু এখন বড় বড় দোকানের চাকরিতে তরুণীদের আর নিস্তার নেই। বড় সায়েবদের বিলাস লালসায় যে রানীমেধ যজ্ঞ জ্বলে তার ইন্ধন অষ্টপ্রহর দেদীপ্যমান রাখবার জন্য আর কোনো তরুণীর বসনভূষণ বাঁচিয়ে রাখবার উপায় নেই।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাকাব্য রচনা করলেন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের মহাপুরুষ কার্ল স্পিটলার। সে কাব্যের নাম প্রমেটয়েস উন্ট এপিমেটয়েস (Prometheus and Epimetheus)। এ কাব্যের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন আর কোনো কাব্য আমার জানা নেই। গুরুগম্ভীর গদ্যচ্ছন্দে লেখা সে কাব্য, পদ্যের সর্বোচ্চ শিখরে জ্যোতিষ্মান ভাস্করের ন্যায় সে গদ্য। এ গদ্য ছন্দ পাই উপনিষদ, বাইবেল এবং কুরানে। এবং উপনিষদ, বাইবেল, কুরানের অনুবাদ যে-রকম অসম্ভব, এ কাব্যের অনুবাদও মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ-কাব্য রচনা করে স্পিটলার নোবেল প্রাইজ পান, তৎসত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ-কাব্যের অনুবাদ হয়নি।

স্পিটলার যে অত্যাচার অবিচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রমিথিয়ুসের কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, সে অত্যাচার ইতিমধ্যে আরও রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। কলকাতার বুকের উপরই তার নব নব তাণ্ডব আমরা দেখতে পাচ্ছি! মানুষের গড়া দুর্ভিক্ষ, দৈনন্দিন অনশন, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, 'দৈন্যের দায়ে দেহ বিক্রয়, নিরপরাধের উপর গুলিবর্ষণ, সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, মানুষের প্রাণ নিয়ে বিবেকহীন রাজনীতিকদের ছিনিমিনি খেলা, অরক্ষণীয়ার অন্ধকার ভবিষ্যৎ, অর্থের জোরে সমাজের বুকের উপরে বসে অন্নাভাবে মৃত্যুভয়ে কাতর পিতামাতার সম্মুখে তাদের কুলকামিনীর সর্বনাশ, ভ্রূণহত্যা—সবই তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু কই সে বাঙালী স্পিটলার ? ?

মোপাসাঁ—চেখফ্—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে অনেক তথ্য ও অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শুনেছি রোন্টগেনের রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার, ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার এ রকম যোগাযোগের ফল। সাহিত্যে এ রকম ধারা বড় একটা হয় না। শুধু ছোট গল্পের বেলা তাই হয়েছে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, রোন্টগেন ও ফ্যারাডে যদি বহু বৎসর ধরে আপন আপন জ্ঞানচর্চায় নিবিষ্ট না থাকতেন, তাহলে যে-সব যোগাযোগের ফলে রঞ্জনরশ্মি ও বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার হল সে সব যোগাযোগ বন্ধ্যাই থেকে যেত। ছোট গল্পের বেলাও তাই—মোপাসাঁ যদি সাহিত্য সাধনায় পূর্বের থেকেই নিযুক্ত না থাকতেন, তবে ফ্লবেরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হত।

ফ্লবের যে কি অদ্ভুত সুন্দর ফরাসী লিখে গিয়েছেন, তার বর্ণনা দিতে পারেন শুধু ফ্লবেরই! ভলতেয়ের পরেই ফ্লবেরের নাম করতে হয় এবং এঁদের মাঝখানের যে-কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক পেলেও বাঙলা ভাষা বর্তে যাবে। আর ফ্লবেরের আশা শিকেয় তুলে রাখাই ভালো, তাঁর মত লেখক জন্মাবার পূর্বে এদেশের গঙ্গায় বিস্তর চড়া পড়ে যাবে। তার কারণ এ নয় যে আমাদের দেশে শক্তিমান লেখকের অভাব, বেদনাটা সেখানে নয়, আসল বেদনা হচ্ছে আমাদের লেখকেরা খাটতে রাজী নন। ফ্লবেরের লেখা পড়ার সময় বোঝাই যায় না তার পিছনে কি অসম্ভব পরিশ্রম রয়েছে, কারণ সে পরিশ্রমের উপরে ফ্লবেরকে আরো পরিশ্রম করতে হয়েছে গোড়ার পরিশ্রমটা ঢাকবার জন্য। ভলতেয়ের সরল স্বচ্ছ শৈলীর প্রশংসা করলে তিনি নাকি করুণ হাসি হেসে বলতেন, ফরাসী জাতটা কি আর জানে তাদের কষ্ট বাঁচাবার জন্য আমি নিজে কতটা কষ্ট স্বীকার করি?' ফ্লবের এ-কথাটা বললে মানাতো আরো বেশি—তিনি তো শেষটায় সে পরিশ্রম সইতে না পেরে লেখাই ছেড়ে দিলেন।

ধুয়ে মুছে কেচে ইস্ত্রি পাট না করা পর্যন্ত ফ্লবের ভাষাকে রেহাই দিতেন না। তাই যখন শাগরেদ মোপাসাঁর ভিতর ফ্লবের গুণের সন্ধান পেলেন তখন তিনি মোপাসাঁর লেখার উপর নির্মম র‍্যাঁদা চালাতে আরম্ভ করলেন। আর কী সব অদ্ভুত ফরমায়েশ—দশ লাইনে করুণ বর্ণনা লেখো, পনেরো লাইনে বীররস বাৎলাও, এটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ওটা ছাপিয়ো না—অর্থাৎ ফ্লবের শাগরেদ মোপাসাঁকে ধুয়ে মুছে কেচে তৈরি করে প্রায় পকেটস্থ করে ফেলেছেন, এমন সময় তাঁর ডাক পড়লো সেই লোক থেকে যেখানে রসসৃষ্টি করা যায় বিনা পরিশ্রমে—স্বর্গলোকে পরিশ্রম নেই বলেই মর্তলোকের সৃষ্টি হয়েছিল এ-কথা বাইবেলে লেখা আছে।

এই তালিমের ফলেই ছোট গল্পের সৃষ্টি। মোপাসাঁর পূর্বের লেখকেরা কি বর্ণনা, কি চরিত্রে বিশ্লেষণ, কি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সবকিছুই লিখতেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ছোট গল্প লিখতে হলে যে বাকসংযম দরকার, বিস্তর কথা অল্প কথায় প্রকাশ করবার যে কেরামতি প্রয়োজন, প্রকাণ্ড আলোটার চতুর্দিক কালো কাপড়ে ঢেকে তার সামনের দিকে পুরু কাঁচ লাগালে যে রশ্মির তীব্রতা বাড়ে সেই জ্ঞান মোপাসাঁর পূর্বে কারো ছিল না, অথবা তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেন নি। সর্বাঙ্গ বেনারসীতে ঢেকে মুখ থেকে শুধু ঘোমটা সরিয়ে ফিক করে এক ঝলক হেসে সুন্দরী চলে গেল—মোপাসাঁর পূর্বে ফরাসীরা যেন এ-অভিজ্ঞতার কল্পনাই করতে পারেন নি। তাঁদের কায়দাটা কি ছিল সে কথা ফেনিয়ে বলার সাহস আমার নেই—কলিকাতা এ সব বাবদে প্যারিসের মত 'উদার' নয়!

এ সব নিছক যোগাযোগের কথা। মোপাসাঁর আপন কৃতিত্ব তবে কোন্‌খানে? গল্পটাকে বিশেষ এক জায়গায় এনে অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়া, এবং সেই অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়াটাই গল্পের সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করল—ইংরিজীতে যাকে বলে 'ক্লাইমেক্স'—এইখানেই মোপাসাঁর বিশেষত্ব। মোপাসাঁর পূর্বের ঔপন্যাসিকেরা তাবৎ নায়ক-নায়িকাদের জন্য একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত না করে উপন্যাস বন্ধ করতেন না। নটে গাছটি তাঁরা এমনি কায়দায় মুড়তেন যে, পাঠকের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকত না যে এদের জীবনে আর কিছু ঘটতে পারে না, এরা এখন থেকে 'পুত্র কন্যা লাভ করতঃ পরমানন্দে জীবন যাপন করিল' অথবা 'অনুতাপের তুষানলে তিলে তিলে দগ্ধ হইতে লাগিল।'

ক্লাইমেক্‌স্ আবিষ্কার মোপাসাঁর একান্ত নিজস্ব।

মোপাসাঁর পর বিস্তর লেখক এন্তার ছোট গল্প লিখেছেন, কেউ কেউ মোপাসাঁর চেয়ে ভালো লিখেছেন ; কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সব গল্পই মোপাসাঁর ছাঁচে ঢেলে গড়া। মোপাসাঁ যে কাঠামোটি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাঠামোটিতে কোন ফেরফার করার সাহস কারোরই হল না।

চেখফ্ই (Chekhov, Tschehoff ইত্যাদি নানা বানানে নামটি লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারণ 'চেখফ') প্রথম এই কাঠামোতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে ক্লাইমেক্স্ বাদ দিয়েও সরেস ছোট গল্প লেখা যায়। শুধু তাই নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুব কম ঘটনাই এ রকম ধারা 'বুম্স্-প্যাঙ' করে সশব্দে ক্লাইমেক্সে এসে অরকেস্ট্রা শেষ করে। চেখফের অনেক গল্প ক্লাইমেক্সে শেষ হয় সত্য ; কিন্তু সেটা গল্পের নিজস্ব প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সব গল্পই যদি পাঠক ক্লাইমেক্সের প্রত্যাশা করে করে পড়ে, তবে সেগুলো একঘেয়ে হয়ে যেতে বাধ্য—সব কবিতাই তো আর সনেট নয় যে শেষের দুই ছত্রে কবিতার সারাংশ জোর গলায় বলে দেওয়া হবে। তাই চেখফের বহু ক্লাইমেক্স্-বর্জিত গল্পের ভারকেন্দ্র এমন এমন ভাবে সমস্ত গল্পে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যে, পাঠক রসিয়ে রসিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গল্পগুলো পড়তে পারে—ক্লাইমেক্সের আচমকা ইলেকট্রিক শকের জন্য নাক কান খাড়া করে থাকতে হয় না।

আর ভাষার দিক দিয়ে চেখফ্ মোপাসাঁকেও ছাড়িয়ে যান। টলস্টয়ের গুরুবের চেয়ে অনেক বড় স্রষ্টা এবং চেখফ্ যদিও টলস্টয়ের শিষ্য নন তবু তিনি বহু বৎসর ধরে টলস্টয়ের সাহচর্য ও উপদেশ পেয়েছিলেন। টলস্টয় স্বয়ং গর্কির চেয়ে চেখফ্কে পছন্দ করতেন বেশি—তিনি নাকি একবার গর্কিকে বলেছিলেন, চেখফ্ মেয়ে হলে তিনি তাঁর কাছে নিশ্চয়ই বিয়ের প্রস্তাব পাড়তেন।

রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের গল্পগুলি বড় ঢিলে। প্রমাণ করা কঠিন কিন্তু আমার মনে হয়, এই ঢিলে ভাব তাঁর প্রথম কাটল মোপাসাঁর গল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পে মোপাসাঁরই মত ঠাস বুনুনি দেখতে পাওয়া যায়, আর কাঠামোটাও হুবেহুবে মোপাসাঁর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত লেখক আপন বৈশিষ্ট্য বর্জন করে লিখবেন—তা সে কাঁচা লেখাই হোক আর পাকা লেখাই হোক—সে কথা অনায়াসে অস্বীকার করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের গল্প মোপাসাঁ চেখফ্ দুজনের গল্পকেই হার মানায় তার গীতিরস দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পটি কেমন যেন সঙ্গীতের কোনো এক রাগে বাঁধা। এখানে সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল রয়েছে। মৃৎশকটিকা শকুন্তলা, রত্নাবলী নাটক গ্রীক কাঠামোতে ফেলা যায় সত্য; কিন্তু এগুলিতে যে গীতিরস রয়েছে, গ্রীক নাটকে তা নেই—তাই আমরা সংস্কৃত নাটকে যে আনন্দ পাই, গ্রীক নাটকে সেটি পাইনে।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বয়সে শেলি, কীটসের প্রভাবে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য, রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাব একদিন সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। গল্পের বেলাতেও রবীন্দ্রনাথ একদিন মোপাসাঁর প্রভাব ঝেড়ে ফেলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকের গল্পগুলিতে কি যেন এক অনির্বচনীয়ের প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। 'মিস্টিক' কথাটাতে সব কিছুই ঢাকা পড়ে যায় বলে শব্দটা ব্যবহার করতে বাধো বাধো ঠেকে; কিন্তু মানব-চরিত্রের আলো-অন্ধকারের আবছায়া আঁকুবাঁকু, মানব-চরিত্রের যে দিক দৈনন্দিন জীবন আমাদের চোখে পড়ে না, মানুষকে যে সবসময় তার বাক্য আর আচরণ দিয়েই চেনা যায় না, মানুষের সেই দুর্জ্ঞেয় অন্তঃস্থল রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন আধা-আলোরই ভাষা এবং ভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ করতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ একা, মোপাসাঁ চেখফের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র সেখানে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যের মত অদ্ভুত এবং বেতাল সাহিত্য পৃথিবীতে কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ গান আর কবিতা দিয়ে যে বাঙলা গীতিসাহিত্য রচে গিয়েছেন তার কাছে এসে দাঁড়াতে পারে, এমন গীতিসাহিত্য পৃথিবীতে আর নেই বললেও চলে। মেঘদূতের মত গীতিকাব্য পৃথিবীতে নেই—রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান অনেক স্থলে কালিদাসের মেঘদূতকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে! রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকাব্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যকে যেন একসঙ্গে তেইশটা ডবল প্রমোশন পাইয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পও বিশ্বসাহিত্যের যে-কোনো কথাসাহিত্যের সঙ্গে

াধ মিলিয়ে চলতে পারে। আরো বিস্তর অতুলনীয় সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কলম দিয়ে বেরিয়েছে, তার উল্লেখ এখানে অবান্তর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টিকার। তাঁর পক্ষে অন্য লেখকের রচনা অনুবাদ করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এমনকি এ-কথা বললে ভুল লা হবে না, যেটুকু অনুবাদ তিনি করেছেন তাতে সময় নষ্ট হয়েছে মাত্র। দমফুলের কেশর ছাড়িয়ে লাট্টু বানিয়ে ছেলেরা জিনিসটাকে কাজে লাগায় বটে, বু নিষ্কর্মা কদমফুলেরই দাম বেশি।

অনুবাদ-চর্চা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশি সময় নষ্ট করেননি বলেই বোধ করি াঙলা সাহিত্য অনুবাদের দিক দিয়ে এত হীন। তাই বলছিলুম, বাঙলা াহিত্য বেতালা সাহিত্য; গীতিকাব্যে যেন সে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বিশ্ব-হ্মাণ্ডময় উড়ে বেড়ায় আর অনুবাদ সাহিত্যের বেলা সে যেন এদোঁ কুয়োর ভতরে খাবি খায়।

অথচ উনবিংশ শতকের শেষের দিকে বাঙলা ভাষায় যে অনুবাদসাহিত্যের চন দানা বাঁধতে আরম্ভ করে, তার তুলনায় আজকের দিনে তাকিয়ে দেখি ন দানা দিয়ে মিঠাই মণ্ডা তো হ'লই না, তলানির চিনিটুকু দিয়ে আজ যেন াহিত্য-সভায় পানসে শরবৎ বিলানো হচ্ছে। গীতিকাব্যে যে সাহিত্য তেইশটে বল প্রমোশন পেয়েছিল, অনুবাদে সেই সাহিত্যকেই বাহান্নটা ডিগ্রেডেশন য়ে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ করতে হলে বিদেশী ভাষা জানার প্রয়োজন। আজকের দিনে লকাতা শহরে শুধু ফরাসী বই বিক্রয়ের জন্য দোকান—সত্তর বৎসর আগে ল না—তবু আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যে যেটুকু শরবৎ আজ বিলানো হচ্ছে ার আগাগোড়া ইংরিজী থেকে।

অথচ উনবিংশ শতকের শেষের দিকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসী হিত্যের উত্তম উত্তম রস-সৃষ্টি বাঙলায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। বিংশ তকেও তিনি এই কর্মে লিপ্ত এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি একাজে ান্ত দেননি। ঠিক স্মরণ নেই, তবে খুব সম্ভব লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের রাট মারাঠী গীতার অনুবাদই তাঁর শেষ দান।

আশ্চর্য বোধ হয় যে, বাঙালী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভুলে গিয়েছে। সংস্কৃত কে তিনি যে সব নাটক অনুবাদ করেছিলেন সেগুলোর কথা আজ থাক! পণ্ডিত পিয়ের লোতির একখানা বইয়ের কথা স্মরণ করছি।

পিয়ের লোতির মত লেখক পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন। শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে, সম্পূর্ণ অজানা, অদেখা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা গড়ে তোলা যে কি কঠিন কর্ম, তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন, যাঁরা কখনো এ-চেষ্টায় দণ্ডমাত্র কালক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার মত দুর্মতি কোনো বাঙালীর হওয়ার কথা নয়, তাই বলতে আপত্তি নেই যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অদেখা বা অল্পদেখা জিনিস নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করাটা পছন্দ করতেন না। সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে পাহাড় এবং সমুদ্রের পরিচয় অতি কম—তাই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ এ দু'টো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন যতদূর সম্ভব কম। শীতপ্রধান দেশের পাতা-ঝরা হেমন্ত ঋতু, শুভ্র মল্লিকা বর্ষণের মত বরফপাত যে কি দর্শনীয় বস্তু, সিনেমা থেকেও তার খানিকটে আন্দাজ করা যায়,—রবীন্দ্রনাথ এসব দেখেছেন, উপভোগ করেছেন বহুবার ; কিন্তু কোথাও তার বর্ণনা করেছেন বলে তো মনে পড়ে না।

পিয়ের লোতির বৈশিষ্ট্য এইখানেই। তিনি জাপান, তুর্কী, আইসল্যাণ্ড এবং আরও নানাদেশের যে সব ছবি ফরাসী ভাষায় এঁকে দিয়ে গিয়েছেন, সে-সব পড়ে মনে হয় ভাষার ভিতরে সঙ্গীত, বর্ণ, গন্ধ একসঙ্গে মিলে গিয়ে কি করে এইরূপ রসবস্তু নির্মাণ হতে পারে। মনে হয়, একসঙ্গে যেন পঞ্চেন্দ্রিয় রস গ্রহণ করছে, মনে হয় কারো কলম যদি নিতান্ত অরসিক জনকে দেশ-কাল-পাত্র ভোলাতে সক্ষম হয়, তবে সে কলম পিয়ের লোতির।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লোতি যে বইখানা লিখেছেন তার নাম 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'। অর্থাৎ 'ভারতবর্ষ, কিন্তু ইংরেজকে বাদ দিয়ে'। অর্থাৎ তিনি ভারতবর্ষের ছবি আঁকতে বসেছেন কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছেন যে, এ-দেশের ইংরেজদের সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবেন না।

স্বীকার করি, 'ইংরেজ-বর্জিত-ভারত' ('বসুমতী' কর্তৃক প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য) 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'র ঠিক অনুবাদ নয়, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদশশাঙ্কে ঐ একটি মাত্র কলঙ্ক। বাদবাকী পুস্তকখানা অনুবাদ-সাহিত্যে যে কি আশ্চর্য কুতুব-মিনার, তার বর্ণনা দিতে হলে লোতির কলমের প্রয়োজন।

ত্রিবাঙ্কুরে লোতি ভারতীয় সঙ্গীত শুনে বিস্ময়ের উচ্ছ্বাসে সে-সঙ্গীতের বর্ণনাতে কত না স্বর কত না ধ্বনি মিশিয়ে দিয়েছেন ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা সে স্বর সে-ধ্বনি অবিকল বাজিয়ে চলেছে। মাদ্রাজে লোতি ভারতনাট্যম

দেখে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে মানবহৃদয়ের যত প্রকারের আশা-নৈরাশ্য, ঘৃণা-ক্রোধ, আকুলি-বিকুলি সম্ভব হতে পারে, সব কটি প্রকাশ করেছেন কখনো গম্ভীর মেঘমন্দ্রে, কখনো মধুর বীণাঝঙ্কারে, কখনো শব্দ সমন্বয়ের চটুল নৃত্যে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা-বীণা যেন প্রতি মন্দ্র, প্রতি ঝঙ্কার, প্রতি বাঞ্জনা ঠিক সেই সুরে রসসৃষ্টি করেছে। ইলোরার স্থাপত্য-ভাস্কর্য লোতিকে বিহ্বল ভয়াতুর করে ফেলেছে, অনির্বচনীয় চিরন্তর সত্তার রসস্বরূপে স্বপ্রকাশ দেখিয়ে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনী লোতির বিহ্বল ভয়ার্ত হৃদয়ের প্রতি কম্পন প্রতি স্পন্দন ধরে নিয়ে যেন বীণাযন্ত্রের চিকণ কাজের সঙ্গে মৃদঙ্গের নিপুণ বোল মিশিয়ে দিয়েছে।

এরূপ অদ্ভুত সঙ্গত দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের মজলিসে যে অনুবাদ-সাহিত্য আরম্ভ করেছিল, আজ তার সমাপ্তি দেখতে পাচ্ছি সস্তা, রগরগে ইংরিজী উপন্যাসের অনুবাদে। খেমটা আর 'ফিলমি গানের' সঙ্গে তার মিতালি।

'কলচর'

'পরশুরামের' কেদার চাটুজ্যেকে বাঘা তাড়া করেছে, ভূত ভয় দেখিয়েছে, হনুমান দাঁত খিচিয়েছে, পুলিস কোর্টের উকীল জেরা করেছে, তবু তিনি ভয় পাননি, কিন্তু শেষটায় এক আমেরিকান মেমসায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান। কেদার চাটুজ্যের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাকে সবিনয় বলতে হবে তাঁর তুলনায় আমি দেশভ্রমণ করেছি অনেক বেশি, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়েছে আরো অনেক বেশি ভূত, অদ্ভূত, নাৎসী, কম্যুনিস্ট, মিশনারী, কলাবৎ, সম্পাদক, দারোয়ান ইত্যাদি, কিন্তু তবু যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ কাটতে হয়, তবে বলব আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছি 'কলচরের' সামনে।

বাঙলা দেশে 'কলচর' আছে কিনা জানিনে, যদি বা থাকে তবে আমি নিজে বাঙালী বলে সে জিনিস এড়িয়ে যাবার অন্ধিসন্ধি জানি। কিন্তু বিদেশ-বিভূঁইয়ে হঠাৎ বেমক্কা এ জিনিসের মুখোমুখি হয়ে পড়লে যে কি দারুণ নাভিশ্বাস ওঠে তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা এবং শৈলী আমার পেটে নেই।

পশ্চিম ভারতে একবার এই 'কলচর' অথবা 'কলচরড্' সমাজের পাল্লা পড়েছিলুম। তার মর্মন্তুদ কাহিনী নিবেদন করছি।

এক যুবতীর সঙ্গে কোনো এক চায়ের মজলিসে আলাপ হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। সুন্দরী রমণী। প্রত্যাখ্যান করি কি প্রকারে? তখন যদি জানতুম তিনি আমাকে বাঙালী অতএব 'কলচরড্' ঠাউরে নিমন্ত্রণ করেছেন তাহলে ধর্ম সাক্ষী আমি কেটে পড়তুম। কারণ, আমি 'কলচরড্' নই এবং পূর্বেই বলেছি ও-জিনিসটাকে আমি বড্ড ডরাই।

সুন্দরী মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই বাড়ি খুঁজে বের করার মেহন্নত থেকে রেহাই পেলুম। গাড়ি এসে এক বিপুলায়তন বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়ি বলা হয়ত ভুল হল। সংস্কৃতে খুব সম্ভব এই বস্তুকেই 'প্রাসাদ' বলে।

কিন্তু সে কী অদ্ভুত বিভীষিকা। সাঁচীর স্তূপ, অজন্তার প্রবেশদ্বার, অশোকের স্তম্ভ, মাদুরার মণ্ডপ, তাজের জালির কাজ, জামি মসজিদের আরাবেস্‌ক্ ভারতবর্ষের তাবৎ সৌন্দর্য নিদর্শন সেখানে যেন এক বিরাট তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়েছে। যে ফিরিস্তিটি দিলুম সেটা পূর্ণাবয়ব কি না জানিনে এবং এসব স্থাপত্যকলার মর্ম এ অধম জানে না সেটাও সে সবিনয় স্বীকার করে নিচ্ছে। আমি সাহিত্য নিয়ে ঈষৎ নাড়াচাড়া করি, কারণ ঐ একমাত্র জিনিসই মাস্টার অধ্যাপকেরা আমাকে স্কুল-কলেজে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে কিছুটা শিখিয়েছেন। সাহিত্যের দৃষ্টিবিন্দু দিয়ে তাই যদি সে-প্রাসাদের বর্ণনা দিই তবে বলতে হবে, আমি যেন এক কবিতার সামনে দাঁড়ালুম যার প্রথম লাইন চর্যাপদী, দ্বিতীয় লাইন চণ্ডীদাসী, তৃতীয় লাইন মাইকেলী, চতুর্থ লাইন রঙ্গলালী, পঞ্চম লাইন ঠাকুরী এবং শেষ লাইন নজরুলী। জানি, আজ যদি কেউ এই সব ক'জন মহাজনের শৈলী এবং ভাষা আয়ত্ত ক'রে কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন তবে তিনি কি কালিদাস, কি সেক্সপীয়ার, কি গ্যেটে সর্বযুগের সর্ব কবিরাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু আমি যে বিভীষিকার সামনে দাঁড়ালুম সে তো তা নয় এ যেন কেউ কাঁচি দিয়ে নানান কবির লেখা নিয়ে হেথা থেকে দু'ছত্র হোথা থেকে তিন পংক্তি কেটে গঁদ দিয়ে জুড়ে দিয়ে বলছে, 'পশ্য, পশ্য, কী অপূর্ব কবিতা; এ-কবিতা মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো কবির লেখাকে হার মানায় কারণ এ-কবিতা দুনিয়ার তাবৎ কবির বারোয়ারী চাঁদা দিয়ে গড়া। বাঁদর হাসালেও এখন খুঁজে পাবে'

তখনও পালাবার পথ ছিল, কিন্তু সুন্দরীর—যাকৃগে। না পালাবার অন্য আরেকটা কারণও মজুদ ছিল। এ বিভীষিকা দেখে গাঙ্গুলী মশাই অথবা ক্রামরিশ বীবী পালাবেন, কিন্তু আমি তো 'কলচরড্' নই, আমি পালাব কেন ?

ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি লিফ্‌টের সামনে। অপূর্ব সে খাঁচা। এতদিন বাদে আজ আর মনে নেই কোন্ কোন্ শৈলীর ঘুষোঘুষিতে (কোলাকুলিতে নয়) সে লিফ্‌টের চারখানা কাঠের পাট নির্মিত ছিল। প্রত্যেক পাটে অতি সূক্ষ্ম লাজুক, মোলায়েম দারুশিল্প। জয়পুরের মিনা যেন সূক্ষ্মতায় তার কাছে হার মানে।

ভিতরে ঢুকলুম। তখন লক্ষ্য করলুম লিফ্‌টবয় দরজাখানা বন্ধ করল অতিশয় সন্তর্পণে—পাছে কাঠের চিকন কাজে কোনো জখম হয়। কিন্তু ফল হল এই যে লিফ্‌ট আর উড্ডীয়মান হতে চায় না। বয় ধীরে ধীরে চাপ বাড়ায় কিন্তু লিফ্‌ট নড়তে চায় না। তারপর হুস করে বলা নেই কওয়া নেই, লিফ্‌ট উপরের দিকে চলল, পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ জিন লাগানে যে-রকম ধারা আচমকা লম্ফ দিয়ে ওঠে।

তারপর দোতলায় নামবার কথা—লিফ্‌ট সেখানে থামে না। থামলো গিয়ে আচম্বিতে দোতলা আর তেতলার মধ্যিখানে।

একে ত গাঁয়ের ছেলে, বয়স হওয়ার পর শহরে এসে প্রথম লিফ্‌ট দেখেছি এবং তখনকার দিনে ধুতিকুর্তা পরা থাকলে লিফ্‌ট চড়তে দিত না বলে এ ফাঁড়া থেকে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি, তার উপর জানি দড়াম করে দরজা বন্ধ না করলে ভালো লিফ্‌টও নড়তে চায় না এবং তার উপর দেখি এই ছোকরা চাকরি যাবার ভয়ে দরজার উপর জোর লাগাতেও রাজী হয় না। এই 'কলচরড্' লিফ্‌টটাকে জখম চোটের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রাণটা বলি দিতে হবে নাকি ?

আমি তখন হন্যে হয়ে উঠেছি। ধমক দিয়ে বললুম, 'দরজা জোরে বন্ধ করো।'

সে করে না। এই মাগ্‌গীর বাজারে প্রাণের চেয়ে চাকরি বড়। প্রাণ জিনিসটা জন্মে জন্মে বিনা খরচে, বিনা মেহন্নতে পাওয়া যায় ; কিন্তু চাকরির জন্য বিস্তর বেদরদ বেইজ্জতী সইতে হয়।

আমি আর কি করি ? ধাক্কা দিয়ে ছোঁড়াটাকে পথ থেকে সরিয়ে দরজায় দিলুম বিপুল এক ধাক্কা। হুস করে লিফ্‌ট উঠে গেল তেতলায়। আমি দরজা

খুলে নাবতে যাচ্ছি, বয় চেঁচিয়ে বললো, 'আপনি যাবেন দোতলায়, তেতলায় নয়।' আমি বললুম, 'তুমি যাও চুলোয়।' ছোকরা বাঙলা বোঝে না।

তেতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামলুম দোতলায়।

ততক্ষণে লিফ্‌টে ধড়াধড় শব্দ শুনে সুন্দরীর ভাই-বেরাদর দু'একজন সিঁড়ির কাছে জমায়েত হয়ে গিয়েছেন। আমি ছোকরার চাকরি বাঁচাবার জন্য নিজের অপরাধ স্বীকার করলুম। ওরা যে-রকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে মনে হল আমি যেন তাজমহলের উপর এটম বম মেরেছি অথবা ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের গলা কেটে ফেলেছি।

'কলচরড্‌' নই, তাই বলতে পারবো না, 'কলচর' দেশ-কাল-পাত্র মেনে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় কি না। কিন্তু লিফ্‌টের ভিতরকার 'কলচর'কে সম্মান দেখাতে গিয়ে আমি প্রাণটা দিতে রাজী নই। তাই বলছিলুম, আমি 'কলচর' জিনিসটাকে ডরাই॥

বর্ষা

কাইরোতে বছরে ক'ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে এতদিন বাদে সে কথা আমার আর স্মরণ নেই। আধা হতে পারে সিকিও হতে পারে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মেঘমুক্ত নীল আকাশ দেখে দেখে আমার তো প্রথমটায় মনে হয়েছিল, এদেশে বুঝি আদপেই বৃষ্টিপাত হয় না। আর গাছপালার কী দুরবস্থা, পাতাগুলোর কী অদ্ভুত চেহারা! সাহারার ধুলো উড়ে এসে চেপে বসেছে পাতাগুলোর গায়ে—সিন্দবাদের কাঁধে যে রকম পাগলা বুড়ো চেপে বসেছিল—সে ধুলো সরানো দু'দশটা হৌজের কর্ম নয়। কাফেতে বসে বুলভারের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রায়ই ভাবতুম, এদের কপালে কি কোনো প্রকারের মুক্তিস্নান নেই?

সুদানের একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে বললে, তার দেশে নাকি যাট বছরের পর একদিন হঠাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি নেবেছিল। মেয়েরা, কাচ্চাবাচ্চারা, এমনকি গোটা কয়েক জোয়ান মদ্দরা পর্যন্ত হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়েছিল, 'আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে আমাদের ঘাড়ে ভেঙে

পড়লো গো। আমরা যাব কোথায়? কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) দিন এসে গেছে। সব পাপের তওবা (ক্ষমা-ভিক্ষা) মাঙবার সময় পেলুম না, সবাইকে যেতে হবে নরকে।' গাঁও-বুড়োরা নাকি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে না। এ যা নাবছে সে জিনিস জল। এর নাম মৎর্ (অর্থাৎ বৃষ্টি)।' সুদানী ছেলেটি আমায় বুঝিয়ে বললে, 'আরবী ভাষায় মৎর্ (বৃষ্টি) শব্দ আছে; কারণ আরব দেশে মাবে' মাঝে বৃষ্টি হয়, কিন্তু সুদানে যে-আরবী ভাষা প্রচলিত সে-ভাষায় মৎর্ শব্দ কখনো ব্যবহৃত হয়নি বলে সে শব্দটি সুদানী মেয়েছেলেদের সম্পূর্ণ অজানা।'

সুদানে যাই হোক্ হোক্। কিন্তু একদিন যখন হঠাৎ কাইরোতে বৃষ্টি নাবল আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাফে ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। বিরহী যক্ষ যেরকম দুই বাহু প্রসারিত করে উত্তরের বাতাস আলিঙ্গন করেছিল, আমি ঠিক সেইরকম 'ঝড় নেমে আয় আয়' বেসুরা বেতালা করে গাইলুম আর আমার জোব্বা-জাব্বা যে ভিজে কাঁই হল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বৃষ্টি না থামার পূর্বেই ফিরে এলুম পাড়ার কাফেতে। সবাইকে বোঝাবো, বাঙলা দেশে কি রকম অদ্ভুত বর্ষা নামে, তার কি অপূর্ব জৌলুস। দেখি, আড্ডার সদস্যরা কেউ আধভেজা, কেউ ছ' আনা, কেউ দু' আনা। আমাকে দেখা মাত্র সবাই তো মারমার করে তেড়ে এল। আরে, বুঝিয়েই বলো না, কি ব্যাপার, চটছো কেন?

সবাই এক সঙ্গে কথা কয়। কি মুশ্কিল! ভাবখানা অনেকটা;—এই ড্যাম নুইসেন্স বৃষ্টির প্রশংসা আমি রাস্কেল ইণ্ডিয়ান কেন এতদিন ধরে করে আসছি? আর স্যাটৃ পোয়েট টেগোর, যার নামে আমি অজ্ঞান, সেই বা এই বৃষ্টির নামে এত কবিতা লিখল কেন? সুট বরবাদ হয়ে গিয়েছে, হিম লেগে কেউ হাঁচছে, কেউ কাঁপছে, কেউ বা পিছলে পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। আর সবচেয়ে মারাত্মক খবর, পাউলুসের বান্ধবী বৃষ্টির জন্য আসতে পারেনি বলে পাউলুস মর্মাহত হয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইডের সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে।

মহা মুশ্কিলে পড়লুম। জুৎসই কি উত্তর দিই! মৃৎশকটিকায় বসন্তসেনা বৃষ্টিতে ভিজে যখন চারুদত্তের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন যে কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার বর্ণনা এদের সামনে এই বেমক্কায় পেশ করলে এরা আমাকে খুন করবে; মেঘদূতের বয়ান, জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরম্বরং' এদের সামনে গাইতে গেলে এরা আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। তাই ভাবলুম, কার্ল মার্কসের স্মরণ নেওয়াই

প্রশস্ত। অর্থনৈতিক কারণ দেখালে এরা হয়ত মোলায়েম হবে। বললুম, 'বৃষ্টি না হলে গাছপালা, গম-ধান গজাবে কি প্রকারে?'

সবাই আমার দিকে এমন ভাবে তাকালে যেন আমি বেহেড মাতাল অথবা বদ্ধ উন্মাদ। মিশরে পাগলা উটের কামড় খেয়ে বহু লোক মস্তিষ্কচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে এরা পাগলাকে কি ভাবে শায়েস্তা করতে হয় সে কথা বিলক্ষণ জানে। রমজান বললো, 'কাইরো শহরের ভিতর কি যব-গম ফলে যে এখানে বৃষ্টির প্রয়োজন? যব-গম ফলে গ্রামাঞ্চলে। সেখানে বৃষ্টি হোক না, কে বারণ করছে। কিন্তু শহরের ভিতরে কেন?'

শরিফ মুহম্মদ বললো, 'সেখানেই বা বৃষ্টি হবে কেন? আমাদের গম-ধান ফলে নাইলের জলে। এই যে বৃষ্টি কখন আসে কখন আসে না তার তো কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। এর উপর নির্ভর করলে মিশরীদের আর বাঁচতে হত না।' আমি কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় গ্রীক সদস্য পাউলুস ফিরে এসে ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করল। আমার সঙ্গে তর্কাতর্কির কথা সবাই ভুলে গিয়ে পাউলুসের চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ালো।

কি হয়েছে, কি ব্যাপার?'

অনেক ঝুলোঝুলির পর পাউলুস মাথা না তুলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যা বললো তার অর্থ, মেঘ আর বৃষ্টিতে তার বান্ধবীর বিরহবেদনা তাকে কাবু করে ফেলেছে। এ যন্ত্রণা সে সইতে পারবে না। পটাসিয়াম সায়ানাইড রেশন্‌ড্‌ হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অন্য কোনো প্রশস্ত পন্থা আড্ডা যদি তাকে না বাৎলায় তবে—ইত্যাদি।

আমাকে তখন আর পায় কে? হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'ওরে মূর্খের দল, জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য বিরহ। আর বিরহ কারে কয়, সে-কথা কি করে জানবি মেঘ না জমলে, বৃষ্টি না ঝরলে? আর শেষ তত্ত্বকথা কবিতা কি করে ওৎরাবে বিরহবেদনা যদি মানুষকে পাগল করে না তোলে?'

* * *

আজও ভাবি, আমাদের পদাবলী, জয়দেব, কালিদাস, শূদ্রক যে বিরহবর্ণনা রেখে গিয়েছেন তার সঙ্গে তো অন্য কোনো সাহিত্যের বিরহবর্ণনার তুলনা হয় না। তার একমাত্র কারণ আমাদের বর্ষা।

জিন্দাবাদ হিন্দুস্থানী বর্ষা!!

প্যারিস

জর্মন ভাষায় একটি গান আছে :

In Paris, in Paris, sind die
Maedels so suess
Wenn sie fluestern "Monsieur,
ich bin Dein,—"

অর্থাৎ :—

প্যারিসের মেয়েগুলো কি মিষ্টি !
যখন তারা কানের কাছে গুনগুনিয়ে বলে,
'মসিয়ো আমি তোমারি।'
সবাই হেসে হেসে তাকায়, সবাই কথা বলবার
সময় 'তুমি' বলে ডাকে
আর কানে কানে বলে, 'তোমায় ছেড়ে
আর কারো কাছে যাব না।'
কিন্তু হায়, শুধু তোমাকেই না, আরো
পাঁচজনকে তারা ঐ রকমধারাই বলে !

ইংরেজীতে বলে 'কেরীং কোল টু নিউ কাসল্', হিন্দীতে বলে 'বরেলীমে বাঁস লে জানা' (বেরেলীতে নাকি প্রচুর বাঁশ জন্মে !), রাশানে বলে, 'তুলা শহরে সামোভার নিয়ে যাওয়া' (সেখানে নাকি পৃথিবীর বেশির ভাগ সামোভার তৈরি হয়), গুজরাতীতে বলে, 'ভরা কলসী নিয়ে নদীতে যাওয়া !' এবং ফরাসীতে বলে, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া !'

ফরাসী প্রবাদটিই মুখরোচক। কিন্তু প্রশ্ন, সত্যই কি প্যারিস-সুন্দরীরা বড্ডই দিলদরিয়া ? উপরের গানটাতে তো খানিকটে হদিস পাওয়া গেল। তবু কেন তামাম ইয়োরোপবাসীর সুখস্বপ্ন অন্তত একবারের মত প্যারিসে যাওয়া ? এমনকি

যে জর্মন ফরাসী জাতটাকে দু'চোখের দুশমন বলে জানে, সেও ফরাসীনীর নাম শুনলে বে-এক্তেয়ার হয়ে পড়ে। হিন্দুর কাশী দর্শনাভিলাষ, মুসলমানের মক্কা গমন তার কাছে নস্যি।

এ অধম ছেলেবেলায় এক ভশ্চায্যি বামুনের খপ্পরে পড়েছিল। তিনি তার মাথায় তখনই গবেষণার পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্যারিসে নেবেই ভাবলুম, 'সত্য কোন্ হিরণ্ময় পাত্রে লুক্কায়িত আছেন, তার গবেষণা করতে হবে' এবং তার নির্যাস আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব। এ-নির্যাস বানাতে আমাকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে।

প্রথমত, প্যারিসের মেয়েরা সুন্দরী বটে। ইংরেজ মেয়ে বড্ড ব্যাটামুখো, জর্মন মেয়েরা ভোঁতা, ইতালিয়ন মেয়েরা অনেকটা ভারতবাসীর মত (তাদের জন্য ইয়োরোপে আসার কি প্রয়োজন ?), আর বলকান মেয়েদের প্রেমিকরা হররকতই মারমুখো হয়ে আছে (প্রাণটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে)। তার উপর আরো একটা কারণ রয়েছে—ফরাসী মেয়ে সত্যি জামা-কাপড় পরার কায়দা জানে—অল্প পয়সায়—অর্থাৎ তাদের রুচি উত্তম।

তা না হয় হল। কিন্তু সুন্দরীরাই যে সব সময় চিত্তাকর্ষণ করেন তা তো নয়। যে-সব দেশে কোর্টশিপ করে বিয়ে হয়, সে-সব দেশে দেখেছি, মেলা সুন্দরীর বর জোটেনি আর এন্তার সাদামাটা মেয়ে খাপসুরৎ বর নিয়ে শহরময় দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

তবে কি মানুষ প্রেমে পড়ার বেলা সুন্দরী খোঁজে, বিয়ে করার সময় অন্য বস্তু ? তবে কি প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া ? হবেও বা !

তবে একথা অস্বীকার করার জো নেই, ফরাসী মেয়েরা আর পাঁচটা দেশের মেয়েদের তুলনায় ঢের বেশি বিদগ্ধা। গান বোঝে, সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করে, নাচতে জানে, ওয়াইনে বানচাল হয় না, অপ্রিয় সত্য এড়িয়ে চলে, পলিটিকস্ নিয়ে মাথা ঘামায় কম এবং জাত-ফাত, সাদা-কালো, দেশী-বিদেশী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংস্কার বিবর্জিত। ভালো লেগেছে, তাই হামেশাই দেখতে পাবেন, দেবকন্যার মত সুন্দরী ফরাসীনী যমদূতের মত বিকট হাবশীর সঙ্গে সগর্বে সদম্ভে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন, নাচে খাসা, গান গায় তোফা, ছবি দেখলেই বলতে পারে কোন্ নম্বরী, আর ডাক্তারি পড়ে বলে এর ব্যাণ্ডেজ ওর ইন্‌জেকশন্ হামেশাই বিন্‌ফিতে করে দেয়।

জর্মন মেয়ে বিদেশীকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, প্রেমে পড়ে ফরাসী

চেয়েও বেশি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনি চিরদিনই তার কাছে 'আউসল্যাণ্ডার' (আউট্‌ল্যাণ্ডার) বা 'বিদেশী'ই থেকে যাবেন—কিন্তু ফরাসীনীর মনে অন্য ভাগাভাগি। তার কাছে পৃথিবীতে দুই রকম লোক আছে—কলচরড্ আর অনকলচরড্। ফরাসী, বিদেশী এই দুই স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বাদ-বিচার তার মনে কখনো ঢোকে না।

আপনি দিব্য ফরাসী বলছেন, ফ্রাঁস আপনি পড়েন, রোদাঁকে ভক্তি করেন, শোপাঁর রস চাখতে জানেন, বর্দো বর্গেণ্ডি সম্বন্ধে ওকীবহাল, ব্যস, তবেই হল। কোনো ইংরেজ বন্ধুকে যদি আপনি ফরাসীনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় সসম্রমে ভারতীয় কায়দায় বলেন, 'ইনি অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট', তবে ফরাসীনী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শুধাবে, 'কোন্ সব্‌জেক্টে মহাশয়? টেনিস না ক্রিকেট?' ফরাসীনীর বিশ্বাস, অক্সফোর্ডে মাত্র ঐ দুই কর্মই হয়। ভাগ্যিস প্যারিসীনী জানে না, ভারতবর্ষে কিছুই হয় না—কাজেই আপনাকে এ রকম ধারা প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করবে না।

কিন্তু ফরাসীনীর সবচেয়ে বড় গুণ—সে ভণ্ডামি করতে জানে না। আর সব শহরে যা হয়, প্যারিসেও তাই হয়, কিন্তু ফ্রান্সের লোক ঢেকে চেপে রাখবার চেষ্টা করে না। যদি কোনো জিনিস চেপে যায়, তবে সেটা দৃষ্টি-কটু, রুচিবিরুদ্ধ বলে—নিজকে ধর্মপ্রাণ, নীতিবাগীশ বলে প্রচার করার জন্য নয়।

অর্থাৎ ফরাসীনীর কাছে টেস্ট্ বা রসবোধ মরাল্ বা নীতিবোধের চেয়ে বহুৎ বেশি বরণীয়।

আজব শহর কলকেতা

আজব শহর কলকেতা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। বুড়ো হতে চললুম তবু তার প্রমাণ পেলুম কমই। তাই নিয়ে একখানা প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখব ভাবছি এমন সময় নামল জোর বৃষ্টি। সমীরণে পথ হারানোর বেদনা বেজে উঠল কারণ যদিও পথ হারাইনি তবু সমস্যাটা একই। ছাতা নেই, বর্ষাতি নেই, ট্রামে চড়বার মত তাগদও আর নেই—বাস মাথায় থাকুক,—ট্যাক্সি চড়তে বুক কচ কচ করে; কাজেই বাড়ি ফেরার চিন্তার বেদনাটা 'পথহারানোর' মতই হল। এমন সময় সপ্রমাণ হয়ে গেল 'কলকেতা আজব শহর'—সামনে দেখি বড় বড় হরফে লেখা 'স্নেক বুক শপ!'

খেয়েছে! নিশ্চয়ই কোনো ফরাসী পথ হারিয়ে কলকাতায় এসে পড়েছে আর যে দুটি পয়সা ট্যাঁকে আছে তাই খোয়াবার জন্য ফরাসী বইয়ের দোকান খুলেছে! বাঙালী প্রকাশকরা বলেন, 'শুধু ভালো বই ছাপিয়ে পয়সা কামানো যায় না, যদি উপন্যাসও গাদা গাদা ছাড়তে হয়।' কথাটা যদি সত্যি হয় তবে শুধু ফরাসী বই বেচে এ দোকান মুনাফা করবে কি প্রকারে? তাই আন্দাজ করলুম, এই 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ' বোধ হয় হাতীর দাঁতের মত—শুধু দেখবার জন্য, চিবোবার জন্য অন্য দাঁত রয়েছে লুকোনো অর্থাৎ দোকানের নাম বাইরে যদিও 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ', ভিতরে গিয়ে পাবো অন্য মাল,—'খুশবাই', 'সাঁঝের পীর', 'লোধ্র-রেণু', 'ওষ্ঠ-রাগ'।

সেই ভরসায় ঢুকলুম। বৃষ্টিটাও জোরে নেমেছে! নাঃ। আজব শহর কলকেতাই বটে। শুধু ফরাসী বই বেচেই লোকটা পয়সা কামাতে চায়। গাদা গাদা হলদে আর সাদা মলাটওলা এস্তার ফরাসী বই, কিছু সাজানো-গোছানো, কিন্তু যত্রতত্র ছড়ানো। ফরাসী দোকানদার কলকাতায় এসে বাঙালী হয়ে গিয়েছে। বাঙালী দোকানদারেরই মত বইগুলো সাজিয়েছে।

আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় তখন ব্যাকরণকে গঙ্গাযাত্রায় বসিয়ে, উচ্চারণের মাথায় ঘোল ঢেলে চালালুম আমার ধেনো মার্কা ফরাসী শ্যাম্পেন। মেমসাহেব খুশ। আম্মো তর।

অতি সযত্নে তিনি আমার বইয়ের ফর্দ টুকে নিলেন, বই আসা মাত্র আমায় খবর দেবেন সে ভরসাও দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারে বিদেশীর সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা কইতে পাওয়ার আনন্দে সুখ-দুঃখের দু'চারটা কথাও বলে ফেললেন। মাত্র তিন মাস হল এদেশে এসেছেন, তাই ইংরিজী যথেষ্ট জানেন না, তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন, বইয়ের দোকান তাঁর নয়, এক বান্ধবীর, তার অনুপস্থিতিতে স্বল্পমাত্র ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার কামনায় দোকানে বসেছেন।

তুলসীদাস বলেছেন—'পৃথিবীর কি অদ্ভুত রীতি। শুঁড়ি দোকানে জেঁকে বসে থাকে আর দুনিয়ার লোক তার দোকানে গিয়ে মদ কেনে। ওদিকে দেখ, দুধওয়ালাকে ঘরে ঘরে ধন্না দিয়ে দুধ বেচতে হয়।'

বুঝলুম কথা সত্যি। এতদিন পৃথিবীর লোক প্যারিসে জড়ো হত ফরাসী বেচবার জন্য।

সে কথা থাক্। ইতিমধ্যে একটি বাঙ্গাল ছোকরা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস

করলো, 'কমার্শিয়াল আর্ট সম্বন্ধে কোন বই আছে কিনা?' আমার মনে বড় আনন্দ হল। বাঙালী তাহলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। ফরাসী ভাষায় কমার্শিয়াল আর্টের বই খুঁজছে।

ততক্ষণে আমি একটা খাসা বই পেয়ে গিয়েছি। ন্যুরনবর্গের মোকদ্দমায় যেসব দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গিয়েছিল, তাই দিয়ে গড়া হিটলার চরিত্রবর্ণন। হিটলার সম্বন্ধে তাঁর দুশমন ফরাসীরা কি ভাবে তারও পরিচয় বইখানাতে আছে। এ বইখানার পরিচয় আপনাদের দেব বলে লেখাটা শুরু করেছিলাম, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা শেষ হতে না হতেই ভোরের কাক কা-কা করে আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে, 'কলম ফুরিয়ে গিয়েছে'। আরেক দিন হবে॥

কিসের সন্ধানে ?

হটেনটটদের কথা আলাদা। শিক্ষালাভের জন্য তারা যেখানে খুশি যেতে পারে। একথা তাদের ভাবতে হয় না, যে-শিক্ষা লাভ করতে যাচ্ছি সেটা টাইপ রাইটারের হরফ সাজানোর মত করে। অর্থাৎ সিজিলটা যার জানা আছে সে চোখ বন্ধ করেই ইচ্ছামত বই বের করে নিতে পারবে, যে জানে না তার কোমর ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যাবে।

ফুটফুটে এক মেমসাহেব এসে ইতিমধ্যে ফরাসী হাসি হেসে দাঁড়িয়েছেন। পরশুরামের কেদার চাটুজ্যেকে আমি মুরুব্বি মানি। তাঁরই ভাষায় বললুম, 'সেলাম মেমসাহেব।' মেমসাহেব ফরাসীতে বললেন, 'আপনার আনন্দ কিসে?'—অর্থাৎ 'কি চাই?' মেরেছে। ফরাসী ভাষা কবে সেই প্রথম যৌবনে বলেছি সে কথাই স্মরণ নেই—গোটা ভাষাটার কথা বাদ দিন।

জর্মন ভাষায় একটি প্রেমের গান আছে Dein Mund sagr "Nein" Aber Deine Augen sagen "Ja" অর্থাৎ, তোমার মুখ বলছে 'না, না', কিন্তু তোমার চোখ দু'টি বলছে 'হাঁ, হাঁ'।

কিন্তু ফরাসী জর্মনির দুশমন। জর্মন যা করে ফরাসী তার ঠিক উল্টো করাটাই জাত্যভিমানের কৈবল্যানন্দ বলে ধরে নিয়েছে। তাই মেমসাহেব যতই মুখে 'ইয়েস ইয়েস' বলেন ততই দেখি তাঁর চোখে স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'নো', 'নো'—অর্থাৎ মেমসাহেব আমার ইংরিজী বুঝতে পারছেন না। মহা মুশকিল।

হঠাৎ কখন ফরাসী রাজদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসে'র নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে বোধহয় কিছুটা ফরাসী উচ্চারণ বেরিয়ে পড়েছিল, আর যাবে কোথা, মেমসাহেব আদেশ দিলেন, 'মসিয়ো, ফরাসীতে কথা বললেই পারেন।'

বাঙালীর জাত্যভিমানে বড্ডই আঘাত লাগলো স্বীকার করতে যে যদিও ফরাসী ভাষাটা কেঁদেকুকিয়ে পড়ে নিতে পারি, বলতে গেলে আমার অবস্থা ভডনং হয়ে দাঁড়ায়। ভাবলুম, দুর্গা বলে ঝুলে পড়ি। এ মেমসাহেব যদি কলকাতার বুকের উপর বসে বাঙলা (এমনকি ইংরিজীও) না বলতে পারে তবে আমি ফ্রান্স থেকে হাজারো মাইল দূরে দাঁড়িয়ে টুটিফুটি ফরাসী বললে এমন কোন্ বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

দশ বছরের পুরোনো মর্চে ধরা, জাম-পড়া, ছাতি-মাখা ফরাসী তানপুরোটার তার বেঁধে বরজলালের মত ইমনকল্যাণ সুর ধরলুম। এবং কী আনন্দ, কী আনন্দ, মেমসাহেবও বুড়ো রাজা প্রতাপ রায়ের মত। আমার ফরাসী শুনে কখনো 'আহাহা বাহাবা বাহাবা' বলেন, কখনো, 'গলা ছাড়িয়া গান গাহো' বলেন। এই হল ফরাসী জাতটার গুণ। হাজারো দোষের মধ্যে একটা কিছু ভালো দেখতে পেলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

আমাকে আর পায় কে?

আমার দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাবে তো?' কারণ কোনো প্রকারের ঐতিহ্যের কণামাত্র বালাই তাদের নেই।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমরা প্রায় হটেনটটের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিলুম। আর কয়েকটি বৎসর মাত্র ইংরেজ এদেশে থাকলে আমরা একে অন্যকে কাঁচা খেয়ে ফেলতে আরম্ভ করতুম।

ইংরেজ গিয়েছে। তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে আমরা বিদ্যা লাভ করতে যাব কোন্ দেশে? এতদিন এ প্রশ্ন কেউ শুধাতো না। টাকা থাকলেই ছোকরারা ছুটতো হয় অক্সফোর্ডের দিকে নয় কেমব্রিজের পানে। সেখানে সীট না পেলে লণ্ডন কিংবা এডিনবরা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। এই ভারতবর্ষে একদিন বিদ্যাশিক্ষায় এমনি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল যে, গান্ধার, কম্বোজ, বল্হীক, তীব্বত, শ্যাম, চীন থেকে বিদ্যার্থী শ্রমণ এদেশে আসত সত্যজ্ঞান লাভ করার জন্য। এবং বিংশ শতকে দেখলুম, এই ভারতবর্ষের লোকেই ধেয়ে চলেছে ইংলণ্ডের দিকে 'বিদ্যালাভের' জন্য। ভারতীয় ঐতিহ্য তখন তার দুরবস্থার চরমে পৌঁছেছে।

রাধার দুরবস্থা যখন চরমে পৌঁছেছিল, তখন যমুনার জল উজান বয়েছিল, একথা তাহলে মিথ্যা নয়।

কিন্তু আমাদের ছেলেরা যে ইংলণ্ডের পানে উজান স্রোতের মতো বয়ে চলেছিল, সেটা তো আর রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া যায় না—পরাধীনতা-মুর্গীটার গলা কাটা যাওয়ার পরও সে খানিকদূর পর্যন্ত ছুটে যায় তারপর ধপ করে মাটিতে পড়ে। তাই এই বেলা জমাখরচ নিয়ে নেওয়া ভালো, ভারতীয় ছেলে ইয়োরোপে পেত কি, যেত কিসের আশায়?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করার সময় বলেছিলেন, ইয়োরোপকে আমরা চিনলুম ইংলেণ্ডের ভিতর দিয়ে—তাই আমাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ইংলেণ্ড আর ইয়োরোপ একই জিনিস। ইংলেণ্ডের অনেক গুণ আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যভাণ্ডারে যে ইংলণ্ড তেমন কিছু হীরে-মানিক জমা দিতে পারেনি, সে কথাও সত্য। ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুতুবমিনার বলতে যাঁদের নাম মনে আসে—মাইকেল এঞ্জেলো, রদাঁ, রাফায়েল, সেজান, বেটোফেন, ভাগনার, গ্যোয়টে, টলস্টয়, দেকার্ত, কাণ্ট, পাসত্যোর, আইনস্টাইন ইংলেণ্ডে জন্মায়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে যেন ফ্রান্স, জর্মনি, ইটালি, রুশ থেকে গুণীজ্ঞানী এসে এদেশে ছেলেমেয়েদের সামনে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন বহু গুণী শান্তিনিকেতনে এসেছেন, বহু ছাত্র তাঁদের কাছ থেকে নানা প্রকারের বিদ্যা আহরণ করেছে, কিন্তু আজ শান্তিনিকেতনে সে-মেলা আর বসে না! তবু আমার বিশ্বাস, বাঙালী যদি আত্মবিশ্বাস না হারায় তবে এই শান্তিনিকেতনেই—দিল্লী, এলাহাবাদ, আহমদাবাদে নয়—এই শান্তিনিকেতনের পঞ্চবটীর তলায়ই একদিন পঞ্চমহাদেশ সম্মিলিত হবে! আমাদের দেখতে হবে, এই পঞ্চবটী যেন ততদিন শুকিয়ে না যায়।

ভারতীয় ছেলে যে ইংলেণ্ডে পড়াশোনা করতে যেত তার কারণ এই নয় যে, তাদের সবাই ধরে নিয়েছিল ইংলেণ্ডই ইয়োরোপের প্রতীক—তারা ধরে নেয়নি যে, ইয়োরোপ থেকে যা কিছু শেখবার মত আছে তার তাবৎ সম্পদ অক্সফোর্ড কেমব্রিজেই পাওয়া যায়। এদের ভিতর অনেক ছেলেই জানতো, শিল্পকলার জন্য ফ্রান্স, এবং বিজ্ঞানদর্শনের জন্য জর্মনিতেই গঙ্গোদক পাওয়া যায়—অভাববশতঃ তারা যে তখন কূপোদকের সন্ধানে যেত তাও নয়

তার একমাত্র কারণ চাকরি দেবার বেলা ইংরেজ এ জলেরই কদর দেখাতো বেশি। (এতে আশ্চর্য হবার মত কিছু নেই ; আয়ানও চাইতেন না যে রাধা যমুনার জল আনতে যান, পাছে কৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়ে যায়—ইংরেজও চাইত না যে, ফ্রান্স জর্মনি গিয়ে আমরা সভ্য ইয়োরোপকে চিনে ফেলি! আয়ান ইংরেজ দুজনেই তাই কূপোদক-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র)।

জানি, আমার পাঠকমাত্রই টিপ্পনি কাটবেন আমি বড্ড বেশি প্রাদেশিক কিন্তু তাই বলে তো আর তাহা মিথ্যা কথা বলতে পারিনে। নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইংলেণ্ড বর্জন করে তবু যে কয়টি ছেলে প্যারিস, বার্লিন, ম্যুনিক, ভিয়েনায় জ্ঞানের সন্ধানে যেত তাদের অধিকাংশই বাঙালী।

আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে বাঙালীর ট্যাঁকে এত বেশি কড়ি জমে গিয়েছিল যে, সেগুলো ওড়াবার তালে সে প্যারিস যেত, জর্মনি ঘুরত। বরঞ্চ বাঙালীর বদনাম সে চাকরির সন্ধানে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। এক অখ্যাতনামা বাঙালী কবি চাকরির বাঁচানো সম্পর্কে আপিস ধাবমান বাঙালী কেরানীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

ভরা পেটে ছুটতে ছুটতে মানা? চিবিয়ে খাওয়া
স্বাস্থ্যকর?
চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো
সে তারপর।

যে অন্নের জন্য বাঙালী কেরানীগিরি করে সেই অন্ন পর্যন্ত বাঙালী কেরানী ধীরেসুস্থে খেয়ে আপিস যেতে পারে না। এত বড় প্যারাডক্স, এত বড় ট্র্যাজেডি বাঙালা দেশের বাইরে আপনি পাবেন না।

আমি বলি—আর আপনার কথায় কান দেব না—বাঙালীরই ঈষৎ রসবোধ ছিল, তাই সে প্যারিস যেত।

প্যারিসে একপ্রকারের হতভাগা চিত্রকরের দল আছে—এদের নাম পেভমেণ্ট আর্টিস্ট। এরা আবার দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এদের ভিতর যারা কিঞ্চিৎ খানদানি তারা আপন ছবি ফুটপাথের রেলিঙের উপর ঝুলিয়ে রেখে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যদি কোনো ছবি সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তবে সে পরম উৎসাহে আপনাকে বাৎলে দেবে ছবিটার তাৎপর্য কি! আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেখান তবে সে তার তাবৎ ছবির ঠিকুজি-কুলুজি, নাড়ী-নক্ষত্র সব কিছু গড় গড় করে বলে যাবে, আর যদি অকস্মাৎ আপনি

একখানা ছবি কিনে ফেলেন—এ জাতীয় অলৌকিক ঘটনা অতিশয় রাঙা শুক্রবার ছাড়া কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না—তবে সে আপনাকে 'ও রিভোয়া' জানাবার সময় কানে কানে বলে দেবে, 'এ ছবি কিনে আপনি ভুল করেন নি, মসিয়ো—এ ছবি দেখবার জন্য তামাম পৃথিবী একদিন আপনার দোরের গোড়ায় ধন্না দেবে।'

অবশ্য ততদিন সে উপোস করে। শেষটায় সে-দিন না দেখেই সে মরে—শীতে এবং ক্ষুধায়।

এদের চেয়েও হতভাগা চিত্রকর আছে। তাদের রঙ আর ক্যানভাস কেনবার পয়সা পর্যন্ত নেই। তাই তারা রঙিন খড়ি দিয়ে ফুটপাথের একপাশে ছবি এঁকে রাখে। প্যারিসের ফুটপাথে বারোমাস পুজোর ভিড়—তাই এদের ছবি আঁকতে হয় অপেক্ষাকৃত নির্জন ফুটপাথে। সেখানে পয়সা পাবার আশাও তাই কম।

এসব ছবি তো আর কেউ বাড়ি নিয়ে যেতে পারে না, তাই ছবি দেখে খুশী হয়ে কেউ যদি চিত্রকরের হ্যাটের ভিতর—বলতে ভুলে গিয়েছিলুম হ্যাটটা ছবির একপাশে চিৎ করে পাতা থাকে—দু'টি পয়সা ফেলে দেয় তবে সেটা ভিক্ষে দেওয়ার মতই হ'ল। এ শ্রেণীর চিত্রকররা অবিশ্যি বলে, 'পয়সাটা ভিক্ষে নয়, পিকচার গ্যালারির দর্শনী। দর্শনী দিয়েছ বলে কি তোমাকে গ্যালারির ছবি বাড়ি নিয়ে যেতে দেয়?' হক্ কথা।

এদের যদি বেশী পয়সা দিয়ে বলেন, 'ঐ ছবিটা তুমি আমাকে ক্যানভাস আর রঙ কিনে ভালো করে এঁকে দাও', তবে সে পয়সাটা সীনের জলে ফেলারই সমান। এ শ্রেণীর চিত্রকরের সঙ্গে বোতলবাসিনীর বড্ড বেশী দহরম-মহরম্।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে মন উদাস হয়ে গিয়েছিল। তাই বেড়াতে বেরিয়েছি আর দেশের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি ফুটপাথের উপর অলৌকিক দৃশ্য। পদ্মানদীর গোটা ছয়েক ছবি রঙিন খড়ি দিয়ে আঁকা। ছবিগুলো ভালো না মন্দ সেকথা আমি এক লহমার তরেও ভাবলুম না। বিদেশ-বিভুঁইয়ে দেশের লোক পেলে সে পকেটমার না শঙ্করাচার্য, সেকথা কেউ শুধায় না।

বৃষ্টি নামলেই ছবিগুলো ধুয়ে-মুছে যাবে। আর্টিস্টের দিকে তাকালুম। শতচ্ছিন্ন কোট পাতলুন। হাতে বেয়ালা। বাঙালী।

আমাকে দেখে তার মুখের ভাব কণামাত্র বদলালো না। হারোলাখানা কানের কাছে তুলে ধরে ভাটিয়ালি বাজাতে আরম্ভ করল।

হাড্ডিসার মুখ, ঠোঁট দুটো অনবরত কাঁপছে, চোখ দুটিতে কোনো প্রকারের জ্যোতির বিন্দুমাত্র আভাস নেই, একমাথা উস্কোখুস্কো চুল, কিন্তু সব ছাপিয়ে চোখে পড়ে তার কপালখানা। এবং সে কপাল দেখে কত্তই মনে প্রশ্ন জাগে, এরকম 'কপালী' মানুষ বিদেশ বিভুঁইয়ে ভিক্ষে মাগছে কেন?

তাকে পাশের কাফেতে টেনে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিল। আমার কোনো কথার উত্তর দেয় না, আমার চেয়ে দেড় মাথা উঁচু বলে তার দৃষ্টি আমার মাথার উপর দিয়ে কোথায় কোন্ দূরান্তে গিয়ে ঠেকেছে তার সন্ধান নেই। একবার হাত ধরে বললুম, 'চলুন, এক কাপ কফি খাবেন'; ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে ফেলল।

আমি নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছি দেখে হঠাৎ হ্যাটটা তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। পাশের কাফেতে বসে আমি শুধালুম, 'কফি? চা?' মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। আমি মনে মনে বুঝতে পেরেছিলুম সে কি চায়; কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্যই চা কফির প্রস্তাব পেড়েছিলুম। শেষটায় শুধালুম, 'তবে কি খাবেন?'

একটি কথা বললো, 'আবসাঁৎ।'

দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক মাদক দ্রব্য! শতকরা আশীভাগ তাতে এলকহল। এ মদ মানুষ তিন চার বৎসরের বেশী খেতে পারে না। তারই ভিতরে হয় আত্মহত্যা করে, নয় পাগল হয়ে যায়, না হয় এলকহলিক বিভীষিকা দেখে দেখে এক মারাত্মক রোগে চীৎকার করে করে শেষটায় ভিরমি গিয়ে মারা যায়। ইঁদুরছানার নাকের ডগা এ মদে একবার চুবিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে মিনিট তিনেকের ভিতর ছটফট করে মারা যায়।

কী বিকৃত মুখ করে যে আর্টিস্ট আবসাঁৎটা খেল, তাঁর বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মনে হল, পানীয় যেন আগুন হয়ে পেটে ঢুকতে চায় বলে নাড়ী-ভুঁড়ি উল্টে গিয়ে বমি হয়ে বেরুতে চায়, আর সমস্ত মুখে তখন ফুটে ওঠে অসহ্য যন্ত্রণার বিকৃততম বিভীষিকা।। চোখ দুটো ফুলে উঠে যেন বাইরের দিকে ছিটকে পড়ে যেতে চায়, আর দরদর করে দু'চোখ দিয়ে জল নেমে আসে।

আমি মাত্র একটা আবসাঁতের অর্ডার দিয়েছিলুম। সেটা শেষ হতেই আমার দিকে না তাকিয়ে নিজেই গোটা তিনেক অর্ডার দিয়ে ঝাপাঝপ গিললো।

আমি চুপ করে আপন কফি খেয়ে যাচ্ছিলুম।

গোটা চারেক আবসাঁৎ সে ততক্ষণে গিলেছে। তখন দেখি সে আমার দিকে তার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এর চোখে এল কোত্থেকে?

হঠাৎ বললো, 'আর কেন ছোকরা, এইবার কেটে পড়ো, বীট্‌ ইট্‌. গে ভেক্‌, ভিৎ ভিৎ!' ক'টা ভাষায় যে সে আমায় পালাতে বললো তার হিসেবই আমি রাখতে পারলুম না।

আমি চুপ করে বসে রইলুম—নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু।

একগাল হেসে বলল, 'দেখলি? আমি ভিখিরি নই। এই ভাষা ক'টি ভাঙ্গিয়েই আমি তোর চেয়ে দামী স্যুট পরতে পারবো, বুঝলি? আবসাঁৎ দিয়ে প্যারিস শহর ভাসিয়ে দিতে পারবো, বুঝলি, কমপ্রাঁ, ফেরশট্‌হেস্ট ডু, পন্নিময়েশ?' আবার চলল ভাষায় ডুবড়ি।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে খানিকক্ষণ হাসলো। শুধালো, 'ছবি আঁকতে এসেছিস এ দেশে?—না হলে আর্টিস্টের উপর এ দরদ কেন, বাপু? তা তোর অজন্টায় কি হল? না বাগ-গুহা? কিংবা মোগল? অথবা রাজপুত?'

তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে কুটি কুটি। 'অবনবাবু? নন্দলাল? যামিনী রায়? এনরা সব আর্টিস্ট: কচু!'

আমি তবু চুপ।

বললে, 'অ-অ-অ। সেজান্‌, রেনোয়া, গোগাঁ, আঁরি-মাতিস? বল না রে ছোকরা!'

আমি পূর্ববৎ।

'তবে শোন্‌ ছোকরা। এদের কাছ থেকে কিচ্ছুটি শেখবার নেই, তোকে সাফসফা বলে দিচ্ছি। আমার কথা শোন্‌। আর্ট জিনিসটা কি? আর্ট হচ্ছে—'

বলে সে আমায় প্রথম আর্ট সম্বন্ধে একখানা লেকচর শোনালে। সেই গ্রীকদের আমল থেকে নন্দনশাস্ত্রের ইতিহাস শুরু ক'রে হঠাৎ চলে গেল ভরত দণ্ডিন মম্মট ভট্টে। সেখান থেকে গোত্তা খেয়ে নাবলো টলস্টয়ে—মাঝখানে গ্যোটেকে খুব একহাত নিল। তারপর বদলের, মালার্মে। শেষ করল জেমস জয়েসকে দিয়ে।

আরো বিস্তর কাব্য, নাট্য, চিত্রের যে উল্লেখ করে গেল, যার নাম আমি বাপের জন্মে শুনিনি।

তারপর ঝপ ক'রে আরেকটা আবসাঁৎ গিলে বললো,

'উহুঁ! তোর চোখ থেকে বুঝতে পারছি ছবির তুই বুঝিস কচুপোড়া। একবার একটা সাড়া পর্যন্ত দিলিনে। তবে কি তোর শখ মূর্তি গড়াতে? অশোকস্তম্ভের সিংগি, গান্ধারের বুদ্ধ, মথুরার অমিতাভ, এলেফেন্টার ত্রিমূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলার মোজেস, নটরাজ? বল না?'

তারপর ঝাড়লে আরেকখানা লেকচর। দুনিয়ার কোন্ যাদুঘরের কোন্ কোণে কোন মূর্তি লুকনো আছে, সব খবর নখাগ্র-দর্পণে।

এই রকম ক'রে লোকটা আর্টের যত শাখা-প্রশাখা আছে তার সম্বন্ধে আপন মনে কখনো মাথা নেড়ে নেড়ে, কখনো শব্দ ওজন ক'রে ক'রে, কখনো গড়গড়িয়ে মেল গাড়ির তেজে, কখনো বক্রোক্তি ক'রে, সন্দেহের দোদুল-দোলায় দুলে ব্যাখ্যান দিল। —এদেশ ওদেশ সেদেশ সব দেশ-মহাদেশের সর্বপ্রকারের আর্ট বস্তুর পাঁচমেশালি বানিয়ে।

এরকম পণ্ডিত আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে সে চুপ করে আর থাকতে দিল না।

বোধহয় নেশা একটু কমে গিয়েছিল; তাই চাপ দিয়ে শুধালো, 'বল্, তুই এদেশে এসেছিস কি করতে?'

আমি না পেরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'লেখাপড়া শিখতে।'

খুব লম্বা একখানা 'অ-অ-অ' টেনে বললো।

'তা তো শিখবি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইন, শ্যাম্পেন, আবসাঁৎ? তার কি হবে? নানা প্রকারের ব্যামো? তার কি হবে? অদ্ভুত অদ্ভুত নগ্ন নগ্ন ইনকিলাবী মতবাদ? তার কি হবে?'

ই হল মুশকিল। আবসাঁৎ ব্যামোর চেয়েও ভয়ঙ্কর অর্ধসিদ্ধ অর্ধপক্ক মতবাদ। শুধু ইনকিলাবী নয়, অন্য পাঁচরকমেরও।

আজ পর্যন্ত যেটুকু এদেশে এসেছে তাকেই আমরা সামলে উঠতে পারছিনে। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে তাকে কি করে মিল খাওয়াবো, বুঝে উঠতে পারিনে। অথচ পশ্চিমের সঙ্গে লেন-দেনও তো বন্ধ ক'রে দেওয়া যায় না। উপায় কি?

ভক্তি

ভক্তি ও ভালোবাসার ভিতর দিয়ে অনির্বচনীয় সত্তাকে পাবার চেষ্টা মানুষ সব যুগে আর সব দেশেই করেছে। এ-প্রচেষ্টার তুলনাত্মক ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। কারণ শেষ পর্যন্ত এ-ইতিহাস লেখা হবে সর্বধর্মের উৎপত্তিস্থল প্রাচ্যেই এবং প্রাচী এখনো আপন ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধন নিয়ে এতই উদ্ব্যস্ত যে তিন দেশের শাস্ত্রগ্রন্থ একত্র করে সেদিকে আপন শক্তি নিয়োজিত করবার অবসর পাচ্ছে না।

ভক্তিমার্গের প্রসার ও বিস্তার হয় প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলিম এবং খৃস্টান ধর্মে। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্ররাশি এতই বিশাল এবং বিক্ষিপ্ত, তার ভিতর দিয়ে ভক্তির অভ্যুদয় পদে পদে অনুসরণ করা সহজ কর্ম নয়। তার তুলনায় খৃস্টধর্মে ভক্তির অনুসন্ধান অনেক সহজ। একমাত্র বাইবেলখানা মন দিয়ে পড়লেই ভক্তির সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

বাইবেলের প্রথম খণ্ডে (অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্ট) ঈশ্বরের যে রূপ পাওয়া যায়, সেটি প্রধানতঃ একচ্ছত্রাধিপতি দুর্ধর্ষ, অকরুণ এমনকি বদরাগী এবং খামখেয়ালী রাজার রূপ। তাঁর সামনে পশুপক্ষী দাহ না করলে তিনি তৃপ্ত হন না, তাঁর পদপ্রান্তে কুমারী কন্যাকে বিসর্জন না দিলে তিনি বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দিয়ে দেশ লণ্ডভণ্ড করে দেন। তাই ওল্ড টেস্টামেন্টের দেবতাকে পূজারী আপন অর্ঘ্য দিচ্ছে অতি ভয়ে, সশঙ্ক চিত্তে।

খৃষ্ট এসে এই ভাবধারা সম্পূর্ণ বদলে দিলেন। তিনি বললেন, সৃষ্টিকর্তা রাজাধিরাজ, তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি আমাদের পিতা। 'আওয়ার ফাদার উইচ আর্ট ইন হেভ্‌ন্,' এইখানেই ভক্তির সূত্রপাত। ভগবানকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর করুণা, তাঁর স্নেহ পেতে হলে তাঁকে ভালবাসতে হবে পিতার মত।

কিন্তু মানুষ একবার ভালবাসার মন্ত্র পেলে সে আর মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চায় না। মুক্তপক্ষ বিস্তার করে সে আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে উড্ডীয়মান হতে চায়: পিতার প্রতি ভালবাসা মঙ্গলময় জিনিস কোনো

সন্দেহ নেই; কিন্তু তার চেয়ে অনেক মধুর, বহু নিবিড় মাতার প্রতি পুত্রের ভালবাসা, পুত্রের প্রতি মাতার মমতা। তাই ক্যাথলিক জগৎ গেয়ে উঠল, "ধন্য হে জননী মেরি, মা করুণাময়ী।"

ক্যাথলিক জগতে তাই ভগবানের পূজা প্রধানতঃ মা-মেরিরূপে। এ পূজা 'আভেমারিয়া' মন্ত্র দিয়ে সমাধান হয় এবং সে মন্ত্র যে কত সঙ্গীত-স্রষ্টাকে অনুপ্রাণিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। খৃষ্টবৈরী ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রধান সঙ্গীতকার মেণ্ডেলসজোন এই আভেমারিয়া মন্ত্রে সুর দিয়ে লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিক নরনারীর ধর্মপিপাসা সঙ্গীতসুধা দিয়ে তৃপ্ত করেছেন—সঙ্গীতজগতে আপন অক্ষয় আসন রেখে গিয়েছেন।

ঊর্ধ্বদিকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত এই আভেমারিয়া সঙ্গীতের প্রতীক ঊর্ধ্বশির ক্যাথলিক গির্জা। আতুর মানুষের যে প্রার্থনা, যে বন্দনা অহরহ মা-মেরির শুভ্র কোলের সন্ধানে ঊর্ধ্বপানে ধায় তারই প্রতীক হয়ে গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে ঊর্ধ্বদিকে। লক্ষ লক্ষ গির্জার লক্ষ লক্ষ শিখর মা-মেরির দিব্য সিংহাসনের পার্থিব স্তম্ভ।'

কিন্তু মানুষ এখানে এসেও থামল না। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, মানুষের বিশ্বাস মাতার প্রেম, পুত্রের ভালবাসার চেয়েও শক্তিশালী যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীর মধ্যে যে প্রেম উদ্ভাসিত হয়। বাইবেলে যখন বলা হয়েছে, "For love is stronger than death" তখন মহাপুরুষ এই প্রেমের কথা ভেবেছিলেন। তাই মানুষ বিচার করল, 'ভগবানকে যদি ভালবাসা দিয়েই পেতে হয়, তবে সে ভালবাসা তার নিবিড়তম রূপ নেবে না কেন? ভগবানকে তবে পিতা অথবা মাতারূপে কল্পনা না করে তাঁকে হৃদয়ে বসাব বল্লভরূপে, প্রেমিকরূপে।''

সমস্ত বৈষ্ণব রসসাধনা এই তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত—সে কথা পরে হবে। কিন্তু ক্যাথলিক রহস্যবাদী ভক্তেরা (Mystic saints) ও যে এ-রকম রসস্বরূপে আরাধনা করছেন তার সন্ধান আমরা কমই রাখি,- কারণ আমাদের পরিচয় প্রধানতঃ প্রটেস্টান্ট ধর্মের সঙ্গে। ঈষৎ দীর্ঘ হলেও নিচের কবিতাটি উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না:—

O Night, that dids't lead us thus.
O Night, more lovely than dawn
of light,
O Night, that broughtest us
Lover to lover's sight

Lover with loved in marriage
of delight !

Upon my flowery breast,
Wholly fos him, and save himself
for none,

There did I give sweet rest
To my beloved one ;
The fanning of the cedars
breathed thereon.

When the first morning air
Blew from the bower, and waived
his locks aside.

His hand with gentle care,
Did wound me in the side,
And in my body all my senses
died.

All things I then forgot,
My cheek on him who for my
comming came ;

All ceased and I was not,
Leaving my cares and shame
Among the lilies and forgetting
them.

ক্যাথলিক জগতের বিখ্যাত সাধু সান খোয়ান্ দে লা ক্রুসের (San Juan de la Cruz) কবিতা পড়ে কে বলবে—এ কবিতা আধ্যাত্ম জগতের ধর্মরস সৃষ্টি করবার জন্য রচিত হয়েছিল ? এ কবিতা তো বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে বাঁধা।

কিন্তু ভগবানকে রসস্বরূপে আরাধনা করার প্রচেষ্টাতে ক্যাথলিক জগতের এই চূড়ান্ত।

বৈষ্ণব ভক্ত সেই চূড়ান্ত ত্যাগ করে তারপর আকাশে উড্ডীয়মান হন। বৈষ্ণব প্রেমিক বলেন,—'বৈধ প্রণয়ের নিবিড়তা বার বার হার মেনেছে অবৈধ প্রেমের সম্মুখে। আত্মীয়স্বজন, প্রচলিত ধর্মরীতি যেখানে এসে প্রেমের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, দুর্বার প্রেম এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেইখানেই। তাই আমাদের কদম্ববনবিহারিণী বিরহিণী ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধা যে প্রেম পাগলিনী, সে প্রেমের সঙ্গে অন্য কোন প্রেমের তুলনা হয় না। বাঙালীর রাধা বিবাহিতা,

—সমাজ তাঁর প্রেমের পথে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে। শাশুড়ী-ননদী শঙ্খ-করাতের মত তাঁকে আসতে যেতে যেন খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলছেন।

বহু যুগ পূর্বে উচ্চারিত মন্ত্র তাই তার সম্পূর্ণ অর্থ পেল কৃষ্ণরাধার মিলনে—

যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম॥

ভারতের বাইরে একমাত্র ইরানে মাঝে মাঝে এই সর্বোচ্চ রসসাধনার সন্ধান মেলে। কারণ ভারত ও ইরানের আধ্যাত্মিক যোগাযোগ বহু শত শতাব্দীর। তাই ইরানী কবি সুর মিলিয়ে গেয়েছেন :—

'মন্ তু শুদম্ তু মন্ শুদী, মন্ তন্ শুদম্
তু জাঁ শুদী
তা কসীন গোয়েদ্ বাদ্ আজ্ ঈঁ মন্ দিগরম্
তু দিগরী।'
আমি তুমি হনু, তুমি আমি হলে, আমি দেহ
তুমি প্রাণ,
এর পরে যেন কেহ নাহি বলে তুমি আন
আমি আন।

* * *

এই বিশাল রসধারার কত স্রোত, কত-শত শাখা-প্রশাখা। কত ধ্বনি, কত সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সান খোয়ান, শ্রীরাধা, রুমীর বিরহকাতর বক্ষ থেকে। কিন্তু হায়, এ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি মানুষকে কাছে এনেও কাছে আনতে পারল না। অর্থের সন্ধানে—স্বার্থের অন্বেষণে আজ পৃথিবীর এক কোণের মানুষ অপর কোণে গিয়ে মাথা কোটে, কিন্তু এ সব সাধক প্রেমিকদের বাণী এক করে দেখবার চেষ্টা কেউ যে করে না!!

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে'

শব্দপ্রাচুর্যের উপর ভাষার শক্তি নির্ভর করে। ইংরেজী এবং বাঙলা এই উভয় ভাষা নিয়ে যাঁদের একটুখানি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়, তাঁরাই জানেন বাঙলার শব্দ-সম্পদ কত সীমাবদ্ধ। ডাক্তারী কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনিকেল শব্দের কথা তুলছিনে—সে সব শব্দ তৈরী হতে ঢের দেরী—উপস্থিত সে শব্দের কথাই তুলছি যে-গুলো সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বদা দরকার হয়।

ইংরেজির উদাহরণই নিন। ইংরেজি যে নানা দিক দিয়ে ইয়োরোপীয় সর্ব-ভাষার অগ্রগণ্য তার অন্যতম প্রধান কারণ ইংরেজির শব্দ-সম্পদ। এবং ইংরেজি সে সম্পদ আহরণ করেছে অত্যন্ত 'নির্লজ্জের' মত পূর্ব-পশ্চিম সর্ব দেশ-মহাদেশ থেকে। গ্রীক, লাতিনের মত দুটো জোরালো ভাষা থেকে তার শব্দ নেবার হক তো সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েইছে, তার উপর ফরাসীর উপরও ওয়ারিশান বলে তার ষোলআনা অধিকার। তৎসত্ত্বেও—সুকুমার রায়ের ভাষায় বলি

এতো খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু-পোড়া খাও তবে ঘণ্টা!!

ইংরেজ উত্তরে বেশরমের মত বলে, "ঠিক বলেছ আমার মন ওঠেনি, আমি কচু-পড়া এবং ঘণ্টা খেতেও রাজী আছি!"

তাই দেখুন ইংরেজ, আরবী, ফার্সী, তামিল, হিন্দী, মালয়—কত বলবো? —দুনিয়ার তাবৎ ভাষা থেকে কচু-পোড়া ঘণ্টা সব কিছু নিয়েছে, খেয়েছে, এবং হজমও করে ফেলেছে। 'এডমিরাল' নিয়েছে আরবী 'আমীর-উল্-বহর' থেকে, 'চেক' (কিস্তিমাতের) নিয়েছে ফার্সী 'শাহ' থেকে, 'চুরুট' নিয়েছে তামিল 'শুরুট্টু' থেকে, 'চৌকি' নিয়েছে হিন্দী থেকে, 'এমাক' নিয়েছে মালয় থেকে।

(কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজের এই বিদঘুটে গরুড়ের ক্ষুধা শুধু শব্দ বাবদেই; আহারাদির ব্যাপারে ইংরেজ নকিমিস্তি কুলীনের মত উন্নাসিক, কট্টর স্বপাকে খায়, এ-দেশে এত কাল কাটানোর পরও ইংরেজ মাস্টার্ড (অর্থাৎ সর্ষেবাটা বা কাসুন্দি) এবং মাছে মিলিয়ে খেতে শেখেনি, অথচ কে না জানে সর্ষেবাটায়

ইলিশ মাছ খাদ্য-জগতে অন্যতম কুতুব-মিনার? ইংরেজ এখনো বিস্বাদ ক্রাইও ফিশ খায়, মাছ ভাজতে শিখলো না; আমারা তাকে খুশী করার জন্য পান্তুয়ার নাম দিলুম লেডিকিনি (লেডি ক্যানিং) তবু সে তাকে জাতে তুললো না, ছানার কদর বুঝলো না। তাই ইংরেজের রান্না এতই রসকষ-বর্জিত, বিস্বাদ এবং একঘেয়ে যে তারই ভয়ে কন্টিনেণ্টাল মাত্রই বিলেত যাবার নামে আঁৎকে ওঠে—যদি নিতান্তই লণ্ডন যায় তবে খুঁজে খুঁজে সোহো মহল্লায় গিয়ে ফরাসী রেস্তোরাঁয় ঢুকে আপন প্রাণ বাঁচায়। আমার কথা বাদ দিন, আমার পেটে এটম বোমা মারলেও আমি ইংরিজি খানা দিয়ে আমার পেট ভরতে রাজী হবো না!)

শব্দের জন্য ইংরেজ দুনিয়ার সর্বত্র ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় সে না হয় বুঝলুম; কিন্তু ইংরেজের মত দম্ভী জাত যে দুশমনের কাছ থেকেও শব্দ ধার নেয় সেইটেই বড় তাজ্জব কী বাৎ। এই লড়াইয়ের ডামাডোলে সবাই যখন আপন আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত তখনো ইংরেজ গোটা কয়েক শব্দ দুশমনের কাছ থেকে ধার নিয়ে দাঁত দেখিয়ে হেসেছে। লুফ্‌ট-ভাফের মার খেয়ে খেয়ে ইংরেজ যখন মর-মর তখনো সে মনে মনে জপছে, লুফ্‌ট্-ভাফ্‌কে, লুফ্‌ট্ ভাফ্‌ফে, শব্দটা ভুললে চলবে না, 'ব্লিৎস্‌ক্রীগের ঠেলায় ইংরেজ যখন ডানকার্কে ডুবু-ডুবু তখনো ইষ্টনাম না জপে সে জপেছে, 'ব্লিৎস-ক্রীগ, ব্লিৎস-ক্রীগ।'

আর বেতামিজীটা দেখুন। গালাগাল দেবার বেলা যখন আপন শব্দে কুলোয় না—মা লক্ষ্মী জানেন সে ভাণ্ডারেও ইংরেজের ছয়লাব—তখনো সে চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না। এই তো সেদিন শুনলুম কাকে যেন "স্বাধিকার-প্রমত্ত" বলতে গিয়ে কোনো এক ইংরেজ বড় কর্তা শত্রুপক্ষকে শাসিয়েছেন, "আমাদের উপর ফ্যুরার ফপরদালালি করো না।"

পাছে এত সব শব্দের গন্ধমাদন ইংরেজকে জগন্নাথের জগদ্দল পাথরে চেপে মারে তাই তার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছে। 'জগন্নাথ' কথাটা ব্যবহার করেই সে বলেছে, "ভেবে চিন্তে শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করবে—পাগলের মত থ্রো ইয়োরসেলভস্ আণ্ডার দি হুইল অব Juggernaut (জগন্নাথ)।"

ব্যাটারা আমাদের জগন্নাথকে পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা করিয়ে দেশে দেশে ছেড়েছে। পারলে তাজমহল আর হিমালয়ও আগেভাগেই নিয়ে বসে থাকত—কেন পারেনি তার কারণ বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

ফরাসী জাতটা ঠিক তার উল্টো। শব্দ গ্রহণ বাবদে সে যে কত মারাত্মক ছুঁৎবাইগ্রস্ত তা বোঝা যায় তার অভিধান থেকে। পাতার পর পাতা পড়ে

যান, বিদেশী শব্দের সন্ধান পাবেন না। মনে পড়ছে, আমার তরুণ বয়সে শান্তিনিকেতনের ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রোমা রলাঁর পঞ্চাশ না ষাট বছর পূর্ণ হওয়াতে পৃথিবীর বড় বড় রলাঁ-ভক্তেরা তখন তাঁকে একখানা রলাঁ-প্রশস্তি উপহার দেন। এ-দেশ থেকে গাঁধী, জগদীশ বসু এঁরা সব লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কি না ঠিক মনে পড়ছে না। বেনওয়া সায়েবও সে-কেতাবে একখানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—বিষয়বস্তু 'শান্তিনিকেতনের আশ্রম।' 'আশ্রম' শব্দে এসে বেনওয়া সায়েবের ফরাসী নৌকা বানচাল হয়ে গেল। 'আশ্রম' শব্দটা ফরাসীতে লিখবেন কি প্রকারে, অথচ ফরাসী ভাষায় 'আশ্রম' জাতীয় কোনো শব্দ নেই। আমি বললুম, 'প্যারিস শহর আর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তে অবস্থিত—অন্ততঃ ভাবলোকে—সে কথা সবাই জানে, তবু—ইত্যাদি।' বেনওয়া সায়েব ফরাসী কায়দায় শোলডার শ্রাগ করে বললেন, 'উহুঁ, বদহজম হবে।' সায়েব শেষটায় কি করে জাত-রক্ষা আর পেট ভরানোর দ্বন্দ্ব সমাধান করেছিলেন, সে-কথাটা এতদিন বাদে আজ আমার আর মনে নেই।

অর্থাভাবশতঃ একদা আমাকে কিছুদিনের জন্য এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর ফ্রান্সাগত ফরাসী চিঠি-পত্রের অনুবাদ করে দিতে হয়েছিল। মনে পড়ছে, কারবারে ফরাসী পক্ষ হামেশাই ইংরেজ পক্ষকে দোষারোপ করত যে ইংরেজ অনেক সময় আপন অভিসন্ধি সাফ সাফ বলে না। ইংরেজি ভাষায় শব্দসম্পদ প্রচুর বলে ইচ্ছে করলেই আপন বক্তব্য ঘোলাটে, আব্‌ছা-আব্‌ছা করে লেখা যায়। ফরাসীতে সেটি হবার জো নেই। যা বলার সেটা পরিষ্কার হয়ে বেরবেই বেরবে (লক্ষ্য করে থাকবেন কাচ্চা-বাচ্চার শব্দ-সম্পদ সীমাবদ্ধ বলে তাদের কথায় সব জিনিসই হয় কালো নয় ধলা, সব কিছুই পরিষ্কার, কোনো প্রকারের হাফটোন নেই)। তাই ফরাসী এই চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারে পড়লো বিপদে।

কিন্তু ফরাসীরাও গম যব দিয়ে লেখাপড়া শেখে না। তাই শেষটায় ফরাসী কারবারি হুমকি দিল, সে ইংরেজ রেখে চিঠি-পত্র ইংরাজীতে লেখাবে। ইংরেজ হন্তদন্ত হয়ে চিঠি লিখল, 'সে কি কথা, আপনাদের বহুৎ তকলিফ হবে, বড্ড বেশী বাজে খর্চা হবে, এমন কর্ম করতে নেই।'

তখন একটা সমঝাওতা হল।

Gepaeckaufbewahrungstelle !

প্রথমবার বার্লিন যাচ্ছি, জর্মন ভাষার জানি শুধু ব্যাকরণ, আর কণ্ঠস্থ আছে হাইনরিশ হাইনের গুটিকয়েক মোলায়েম প্রেমের কবিতা। সে-রেস্ত দিয়ে তো বার্লিন শহরে বেসাতি করা যায় না। তাই একজন ফরাসী সহযাত্রীকে ট্রেন বার্লিন পৌঁছবার কিছু আগে জিজ্ঞেস করলুম, 'ক্লোক-রুম' বা 'লেফট-লগেজ-অফিসের' জর্মন প্রতিশব্দ কি ? বললেন—

Gepaeckaufbewahrungstelle !

প্রথম ধাক্কায়ই এ-রকম আড়াইগজী শব্দ মুখস্থ করতে পারবো, সে দুরাশা আমি করিনি। মঁসিয়োও আঁচতে পারলেন বেদনাটা—একখানা কাগজে টুকে দিলেন শব্দটা। তাই দেখালুম বার্লিন স্টেশনের এক পোর্টারকে। মাল সেখানে রেখে একটা হোটেল খুঁজে নিলুম। ভাগ্যিস 'হোটেল' কথাটা আন্তর্জাতিক—না হলে ক্লোক-রুমের তুলনায় হোটেলের সাইজ যখন পঞ্চাশগুণ বড় তখন শব্দটা পঞ্চাশগুন লম্বা হত বই কি।

জর্মন ভাষার এই হল বৈশিষ্ট্য। জর্মন ইংরিজীর মত দিল-দরিয়া হয়ে যত্রতত্র শব্দ কুড়োতে পারে না, আবার ফরাসীর মত শব্দতাত্ত্বিক শান্ত-ব্যামোও তার এমন ভয়ঙ্কর মারাত্মক নয় যে উবু হয়ে দু'একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় শব্দ কুড়োতে না পারে। শব্দ সঞ্চয় বাবদে জর্মন ইংরিজী ও ফরাসীর মাঝখানে। তার সম্প্রসারণক্ষমতা বেশ খানিকটা আছে ; কিন্তু ইংরিজী রাবারের মত তাকে যত খুশী টেনে লম্বা করা যায় না।

জর্মন ভাষার আসল জোর তার সমাস বানাবার কৌশলে আর সেখানে জর্মনের মত উদার ভাষা উপস্থিত পৃথিবীতে কমই আছে।

এই যে উপরের শব্দটা শুনে বিদগ্ধ পাঠক পর্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন সেইটেই নিন। Gepaeck অর্থ যা প্যাক করা যায়, অর্থাৎ লাগেজ, aufbewahrung অর্থ তদারকি করা (ইংরিজী beware কথা থেকে bewahrung) ; আর stelle কথার অর্থ জায়গা। একুনে হল 'লাগেজ তদারকির জায়গা।' জর্মন সবকটা শব্দকে আলাদা আলাদা রূপে বিলক্ষণ চেনে বলেই সমাসটার দৈর্ঘ্য তাকে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত করে না।

তুলনা দিয়ে বক্তব্যটা খোলসা করি।

"কিংকর্তব্যবিমূঢ়" কথাটার সামনে আমরা মোটেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইনে। তার কারণ, কর্তব্য আর বিমূঢ় আমরাই হামেশাই ব্যবহার করি আর কিং

কথাটার সঙ্গেও আমাদের ঈষৎ মুখচেনাচিনি আছে। কাজেই সমাসটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের বড্ড বেশী 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের' প্রয়োজন হয় না। যারা সামান্যতম বাঙলা জানে না তাদের কথা হচ্ছে না; তারা 'নিত্যসা ফতে না দিয়ামা' করে এবং ঘৃত-তৈল-লবণ-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধনের সামনে ঘরপোড়া গোরুর মত সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়।

বড্ড বেশী লম্বা সমাস অবিশ্যি কাজের সুবিধে করে দেয় না। তাই যারা সমাস বানাবার জন্যই সমাস বানায় তাদের কচকচানি নিয়ে আমরা ঠাট্টামস্করা করি। জর্মনরাও করে। রাজনৈতিক বিসমার্ক পর্যন্ত সমাস বানাবার বাই নিয়ে ঠাট্টা করতে কসুর করেননি। 'ড্রগিস্ট' শব্দটা জর্মনে চলে, কিন্তু তার একটা উৎকট জর্মন সমাস স্বয়ং বিসমার্ক বানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

Gesundheitswiederherstellungsmittelzusammenmischungverhaeltnisskundiger.

টুকরো টুকরো করলে অর্থ হয়; 'স্বাস্থ্য', 'পুনরায় দান', 'সর্বভৈষজ', 'একসঙ্গে মেশানোর তত্ত্বজ্ঞান'। একুনে হবে 'স্বাস্থ্যপুনরদাসর্বভৈষজসংমিশ্রণ শাস্ত্রজ্ঞ'।

(সমাসটায় কোনো ভুল গেলে বিদগ্ধ পাঠক বিরক্ত হবেন না—আমার সংস্কৃতজ্ঞান 'নিত্যসা ফতেনা' জাতীয়।)

সংস্কৃত ভাষা সমাস বানানোতে সুপটু, সে-কথা আমরা সবাই জানি এবং প্রয়োজনমত আমরা সংস্কৃত থেকে সমাস নিই, কিন্তু নূতন সমাস যদি বা আমরা বানাই, তবু কেমন যেন আধুনিক বাংলায় চালু হতে চায় না। 'আলোকচিত্র', 'যাদুঘর', 'হাওয়া গাড়ি', কিছুতেই চললো না—ইংরিজী কথাগুলোই শেষ পর্যন্ত ঠেলা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসন জাঁকিয়ে বসলো। দ্বিজেন্দ্রনাথ নির্মিত automobile কথার 'স্বতশ্চলশকট' সমাসটা চালানোর ভরসা আমরা অবশ্য কোনো কালেই করিনি।

বিশেষ করে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এ-প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করেছি—এবং এতক্ষণ ধরে তারই পটভূমিকা নির্মাণ করলুম।

ভাষাকে জোরালো করার জন্য যে অকাতরে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করতে হয়, সে-কথা অনেকেই মেনে নেন, কিন্তু আপন ভাষারই দুটো কিংবা তারও বেশী শব্দ একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে তৃতীয় শব্দ নির্মাণ করে ভাষায় শব্দভাণ্ডার বাড়ানো যায়, সে দিকে সচরাচর কারো খেয়াল যায় না।

এই সমাস 'বানানোর প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা কোনো কোনো ভাষার নেই।

ইংরিজী ফরাসী কেঁদে কুকিয়ে দৈবাৎ দু'একটা সমাস বানাতে পারে—যথা 'হাই-ব্রাও', 'রাঁদেভু'। এ প্রবৃত্তি যে ভাষার নেই, তার ঘাড়ে এটা জোর করে চাপানো যায় না।

বাঙ্গলার আছে, কিন্তু মরমর। এখানে শুদ্ধ সংস্কৃত সমাসের কথা হচ্ছে না—সে তো আমরা নিইই—আমি খাঁটি বাঙ্গলা সমাসের কথা ভাবছি। হুতোমের আমলেও অশিক্ষিত বাঙালী খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ দিয়ে খাসা সমাস বানাতো। মেছুনি ডাকছে, "ও 'গামছা-কাঁধে,' দাঁড়া, ঐ হোথায় 'খ্যাংরা-গোঁপো' তোর সঙ্গে কথা কইতে যায়।"

একেই বলে সমাস! চট করে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু আজকালকার লেখকেরা এরকম সমাসের দিকে নজর দেন না নতুন সমাস গড়বার তকলিফ বরদাস্ত করতে তো তাঁরা বিলকুল নারাজ বটেনই। সমাস বানাবার প্রবৃত্তিটা অনাদরে ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কারণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরা যদি দিশী সমাসকে আপন লেখনে স্থান না দেন, তবে ক্রমে ক্রমে গোটা প্রবৃত্তিটা বেমালুম লোপ পায়—যে-রকম বাউল-ভাটিয়ালী সাহিত্যিকদের কাছে সম্মান পাচ্ছে না বলেই ক্রমে উপে যাচ্ছে—পরে যখন হুঁশ হয় ততদিনে ভাষার লড়াইয়ের একখানা উমদা-সে উমদা হাতিয়ার অবহেলায় মর্চে ধরে শেষ হয়ে গেছে। তখন শুধু মাথা-চাপড়ানো আর কান্নাকাটি।

রবীন্দ্রনাথ এ তত্ত্বটা শেষ বয়সে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই শেষ রাতেই ওস্তাদের মার দেখিয়ে গিয়েছেন :—

'ডাকছে থাকি থাকি
ঘুমহারা কোন্ 'নাম-না-জানা' পাখী'
'দক্ষিণের 'দোলা-লাগা,' 'পাখী-জাগা'
বসন্ত প্রভাতে'

তাই বলি বাঙ্গলা ভাষা 'লক্ষ্মীছাড়া' 'হতভাগা' নয়। শুধু হাতীর মত আমরা নিজেদের তাগদ জানিনে॥

মার্জারনিধন কাব্য

বা

গুরবে কুশ্‌তন শব-ই-আওওয়ল

কোন্ দেবে পূজা করি কোন শীর্নী ধরি ?
গণপতি, মৌলা-আলী, ধূর্জটি, শ্রীহরি ?
মুশকিল্ আসান্ আর মুর্শীদ মস্তান্
কোম্পানি কি মহারানী, ইংরেজ, শয়তান ?
হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, যেবা আছ যথা
ইস্পাহানী, ডালমিঞা—কলির দেবতা।
সবারে স্মরণ করি সিতুমিঞা ভণে
বেদরদ বেধড়ক ভয় নাহি মনে ॥

ইরান দেশের কেচ্ছা শোনো সাধুজন
বেহদ্ রঙীন কেচ্ছা, বহুৎ বরণ।
এস্তার তালিম পাবে করিলে খেয়াল
রোশনী আসিবে দিলে ভাঙিয়া দেয়াল।
পুরানা যদিও কেচ্ছা তবু হর্বকৎ
সমঝাইয়া দিবে নয়া হাল হকীকৎ ॥

ইরান দেশেতে ছিল যমজ তরুণী
ইয়া রঙ, ইয়া ঢঙ, নানা গুণে গুণী।
কোথায় লায়লী লাগে কোথায় শিরীন
চোখেতে বিজলী খেলে ঠোঁটে বাজে বীণ ;
ওড়না দুলায়ে যবে দুই বোন যায়
কলিজা আছাড় খায় জোড়া রাঙা পায়।
এ্যাসা পীরিতি তোলে ফকিরেরও জানে
বেহুঁশ হইয়া লোক তারীফ বাখানে।

দৌলতও আছিল বটে বিস্তরে বিস্তর
বাপ দাদা রাখি গেলা চাকর-নফর ।
ধন জন ঘর বাড়ী তালাব খামার
টাকা কড়ি জওয়াহর এন্তারে এন্তার ।
তার দুই নারী চায় থাকিতে আজাদ
কলঙ্কের ভয়ে শুধু বিয়ে হৈল্ সাধ ।
তখন করিল শর্ত সে বড় অদ্ভুত
সে শর্ত শুনিলে ডর পায় যমদূত ।
বলে কিনা প্রতি ভোরে মিঞার গর্দনে
পঞ্চাশ পয়জার মারি রাখিবে শাসনে !
এ বড় তাজ্জব বাৎ বেতালা বদ্‌খদ্
এ শর্ত মানিবে কেবা হয় যদি মর্দ ?
দুল্‌হা বরেতে ছিল পাড়া ছয়লাপ
শর্ত শুনে পত্রপাঠ হয়ে গেল সাফ ।
সিতু মিঞা বলে সাধু এ বড় কৌতুক ।
মন দিয়া কেচ্ছা শোনো পাবে দিলে সুখ ॥

শীত গেল বর্ষা গেল আসিল বাহার
ফুলে গুলে ইস্‌ফাহান হৈল গুলজার ।
শীরাজ তব্রীজ আর আজরবৈজান
খুশীতে ভরপুর ভেল জমিন আসমান ।
শুধু দুই ভাই নাম ফিরোজ মতীন
পেটের ধান্দায় মরে দুঃখে কাটে দিন ।
অবশেষে ছোট ভাই বলে ফিরোজেরে
"কি করে বাঁচিবে বলো, কি হবে আখেরে
তার চেয়ে জুতা ভালো চলো দুই জনে
শাদী করি পেট ভরি দু মেয়ের সনে !
দুআতুলা ফিরোজের মন মাঝে হয়
শাদীতে আপশে বটে স্তুতাঙ্কও তো ভয় ।

হদীসের লাগি ঘাঁটে কুরান পুরাণ
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান ॥

মজলিস জৌলুস করি দুনিয়া রওশন
জোড়া শাদী হয়ে গেল খুশ ত্রিভুবন।
চলি গেলা দুই ভাই ভিন্ন হাবেলিতে
মগ্ন হইয়া মত্ত হইলা রসের কেলিতে।
পয়জারের ভয়ে নারি করিতে বয়ান
সিতু ভণে চুপিসারে শুনে পুণ্যবান ॥

তিন মাস পরে বুঝি খুদার কুদ্রতে
আচম্বিতে দু ভায়েতে দেখা হল পথে।
কোলাকুলি গলাগলি সিনা কলিজায়
মরি মরি মেলামেলি করে দুজনায়।

"তোমার মাথায় টাক নাই কেন?"
শুধায় ফিরোজ ভাই
মানিয়া তাজ্জব উত্তরে মতীন
"টাক কেন বলো তাই?"
কাঁচুমাচু হয়ে পুছিল ফিরোজ
"জোরে কি মারে না চটি?"
"আরে দুত্তোর হিম্মত কাহার
আমি কি তেমনি বটি?
বাখানিয়া বলি শোন কান পেতে
ভরতিব কাহারে কয়
আজব দুনিয়া আজব চিড়িয়া
মামেলা ঝামেলা ময়।
তাই বসিলাম তলওয়ার হাতে
বীবী দিলা থানা আনি
কোর্মা পোলাও তন্দুরী মুর্গী
ঢাকাই বাখরখানী।

থানা আইল যেই বীবীর পেয়ারা
বিড়াল আসিল সাথে
যেই না করিল মরমিয়া 'ম্যাঁও'
থাপটা না তুল্যা হাতে,—
খুল্যা তলোয়ার এক কোপে কাট্যা
ফালাইনু কল্লাডারে
তাজ্জাব বীবী আক্কেল গুড়ুম
জবানে রা'টি না কাড়ে।
গুস্‌সা কৈরা কই 'এসব না সই
মেজাজ বহুৎ কড়া
বরদাস্ত নাই বিলকুল আমার
ভবিষ্যৎ আগুনে গড়া।'
তার পর কার ঘাড়ে দুইডা মাথা
করিবে যে তেড়িমেড়ি ?"
সিতু মিঞা কয় নিশ্চয় নিশ্চয়
বাঘিনী পরিল বেড়ি।

"ক্যাবাৎ", "ক্যাবাৎ" বলি হইয়া করি ভর
চলিলা ফিরোজ মিঞা পৌঁছি গেলা ঘর।
মিলেছে দাওয়াই আর আন্দেশা তো নাই
খুদার কুদ্রতে ছিল তালেবর ভাই।
তার পর শোনো কেচ্ছা শোনো সাধুজন
ঠাস্যা দিল সেই দাওয়া পুলকিত মন।
সে রাতে থানার ওক্তে খুল্যা তলোয়ার
কাট্যা না ফালাইল মিঞা কল্লা বিল্লিডার
চক্ষু দুইডা রাঙ্গা কর্যা হুঙ্কারিয়া কয়
"ভবিষ্যৎ আমার বুঝি গড়া না সয়।
হুশিয়ার হয়ে থেকো নয় সর্বনাশ।"
সিতু মিঞা শুনে কয়, শাবাশ শাবাশ।

হায়রে বিধির লেখা, হায়রে কিস্মৎ
জহর হইয়া গেল যা ছিল শর্বৎ।
ভোর না হইতে বীবী লয়ে পয়জার
মিঞার বুকেতে চড়ি কানে ধরি তার।
দোদম মারে জুতা দাড়ি ছিঁড়ে কয়
"তবিয়ৎ তোমার বুরা, বরদাস্ত না হয়?
মেজাজ চড়েছে তব হয়েছ বজ্জাৎ?
শাবুদ করিব তোমা শুনে লও বাৎ।
আজ হৈতে বেড়ে গেল রেশন তোমার
পঞ্চাশ হৈতে হৈল একশ' পয়জার।"
এত বলি মারে কিল মারে কানে টান
ইয়াল্লা ফুকারে সিতু ভাগ্যে পুণ্যবান
কোথায় পাগড়ী গেল কোথায় পাজামা
হোঁচট খাইয়া পড়ে কভু দেয় হামা।
খুন ঝরে সর্ব অঙ্গে ছিঁড়ে গেছে দাড়ি
ফিরোজ পৌঁছিল শেষে মতীনের বাড়ি।
কাঁদিয়া কহিল "ভাইয়া কি দিলি দাওয়াই
লাগাইনু কামে এবে জান যায় তাই।"
বর্ণিল তাৎ বাৎ, মতীন শুনিল
আদর করিয়া ভায়ে কোলে তুলি নিল।
বুলাইয়া হাত মাথে বুলাইয়া দেহ
"বিড়াল মেরেছ" কয়, "নাই তো সন্দেহ।
ব্যাকরণে তবু, দাদা, কৈলা ভুল খাঁটি।
বিলকুল বরবাদ সব গুড় হৈল মাটি।
আসল এলেমে তুমি করোনি খেয়াল
শাদীর পয়লা রাতে বধিবে বিড়াল।"
বাণীরে বন্দিয়া বন্দিয়া বান্ধিলো বয়ান
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান।

মল্লিনাথস্য {
স্বরাজ লাভের সাথে কালোবাজারীরে
মারনি এখন তাই হানো শিরে।
শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল
না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল॥ *
}

বেদে

ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর মিশরে চাকরি করার পর ইংরেজ রাসল্ পাশা (পাশা খেতাবটি তিনি মিশরীয় সরকারের কাছ থেকে পান) একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছেন। সা'দ জগলুল পাশা থেকে আরম্ভ করে বহু বাঘ বহুৎ চিড়িয়ার সঙ্গে তাঁর বিস্তর যোগাযোগের ফলে এই কেতাবখানি লেখা হয়েছে।

এমনকি বেদেরাও এ বইয়ে বাদ পড়েনি! রাসল্ পাশার মতে মিশরের বেদেরা আসলে ভারতীয়। শুধু তাই নয়, রাসল্ পাশা পৃথিবীর আর সব পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন পৃথিবীর সব বেদেরই ভাষা নাকি আসলে ভারতীয়—তা সে ইয়োরোপীয় বেদেই হোক আর চীনে বেদেই হোক্।

পণ্ডিত নই, তাই চট্ করে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ইয়োরোপীয় বেদেরা ফর্সায় প্রায় ইংরেজের শামিল, সিংহলের বেদে ঘনশ্যাম। আচার-ব্যবহারেও বিস্তর পার্থক্য, বহুৎ ফারাক। আরবিস্থানের বেদেরা কথায় কথায় ছোরা বের করে, জর্মনীর বেদেরা ঘুষি ওঁচায় বটে, কিন্তু শেষটায় বখেড়ার ফৈসালা হয় বিয়ারের বোতল টেনে। চীন দেশের বেদেরা নাকি রূপালি ঝরণাতলায় সোনালি চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চুকুস চুকুস করে সবুজ চা চাখে।

তবু আজ স্বীকার করি গুণীরাই হক্ কথা বলেছেন।

*　　　*　　　*

আমার বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ। আজ যেখানে জর্মনীর রাজধানী, সেই সাদা-মাটা বন্ন্ (Bonn) শহরে আমি তখন কলেজ যাই। এগারোটার ঝোঁকে কলেজের পাশের কাফেতে বসে এক পাত্র কফি খাই। ও সময়টায়

---

* ইরানে এ কাহিনী সবিস্তর বলা হয় না। শুধু বলা হয়, 'গুরবে কুশতন, শব ই-আওওয়ল' অর্থাৎ গুরবে = বিড়াল, কুশতন্ = মারা, শব = রাত্রি, অওওয়ল = প্রথম। সোজা বাঙলায়, 'পয়লা রাতেই মারবে বেরাল।'

বনের মত আধা-ঘুমন্ত পুরীর কাফেতে খদ্দেরের ঝামেলা লাগে না। খদ্দের বলতে নিতান্ত আমারই মত দু'একটি কফি-কাতর প্রাণী।

সেদিনও তাই আমি এক কোণে কফি সাঙ্গ করে উঠি-উঠি করছি, এমন সময় অন্য কোণের কাউণ্টারে, আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল এসে এক বেদেনী। গোলাপী স্কার্ট, বেগুনী ব্লাউজ, লাল-নীলে ডোরা-কাটা স্কার্ফ, মিশ-কালো খোঁপা-বাঁধা চুল। কেক্ আর কফির গুঁড়ো কিনতে এসেছে।

সওদা শেষ হয়ে গেলে পর যখন সে ঘুরে দাঁড়াল তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার উপর। প্রথমটায় থ হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাট প্যাট করে। তারপর কি এক বিজাতীয় ভাষায় চীৎকার করে সোল্লাসে এগিয়ে এল আমার দিকে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় সর্বমুখ টমাটোর মত লাল করে অনর্গল বকে যেতে লাগল সেই 'যাবনিক' ভাষায়। সে ভাষা আমার চেনা-অচেনা কোনো ভাষারই চৌহদ্দি মাড়ায় না, কিন্তু শোনালো—তারই মুখের মত—মিষ্টি।

আমি জর্মনে বললুম, 'আমি তো আপনার ভাষা বুঝতে পারছিনে।'

মেয়েটি মুখ করল আরও লাল। বুঝলুম, চটেছে। ফের চলল সেই তুবড়ী-বাজী—সেই বিজাতীয় বুলিতে। কিছুতেই জর্মন বলতে রাজী হয় না।

আমি কাতর হয়ে কাফের মালিককে বললুম, 'একে বুঝিয়ে বলুন না, আমি ভারতীয়। এর ভাষা বুঝতে পারছিনে।'

আমার সকরুণ নিবেদনটা শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়েটা হুঙ্কার দিয়ে কাফেওয়ালাকে পরিষ্কার জর্মনে বলল, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। আমরা বেদে, ভারতবর্ষ আমাদের আদিম ভূমি। এও ভারতীয়। আমার জাত-ভাই। ভদ্রলোক সেজেছে, তাই আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না।'

আমি আর কি বলব ? পণ্ডিতেরাও তো এই মতই পোষণ করে। তবু বললুম, 'কিন্তু সত্যি বলছি, আমি আপনার ভাষা বুঝতে পারছিনে।'

চোখে মুখে—এমনকি আমার মনে হল চুলে পর্যন্ত—ঘেন্না মেখে মেয়েটা গটগট করে কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বোকার মতন তাকিয়ে রইলুম।

কয়েক মিনিট পরে জানালার দিকে নজর যেতে দেখি সেই মেয়েটি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কফির দাম পূর্বেই চুকিয়ে দিয়েছিলুম—চুপ করে বেরিয়ে পড়ে তার মুখোমুখি হলুম।

ধবধবে দাঁতে হাসি: ঝিলিক [illegible] [illegible] করে নিজে বললো

—ছুত্তোর ছাই আবার সেই বিজাতীয় ভাষায়—কি বললো, খোদায় মালুম। গড়গড় করে চোখে-মুখে হাসি মেখে, সুডৌল দু'খানি বাহু দুলিয়ে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যে ঢেউ তুলে।

আমি আবার জর্মনে বললুম, 'সত্যি ফ্রলাইন (কুমারী), আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছিনে।'

কেউটে সাপের মতো ফণা তুলে যেন আমাকে ছোবল মারতে এল। আমি তড়াক করে তিন কদম পিছিয়ে গেলুম।

হঠাৎ মেয়েটা কি যেন ভেবে নিয়ে আবার হাসিমুখে বলল,—যাক্ বাঁচাল, এবার জর্মনে—'সব মানুষেরই কিছু না-কিছু পাগলামি থাকে, তোমার বুঝি মাতৃভাষায় কথা না বলার ? তা আমি সেটা সয়ে নিলুম। কিন্তু কেন এ স্নবারি, আপন ভাষাকে অবহেলা, কাফের লোকের সামনে আপন জনকে অস্বীকার করা ? তাই তোমাকে বাইরে ডেকে আনলুম।'

আমি বললুম, 'তোমার আপন জন হতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমি তো তা নই।'

ফের ফণা তুলতে গিয়ে নিজেকে চেপে নিয়ে বলল, 'তোমার আপন জন নই আমি ? দেখো দিকিনি তোমায় রঙ আর আমার রঙ মিলিয়ে—একই বাদামী না ? হাঁ, আমার একটু সোনালী বটে—তা সে আমি রোদবৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি করি বলে। দেখো দিকিনি চুলের রঙ—মিশকালো, ঢেউখেলানো। নিজের চোখ দেখনি কখনো আয়না দিয়ে ?—আমার চোখের রঙ তোমারই মত কালো। আর সব জর্মনদের দিকে তাকিয়ে দেখো, হাবা-গবার দল, শ্বেত কুষ্ঠের মত সাদা, মাগো !'

আমি চুপ।

বলল, 'বুঝতে পেরেছি, বাপু, বুঝতে পেরেছি ; বাপ তোমার দু'পয়সা রেখে গিয়েছে—হঠাৎ নবাব হয়েছে। এখন আর বেদে বলে পরিচয় দিতে চাও না। হাতে আবার খাতাপত্র—কলেজ যাও বুঝি ? ভদ্রলোকের সাজার শখ চেপেছে, না ?'

আমি বললুম, 'ফ্রলাইন, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার সাতপুরুষ লেখাপড়া করেছে, আমিও তাই করছি। ভদ্রলোক সাজা না-সাজার কোনো কথাই উঠছে না।'

মেয়েটি এমনভাবে তাকালো যার সোজা অর্থ 'গাঁজা গুল।' জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভারতীয় নও ?'

আমি বললুম, 'আলবৎ!'

আনন্দের হাসি হেসে বলল, 'ভারতীয়েরা সব বেদে।'

আমি বললুম, 'সুন্দরী, তোমরা ভারতবর্ষ ছেড়েছ হাজার, দু'হাজার বছর কিংবা তারও পূর্বে। বাদবাকী ভারতীয়রা এখনো গেরস্থালী করে।'

কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলল, 'তোমার সঙ্গে আর কাঁহাতক খামকা তর্ক করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে। আমাদের সার্কাসের গাড়ি শহরের বাইরে রেখে এসেছি। বাবা, মা সেখানে তোমাকে পেলে ভারি খুশী হবেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করো। তখন বুঝবে ঠ্যালা কারে কয়। বাবা সব জানে। কাচের গোলার দিকে তাকিয়ে তোমাকে সব বাৎলে দেবে।'

অনেকক্ষণ ধরে এ রকম ধারা কথা হয়েছিল। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, আমি বেদে নই, স্বব নই, সাদা-মাটা ভারতীয়।

* * *

এ-কথাটা কিন্তু সেদিন সাফ বুঝে গেলুম, দু'হাজার কিংবা তার বেশি বছর পরে যাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তারা যদি বিদেশ-বিভূঁইয়ে দেখামাত্র আমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি আমাদের আপন জন, তখন কি করে বুক ঠুকে বলি—যদিও জানি, আজ আমাদের ভাষা আলাদা, আচার ব্যবহার আলাদা—যে ওরা ভারতীয় নয়?

ভাষাতত্ত্ব

প্যারিসে রেস্তর্রাঁয় বসে আছি। নিতান্ত একা; যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরা আসেননি। এমন সময় একটি অতি সুপুরুষ এসে আমারই টেবিলের একখানা শূন্য চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন—অবশ্য প্রথমে 'ফরাসী' কায়দায় বাও করে, আমার অনুমতি নিয়ে।

নিতান্ত মুখোমুখি তদুপরি কার্তিকের মত চেহারাখানা—বার বার আমার মুগ্ধ চোখ তাঁর চেহারার দিকে ধাওয়া করছিল। তিনিও নিশ্চয়ই এ রকম পরিস্থিতিতে জীবনে আরো বহুবার পড়েছেন; কি করতে হয় সেটা তাঁর রপ্ত আছে।

সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলছেন, 'ইচ্ছে করুন।'

6

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসীটা বলতে পারেন তো? আমি তো আর কোনো ভাষা জানিনে।'

আমি বললুম, 'ফরাসী ভাষাটা সব সময় ঠিক বুঝতে পারি কি না বলা একটু কঠিন। এই মনে করুন, কোনো সুন্দরী যখন প্রেমের আভাস দিয়ে কিছু বলেন, তখন ঠিক বুঝতে পারি আবার যখন ল্যাণ্ডলেডি ভাড়ার জন্যে তাগাদা দেন তখন হঠাৎ আমার তাবৎ ফরাসী ভাষাজ্ঞান বিলকুল লোপ পায়।'

উচ্চাঙ্গের রসবিকাশ হল না সে কথা আমার সুরসিক পাঠকেরা বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই একটুখানি স্মিতহাস্য করবেন। আমিও এ-কথা জানি, কিন্তু বিদেশে যখন মানুষ নিতান্ত একা পড়ে এবং রাম, শ্যাম, যে-কোনো কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে চায় তখন ঐ হল একমাত্র পন্থা, অর্থাৎ তখন কাঁচা, পাকা যে-কোনো প্রকারের রসিকতা করে বোঝাতে হয় যে, আমি তখন সঙ্গ-সুখলিপ্সু।

ফরাসী ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দেশভ্রমণ বড় ভালো জিনিস। বিদেশে ভাষা নিয়ে এ ভানটা অনায়াসে করা যায়। আমি করি কি প্রকারে? আমি যে ফরাসী সে তো আর বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারিনে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে না হয় হল। কিন্তু বলুন তো, শব্দার্থ আপনি ঠিক ঠিক বুঝতে শিখেছেন? এই যদি আমি বলি যে, আমি 'জার্নালিস্ট' তাহলে তার মানে কি হল?'

এক গাল হেসে বললুম, 'তা আর জানিনে? তার মানে হল আপনি খবরের কাগজে লেখেন।'

'উঁহু, হল না। ঠিক তার উল্টো; আমি লিখিনে। সে কথা যাক। আরেকটি উদাহরণ দি। আমি যদি বলি 'আচ্ছা তা হলে আরেকদিন দেখা হবে, তবে তার মানে কি?'

আমি এবারে আরেক গাল আর হাসলুম না; বললুম, 'তার মানে আরেক-দিন দেখা হবে,' এতে আর অস্পষ্টতাটা কোথায়?

বললেন, 'ফেল্! তার মানে হল, 'আপনি এবারে দয়া করে গাত্রোৎপাটন করুন।'

আমি খুশী হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরাও যখন বাঙলায় বলি, 'এবার তুমি এসো' তখন তার অর্থ 'তুমি এবারে কেটে পড়ো'।'

'ঠিক ধরেছেন। তাই বলছিলুম, আমি জার্নালিস্ট ; কিন্তু না-লেখার জন্য লোকে পয়সা দেয়। খুলে কই।

'এই ধরুন কয়েক মাস আগে খবর পেলুম, আমাদের ডাকসাঁইটে রাজনৈতিক মসিয়ো অনুস্বার একটি রমণীর সঙ্গে ঢলাঢলি করছেন। ওদিকে বাজারে তাঁর সুনাম আর খ্যাতি অতিশয় ধর্মভীরুরূপে—কোথায় জানিনে গির্জে মেরামত করে দিয়েছেন, কোন্ সেন্টের জন্মদিনে জাব্বাজোব্বা পরে পরবে পয়লা নম্বরী বনেছিলেন এই রকম ধারা কত কি ? আমি খবরটা শুনে বললুম, 'বটেরে স্যাঙাৎ, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি'।

'করলুম কি, লাগলুম তত্ত্ব-তাবাশে। ডাক্তাররা নাকি এক্স-রে দিয়ে পেটের মধ্যিখানের ছবি তোলেন ? স্রেফ গাঁজা ; তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী নাড়ীভুঁড়ির খবর মেলে কয়েক আউন্স রুপো ঢেলে, সোনা ঢাললে তার চেয়েও ভালো।

'সেই নর্তকীর নামধাম সাকিনঠিকানা হাড়হদ্দের তাবৎ খবর পেয়ে গেলুম এক হপ্তার ভিতর।'

সিগারেট ধরাবার জন্য কথা বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এ কর্মে একটুখানি খাবসুরৎ হতে হয়। আমি—'বলে থামলেন।

আমি বললুম, 'আপনার চেহারা সম্বন্ধে কি আর বলব—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'তারপর করলুম কি জানেন, একপ্রস্ত উত্তম্ সুট পরে, গোঁফে আতর মেখে লেগে গেলুম নর্তকীর পিছনে। প্রেমের কবিতাগুলো ঝালিয়ে নিলুম আচ্ছা করে, টাঙ্গো ওয়াল্‌টস্ নাচের নবীনতম 'অবদানগুলো' রপ্ত করে নিয়ে দিলুম হানা। জানতুম, রাজনৈতিক মসিয়ো অনুস্বারের টাকার জোয়ারের উপর আমি থাড্ডো কেলাস খোলামকুচি, কোথায় ভেসে যাব কেউ পাত্তাটি পাবে না, কিন্তু খোলামকুচি না হয়ে যদি পদ্মফুল হই চেহারাটা বিবেচনা করুন—তা হলে নর্তকী কি একটুখানি মোলায়েম হবেন না ?

'আমি অবশ্যি নর্তকীকে প্রিয়ারূপে চিরকালের জন্য জিতে নিতে চাইনি ; মসিয়ো অনুস্বার তাকে নিয়ে প্রেমসে প্রেমের ঢলাঢলি করুন আমার তাতে নস্যি। আমি শুধু চাই একটুখানি খবর।

'কিছুটা ভাবসাব হয়ে যাওয়ার পর আমি আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলুম যে, তিনি যদি অন্য সূত্র থেকে অর্থাৎ অনুস্বারের কাছ থেকে টাকা মারেন

তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তিনি দু ঘোড়া না চড়ে আড়াই শ'টা চড়ুন, আমি আপনাদের দেশের ফকিরের মত নির্বিকার। আমি একটুখানি প্রেমেই খুশী।

'কাজেই আস্তে আস্তে প্রেমের নেশায় বানচাল হয়ে নর্তকী খবর দিয়ে ফেললেন, কোন্ হোটেলে কবে তাঁরা গোপনে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করেছেন, কোন্ ইয়টে কবে ক'দিন ক'রাত্রির কাটিয়েছেন। সেই খেই ধরে তাবৎ গোপনীয় খবর যোগাড় করে গেলুম অনুস্বারের কাছে। তাঁকে বললুম, 'নিছক' সাহিত্যের খাতিরে আমি তাঁর জীবনী লিখতে চাই। তাতে অবশ্য নর্তকী সম্পর্কীয় কিঞ্চিৎ প্রামাণিক সংবাদও থাকবে। তবে কিনা, কিছু অর্থ পেলে আমি এসব ছাপবো না'।

'অনুস্বার জউরি এবং ঘড়েল লোক। যেসব হোটেলে জাল সই করেছেন তার ফোটোগ্রাফ দেখে বুঝবেন আমিও কাঁচা নই।'

তারপর বললেন, 'লিখিনি বলেই তো টাকা পেলুম, হাজার দশেক। যাক্‌গে, এখন আমি চললুম।'

ব্যাপারটা বুঝতে আমার মিনিটখানেক লাগল। তখন ছুটে গিয়ে তাঁকে বললুম, 'এটা কি তবে ব্ল্যাক-মেলিং হল না ?'

হেসে বললেন, 'অর্থাৎ 'না-লিখিয়ে জার্নালিস্ট'। তাই তো বলছিলুম, ভাষা জিনিসটে অদ্ভুত।'

আমি স্বয়ং জার্নালিস্ট—আঁৎকে উঠলুম !!

সিনিয়র এপ্রেন্টিস্

কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থ যত পুরনো হয় তাদের কদর ততই বেড়ে যায়। নূতন যুগের লোক সে সব গ্রন্থ থেকে নূতন সমস্যার অতি প্রাচীন এবং চিরন্তন সমাধান পায় বলে তারা সব কেতাবকে অনায়াসে হার মানায় ! শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, কোনো কোনো গল্পও অজরামর হয়ে থাকে ঐ একই কারণে। তারই একটা অতি মর্মান্তিকভাবে কাল মনে পড়ে গেল--কুড়িটি টাকা জেবে নিয়ে বাজার ঘুরে এলুম, ধুতি পেলুম না। গল্পটি হয়ত অনেকেই জানেন — তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

গণেশ বেচারী এপ্রেনটিস্, মাইনে পায় না। কাজ শিখছে, এর ধাঁতানি ও৲ গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়। আশা, একদিন পাকাপাকি চাকরি, মাইনে সব কিছুই পাবে। চাকরি খালি পড়লও, কিন্তু বড়বাবু সেটা দিয়ে দিলেন তাঁর শালীর ছেলেকে—সে কখনো এপ্রেনটিসি করেনি। বড়বাবু গণেশকে ডেকে বললেন, 'বাবা গণেশ, কিছু মনে করো না। এ চাকরিটা নিতান্তই অন্য একজনকে দিতে হল। আসছেটা তোমাকে দেব নিশ্চয়ই।'

কাকস্য পরিবেদনা, আবার চাকরি খালি পড়ল, বড়বাবু ফের ফক্কিকারি মারলেন, গণেশকে ডেকে আবার মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজালেন। এমনি করে দেদার চাকরি গণেশের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, তার এপ্রেনটিসির আঁকশি দিয়ে একটাকেও ধরতে পারল না। শেষের দিকে বড়বাবু আর গণেশকে ডেকে বাপুরে, বাছারে বলে সান্ত্বনা মালিশ করার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

গণেশের চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙে গেছে, রগের চুলের দু'এক গাছায় পাক ধরলো. পরনের ধুতি ছিঁড়ে গিয়েছে, জামাটা কোন গতিকে গায়ে ঝুলে আছে। গণেশ এ-টুলে ও-টুলে, এর কাজ, ওর ফাইফরমাশ করে দেয়—আর করে করে অফিসের বেবাক কাজ তার শেখা হয়ে গেল। চাকরি কিন্তু হল না।

এমন সময় বডসাহেব একদিন বড়বাবুকে দোতলায় ডেকে বললেন, 'আমায় একটা জরুরী রিপোর্ট লিখে আজকের মেল ধরতে হবে। কেউ যেন ডিসটার্ব না করে। দরজার গোড়ায় একজন পাকা লোক বসিয়ে দাও, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।'

দারোয়ানরা সেদিন করেছিল ধর্মঘট। বড়বাবু গণেশকে দিলেন দোরের সামনে বসিয়ে। বললেন, 'কিছু মনে করো না বাবা গণেশ, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ', ইত্যাদি। গণেশ টুলে বসে ছেঁড়া ধুতিতে গিঁট দিতে লাগল।

এমন সময় নিচের রাস্তায় হৈ হৈ রৈ রৈ। এক বদ্ধ পাগল রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পরনে কপ্পিনটুকু পর্যন্ত নেই—ইংরেজিতে যাকে বলে 'বার্থ-ডে-স্যুট'—আর পিছনে রাস্তার ছোঁড়ারা তাকে লেলিয়ে লেলিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হবি তো হ, পাগলা করল গণেশের আপিসের দিকেই ধাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে উপরের তলায় উঠে ঢুকতে গেল বড় সাহেবের ঘরে। গণেশ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পাগলাকে বাধা দিল না।

তারপর কাটকাট কাণ্ড। পাগলের পিছনে পিছনে ছোঁড়াগুলোও গিয়ে

ঢুকেছে বড় সাহেবের ঘরে। চীৎকার চেঁচামেচি। পাগলা আবার সাহেবকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলে রিভলভিং-টিল্টিঙ চেয়ারে বসতে চায়।

তাই দেখে কেউ বদ্যি ডাকে
কেউ বা ডাকে পুলিশ,
কেউ বা বলে কামড়ে দেবে
সাবধানেতে তুলিস!

শেষটায় পুরো লালবাজার এসে ঘর সাফ করল।

সাহেব তো রেগে কাঁই। বড়বাবুকে ধরে তো এই-মার কি তেই-মার লাগাল আর কি। বলেন, 'তুমি একটা ইডিয়েট, আর দোরে বসিয়েছিলে তোমার মত একটা ইম্বেসাইলকে। কোথায় সে, ডাকো তাকে।' গণেশ এসে সামনে দাঁড়াল।

সাহেব মারমুখো হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ প্রাইজ-ইডিয়েট, পাগলকে তুমি ঠেকালে না কেন?'

গণেশ বড় বিনয়ী ছেলে। বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, উনি আমাদের আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্টিস্। আমি তো জুনিয়র, ওঁকে ঠ্যাকাবো কি করে?'

সাহেব তো সাত হাত পানিমে। বললেন, হোয়াক্য মীন বাই ছাট?'

গণেশ বললে, 'হুজুর, আমি তিন বৎসর ধরে এ আপিসে এপ্রেন্টিসি করছি। খেতে পাইনে, পরতে পাইনে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পটি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। তাই যখন এঁকে দেখলুম, আমাদের আপিসে ঢুকছেন, একদম অবাস্তব উলঙ্গ, তখন আন্দাজ করলুম, ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্টিস্। তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রেন্টিসি করে করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়র এপ্রেন্টিস্ হয়েছেন।'

* * *

১৯৪৭ সালে স্বরাজ লাভ হয়। আমাদের এপ্রেন্টিসি তখন শুরু হয়। তখনো পরনে ধুতি ছিল, গায়ে জামা ছিল। আর আমাদের সিনিয়র এপ্রেন্টিস হওয়ার বেশী বাকী নেই। সবই আল্লার কেরামতি।

যাঁদের ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছি—অর্থাৎ 'পঞ্চতন্ত্র' তৈরি করছি তাঁদের সঙ্গে 'দেশের' পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র স্থাপন করার বাসনা এ-অধমের প্রায়ই হয়! তাঁদেরই একজন আমার এক চীনা বন্ধু। সত্যকার জহুরী লোক—লাওৎসে, কন-ফুৎসিয়ে টে-টম্বুর হয়ে আছেন। তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হলেই শাস্ত্রবচন ওষ্ঠাগ্রে। আমি যে পদে পদে হার মানি সে-কথা আর রঙ-ফলিয়ে, তুলি-বুলিয়ে বলতে হবে না।

ক্লাবের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি নিমগাছের তলায় বসে তিনি আপিস ফাঁকি দিয়ে চা পান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এন্তার এলেম হাঁসিল করেছি—তারই একটা আপিস ফাঁকি দেওয়া। কাছে পৌঁছতেই একগাল হেসে নিলেন—অর্থ সুস্পষ্ট—ছোকরা কাবেল হয়ে উঠছে। আর ক'দিন বাদেই আপিস-যাওয়া বিলকুল বন্ধ করে পুরো তনখা টানবে।

ইতিমধ্যে এক ইংরেজও এসে উপস্থিত।

রসালাপ আরম্ভ হল। কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা। সাহেব বললে, 'লণ্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল, স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিঙটিঙে হাড্ডি-সার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই ছ'ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরৎ দুমদুম-করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না। চলো বাড়ি।' সুড়সুড় করে ছোকরা চলে গেল সেই থাণ্ডার বউয়ের পিছনে পিছনে।'

আমার চীনা বন্ধুটি আদর-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন। সায়েব খুশি হয়ে চলে গেল।

গুটিকয়েক শুকনো নিমপাতা টেবিলের উপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিলক্লথের উপর আল্পনা সাজাতে সাজাতে বললেন, 'কী গন্ধ! শুনে হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশি।' তারপর চোখবন্ধ করে বললেন,

'চীনা গুণী আচার্য সু তাঁর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীন

দেশের পেপিং শহরে অত্যাচার জর্জরিত স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য, কি প্রকারে নিপীড়িত স্বামীকুলের তাঁদের খাণ্ডার গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?

'সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওলা অধ্যাপক মাওলীকে। ঝাড়া ষাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল গিন্নীর হাতে অশেষ অত্যাচার ভুগেছেন সেকথা সকলেরই জানা ছিল।

'ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বক্তার পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের অত্যাচারে দেশ গেল, ঐতিহ্য গেল, ধর্ম গেল, সব গেল, চীন দেশ হটেনটটের মুল্লুকে পরিণত হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে। ধন-প্রাণ, সর্বস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে। এস ভাই, এক জোট হয়ে—

'এমন সময় বাড়ির দারোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, 'হুজুররা এবার আসুন। আপনাদের গিন্নীরা কি করে এ সভার খবর পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া করে আসছেন।'

'যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়? জানলা দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে, এমনকি ছাত ফুটো করে, দেয়াল কাণা করে দে ছুট, দে ছুট! তিন সেকেণ্ডে মিটিঙ সাফ—বিলকুল ঠাণ্ডা!

কেবলমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শান্ত গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। দারোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বারবার প্রণাম করে বলল, 'হুজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন তাঁর সামনে চেঙ্গিস খানও তসলীম ঠুকতেন, কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার শামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনের সক্কলের পয়লা রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে। আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।' সভাপতি তবু চুপ। তখন দারোয়ান তাঁকে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।'

আচার্য উ থামলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে 'সাধু সাধু', 'শাবাস', 'শাবাশ' বললুম। করতালি দিতে দিতে নিবেদন করলুম, 'এ একটা গল্পের মত গল্প বটে।'

আচার্য উ বললেন, 'এ বিষয়ে ভা বাক্য কি?'

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসুলকে স্মরণ করলুম, পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না। শেষটায় মৌলা আলীর দয়া হল।

হাত জোড় করে বরজলালের মত ক্ষীণ কণ্ঠে ইমন কল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিরাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার কোণে। খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী এসে শুধালেন, 'মহারাজের কুশল তো?' মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী বিস্তর পীড়পীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, 'ঐ রাণীটা—ওঃ কি দজ্জাল, কি খাণ্ডার! বাপরে! বাপ! দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।'

মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন, 'ওঃ। আমি ভাবি আর কিছু। তাতে অতো বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ! বউকে তো সব্বাই ডরায়—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো আর কেউ এ রকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে না।'

রাজা বললেন, 'ঐ তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।' মন্ত্রী বললেন, 'আমি প্রমাণ করতে পারি।' রাজা বললেন, 'ধরো বাজি।' 'কত মহারাজ?' 'দশ লাখ?' 'দশ লাখ।'

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি হল—বিষ্যুৎবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েৎ হয়; মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।'

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরুর পালের মত, কালবৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মত সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষে, দলে, থেঁৎলে—তিন সেকেণ্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মধ্যিখানে লিক্‌লিক্ করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তিনি তার কল্পনাও

করতে পারেননি। মন্ত্রীকে বললেন, 'তুমিই বাজি জিতলে। এই নাও দশ সখা হার।' মন্ত্রী বললেন, 'দাঁড়ান, মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে।' মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এসে বললেন, 'তুমি যে বড় ওদিকে দাঁড়িয়ে? বউকে ডরাও না বুঝি?'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'অতশত বুঝিনে, হুজুর। এখানে আসবার সময় বউ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।' তাই আমি ওদিকে যাইনি।'

আচার্য উ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভারতবর্ষেরই জিৎ। তোমার গল্প যেন বাঘিনী-বউ। আমার গল্প ভয়ে পালালো।'

তবু আমার মনে সন্দ রয়ে গিয়েছে। রসিক পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন্ গল্পটাকে শিরোপা দি?

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলুম, তাই যদি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেখি তাহলে আশা করি, সুশীল পাঠক এবং সহৃদয়া পাঠিকা অপরাধ নেবেন না।

রবীন্দ্রনাথ উত্তম উপন্যাস লিখেছেন, ছোট গল্পে তিনি মপাসাঁ, চেথফকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, নাট্যে তিনি যে-কোনো মিস্টিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, কবিরূপে তিনি বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করেছেন তার গভীরতা পণ্ডিতদের নির্বাক করে দিয়েছে, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আরো কত বৎসর ভারতবাসীকে নব নব শিক্ষা দেবে তার ইয়ত্তা নেই, আর গুরুরূপে তিনি যে শান্তিনিকেতন নির্মাণ করে গিয়েছেন তার স্নিগ্ধছায়ায় বিশ্বজন একদিন সুখময় নীড় লাভ করবে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এসব উত্তীর্ণ হয়ে অজরামর হয়ে রইবেন তাঁর গানের জন্য।

সুরের দিক দিয়ে বিচার করব না। সুহৃদ শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে' এমন কোন জিনিস বাদ দেন নি যে সম্বন্ধে আপনি আমি আর পাঁচজনকে কিছু বলে পারি। আমি বিচার করছি, কিংবা বলুন, মুগ্ধ হয়ে

ভাবি যে, কতকগুলো অপূর্ব গুণের সমন্বয় হলে পর এ রকম গান সৃষ্ট হতে পারে। সামান্য যে দু'চারটে ভাষা জানি তার ভিতর আমি চিরজীবন যে রসের সন্ধান করেছি, সে ইচ্ছে গীতিরস। শেলি কীট্স, গ্যোটে হাইনে, হাফিজ আত্তার, কালিদাস জয়দেব, গালিব জওক্ এঁদের গান বলুন কবিতা বলুন সবকিছুর রসাস্বাদ করে এ জীবন ধন্য মেনেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বার বার বলেছি—

'এমনটি আর পড়িল না চোখে,

আমার যেমন আছে!'

তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার বার হার মেনেছি। রবীন্দ্রনাথের গান এমনি এক অখণ্ড রূপ নিয়ে হৃদয় মন অভিভূত করে ফেলে যে, তখন সর্বপ্রকারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পায়।

জর্মনরা যখন 'লীডার' কিংবা ইরানিরা যখন গজল গান একমাত্র তখনই আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত জাতীয় কিঞ্চিৎ রস পেয়েছি। তাই একমাত্র সেগুলোর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের গানের তুলনা করে ঈষৎ বিশ্লেষণ করা যায়।

তখন ধরা পড়ে:

রবীন্দ্রনাথের গানের অখণ্ড, সম্পূর্ণ রূপ। বহু লীডার এবং গজল শুনে মনে হয়েছে এ গান অপূর্ব, এ গান যদি আরো অনেকক্ষণ ধরে চলত তবে আরো ভালো লাগত অর্থাৎ শুধু যে অতৃপ্ত রেখে গিয়েছে তাই নয়, অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়েছে এ 'লীডার' বা 'গজল' আরো কিছুক্ষণ ধরে চলতে পারতো। রবীন্দ্রনাথের গান কখনই অসম্পূর্ণরূপে আমার সামনে দাঁড়ায়নি। তাঁর গান শুনে যদি কখনো মনে হয়ে থাকে এ গান আমাকে অতৃপ্ত রেখে গেল তবে তার কারণ তার অসম্পূর্ণতা নয়, তার কারণ অতিশয় উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি মাত্রই ব্যঞ্জনা এবং ধ্বনিপ্রধান। তার ধর্ম সম্পূর্ণ অতৃপ্ত করেও ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি দিয়ে হৃদয়মন ভরে দেওয়া। তখন মনে হয়, এ গান আমার সামনে যে-ভুবন গড়ে দিয়ে গেল তার প্রথম পরিচয়ে তার সব কিছু আমার জানা হল না বটে, কিন্তু খেদ নেই, আবার শুনব তখন সে ভুবনের আরো অনেকখানি আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আর এমনি করে করে একদিন সে ভুবন আমার নিতান্ত আপন হয়ে উঠবে। কোন সন্দেহ নেই এরকম ধারাই হয়ে থাকে কিন্তু আরেকটি কথা তার চেয়েও সত্য: রবীন্দ্রনাথের কোন গানই কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে না।

শব্দের চয়ন, সে শব্দগুলো বিশেষ স্থলে সংস্থাপন এবং হৃদয়মনকে অভাবিত

কল্পনাতীত নূতন শব্দের ভিতর দিয়ে উন্মুখ রেখে রেখে ভাবে, অর্থে, মাধুর্যের পরিসমাপ্তিতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গান যখন সাঙ্গ হয় তখন প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম করি, এ গান আর অন্য কোন রূপ নিতে পারতো না— নটরাজের মূর্তি দেখে যেমন মনে হয়, নটরাজ অন্য কোন অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আমার চোখের সামনে নৃত্যকে রূপায়িত করতে পারতেন না। তাই বলি, নটরাজের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মত রবীন্দ্রনাথের গানের প্রত্যেকটি শব্দ।

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, চমৎকার সুর তাল জ্ঞান, মধুরতম কণ্ঠ, তবু কোনো কোনো গায়কের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান ফিকে, পানসে অর্থাৎ ফ্লাট বলে মনে হয়। কেন এরকম ধারা হয় তার কারণ অনুসন্ধান করলে অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাবেন, গায়কের যথেষ্ট শব্দ-সম্মান বোধ নেই বলে প্রতিটি শব্দ রসিয়ে রসিয়ে গাইছেন না আর তাই যেন নটরাজের প্রতিটি অঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে গিয়ে তাঁর নৃত্য বন্ধ হয়ে গেল।

মৃত্তিকার বন্ধন থেকে রবীন্দ্রনাথ কত শতবার আমাদের নিয়ে গিয়েছেন 'নীলাম্বরের মর্মমাঝে।' আবার যখন তিনি আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তখন এই মৃত্তিকাই স্বর্গের চেয়ে অধিকতর 'মধুময় হয়ে ওঠে।'

'তারায় তারায় দীপ্তিশিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে—'

শুনে কি কল্পনা করতে পারি যে

'ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন,
হোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ।'

তারপর যখন মনকে তৈরি করলুম সেই স্বর্গসভার নব নব নব অভিজ্ঞতার জন্য তখন আবার হঠাৎ আমি

'কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।'

তারপর এ-ধারার কি অপরূপ বর্ণনা

'হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন।'

কখনো স্বর্গে কখনো মর্ত্যে, আপন অজানাতে এই যে মধুর আনাগোনা, মানুষকে দেবতা বানিয়ে, আবার তাকে দেবতার চেয়ে মহত্তর মানুষ করে তোলা —মাত্র কয়েকটি শব্দ আর একটুখানি সুর দিয়ে—এ অলৌকিক কর্ম যিনি করতে পারেন তিনিই 'বিশ্বকর্মা মহাত্মা'।

তোতা কাহিনী

পারস্য দেশের গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, আল্লা যদি আরবী ভাষায় কোরান্ প্রকাশ না করে ফার্সীতে করতেন, তবে মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর 'মসনবি' কেতাবখানাকে কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন। এ ধরনের তারিফ আর কোন দেশের লোক তাদের কবির জন্য করেছে বলে তো আমার জানা নেই।

মৌলানা রুমী ছিলেন ভক্ত। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন কদম্ববনবিহারিণী শ্রীরাধা যেরকম করে গোপীজনবল্লভ শ্রীহরিকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রেম দিয়ে। রুমী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মসনবিতে বর্ণনা করেছেন। বেশির ভাগ গল্পচ্ছলে, তারই একটি 'তোতা কাহিনী'।

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডলফ ভেলেন্টিনো, পাণ্ডিত্যে ম্যাক্সম্যূলার। সদাগর তাই ফুরসৎ পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারত যাবেন কার্পেট বেচতে। যোগাড়-যন্ত্র তদ্দণ্ডেই হয়ে গেল। সর্বশেষে গোষ্ঠিকুটুম্বকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্থান থেকে কি সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না— তাকেও শুধালেন সে কি সওগাত চায়। তোতা বললে, 'হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না কোন্ চিড়িয়া? হিন্দুস্তানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয়, তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ-সওগাতটা চাওয়া তো কিছু অন্যায়ও নয়।'

সদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সব সওগাতও কেনা হল, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন বেবাক ভুলে। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তোতা পাখি দেখে। তখখুনি তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো' ? কোনো পাখিই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখির বুকে এমনি বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটি পাখিকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্যে। স্থির করলেন, এ মূর্খামি দু বার করবেন না। মনে মনে নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে মারলেন গণ্ডা দুই চড়।

বাড়ি ফিরে সদাগর সওগাত বিলোলেন দরাজ হাতে। সবাই খুশ, নিশ্চয়ই 'জয়হিন্দ' বলেছিল ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি—সদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহু, সেটি হচ্ছে না ও-খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে।

কিন্তু হলে কি হয়—গোঁপ কামানোর পরও হাত ওঠে অজানতে চাড়া দেবার জন্য, (পরশুরাম উবাচ) বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়— অস্-সালাম আলাই কুম, ও রহমৎ উল্লাহি, ও বরকত ওহু, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক ইত্যাদি ইত্যাদি,' তোতা চেঁচাল।

সদাগর হেঁ হেঁ' করে গেলেন। মনে মনে বললেন, খেয়েছে।

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে, 'হুজুর, সওগাত ?'

সদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। বলতেও পারেন না, চাপতেও পারেন না। তোতা এমনভাবে সদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান। সওগাতের ওয়াদা দিয়ে গড্‌ড্যাম ফক্কিকারি! মানুষ জানোয়ারটা এই রকমই হয় বটে! তওবা, তওবা !

কি আর করবেন সদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন।

যেই না বলা তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্তানে তার দুরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এরকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায় ?

দিলের দোস্ত তোতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'হায়, হায়, কী বেকুব, কী বে-আক্কেল আমি। একই ভুল, দু-বার করলুম।' পাগলের মত মাথা থাবড়ান সদাগর। কিন্তু তখন আর আপসোসে ফায়দা নেই—ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কি লভ্য! সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তোতাকে বের করে আঙ্গিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ফুরুৎ করে তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সদাগর তাজ্জব—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিতে ফিরে শুধালেন, 'মানে?'

তোতা এবারে প্যাঁচার মত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'হিন্দুস্তানে যে তোতা আমার বদনসিবের খবর পেয়ে মারা যায়, সে কিন্তু আসলে মরে নি। মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠালো, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাবো।'

সদাগর মাথা নিচু করে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু, যাবার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও। আর তো তোমাকে পাব না।'

তোতা বললে, 'মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষ লাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই! সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়েছে। মরার আগে মরবার চেষ্টা করো।'

* * *

এই গল্প ভারতবর্ষে বহু পূর্বে এসেছিল। কবীর বলেছেন,

'ত্যজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা
সতগুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহৈঁ কবীর কোই বিরল হংসা
জীবতহী জো মরতা হৈ॥'

(অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যু লাভ করেছেন সেরকম হংসসাধক বিরল'।)

আর বাঙলাদেশের লালন ফকিরও বলেছেন,

'মরার আগে মলে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়।'॥

ত্রাহি বিশ্বকর্মা

দিল্লী শহরে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। শুধু কুৎব্ মিনারের গায়ে লাগনো কুওৎউল্‌ইসলাম মসজিদের কয়েকটি অংশ যে প্রাচীন হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া হয়েছে সে কথা মসজিদের দেয়ালে পাথরে খোদাই করা রয়েছে আর সেগুলোর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কী সুনিপুণ, সুদক্ষ দৃঢ় হস্তের কলাসৃষ্টি! নৈসর্গিক সৌন্দর্য স্থপতি যে রকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন ঠিক তেমনি বিশ্বভুবনের সর্বসৎবস্তুর অভেদ্য, সমষ্টিগত রূপও তিনি হৃদয়ঙ্গম করে উভয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ প্রস্তরগাত্রে প্রকাশ করেছেন কখনো অতি অল্প দু-একটি ইঙ্গিত দিয়ে, কখনো সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিবিড়তম বর্ণনা এবং ব্যঞ্জনা দিয়ে।

এ তো হল কারুকার্যের কথা। কিন্তু যে স্তম্ভগুলোর উপর এসব কারুকার্য খোদাই করা হয়েছে তাদের আকারপ্রকার দেখলেও মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে এ স্তম্ভগুলো নিশ্চয়ই একদা কোনো মহৎ স্থাপত্যের অঙ্গরূপে নির্মিত হয়েছিল। মনে কণামাত্র দ্বিধার অবকাশ থাকে না যে সে যুগের স্থাপত্য গাম্ভীর্যে এবং মধুরতায় অন্য যে-কোন দেশের স্থাপত্যের সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করতে পারত।

তারপর আরম্ভ হল নব পর্যায়। কুৎব মিনার, ইলতুৎমিশের কবর, আলাউদ্দীন খিলজীর মসজিদ, গিয়াস্ উদ্দীন তুগলুকের কবর, সিকন্দর লোদীর মসজিদ এবং গোর, হুমায়ুনের কবর, খানখানার কবর, জামি মসজিদ, লালকেল্লা, সফদর জঙ্গ আরো কত অজস্র কলা নিদর্শন! দেখতে দেখতে মাসের পর মাস কেটে যায়, দেশকালপাত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায়—দিল্লী ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে রসের সায়রে ডুবে মরা থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

তারপর ইংরেজের বর্বরতা। সেক্রেটারিয়েট মেমোরিয়াল ও রাজা জর্জের প্রতিমূর্তি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যে হিন্দু-মুসলিম যুগের কলাসৃষ্টি দেখার পরও ইংরেজ কী করে এ সব গর্ভস্রাব (সুশীল পাঠক! ক্ষমা ভিক্ষা করি, অনেক ভাবিয়াও কোনো ভদ্র শব্দ খুঁজিয়া পাইলাম না) যত্রতত্র নিক্ষেপ করে

গেল। যে ইংরেজ আপন দেশে চরিত্রবান সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হলে অসাধু হয়ে যায়—যে ইংরেজ স্বদেশে স্ব-ঐতিহ্যে মধ্যম শ্রেণীর স্থাপত্য নির্মাণে সক্ষম সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের দম্ভে মদোন্মত্ত স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে সৃষ্টি করে—কি সৃষ্টি করে? অশ্লীল কথাটার আর পুনরাবৃত্তি করবো না।

ফরাসী গুণী ক্লেমাঁসো দিল্লীর ইংরেজ স্থাপত্য দেখে বলেছিলেন, 'বাই গদ্, হোয়াট ওয়ান্ডারফুল রুইন্‌স্ দে উইল মেক্!' এরপর এ-স্থাপত্য বাবদে এ অধম আর কি নিবেদন করবে?

কিন্তু এ সব-কিছু হার মানে এক নবীন পরিকল্পনার সম্মুখে। এক অতি আধুনিক শিল্পী মহাত্মাজীর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য একটি 'আজব' প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। পদ্মাসনে আসীন মহাত্মাজীর একটি ১৭০ ফুট উঁচু মূর্তি নির্মাণ করা হবে এবং সেই মূর্তির ভিতরে চারতলা এমারৎ ভী থাকবে। যেহেতুক মস্তিষ্ক চিন্তাধার তাই মূর্তির মস্তকে লাইব্রেরী থাকবে এবং সেই হিসেবে বক্ষে থাকবে অন্য কিছু, নাসিকা কর্ণেও তাই সেই রকম জুৎসই কিছু একটা। সমস্ত পরিকল্পনাটা আমার মনে নেই; তবু অনুমান করি উপরের হিসাব মাফিক পেটে থাকবে হোটেল রেস্তোরাঁ!

শান্ত সমাহিত হয়ে ভাবুন দেখি আমরা কোথায় এসে পৌঁচেছি? সেই বিরাট মূর্তি প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকবে তামাম দিল্লী শহরের দিকে অষ্টপ্রহর—হয়ত বা চোখে দুটি জোরালো সার্চ লাইট জুড়ে দেওয়া হবে। মূর্তিটি যদি কলাসৃষ্টি হিসেবেও অতি উচ্চ পর্যায়ের হয় তবু তার বিরাট আকার আর-সব সূক্ষ্মানুভূতিকে গলা টিপে মেরে ফেলে তাবৎ দিল্লীবাসীর মনে হরবকৎ জাগিয়ে রাখবে যে অনুভূতি সেটা হচ্ছে, ভয়-বিহ্বলতা।

অথচ ধর্ম সাক্ষী—মহাত্মাজীকে দেখে কেউ কখনো ভয়ে বিহ্বল হয় নি। অতি পাষণ্ড ইংরেজও তাঁর সামনে শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে মাথা নত করেছে।

সে কথা থাক্। আমার প্রশ্ন, এই যে ব্যাপারটি হতে চলল—শুনলুম শ্রীগাডগিল মূর্তিটির মডেল্ দেখে উর্ধ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছেন এবং পরিকল্পনাটির মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই শ্রীহস্তে—সেটি কলাসৃষ্টির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে তাকে কি বলা যাবে?

অবিমিশ্র ভাস্কর্য ? তা তো নয়। স্থাপত্য ? তাও তো নয়। কারণ ভাস্কর্যের ভিতর স্থাপত্য থানা গাড়েন না। তদুপরি সর্বকলাসৃষ্টির একটা বিশেষ পরিমাণ আছে—মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব হতে পারেন কারণ তিনি এপিক, কিন্তু, মেঘদূত অষ্টাদশপর্ব হতে পারেন না, এবং মহাভারতও মেঘদূতের আকার ধরতে পারেন না। তজমহলকে আরও দশগুণ বড় করে বানালে তার মাধুর্য সম্পূর্ণ লোপ পাবে; মার্বেলে তৈরী যে ক্ষুদে ক্ষুদে তাজ লোকে ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখে তার থেকে আসল তাজের কোনো রসই পাওয়া যায় না। একশ চল্লিশ ফুট উঁচু মূর্তি ভাস্কর্যের রস দিতে পারবে না—যদি কোন রস দেয় তবে সে বীভৎস সে কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। হায় মহাত্মাজীকে দেখতে হবে বিরাট দানবের মূর্তিতে ?

আরেকটি কথা পেশ করতে আমার বড় বাধো বাধো ঠেকছে কিন্তু না করে উপায়ও নেই। সংক্ষেপে বলি। মূর্তির ভিতর যখন চারতলা বাড়ি থাকবে, লাইব্রেরী হাসপাতাল থাকবে তখন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে স্নানাগার ও তৎসংলগ্নীয় যাবতীয় শৌচাগারও থাকবে। একদিকে গ্রামের মেয়েরা এসে সেই বিরাট মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির ভিতরে স্নানাগারে, শৌচালয়ে—থাক্ !

হিন্দু-মুসলমান তুর্ক-পাঠান অনেক কিছু রেখে গিয়েছে দিল্লী শহরে—তাই দেখবার জন্যে দুনিয়ার লোক হন্দমুন্দ হয়ে জমায়েৎ হয় সেখানে। বিস্ময়ে তারা নির্বাক হয়, বিশুদ্ধ কলারসে তারা নিমজ্জিত হয়, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা প্রশস্তিবাক্যে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে, যেন ওগুলো নিতান্ত আপনার-আমার তৈরী, সাতদিন থাকবে বলে দিল্লীতে এসে থাকে সাতমাস, আর প্রাণভরে, প্রেমসে অভিসম্পাত দেয় ইংরেজের বানানো নিউ দিল্লীকে।

আমার মনে হয়, এ মূর্তি গড়া হলে ইংরেজ পর্যন্ত আমাদের অভিসম্পাত না করে হুইস্কি স্পর্শ করবে না।

কিংবা লণ্ডনে বসে মূর্তিটার ছবি দেখেই যে ঠাট্টা অট্টহাস্য ছাড়বে তার শব্দ আমরা ভারত পাকিস্তান সর্বত্র শুনতে পাবো।

গিয়ে দেখলুম ক্লাবের প্রত্যন্ত প্রদেশে সেই নিমগাছের তলায় চীনা বন্ধু, গুণী অধ্যাপক উ বসে আছেন। নিমপাতা এখন বর্ষণ রসে টৈটম্বুর বলে টেবিলের উপর ঝরে পড়ে না। তাই উ বকুল ফুল দিয়ে আল্পনা আঁকছেন।

আমি চীনা কায়দায় ঝুঁকে ঝুঁকে দুলতে দুলতে বললুম 'জয় হিন্দ!'

অধ্যাপক মৃদু হাস্য করে মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'আলাইকুম সালাম, আজ তোমাদের ইদের পরব না?'

আমি বললুম, 'ছুটির বাজার, তাই আপনার কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনতে এলুম।'

'তৎপূর্বে বল, এ ফুলের নাম কি?'

মূল বক্তব্যের সঙ্গে এ প্রশ্নোত্তরের কোনো যোগ নেই তবু বাঙালীর মনে বিমলানন্দের সৃষ্টি হবে বলে নিবেদন করছি।

বললুম, 'বাঙলা, মারাঠী, সংস্কৃতে 'বকুল', হেথাকার নেটিভ ভাষাতে 'মোলশী'।*

অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, 'বকুল, মোলশী—মোলশী বকুল। উহুঁ, বকুলটিই মিষ্টি।' বাঙালীর ছাতি তিন বিঘৎ ফুলে উঠল তো?

আমি বললুম, 'মিষ্টি নামই যদি রাখবেন তবে 'প্রাণনাথ' বলে ডাকলেই পারেন।'

ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সে আবার কি?'

"প্রাণনাথ' মানে, মাই ডার্লিং"।

'আরো বুঝিয়ে বলো।'

আমি বললুম, 'আমি বাঙাল। আমারই দেশের এক 'চুকুমবুদাট' অর্থাৎ এদিকে মুখচোরা ও'দিকে চটে যায় ক্ষণে ক্ষণে, এসেছে কলকাতায়। গেছে বেগুন কিনতে। দোকানিকে বললে, 'দাও তো হে, এক সের বাইগন'। দোকানি

* বানানে ভুল থাকতে পারে, আমি যেরকম শুনেছি, সেই রকমই লিখলুম।

পশ্চিম বাঙলার লোক। 'বেগুনের' উচ্চারণ 'বাইগন' শুনে একটুখানি গর্বের ঈষৎ মৌরী-হাসি হেসে শুধালো, 'কি বললে হে জিনিসটার নাম?' বাঙাল গেছে চটে. উচ্চারণ নিয়ে যত্রতত্র এরকম ঠাট্টা-মস্করা করার মানে?—চতুর্দিকে আবার বিস্তর ঘটি' দাঁড়িয়ে। তেড়েমেড়ে বলল, 'বাইগন' কইছি তো বেশ কইছি. হইছে কি?'

দোকানি আরেক দফা হাম্বড়াই আত্মম্ভরিতার মৃদু হাসি হেসে বললে, 'ছ্যাঃ, বাইগন বাইগন। দেখো দিকিনি আমাদের শব্দটা কি রকম মিষ্টি—বেগুন, বেগুন।'

বাঙাল বলল, 'মিষ্টি নামই যদি রাখবা, তবে 'প্রাণনাথ' ডাকলেই পারো। দাও. তবে এক সের প্রাণনাথ। প্রাণনাথের সের কত? ছ' পয়সা না সাত পয়সা।'

উ প্রাণভরে হাসলেন উচ্চস্বরে। তারপর চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে। সর্বশেষে চেশায়ার বেরালের হাসিটার মত 'আকাশে আকাশে রহিল ছড়ানো সে হাসির তুলনা।'

সুশীল পাঠক, তুমি রাগত হয়েছ, বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এ বাসি মাল আমি পরিবেশন করছি কেন? এ গল্প জানে না কোন মর্কট? পদ্মার এ-পারে কিংবা হে-পারে?

তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। এ গল্পের খেই ধরে চীনা-গুণী সেদিন তত্ত্ব বিতরণ করেছিলেন বলেই এটাকে 'এনকোর' করতে হল।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ গল্পে কি তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে?'

খাইছে। আমি করজোড়ে বললুম, 'আপনিই মেহেরবানী করুন।'

বললেন, 'রেডুক্‌ৎসিয়ো আড আবসুর্ডুম্' কাকে বলে জানো?'

আমার পেটের এলেম আপনারা বিলক্ষণ জানেন। কাজেই বলতে লজ্জা নেই, অতিশয় মনোযোগের সহিত গ্রীবাকণ্ডূয়নে নিযুক্ত হলুম।

বললেন, 'কেন? জানো না, যখন কোনো বিষয় টানাটানি করলে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয় তখনই তাকে বলে 'রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম'।

ততক্ষণ বুঝে গিয়েছি। সোৎসাহে বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, 'রিডাকশিও এ্যাড এ্যাবসার্ডাম্'। একটুখানি গর্বের হাসিও হেসে নিলুম।

বাঁক নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা যখন লাতিন তখন ইংরিজি উচ্চারণ করছো কেন? ইংরেজের মুখ না হলে তোমরা কোনো ঝাল খেতে পারো না! বুঝি?

'সে কথা থাক্। শোনো।'

'আসল কথা হচ্ছে বাঙাল দেখিয়ে দিল, মিষ্টি নামই যদি রাখবে তবে যাও একস্ট্রিমে। রাখো নাম 'প্রাণনাথ'। তৎক্ষণাৎ প্রমাণ হয়ে গেল, মিষ্টত্বের দোহাই কত অ্যাবসার্ড।

'এই দেখো না মার্কিন জাতটা কি রকম অ্যাবসার্ড। শোনো কর্মে সুনিপুণ হতে পারাটা অতীব প্রশংসনীয়। এতে সন্দেহ করবে কে? কিন্তু এরও তো একটা সীমা থাকা দরকার। গল্প দিয়ে জিনিসটে বোঝাচ্ছি।

'ব্রুকলিন ব্রিজ যখন বানানো হয় তখন দু'পাড় থেকে দু'দল লোক পুল তৈরি করে মাঝ গাঙ্গের দিকে রওয়ানা হল। এমনি চৌকশ তাদের হিসেব, এমনি সু-নিপুণ তাদের কলকব্জা যে মধ্যিখানে এসে যখন পুলের দুদিকে জোড়া লাগল তখন দেখা গেল এক ইঞ্চির আঠারো ভাগের উঁচু-নীচুর ফেরফার হয়েছে। তারিফ করবার মত কেরদানী, কোনো সন্দ নেই।

'পক্ষান্তরে আমার স্বর্ণভূমি চীনদেশে কি হয়? দু'দল লোককে এক পাহাড়ের দু'দিকে দেওয়া হয়েছিল সুড়ঙ্গ বানাবার জন্য। এদিক থেকে এনারা যাবেন, ওদিক থেকে ওনারা আসবেন। মধ্যিখানে মিলে গিয়ে খাসা টানেল।

'কিন্তু কার্যত হল কি? দেখা গেল, ঢবল সময় চলে গেল তবু মধ্যিখানে দু'দলের দেখা নেই। তারপর এক সুপ্রভাতে দু'দল বেরিয়ে এলেন দুদিকে। মধ্যিখানে মেলামেলি, কোলাকুলি হয় নি।'

আমি চোখ টিপে ইশারায় জানালুম, 'এ কি রঙ্গ বুঝতে পেরেছি।'

তিনি বললেন, 'আদপেই না। মার্কিনরা সুনিপুণ, সেই নৈপুণ্যের প্রসাদাৎ তারা পেল কুল্লে একখানা ব্রিজ। আর আমরা পেয়ে গেলুম, দু'খানা টানেল! লাভ কার বেশি হ'ল বল তো।

'তাই বলি অত্যধিক নৈপুণ্য ভালো নয়।

'রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্‌ আবসুর্ডুম!'।

ইউরোপে ভারতীয় শাস্ত্র-চর্চা

সুইটজারল্যাণ্ডের মত দেশেও লোকে সংস্কৃত পড়ে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুইসদের কৌতূহলও আছে—যদিও সে দেশে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয় ও তাতে সংস্কৃতের অধ্যাপক কুল্লে একজনই। সেই অধ্যাপকটি এসেছেন এদেশে—সেদিন দেখা হল এখানে। অমায়িক লোক, চেহারাটি খাবসুরৎ, ইংরেজি বলেন ভাঙা-ভাঙা, নিজের ভুলে নিজেই হেসে ওঠেন। ভারতবর্ষের নীল আকাশ, সোনালি রোদ আর সবুজ ঘাসের যা তারিফ করলেন তা শুনে আমি লাজুক হাসি হেসে 'হঁ্যা', হঁ্যা করে গেলুম, এমনি কায়দায় যেন এগুলো নিতান্ত আমারই হাতে গড়া, এগজিবিশানে ছেড়েছি, দু'চার পয়সা পেলে বিক্রি করতেও রাজী আছি। সুইটজ্যারল্যাণ্ডের পাল্টা প্রশংসাও করলুম, 'অহো, কী চমৎকার শাদা বরফ, নীল সরোবর আর চকচকে ঝকঝকে বাড়িঘর-দোর।' সায়েব হাসিমুখে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, 'সায়েব, তোমার দেশে সংস্কৃত এগোচ্ছে কি রকম?'

সাহেব বললেন, 'মন্দ না, তবে কেতাবপত্রের বড় অভাব। আর সংস্কৃত ক'টা ছেলে পড়ে না-পড়ে সেইটেই তো আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাঁচজন সুইসের জ্ঞানগম্যি কতটুকু। সুইসরা ভাবে, ভারতবর্ষ দেশটা সাপে-বাঘে ভর্তি, মধ্যিখানে হরেকরকমের সাধু-সন্ন্যাসী আর ফকির-বৈরাগী ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের ঝোলা থেকে হরবকত হরেকরকমের সাপ লাফ দিয়ে দিয়ে বেরোচ্ছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দেবার মত প্রামাণিক বই কেউ তো লেখে না যেগুলো সাধারণ সুইস পড়তে পারে। ইংরিজি জানে ক'টা সুইস?'

এই থেকেই ধরে দু'দণ্ড রসালাপ হ'ল।

*   *   *

গেল শতকের মাঝামাঝি এবং শেষের দিকে বিস্তর ভারতীয় কেতাবপত্রের ইংরিজী ফরাসী, জর্মন অনুবাদ হয়। ঠিক সেই সময়েই বিজ্ঞানের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের লোক ক্রমেই ঈশ্বর, ধর্ম এবং পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস

ছায়াতে থাকে। অথচ গুণী-জ্ঞানীরা জানতেন যে, ঈশ্বর ধর্ম আত্মা এসব ব্যাপারে অনেকখানি কুসংস্কার মেশানো থাকলেও সব কিছু 'গাঁজাখুরী' বলে এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিতও নয়। তাই তাঁরা এমন কিছুর সন্ধান করেছিলেন যাতে উনবিংশ শতকের 'মুক্ত' 'কুসংস্কারবর্জিত' 'বৈজ্ঞানিক' মনও চরম তত্ত্বের সন্ধান পায়।

তাই বৌদ্ধধর্ম তাদের মনকে বেশ একটা জোর নাড়া দেয়। কারণ, বৌদ্ধধর্মে ভগবানের বালাই নেই, আত্মটাকে পর্যন্ত কবুল জবাব দেওয়া যায়। ওদিকে ইরানি কবি ওমর খৈয়ামের 'কিস্মৎ' অর্থাৎ অদৃষ্টবাদ ইয়োরোপকে পাগল করে তুলেছে, তার সঙ্গে বুদ্ধদেবের 'ধর্মচক্রের' অলঙ্ঘ্য নিয়মও বেশ খাপ খেয়ে গেল।

পল্লবগ্রাহীরা ওমরকে নিয়ে পড়ে রইল আর যাঁরা 'এই বাহ্য' জানতেন তাঁরা বৌদ্ধধর্মের খেই ধরে ভারতবর্ষের আর পাঁচটা তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। উপনিষদ না জেনে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে পরিচয় হয় না। তাই বিশেষ করে উপনিষদের উত্তম উত্তম অনুবাদ ইংরিজী, ফরাসী, জর্মনে বেরুলো। তারই দু'একখানা 'ড লুক্‌স্‌' সংস্করণ এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর গীতার তো কথাই নেই।

এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এসব কেতাবপত্র যে পণ্ডিতেরাই পড়লেন তা নয়—সর্বসাধারণের মধ্যে এসব অনুবাদ এবং তাদের নিয়ে গড়ে তোলা মৌলিক বইও ছড়িয়ে পড়ল। জাতকের বিস্তর গল্প কাচ্চাবাচ্চাদের জন্য অনুবাদ করা হল, মাসিকে ধারাবাহিক হয়ে বেরুতে লাগল।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো, তার জন্য কে দায়ী তা আমি জানিনে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা তখন ভাবখানা দেখাতে আরম্ভ করলেন যে, এ সব তত্ত্বজ্ঞানের বস্তু সাধারণ লোকের বিদ্যেবুদ্ধির বাইরে। এ-সব জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন গুণী-জ্ঞানীরা, এসব কেতাবপত্রের টীকা-টিপ্পনী লিখবেন যাঁদের 'শাস্ত্রাধিকার' আছে তাঁরাই।

তখন ব্যাপারটা কিসে গিয়ে দাঁড়ালো আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যেসব অনুবাদ বেরোয় তাতে অনুবাদের চেয়ে টীকাটিপ্পনী বেশি, ফুটনোটে ফুটনোটে ছয়লাপ আর অনুবাদের ভাষাও দিনকে দিন এমনি টেকনিক্যাল এবং 'হিং টিং ছটে' ভর্তি হতে লাগল যে, সেগুলো সাধারণ পাঠক আর বুঝতে পারে না।

সর্বজনপাঠ্য যে-সব অনুবাদ আগে বেরোত সেগুলোতে ভুল থাকত বটে

এখানে ওখানে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেগুলো অন্তত পড়ত এবং পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারত। শুধু তাই নয় এমন লোকও আমি চিনি, যিনি, বৌদ্ধ দর্শন ও নীতি অতি সামান্য মাত্রায় পড়ে নিয়েই আপন জীবন সেই অনুসারে চালাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মাচরণ তো অভ্রভেদী পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে না।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় শাস্ত্রচর্চার জন্য ইউরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়, সেগুলো থেকে প্রতি বৎসর প্রামানিক অনুবাদ, মূল গ্রন্থ, এমনকি, মোটা মোটা ত্রৈমাসিকও বেরুতে লাগল, ইংরিজী, ফরাসী, জর্মন, ইতালীয়, রুশ ভাষায়, কিন্তু তার প্রায় সব কটাই এমনি পদ্ধতিতে লেখা এবং তার কায়দা-কেতা এমনি পাকা-পোক্ত যে, তাতে কামড় দিতে হলে পাণ্ডিত্যের লৌহদন্তের প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ কামড় দিতে গিয়ে দাঁত হারায়, হজমের তো কথাই ওঠে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনবোধ্য অনুবাদের বই বেরতে লাগল কম—যা দু'একখানা বেরলো পল ব্রাণ্টনের রগরগে বই কিংবা মিস মেয়োর মত প্রপাগাণ্ডা মেশানো।

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আর ওরিয়েণ্টালিস্ট্স্ কনফারেন্সের ভিতর হারেমবদ্ধ হলেন।

তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপে গেলেন তখন এল এক নূতন জোয়ার। বিশেষ করে, কন্টিনেণ্টে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি জানবার জন্য বহু লোকের আগ্রহ দেখা গেল। ফ্রান্সে রেনে গ্রুসের মত লোক আবার চেষ্টা করলেন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরবার জন্য। দু'চারজন পণ্ডিত ব্যক্তিও একর্মে যোগ দিলেন কিন্তু কেন জানিনে, এ আন্দোলন খুব বেশি লোকের ভিতর ছড়াতে পারলো না।

হয়ত ইয়োরোপে তখন, যে অশান্তি দেখা দিয়েছিল—কম্যুনিজম নাৎসিজম দুই-ই সে অশান্তির পিছনে ছিল—তার মাঝখানে সাধারণ মানুষ মনস্থির করে কোনো ভালো জিনিসই গ্রহণ করতে পারছিল না। প্রতিদিন নূতন সমস্যা, অন্নবস্ত্রের নূতন নূতন অনটন, চতুর্দিকে পালোয়ানীর পাঁয়তারা কষার হুঙ্কারধ্বনি, এর মাঝখানে মানুষ পড়বেই বা কি, ভাববার সময়ই বা তার কোথায়?

শুধু ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, চীনা, আরবী-ফারসী, প্রাচীন মিশর, বাবিলনীয় সর্বপ্রকারের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসন্ধান তখনো একেবারে নির্মম-

ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিতরেই সীমাবদ্ধ। বাইরের লোক তখন প্রাণপণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে ব্যস্ত। অন্য জিনিসের জন্য ফুর্সৎ কই ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটতে না কাটতেই এটম বম, চীন, কোরিয়া।

এদিকে ভারতবর্ষ স্বরাজ পেল। দেশ-বিদেশে আমাদের আপন রাজদূতাবাস বসল। অনেকেই আশা করলেন এইবারে হয়ত একটা কিছু হবে—কিন্তু সে কাহিনী আরেক দিনের জন্য মুলতুবি রইল।

* * *

ইয়োরোপে উপস্থিত যে উত্তেজনা উন্মাদনা চলেছে তার মাঝখানে ইউরোপীয় ছাত্র যখন প্লাতো-আরিস্তত্‌ল, কিকেরো-টাকিটুস পড়া ছেড়ে দিয়েছে—ক্লাসিক্‌স্ যখন 'নিজ বাসভূমে' মরমর তখন ভরত-শঙ্কর পড়বে কে ?

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের কি নিতান্তই কোনো কিছুই করবার নেই ? ?

চরিত্র পরিচয়

গল্প শুনেছি, ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন আর স্কচ এই চারজনে মিলে একট চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল। বন্দোবস্ত হল সবাই কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ইংরেজ নিয়ে এল বেকন আর আণ্ডা, ফরাসী নিয়ে এল এক বোতল শ্যাম্পেন জর্মন নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ, আর স্কচম্যান—? সে সঙ্গে নিয়ে এল তার ভাইকে।

এ জাতীয় বিস্তর গল্প ইয়োরোপে আছে। স্কচদের সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ হলেই মনে মনে প্রত্যাশা করতে পারবেন যে গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে, হয় স্কচদের হাড়কিপ্‌টেমিগিরি নয় তাদের হুইস্কির প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা। ওদিকে আবার বিশ্বসংসার জানে স্কচরা ভয়ঙ্কর গোঁড়া ক্রীশ্চান আর মারাত্মক রকমের নীতিবাগীশ (বঙ্গজ হেরম্ব মৈত্র তুলনীয়)। তাই এই তিনগুণে মিলে গিয়ে গল্প বেরল ;—

এক স্কচ পাত্রী এসেছেন লণ্ডনে, দেখা করতে গেছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে। গিয়ে দেখেন হৈহৈ রৈরৈ, ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই পার্টি, মেয়েমদ্দে গিসগিস করছে। বন্ধুর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কাচুমাচু হয়ে পাত্রীকে অভ্যর্থনা

জানালেন। কারণ জানতেন স্কচ পাদ্রীরা এরকম পার্টি পরবের মাতামাতি আদপেই পছন্দ করেন না। অথচ ভদ্রতাও রক্ষা করতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে শুধালেন,

'একটুখানি চা খাবেন ?'

পাদ্রী হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'নো টী !'

আরো ভয়ে ভয়ে শুধালেন,

'কফি ?'

'নো কফি !'

'কোকো ?'

'নো কোকো !'

ভদ্রমহিলা তখন মরিয়া। মৃদুস্বরে, কাতরকণ্ঠে শেষ প্রশ্ন শুধালেন, হুইস্কি সোডা ?'

'নো সোডা !'

অথচ কলকাতায় একবার অনুসন্ধান করে আমি খবর পাই, যে সব ব্রিটিশ এদেশে দানখয়রাত করে গিয়েছেন তাঁদের বেশির ভাগই স্কচ—ইংরেজের দান অতি নগণ্য। তারপর বিলেতে খবর নিয়ে জানলুম, স্কচরা হুইস্কি খায় কম, বেশির ভাগ রপ্তানি করে দেয় আর নিজেরা খায় বিয়ার !

ঠিক সেই রকমই বিশ্বদুনিয়ার বিশ্বাস ফরাসী জাতটা বড্ডই উচ্ছৃঙ্খল। পঞ্চমকার নিয়ে অষ্টপ্রহর বেএক্তেয়ার। তাই ইংরিজী 'ক্যারিইঙ কোল্ টু নিউকাসলের' ফরাসী রূপ নাকি 'ক্যারিইঙ এ ওয়াইফ টু প্যারিস।'

এ প্রবাদটি আমি ফরাসী ভাষায় শুনিনি ; শুনেছি ইংরেজের মুখে ইংরেজি ভাষাতে। তাই প্যারিস গিয়ে আমার জানবার বাসনা হল ফরাসীরা সত্যই উপরের প্রবাদবাক্য মেনে চলে কিনা ?

খানিকটা চলে, অস্বীকার করা যায় না। যৌন ব্যাপারে ফরাসীরা বেশ উদার কিন্তু একটা ব্যাপারে দেখলুম তারা ভয়ঙ্কর নীতিবাগীশ। ফষ্টিনষ্টি তারা অনেকখানি বরদাস্ত করে—অবশ্য নিয়ম, সেটা যেন বিয়ের পূর্বে না করে পরেই করা হয়—কিন্তু সেই ফষ্টিনষ্টি যদি এমন চরমে পৌঁছয় যে স্ত্রী স্বামীকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তবে ফরাসী মেয়েমদ্দ দু'দলই চটে যায়। 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ফরাসী জাত বড়ই সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে চলে। তাই পরকীয়া প্রেম যতই গভীর হোক না কেন তারই ফলে যদি কোনো

পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম করে তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, নাগর-নাগরী একে অন্যকে ত্যাগ করেছেন।

কাজেই মেনে নিতে হয়, এ-ব্যাপারে ফরাসীদের যথেষ্ট সংযম আছে।

ঈষৎ অবান্তর, তবু হয়ত পাঠক প্রশ্ন শুধাবেন, তাহলে এই যে শুনতে পাই প্যারিসে হরদম ফুর্তি সেটা কি তবে তাহা মিথ্যে ?

নিশ্চয়ই নয়। প্যারিসে ফুর্তির কমতি নেই। কিন্তু সে ফুর্তিটা করে অফরাসীরা। যৌন ব্যাপারে ইংরেজের ভণ্ডামি সকলেই অবগত আছেন— লরেন্স্ সেটা বিশ্বসংসারের কাছে গোপন রাখেননি। তাই ইংরেজ মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে। পাড়াপ্রতিবেশী তো আর সেখানে সঙ্গে যাবে না—বেশ যাচ্ছেতাই করা যাবে। শুধু ইংরেজ নয়, আরো পাঁচটা জাত আসে, তবে তারা খোলাখুলি সরাসরিভাবে—ইংরেজের মত 'ফরাসী আর্ট' দেখার ভান করে না। কোন জর্মনকে যদি বার্লিনে শুনতে পেতুম বলছে, 'ভাই হপ্তাখানেকের জন্য প্যারিস চললুম' তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেতুম আর পাঁচজন মিটমিটিয়ে হাসছে—অবশ্য প্রথম জর্মনও সে হাসিতে যোগ দিতে কসুর করছে না।

তা সে যাই হোক, একটা প্রবাদ আমি বিশ্বাস করি। ফরাসীরা বলে 'পারফিডিয়স অ্যালবিয়ন' অর্থাৎ 'ভণ্ড ইংরেজ'। একটি গল্প শুনুন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার খবর শুনে এক বুড়ো শিক মেজরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে ?'

'ইংরেজ-ফরাসী জর্মনির বিরুদ্ধে।'

সর্দারজী আপসোস করে বললেন, 'ফরাসী হারলে দুনিয়া থেকে সৌন্দর্যের চর্চা উঠে যাবে আর জর্মনি হারলেও বুরী বাৎ, কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান কলকৌশল মারা যাবে।' কিন্তু ইংরেজের হারা সম্বন্ধে সর্দারজী চুপ।

'আর যদি ইংরেজ হারে ?'

সর্দারজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, তবে দুনিয়া থেকে বেইমানি লোপ পেয়ে যাবে।'

আড্ডা

আড্ডা সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকটি উত্তম উত্তম লেখা বাঙলায় বেরনোর পর ইংরিজিতেও দেখলুম আড্ডা হামলা চালিয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের ভশচায এবং জমিদার-হাবেলির মৌলবী যেন হঠাৎ কোটপাতলুন-কামিজ পরে গটগট করে স্টেটসম্যান অফিসে ঢুকলেন। আমার তাতে আনন্দই হল।

কিন্তু এসম্পর্কে একটি বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আড্ডাবাজরা বলতে চান, বাঙলার বাইরে নাকি আড্ডা নেই। কথাটা ঠিকও, ভুলও। তুলনা দিয়ে নিবেদন করছি। সিন্ধুনদ উজিয়ে যে মাছ ধরা পড়ে, তার নাম 'পাল্লা'—অতি উপাদেয় মৎস্য। নর্মদা উজিয়ে ভরোচ শহরে যে মাছ ধরা পড়ে তার নাম 'মদার'—সেও উপাদেয় মৎস্য। আর গঙ্গা পদ্মা উজিয়ে যে মাছ বাঙালীকে আকুল উতলা করে তোলে, তার নাম ইলিশ—খোট্টা (মাফ কী জীয়ে) মুল্লুকে পৌঁছনর পর তার নাম হয় হিলসা।

উপর্যুক্ত সর্ব মৎস্য একই বস্তু—দেশভেদে ভিন্ন নাম। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে সরষে বাটা আর ফালি ফালি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমরা যে রকম ইলিশদেবীর পূজো দি বাদবাকীরা ওরকমধারা পারে না। অর্থাৎ আড্ডা বহু দেশেই আছে, শুধু আমাদের মত তরিবৎ করে রসিয়ে রসিয়ে চাখতে তারা জানে না। অপিচ ভুললে চলবে না সিন্ধীরা আমাদের সরষে-ইলিশ খেয়ে নাক সিঁটকে বলেন, কী উম্‌দা চীজকে বরবাদ করে দিলে।' ভৃগুকচ্ছের (ভরোচের) মহাজনগণও সিন্ধীর রান্না পাল্লা খেয়ে 'আল্লা আল্লা' বলে রোদন করেন।

কে সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ বিচার করবে? এ যে রসবস্তু—এবং আমার মতে ভোজনরস সর্বরসের রসরাজ।

তাই কাইরোর আড্ডাবাজরা বলেন, একমাত্র তাঁরাই নাকি আড্ডা দিতে জানেন।

কাইরোর আড্ডা কক্‌খনো কোন অবস্থাতেই কারো বাড়িতে বসে না। আড্ডাবাজরা বলেন, তাতে করে আড্ডার নিরপেক্ষতা—কিংবা বলুন গণতন্ত্র—লোপ পায়। কারণ যাঁর বাড়িতে আড্ডা বসলো, তিনি পানটা-আসটা, খিচুড়িটা

ইলিশ-ভাজাটা (আবার ইলিশ! সুশীল পাঠক, ক্ষমা করো। ঐ বস্তুটির প্রতি আমার মারাত্মক দুর্বলতা আছে। বেহেশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বকৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার কণামাত্র বাসনা আমার নেই) ফিরি' দেন বলে তাঁকে সবাই যেন একটু বড্ড বেশি তোয়াক্কা করে। আড্ডাগোত্রের মিশরী নিকষ্যি মহাশয়রা বলেন, বাড়ির আড্ডায় 'মেস' খেলে না।

অপিচ, পশ্য পশ্য, কোনো কাফেতে যদি আড্ডা বসে, তবে সেখানে কেউ কাউকে খয়ের খাঁ বানাতে পারে না—যেন পুরীর মন্দির, জাতফাত নেই, সব ভাই, সব বেয়াদব।

এবং সবচেয়ে বড় কথা বাড়ির গিন্নী 'মুখপোড়া মিনষেরা ওঠে না কেন' কখনে শুনিয়ে, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে অকারণে অকালে আড্ডার গলায় ছুরি চালাতে পারেন না। তার চেয়ে দেখো দিকিনি দিব্যি কাফেতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছ, পছন্দমাফিক মমলেট কটলেট খাচ্ছো, আড্ডা জমজমাট ভরভরাট, কেউ বাড়ি যাবার নামটি করছে না, কারো গিন্নী এসে উপস্থিত হবেন সে ভয়ও নেই—আর চাই কি ?

শতকরা নব্বুইজন কাইরোবাসী আড্ডাবাজ এবং তার দশ আনা পরিমাণ অর্ধেক জীবন কাটায় কাফেতে বসে আড্ডা মেরে। আমাদের আড্ডা বসত 'কাফে দ্য নীল' বা 'নীলনদ কাফেতে'। কফির দাম ছ' পয়সা, ফি পাত্তর। রাবড়ির মত ঘন, কিন্তু দুধ চাইলেই চিত্তির। সবাই কালো কফি খায়, তাই দুধের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না, দু'দিনেই অভ্যাস হয়ে যায়। কালো কফি খেলে রঙটী ফর্সা হয়।

আমাদের আড্ডাটা বসত কাফের উত্তর-পূর্ব কোণে, কাউণ্টারের গা ঘেঁষে। হরেক জাতের চিড়িয়া সে আড্ডায় হররকৎ মৌজুদ থাকত। রমজান বে আর সজ্জাদ এফেন্দি খাঁটি মিশরী মুসলমান, ওয়াহহাব আতিয়া কপ্ট ক্রীশ্চান অর্থাৎ ততোধিক খাঁটি মিশরী, কারণ তার শরীরে রয়েছে ফারাওদের রক্ত। জুর্নো ফরাসী কিন্তু ক' পুরুষ ধরে 'কাইরোর হাওয়া বিষাক্ত করছে, কেউ জানে না, অতি উত্তম আরবী কবিতা লেখে আর সে কবিতার আসল বক্তব্য হচ্ছে, সে তলওয়ার চালিয়ে আড়াই ডজন বেদুইনকে ঘায়েল করে প্রিয়াকে উটের উপর তুলে মরুভূমির দিগ্‌দিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা সবাই জানতুম, জুর্নো যেটুকু মরুভূমি দেখেছে সে পিরামিডে বেড়াতে গিয়ে, তাও জীবনে একবার মাত্র, যদিও পিরামিড কাইরো থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। উট কখনো

চড়েনি, ট্রামের ঝাঁকুনিতেই বমি করে ফেলে। আর তলওয়ার ? তওবা, তওবা। মার্কোস জাতে গ্রীক, বেশি নয় কুল্লে আড়াই হাজার বৎসর ধরে, তারা মিশরে আছে। মিশর রাণী, গ্রীক রমণী ক্লিয়োপাত্রার সঙ্গে তার নাকি খোশকুটুম্বিতা আছে। হবেও বা, কারণ প্রায়ই ব্যবসাতে দাঁও মেরেছে বলে ফালতো এবং 'ফিরি' এক রোঁদ কফি খাইয়ে দিত। তাতে করে কাফের 'গণতন্ত্র' ক্ষুণ্ণ হত না, কারণ মার্কোসকে 'কাট্যা ফালাইলে'ও আড্ডার ঝগড়া-কাজিয়ায় সে কস্মিন কালেও হিস্সা নিত না ; বেশির ভাগ সময় চেয়ারের হেলানে মাথা রেখে আকাশের দিকে হাঁ করে ঘুমুতো কিংবা খবরের কাগজ থেকে তুলোর ফটকা বাজারের তেজি-মন্দির (বুল-এ্যাণ্ড বিয়ার হালহকিকৎ মুখস্থ করতো।

আর বাঙলা দেশের তাবৎ চণ্ডীমণ্ডপ, বেবাক জমিদার-হাবেলীর আড্ডার প্রতিভূ হিসেবে আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় ধূলির ধূলি এ-অধম।

আমার বাড়ির নিতান্ত গা ঘেঁষে বলে নিছক কফি পানার্থে ঐ কাফেতে আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যা যেতুম। বিদেশ বিভূঁই, কাউকে বড় একটা চিনিনে, ছন্নের মত হেথা-হোথা ঘুরে বেড়াই আর দেশ ভ্রমণ যে কি রকম পীড়াদায়ক 'প্রতিষ্ঠান' সে সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক কেতাব লিখব বলে মনে মনে পায়তারা কষি। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল গেল কাফের কোণের আড্ডাটির দিকে। লক্ষ্য করিনি যে কফি-পানটা ওদের নিতান্ত গৌণকর্ম ওরা আসলে আড্ডাবাজ।

আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা ওদের মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রাহ্ম মুহূর্তে। সে 'মহালগনের বর্ণনা' আমি আর কি দেব ? সুরসিক পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো শ্রীহরি শ্রীরাধাতে, ইউসুফ জোলেখাতে, লায়লী মজনুতে, ত্রিস্তান ইজোলদেতে কি করে প্রথম চারি চক্ষু বিনিময় হয়েছিল। কী ব্যাকুলতা, কী গভীরা তৃষা, কী মহা ভবিষ্যতের প্রগাঢ় সুখস্বপ্ন, কী মরুতীর পার হয়ে সুধাশ্যামলিম নীলাম্বুজে আবগাহনানন্দ সে দৃষ্টি বিনিময়ে ছিল ! এক ফরাসী কবি বলেছেন, 'প্রেমের সবচেয়ে মহান দিবস সেদিন, যেদিন প্রথম বলেছিলুম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম হল সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে।

তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে আসুন, স্পর্শ করে বলব, তিন লহমাও লাগেনি, এই ব্রাত্যের উপনয়ন হয়ে গেল, বেদ, শাখা ঋষি স্থির হয়ে গেলেন—সোজা বাঙলায় বলে, জাতে উঠে গেলুম। অমিয়া ছানিয়া, নয়ন হানিয়া বললুম, 'এক রোঁদ কফি ?'

আড্ডায় মেম্বররা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরিতোষের স্মিতহাস্য বিকসিত রলেন। ভাবখানা ভুল লোককে বাছা হয়নি।

কাফের ছোকরাটা পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। আমার ছন্নছাড়া ভাবটা তার চোখে বহু পূর্বেই ধরা পড়েছিল। রেঁাদ পরিবেশন করার সময় নীলনদ-ডেল্টার মত মুখ হাঁ করে হেসে আমি যে অতিশয় ভদ্রলোক—অর্থাৎ জোর টিপ্‌স দি—সেকথাটা বলে আড্ডার সামনে আমার কেস রেকমেণ্ড করলো।

জুর্নো তাড়া লাগিয়ে বললেন, 'যা, যা ছোঁড়া বেলা জ্যাঠামো করিসনে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাস আরবী বলেন আপনি।'

রবিঠাকুর বলেছেন—

'এত বলি সিক্তপক্ষ দুটি চক্ষু দিয়া

সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া

বিদেশীর অঙ্গ হতে—'

ঠিক সেই ধরনে আমার দিকে তাকিয়ে জুর্নো যেন আমার প্রবাস-লাঞ্ছনা এক থাবড়ায় ঝেড়ে ফেললেন, আমার অঙ্গ থেকে।

আমি কিন্তু মনে মনে বললুম, 'ইয়া আল্লা, তের দিনের আরবীকে যদি এরা বলে খাসা তবে এরা নিশ্চয়ই খানদানী মনিষ্যি।' করজোড়ে বললুম, 'ভারতবর্ষের নীতি সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয়সত্য বলবে না, আপনাদের নীতি দেখছি আরো এক কদম এগিয়ে গিয়েছে, প্রিয় অসত্যও বলবে।'

আড্ডা তো—পার্লিমেণ্ট নয়—তাই হরবকৎ কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসমদিব্যি নেই। দুম্ করে রমজান বে বললে, 'আমার মামা (আমি মনে মনে বললুম, 'যগিদ্যাসের মামা') হজ করতে গিয়েছিলেন আর বছর। সেখানে জনকয়েক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারা নাকি পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ত আর বাদবাকী তামাম দিনরাত এক চায়ের দোকানে বসে কিচিরমিচির করত। তবে তারা নাকি কোন্ এক প্রদেশের—বিঙ্গালা, বাঙালা—কি যেন—আমার ঠিক মনে নেই—'

উৎসাহে উত্তেজনায় ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে আমি শুধালুম 'বাঙালা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম বাঙালী। কিন্তু কই, কখনো তো এত গর্ব অনুভব করিনি যে, আমি বাঙালী। এই যে সমস্ত মহাজনরা মক্কা শহরে আড্ডাবাজ হিসেবে নাম করতে পেরেছেন

—নিশ্চয়ই বিত্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাঁরা আলবৎ শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চাটগাঁ, কাছাড়ের বাঙালী খালাসী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে খিদিরপুরে আড্ডা মারতে শিখে 'হেলায় লঙ্কা করিলা জয়'।

আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ডান হাত বুকের উপর রেখে মাথা নিচু করে অতিশয় সবিনয় কণ্ঠে বললুম, 'আমি বাঙালী।'

গ্রীক সদস্ত মার্কোস প্রথম পরিচয়ের সময় একবার মাত্র 'সালাম আলাইক' করে খবরের কাগজের পিছনে ডুব মেরেছিলেন। তাঁর কানে কিছু যাচ্ছিল কি না জানিনে। আমি ভাবলুম, রাশভারী লোক, হয়ত ভাবছেন, নূতন মেম্বার হলেই তাকে নূতন জামাইয়ের মত কাঁধে তুলে ধেই ধেই করেই নাচতে হবে একথা আড্ডার কনস্‌টিটুশানে লেখে না। মুখের উপর থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'দাঁও মেরেছি। একটা শ্যাম্পেন হবে? আমাদের নূতন মেম্বর—।' কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল মালিক; তার দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত গোল করে বোতল ধরার মুদ্রা দেখিয়ে ডান হাত দিয়ে দেখালেন ফোয়ারার জল লাফানোর মুদ্রা। ম্যানেজার কুল্লে দুই ডিগ্রী কাৎ করে ঘাড় নাড়ল।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এ দোকানে তো মদ বেচার লাইসেন্স নেই।'

মার্কোস বললেন, 'কাফের পিছনে, তার ড্রইংরুমে। ব্যাটা সব বেচে—আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।'

ছোকরাকে বললেন, 'আর একটা তামাকও সাজিস।'

বলে কি? কাইরোতে তামাক! স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু?

দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হনুমানের ল্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। জরির কাজ করা আমাদের ফর্শী কেমন যেন একটু 'নাজুক' মোলায়েম হয়—এদের যেন একটু গাঁইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে ভক্তি হল—ইয়া ডাবর পরিমাণ। একপো তামাক হেসেখেলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্যি আমি টিকের ধিকিধিকি গোলাপী গরম প্রত্যাশা করিনি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গুহ্যতত্ত্ব সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চোদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তদ্বিবৎ করে বানাতে শিখল কি করে? আইস, সে সম্বন্ধে ঈষৎ গবেষণা করা যাক্! এক সিগারেট বানানোর পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এন্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়নশাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে।

সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোট অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রীক কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে কাগজে পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মাখিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনন্দী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ন সিগারেট।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন চায়ের টিন যদি রান্না ঘরে ভালো করে বন্ধ না রাখা হয়, তবে ফোঁড়নের ঝাঁকে চা বরবাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ আর কিছু না হোক খুশবাইটি আঁতুড়ঘরে নুন-খাওয়ানো বাচ্চার মত প্রাণত্যাগ করে। মালজাহাজ লাদাই করা যে অপিসারের কর্ম তিনিও বিলক্ষণ জানেন, যে-জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে তাতে করে গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না—পাছে তামাকের গন্ধ এবং কিঞ্চিৎ স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই তামাকের স্বাদ নষ্ট না করে সিগারেটকে খুশবাইয়ে মজানো অতীব কঠিন কর্ম। সিগারেটে একফোঁটা ইউকেলিপ্‌টস্ তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফুঁকে দেখুন একফোঁটা তেল আস্ত সিগারেট একদম বরবাদ করে দিয়েছে। পাঁচ বছরের বাচ্চাও তখন সে সিগারেট না কেশে অনায়াসে ভস্ ভস্ করে ফুঁকে যেতে পারে (বস্তুত বড্ড বেশি ভেজা সর্দি হলে অনেকে এই পদ্ধতিতে ইউকেলিপ্‌টস্ সেবন করে থাকেন—যাঁরা সিগারেট সইতে পারেন না তাঁরা পর্যন্ত)।

বরঞ্চ এমন গুণী আছেন যিনি এটম বমের মাল-মসলা মেশানোর হাড়হদ্দ হালহকিকৎ জানেন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে খুশবাই! তার পিছনে রয়েছে গূঢ়তর, রহস্যাবৃত ইন্দ্রজাল।

কিছু বাড়িয়ে বলছিনে। অজন্তার দেওয়াল এবং ছবির রঙ কোন্ কোন্ মসলা দিয়ে বানানো হয়েছিল, পাঠানযুগে পাথরে পাথরে জোড়া দেবার জন্য কি মাল কোন্ পরিমাণে লাগানো হয়েছিল আমরা সে তত্ত্বগুলো মাথা খুঁড়েও বের করতে পারিনি এবং পারেনি বিশ্বসংসার বের করতে কি কৌশলে, কি মসলা দিয়ে মিশরীরা তাদের মমীগুলোকে পচার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

স্বীকার করি, মিশরীরাই একদিন সে কায়দা ভুলে মেরে দিয়েছিল—পাঠান-মোগলযুগে যে রকম আমাদের অনেকখানি রসায়নবিদ্যা অনাদরে লোপ পায়। তবু তো আমরা আজও মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ বানাতে পারি—ভেজাল তো শুরু হল মাত্র সেদিন, আমাদেরই চশমার সামনে।

মিশরীরাও ঠিক সেই রকম সুগন্ধ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি। ঝড়তি-পড়তি যেটুকু এলেম তখনো তাদের পেটে ছিল তাই দিয়ে তারা সেই সমস্যা সমাধান করলো, তামাকে কি করে খুশবাই জোড়া যায়, তামাকের 'সোয়াদ'টি জখম না করে!

তাই যখন কোনো ডাকসাঁইটে তামাক কদরদারের (হায়! এ গোত্র পৃথিবীর সর্বত্র কি কাবুল, কি দিল্লী, কি কাইরো—সুকুমারের ভাষায় বলি—হুশ হুশ করে মরে যাচ্ছে) তদারকিতে কাইরোর কাফেতে তামাক সাজা হয় এবং সেই কদরদার যখন সে তামাকের নীলাভ ধুঁয়োটি ফুরফুর করে নাকের ভিতর দিয়ে ছাড়েন এবং নীলনদের মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই ধুঁয়োটির সঙ্গে রসকেলি করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে কাফের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন রাস্তার লোক পর্যন্ত উন্নাসিক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, পাঁড় সিগারখেকো, পাইকারি সিগারেট-ফোঁকো পর্যন্ত বুকের উপর হাত রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে 'অলহমদুলিল্লা, অলহমদুলিল্লা' (খুদাতালার তারিফ) বলে।

আর ইলিশের বেলা যে রকম হয়েছিল, এ অধম ঠিক সেই রকম তাজ্জব মানে, বেহশতের বর্ণনায় এ তামাকের বয়ান নেই কেন? তা হলে পাপ করে নরকে যেত কোন্ মূর্খ?

বাঙালী তার চুলটিকে কেতাদুরস্ত করে রাখতে ভালোবাসে, কাবুলী বেলা-অবেলা মোকা পেলেই তার পায়জারে গুটিকয়েক পেরেক ঠুকিয়ে নেয়, ইংরেজ আয়না সামনে পেলেই টাইটা ঠিক মধ্যিখানে আছে কিনা, তার তদারক কত্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পেশাওয়ারী পাঠানের প্রধান শিরঃপীড়া তার শিরাভরণ নিয়ে, আর মিশরীর চরম দুর্বলতা তার জুতো জোড়াটিকে 'বালিশ' (আরবী ভাষায়

'প' অক্ষর নেই, তাই, ইংরিজি 'পালিশ' কথাটা মিশরীতে 'বালিশ রূপ ধারণ করেছে) রাখার জন্যে।

অতএব কাফেতে ঢোকামাত্রই কাফের 'বুৎ-বালিশ' (অর্থাৎ বুট পালিশ করনেওলা) ছোকরা এসে আপনাকে সেলাম ঠুকবে। আপনি তাকে বিলক্ষণ চেনেন, তাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলবেন, 'যা, যা'—তার অর্থ 'আচ্ছা পালিশ কর।' সে বত্রিশখানা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে আপনার 'বুৎ-বালিশ' কর্মে নিযুক্ত হবে।

সদস্যদের কেউ বলবেন, 'শুভ দিবস', কেউ 'এই যে', কেউ একটু মৃদু হাস্য করবেন, আর কেউ মুখ খবরের কাগজের আড়ালে রেখেই কাগজখানা ঈষৎ দুলিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে আপনার কফি এসে উপস্থিত। ওয়েটার ঠিক জানে, আপনি কতটা কড়া, কতখানি চিনি আর কোন্ ঢঙের পেয়ালায় কফি খেতে পছন্দ করেন। আপনি বলবেন, 'চিঠিপত্র নেই?'

অর্থাৎ গৃহিণীর ভয়ে আপনি প্রিয়াকে কাফের ঠিকানা দিয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফোন?'

'আজ্ঞে না। তবে হউস্থফ বে আপনাকে বলতে বলেছেন, তিনি একটু দেরিতে আসবেন। আপনি যেন চলে না যান।'

'চুলোয় যাক গে ইউসুফ বে। আমি জিজ্ঞেস করছি, চিঠি বা ফোন নেই?'

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'আজ্ঞে না।' জানে আজ আপনি দরাজ হাতে বখশিশ দেবেন না।

'যাও, চিঠির কাগজ নিয়ে এস।'

কাফের নাম-ঠিকানা-লেখা উত্তম চিঠির কাগজ, খাম ব্লটিং প্যাড যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এক মিনিটের ভিতর উপস্থিত হবে। আপনি পাশের টেবিলে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রেমপত্র লিখে যখন ঘণ্টাখানেক পরে আড্ডার টেবিলে ফিরে ওয়েটারকে বলবেন, চিঠিটা ডাকে ফেলতে, তখন হঠাৎ রমজান বে শুধাবে, 'কাকে লিখলে?' যেন কিছুই জানে না।

চটে গিয়ে বলবেন, 'তোমার তাতে কি?'

রমজান বে উদাস সুরে বলবে, 'না, আমার তাতে কি। তবু বলছিলুম, সকালে বিল্‌কিসের সঙ্গে দেখা। সে তোমাকে বলে দিতে বললে, তুমি যেন সাড়ে এগারোটায় 'ফামিনা' সিনেমার গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা করো।'

আরো চটে গিয়ে বলবেন, 'তাহলে এতক্ষণ ধরে সেটা বলোনি কেন?'

'সাড়ে এগারোটা বাজতে তো এখনো অনেক দেরি।'

'আঃ, সে কথা হচ্ছে না। আমি যে মিছিমিছি এক ঘণ্টা ধরে চিঠিটা লিখলুম।'

রমজান বে আরো উদাস সুরে বলবে, 'জানিনে, ভাই, তোমাদের দেশে প্রেমের রেওয়াজ কি। এদেশে তো জানি, প্রিয়া পাশের ঘরে, আর এ-ঘরে বসে প্রেমিক পাতার পর পাতা প্রেমপত্র লিখে যাচ্ছেন।'

এতক্ষণ একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থিত হল। রেশনশপ খোলা মাত্রই মেয়ে-মদ্দে যে রকম দোকানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তামাম আড্ডা ঠিক সেই রকম প্রেমপত্র লেখার সময়-অসময়, মোকা-বে-মোকা, কায়দা-কেতা সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দেবে।

ক্রমে ক্রমে আলোচনার বিষয়বস্তু হটতে হটতে পৌঁছবে সেই সনাতন প্রশ্নে, কোন্ দেশের রমণী সবচেয়ে সুন্দরী হয়।

অবান্তর নয়, তাই নিবেদন করি, দেশ-বিদেশ ঘুরেছি, অর্থাৎ ভ্যাগাবণ্ড হিসাবে আমার ঈষৎ বদনাম আছে। কাজেই আমাকে কেউ শুধান, কোন্ দেশের রান্না সবচেয়ে ভাল কেউ শুধান, তুলনাত্মক কাব্যচর্চার জন্য কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশস্ততম, আর অধিকাংশ শুধান, কোন্ দেশের রমণী সবচেয়ে সুন্দরী ?

আমি কলির পরশুরামের স্মরণে উত্তর দি, 'এনারা আছেন, ওনারাও আছেন।' কারণ যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘোরেন নি, তাঁদের সঙ্গে এ-আলোচনাটা দানা বাঁধে না বড্ড একতরফা বক্তৃতার মত হয়ে যায়, আর সবাই জানেন, বক্তৃতা আড্ডার সবচেয়ে ডাঙর দুশমন।

এ সংসারে যদি কোন শহরের সত্যকার হক থাকে, উপর্যুক্ত প্রাণাভিরাম বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তবে কসম খেয়ে বলতে পারি, সে শহর কাইরো। কারণ কাইরোতে খাঁটি বাসিন্দারূপে যুগ যুগ ধরে আছে গ্রীক, আরব, তুর্কী, হাবশী, সুদানী, ইতালীয়, ফরাসীস্ ইহুদী এবং আরো বিস্তর চিড়িয়া। এদের কেউ কেউ বোরকা পরেন বটে, তবু অক্লেশে বলা যেতে পারে, কাফের দরজার দিকে মুখ করে বসে, আড্ডা অনায়াসে নিজের মুখে ঝাল খেয়ে নিতে পারে।

আর শীতকাল হলে তো পোয়া বারো। কাইরোতে বছরে আড়াই ফোঁটা বৃষ্টি হয়, সাহারার শুকনো হাওয়া যক্ষ্মারোগ সারিয়ে দেয়, পিরামিড কাইরোর বাইরেই ঠায় বসে, ফুর্তি ফার্তির নামে কাইরো বে-এক্তিয়ার, মসজিদ-কবর

কাইরো শহরে বে-শুমার, শীতকালে না-গরম-না-ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে কাইরো টুরিস্টজমের ভূস্বর্গ এবং টুরিস্টাদেরও বটে।

তদুপরি মার্কিন লক্ষপতিরা আসেন নানা ধান্দায়। তাঁদের সন্ধানে আসেন তাবৎ দুনিয়ার ডাকসাঁইটে সুন্দরীরা। তাঁদের সন্ধানে আসেন হলিউডের ডিরেক্টররা এবং তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন আরেক ঝাঁক সুন্দরী।

কিন্তু থাক্, সুশীল পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো, কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে আলোচনা শাস্ত্রে নিষেধ। গুরুর বারণ।

মিশরী আড্ডাবাজরা (দাঁড়ান, ব্যাকরণে ভুল হয়ে গেল, মিশরী মাত্রই আড্ডাবাজ : এমনকি সাদ্ জগলুল্ পাশা পর্যন্ত দিনে অন্তত একবার আড্ডার সন্ধানে বেরুতেন। তবে হাঁ, তিনি কোনো টেবিলে গিয়ে বসলে কেউ সাহস করে সে টেবিলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। সেখান থেকে তিনি চোখের ইশারায় এঁকে ওঁকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আড্ডা জমাতেন) দৈবাৎ একই আড্ডায় জীবন কাটান। বিষয়টা সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয়।

এই মনে করুন, আপনি রোজ আপিস ফেরার পথে 'কাফে দ্য নীলের, উত্তর-পূর্ব কোণে বসেন। সে টেবিলটায় আপনার জন-পাঁচেক দোস্ত বসেন। আড্ডার ফুল স্ট্রেন্‌থ্‌ জন দশ—সবাই কিন্তু সব দিন এ আড্ডাতেই আসেন না। তাই হরে দরে আপনার টেবিলে জন পাঁচ-সাত নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

এ ছাড়া আপনি সপ্তাহে একদিন—জোর দু'দিন, বাড়ির পাশের সেমিরামিস কাফেতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসেন। এ আড্ডার সদস্যরা কিন্তু আপনার 'কাফে দ্য নীলের' সদস্যদের বিলকুল চেনেন না। এরা হয়ত চ্যাংড়ার দল, কলেজে পড়ে, কেরানীগিরি করে, বেকার, কিংবা ইনশিওরেন্স এজেন্ট (তার অর্থও বেকার)। এদের আলোচনার বিষয়বস্তু রাজনীতি, অর্থাৎ কোন্ পাশার বউ কোন মিনিস্টারের সঙ্গে পরকীয় করেন বলে তাঁর বোনপো পার্টিতে ভালো নোকরি পেয়ে গেল কিংবা আলোচনার বিষয়বস্তু সাহিত্য, অর্থাৎ কোন প্রকাশক এক হাজারের নাম করে তিন হাজার ছাপিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া অবশ্যই দুনিয়ার হাজারো জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়, তা না হলে আড্ডা হবে কেন এ আড্ডার সদস্যদের সবাই সবজান্তা। এরা মিশর তথা তাবৎ দুনিয়ার এত সব গুহ্য এবং গরম গরম খবর রাখেন যে এদের কথাবার্তা, হাবভাব দেখে আপনার

মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না যে এদের প্রত্যেকের চোখের সামনে এক অদৃশ্য, অশ্রুত টেলিপ্রিণ্টার খবর জানিয়ে যাচ্ছে এবং সে খবরের যোগান দিচ্ছেন রাশার বেরিয়া, জর্মনির হিমলার আর কলকাতার টেগার্ট। রোজ বাড়ি ফেরার সময় আপনি তাজ্জব মানবেন, এদের সাহায্য ছাড়া মিশর তথা দুনিয়ার বাদবাকী সরকারগুলো চলছে কি করে। আপনার মনে আর কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না যে, এদের যদি মস্কো, বার্লিন, লণ্ডন, দিল্লীর বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ার কুল্লে সমস্তার সাকুল্যে সমাধান এক লহমায়ই হয়ে যাবে। মনে মনে বললেন, 'হায়, দুনিয়া, তুমি জানছো না তুমি কি হারাচ্ছো।'

আপনি এদের চেয়ে বছর দশেক বড়, তাই এরা আপনাকে একটুখানি সমীহ করে যদিও আড় না হয়েই বিড়ি টানে কারণ এদেশে সে রেওয়াজটা তেমন নেই। আপনি নিতান্ত বিদেশী বলেই এ আড্ডায় ছিটকে এসে পড়েছেন। এদের কাউকে পয়লা আড্ডায় নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি নিয়ে গিয়েছিলুম; বেচারী সেখানে রা'টি কাড়ে নি যদ্যপি দুসরা আড্ডাতে সেই শুড়পাতো সবচেয়ে বেশ।

তা ছাড়া আপনি মাসে একদিন কিংবা দু দিন শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা কাফেতে যান। আপনার এক বন্ধু সে কাফেটারই উপরতলায় থাকেন। খাসা জায়গায়—সামনেই নীল নদ বয়ে যাচ্ছে। আপনারই বন্ধু এখানকার এ-আড্ডার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রথম খুঁজবেন কাফেতে—সেখানে না পেলে অবশ্য তাঁর ফ্ল্যাটে যেতে পারেন তাতে কিন্তু কোনো লাভ নেই।

এ কাফে আপনাকে উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করবে যেন আপনি অনেক দিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরে-পাওয়া ভাই। কারণ আপনি এখানে আসেন কালেভদ্রে। আপনাকে পেয়ে এঁদের বিশেষ আনন্দ কারণ পক্ষাধিক কাল ধরে তাঁরা যে সব বিষয় কেটেকুটে ঘষেপিষে চাটনি বানিয়ে ফেলেছিলেন সেগুলো তাঁরা নূতন করে হাড়কাটে ঢুকিয়ে রাম দা' ওঁচাবেন। আপনার রায় জানতে চাইবেন। যে রায়ই দিন না কেন আপনার উদ্ধার নেই। আপনি যদিও গাঁধার দেশের লোক—আপনি অবশ্য একশ' বার ওঁদের বলেছেন যে গাঁধীর সঙ্গে আপনার কোনো প্রকারে সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, কিন্তু তাতে করে কোনো ফায়দা ওৎরায় না—যদিও আপনার জ্ঞানগম্যিতে কারো কোনো সন্দেহ নেই, কারণ

আপনি গুহ্য ষষ্ঠেন্দ্রিয় ধারণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তবু স্বীকার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি নির্ঘাত শেষ বাস্ মিস করবেন। বন্ধুর ফ্ল্যাটে সোফার উপর চতুর্থ যাম যাপন করে পরদিন সকালবেলা বাড়ি ফিরবেন॥

ধূপ-ছায়া

জাহাজে শেষ রাত্রি। পরদিন ভেনিস পৌঁছব।

তিনদিন ধ'রে কারো মুখে আর কোনো কথা নেই—শেষ রাত্রে যে জব্বর ফ্যান্সি বল হবে তাই নিয়ে সুবো-শাম জল্পনা কল্পনা। মহিলারা কে কি পরবেন তাই ভেবে ভেবে আকুল হয়ে উঠছেন কিন্তু কে কোন্ বেশ ধরবেন সে কথা একে অন্যের কাছ থেকে একদম চেপে যাচ্ছেন। নিতান্ত বিপদে পড়লে তবু বরঞ্চ কোনো পুরুষের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিন্তু স্ত্রীলোক—নৈব নৈব চ। বুঝলুম আমাদের দেশে ভুল বলে না, 'বরঞ্চ যমের হাতে স্বামীকে তুলে দেব তবু সতীনের কোলে নয়'। এস্থলে বরঞ্চ অপরিচিত অর্ধপরিচিত ছুলোর সাহায্য কবুল, তবু কোনো মেনির ছায়া মাড়াব না।

আমি নিঝঞ্ঝাট মানুষ, বয়সে চ্যাংড়া, ২৪ হয় কি না হয়। ভয়ে কারোর সঙ্গে কথা কইনে পাছে এটিকেটের ব্যাকরণ-ভুল হয়ে যায়। আমার কেবিনে —বিবেচনা করুন খুদ কেবিনে, 'ডেকে' না, 'লাউঞ্জে' না—এক গরবিনী ফরাসিনী ভামিনী এসে উপস্থিত, 'মসিয়ো, তিন সত্যি দাও, কাউকে বলবে না, তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি।'

বাপ মা আদর করে বলতেন আমার নাকি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আমি বিলক্ষণ জানি, আমার বর্ণ কি? আমারই এক বন্ধু আমার রঙ দেখিয়ে দোকানদারকে বলেছিলেন, ঐ রঙের বুট-পালিশ দিতে। লজ্জায় সেই বর্ণ টিকের আগুন ধরার রঙ চড়ালো। সাত বার খাবি খেয়ে বললুম, ইয়েস, ইয়েস, উই, উই; বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!'

বললেন, 'আপনার সিল্কের পাগড়িটা এক রাত্রের মত ধার দিন।' আমার মত কালো কুচ্ছিৎকে তিনি প্রেমনিবেদন করবেন সে দুরাশা আমি করিনি কিন্তু নিতান্ত গন্ধময়ী পাগড়ি! কে বলে ফরাসিনী সুরসিকা?

তা যাক্‌গে—এইটে আসল বক্তব্য নয়। মোদ্দা কথা, এই করে করে ক্যান্ডি বল 'রূপায়িত' হল!

ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই কাণ্ড। শিখের বাচ্চা দাড়িঝাড়ি বাগিয়ে ভলগা-মাঝির পোশাক পরে নাচছে চীনা পাজামা-কুর্তা পরা নথরা ভিয়েনা-সুন্দরীর সঙ্গে, বগলে ঝাড়ু দেবে মেথরানীর বেশ পরে ফরাসিনী ধেই ধেই করছেন স্প্যানীর রাজপুত্রের বেশে মিশকালো নিগ্রোর সঙ্গে, রেড্ ইণ্ডিয়ানের রঙ মেখে জাপানী তুর্কী-নাচন নাচছেন এক পার্সী নারীর সঙ্গে—তার সর্বাঙ্গ প্যাকিঙের ব্রাউন-পেপারে মোড়া, তদুপরি কালো হরফে লেখা 'ফ্রেজাইল, উইথ কেয়ার'- কাঁচের বস্তু, ভজুর, সাবধানে নাড়াচাড়া করো।'

এসব বস্তু রপ্ত হতে বাঙালী ছেলের সময় লাগে।

আমি কি পরে গিয়েছিলুম তা আর বলব না। একেই তো মর্কটের মত চেহারা, তাকে 'ফিন্‌সি' করলে বড়ি শুকনোর সময় কাগ তাড়াবার জন্য পাড়ায় ডাক পড়বে।

'বারে' গিয়ে দাঁড়ালুম।

উঃ! চ্যাংড়া-চিংড়ীরা কী বেদম ফুর্তিটাই না করতে জানে। হোলির দিনে যেমন মানুষ গায়ে রঙ মাখে এরা ঠিক তেমনি দু পাত্তর রঙীন জল গিলে মনে রং লাগিয়ে নিয়েছেন। চোখ অল্প অল্প গোলাপি হয়ে গিয়েছে—বিশ্ব-সংসার গোলাপি রঙে ছোপানো বলে মনে আমেজ লাগছে। না হয় খর্চা হয়েই গেল শেষ কড়ি—খর্চা না করলে খুদা আরো পয়সা দেবেন কি করে? না হয় নাচলই লক্ষ্মীছাড়া মেরিটা ঐ খাটাশ মুখো সেপাইটার সঙ্গে তোমাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে—ভয় কি, আরো মেলা মেরি ফেনী রয়েছে। মনে আরেক পোঁচ রং লাগিয়ে লাও হে লাটুবাবু, বাবুরা যখন অত করে কইচেন। বেবাক বাৎ ভুলে যাবে। অত সিরিয়স হয়ো না মাইরি, শেষ পরবের রাত্তিরে।

তার সঙ্গে এ কোণে ও কোণে হেথা-হোথা, একে অন্যের কানে কানে কত 'মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণী বলা,' কত 'বেদনার পেয়ালা' ভরে গেল কত হিয়ার, কত গান উঠলো বুকে বুকে, 'পিয়ো হে পিয়ো'।

অরকেস্ট্রা কিন্তু ঢাক ঢোল কত্তাল বাজিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে—

'ওগো, ডনা ক্লারা, তোমাকে আমি নাচতে দেখেছি
ওগো ডনা ক্লারা, তোমার সোনার ছবি বুকে এঁকেছি।'

* * *

বাইরে এসে ডেকের সুদূরতম প্রান্তে একখানা চেয়ার টেনে একলাটি চুপ করে

বললুম। সিগার সিগরেটের অত্যাচারে সমুদ্রের নোনা হাওয়া জলসা ঘরে নাক গলাতে পারেনি; আমাকে পেয়ে খুশি হয়ে আমার সর্বাঙ্গে আদর করে হাত বুলিয়ে গেল।

আজ কি অমাবস্যা? এরকম অন্ধকার শ্রাবণ-ভাদ্রের মেঘাচ্ছন্ন অমযামিনীতেও দেশে কখনো দেখিনি। গাছপালা, বাড়িঘরদোর যেন অন্ধকারের খানিকটে শুষে নেয় বলে ডাঙার অন্ধকার সমুদ্রের অন্ধকারের চেয়ে অনেকখানি হাল্কা। এখানে দিনের বেলাকার নীলসমুদ্র আর নীল আকাশ রাত্রিবেলায় যেন এক হয়ে মিশে গিয়ে জমে উঠে গড়ে তুলেছে এক ঘনকৃষ্ণ অন্ধ-প্রাচীর, না—আরো কাছে এসে আমার চোখে মাখিয়ে দিয়ে গেছে কৃষ্ণাঞ্জন।

শুধু চিলিক মেরে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে প্রপেলারের তাড়ায় ভেসে-ওঠা ফেনা আর বুদ্বুদ। ঐ ফেনাটুকু মাঝে মাঝে না দেখতে পেলে মনে ভয় জাগত অন্ধ হয়ে গিয়েছি, জলসা ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে আলো দেখে সেখান থেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে হত।

জাহাজের হৃৎপিণ্ড যেন ধপ্ ধপ্ করছে—তাই অষ্টপ্রহর একটা একটানা মৃদু শিহরণ জাহাজের সর্বাঙ্গে লেগেই আছে। সে শিহরণ এমনিতে দেহে মনে অস্বস্তি জাগায় কিন্তু আজ এই মৃত্যু-অন্ধকারে সে স্পন্দন যেন আমার চৈতন্য-বোধকে গভীরতম সুষুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখল।

কান্নার শব্দ?

তাজা হাওয়ার জন্য কে যেন সুদূর জলসা ঘরের একখানি জানলা খুলে দিয়েছে। তারই ক্ষীণ আলোতে দেখি একটি মেয়ে রেলিঙে মাথা রেখে কাঁদছে।

এ মেয়ে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে হনি-মুন যাপন করতে। সেখানে স্বামী হঠাৎ মারা যায়। দেশে ফিরে যাচ্ছে একা॥

মেশেদিনী

আরেক জাহাজে একটি মহিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বয়স, এই ধরুন, চল্লিশের সামান্য এদিক-ওদিক। লিপস্টিক, রুজ, পাউডার মাখলে অনায়াসে পঁয়ত্রিশ বলে চালিয়ে নিতে পারতেন। মুখ আর রঙ দেখে বোঝা গেল ইনি খাঁটি মেম নন, কিন্তু ঠিক কোন দিশী সেটা অনুমান করতে পারলুম না। পরনে পুরনে ধরনের লম্বা ফ্রক আর গায়ে লম্বা-হাতা ব্লাউজ। চোখে মুখে ভারী একটা প্রশান্তির ভাব লেগে আছে—একটুখানি কেমন যেন উদাস-উদাস বললেও ভুল বলা হয় না।

কিন্তু তাঁর চেহারা, বেশভূষা ধরনধারণ সেইটে আসল কথা নয়। তিন চার দিন যেতে না যেতেই লক্ষ্য করলুম, এ যাবৎ তাঁকে কারো সঙ্গে একটি মাত্র কথাও বলতে শুনিনি। সমস্ত দিন লাউঞ্জের এক কোণে একা বসে বসে কাটান; তাঁর টেবিলে অন্য কাউকে এসে কথা বলতেও দেখিনি। ওঁর চেয়ে দেখতে খারাপ, বয়সে বেশী, এমন রমণীরাও যখন প্রৌঢ়দের নেকনজর পাচ্ছেন, দু'দণ্ড রসালাপ করবার অবকাশও পাচ্ছেন, তখন ইনিই বা জাহাজ-যজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে সঙ্গরসের উপেক্ষিতা কেন?

কাউকে জিজ্ঞেস করার মত সাহসও খুঁজে পাইনে। উনি আমার মা হতে পারেন, বেশি জিজ্ঞেসবাদ করলে ঠোঁটকাটারা হয়তো বলে বসবে, 'ইডিপস কম্‌প্লেক্স' কিংবা ঐ ধরনেই কিছু একটা।

তখন হঠাৎ একদিন দেখি, আমারই পরিচিত এক সহযাত্রী লাউঞ্জের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ওঁকে নমস্কার করলেন, উনিও উত্তর দিলেন। তাঁকে তখন সুবিধেমত এটা, ওটা, পাঁচটা কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, মহিলাটি কারো সঙ্গে কথা কন না কেন? ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করে কথা বলবেন? উনি তো ফার্সী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। ওঁর বাড়ি মেশেদ্।' তারপর বললেন, 'আপনি না কাবুলে ছিলেন সেখানকার ভাষা পশতু না ফার্সী কি যেন?'

আমি বললুম, 'ফার্সী অনেকখানি ভুলে গিয়েছি; তবে এককালে ফার্সীর মাধ্যমে কাবুলে ইংরিজি পড়িয়েছি।'

আর যাবে কোথায়। আমাকে হিড়হিড় করে হাতে ধরে টেনে নিয়ে চললেন সেই মহিলার দিকে—যেন জলে-ডোবা মানুষকে দম দেবার জন্য বস্তি খুঁজে পেয়েছেন। আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে এমন একখানা মিষ্টি হাসি ছাড়লেন, যেন তিনি এখখুনি আমাকে আপন হাতে গড়ে তৈরি করেছেন। নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া ব্যাটাকেও বোধ হয় বাপ এতখানি দেমাকের সঙ্গে দুনিয়ার সামনে পেশ করে না।

তারপর বললেন শুধু একটি কথা—'ফার্সী!'

মহিলাটিও এই হুল্লোড়ের মাঝখানে একটুখানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছেন। সামলে নিয়ে শুধালেন, 'আপনি ফার্সী বলতে পারেন?'

আমি সবিনয় বললুম, 'এককালে পারতুম।'

ভারী একটা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'বসুন।'

তারপর বললেন, 'আমি যে বেশি কথা কইতে ভালোবাসি তা নয়, তবে এই পাঁচ দিন ধরে একটি কথাও বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি সমস্ত জীবন কাটিয়েছি ইরানের মেশেদ্ শহরে। তারপর গেল আট বচ্ছর লণ্ডনে।'

আমি শুধুলুম, 'ইংরিজি শেখেন নি সেখানে?'

বললেন 'না; লণ্ডনে তো আমি ইচ্ছে করে যাই নি। আমার স্বামী মেশেদে সর্বস্বান্ত হয়ে লণ্ডন গেলেন তাঁর কাকার কাছে। আমরা ইহুদি, জানেন তো, আমরা ব্যবসা করি দুনিয়ার সর্বত্র সেখানে ওঁর দু'পয়সা হয়েছে, কিন্তু আমাদোরা আর ইংরিজি শেখা হল না। ইরানি ইহুদিরা যে দু'চারজন লণ্ডনে আছেন, তাঁদের সঙ্গেই মেলামেশা করি, কথাবার্তা কই। তবে হাট করতে গিয়ে 'গ্রীন পীজ, কলি-ফ্লাওয়ার, টাপেন্স, ত্রাপেন্স-হে-পেনি' বলতে পারি, ব্যাস।'

আমি বললুম, 'ইংরিজি তো তেমন কঠিন ভাষা নয়, আর আপনি যে দু'চারটে ইংরিজি বললেন সেগুলো তো খুব শুদ্ধ উচ্চারণে।'

মহিলাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি করে শিখি বলুন? আমার মন পড়ে আছে সেই মেশেদ শহরে। লণ্ডন সাফসুৎরো জায়গা, বিজলি বাতি, জলের কল, খাওয়াদাওয়া, থিয়েটার সিনেমা সবই ভালো—কোথায় লাগে তার কাছে বুড়ো গরিব মেশেদ্? তবু যদি জানতুম একদিন সেই মেশেদে ফিরে যেতে পারবো, তাহলেও না হয় লণ্ডনটার সঙ্গে পরিচয় করার চেষ্টা করতুম, কিন্তু যখনই ভাবি ঐ শহরে আমাকে একদিন মরতে হবে, আমার হাড় ক'খানা

বাপপিতামোর হাড়ের কাছে জায়গা পাবে না, তখন যেন সমস্ত শহরটা আমার দুশমন, আমার জল্লাদ বলে মনে হয়।'

আমি বললুম, 'আপনার এমন কি বয়স হয়েছে যে আপনি মরার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন?'

'তেমনি কিছু নয়, জানি, কিন্তু যখন একথাও জানি যে, লণ্ডনেই মরতে হবে, তখন যেন বয়সের আর গাছ পাথর থাকে না।'

আমি শুধালুম, 'মেশেদে ফিরে যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব। আপনি না বললেন, আপনাদের দু'পয়সা হয়েছে।'

মহিলাটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। বুঝলুম, সব কিছু আমাকে প্রথম পরিচয়েই বলবেন কি না, তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করছেন। শেষটায় বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আজ আমাদের যা টাকা হয়েছে, তাই দিয়ে আমরা মেশেদের পুরানো ভিটে, জমিজমা সব কিছু কিনতে পারি, নূতন ব্যবসা ফাঁদতে পারি।'

আবার নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আমার স্বামী যেতে চান না। লণ্ডন তাঁর ভালো লেগে গিয়েছে। ভূতের মত খাটেন, পয়সা কামান আর মোটর-হোটেল, রেস্তরাঁ-ক্লাব, কনসার্ট-কাবারে করে করে বেড়ান। আমার উপরও চোটপাট, আমিও কেন সঙ্গে সঙ্গে হৈহৈ করি না।'

বললেন, 'বুঝলেন—এখন তিনি লণ্ডনের প্রেমে; বুড়ী মেশেদকে বেবাক ভুলে গিয়েছেন।'

জাহাজে যে ক'দিন ছিলুম রোজ দু'একবার ওঁর কাছে গিয়ে বসতুম। ভদ্রমহিলা নিজের থেকেই একদিন বললেন, 'আপনি যেন না আবার ভাবেন আমি আপনার এক বোঝা হয়ে উঠলুম। যাঁদের সঙ্গে হৈহল্লা করতে আপনি ভালোবাসেন তাঁদের বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে বেশি সময় কাটাবার কোনো প্রয়োজন নেই।'

আমি আপত্তি জানালুম।

তবু তিনি শান্তভাবে লাউঞ্জে আপন কোণে বসে থাকতেন; কথা বলার জন্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টাই করতেন না। আমি কাছে গেলেই মিষ্টি হেসে বলতেন, 'বসুন'; তারপর শুধাতেন, 'কি খাবেন বলুন।' জাহাজে খাবার ব্যবস্থা কুলীন শ্বশুরবাড়ির মত, কাজেই এস্থলে 'খাবার বলতে পানীয়ই বোঝায়।

আমি একদিন বললুম, 'প্রতিবারেই আপনি আমাকে কিছু একটা খেতে বলেন কেন, বলুন তো ?'

অবাক হয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য ! আপনি মেশেদে অর্থাৎ লণ্ডনে আমার বাড়িতে এলে আপনাকে ভালোমন্দ খেতে দিতুম না ?'

আমি বললুম, 'কিন্তু এটা তো আপনার বাড়ি নয় ।'

তিনি বললেন, 'সে কি কথা ! আমার কাছে এলেন তার মানে আমার বাড়িতে এলেন ।'

তারপর বললেন, 'কিন্তু এখানে খেতে দিই বা কি ? আচ্ছা বলুন তো, আপনি জাহাজের এই বিলিতি রান্না খেতে ভালোবাসেন ?'

আমি বললুম, 'এ জাহাজের রান্নার খুশনাম আছে, আমি কিন্তু আমাদের দিশী রান্নাই পছন্দ করি ।'

হেসে বললেন, 'তবে আপনার রসবোধ আছে । এই আইরিশ স্টু আর বাঁধাকপি-সেদ্ধ মানুষ কি করে খায় খোদায় মালুম । সেদিন আবার পোলাও রেঁধেছিল—মাগো ! ছিরি দেখে ভিরমি যাই ।'

আমি শুধালুম, 'মেশেদের লোক পোলাও খায় ?'

বললেন, 'খায়, জাহাজে আপন রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই তা না হলে আপনাকে এ্যাসা পোলাও খাইয়ে দিতুম যে জীবনভর তার সোয়াদ জিভে লেগে থাকত । ভালো কথা, আপনি তো বোম্বাই যাচ্ছেন সেখানে আপনাকে আচ্ছাসে পোলাও খাইয়ে দেব ।'

আমি বললুম, 'আমি তো ভেবেছিলুম আপনি মিশর যাচ্ছেন ।'

তিনি বললেন, 'ওঃ, আপনাকে বলিনি বুঝি, আমি বোম্বাই যাচ্ছি—আমার মেয়ের সেখানে বিয়ে হয়েছে । যে ভদ্রলোক আপনাকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি আমার স্বামীর বন্ধু । উনি বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারবেন বলেই এই জাহাজে যাচ্ছি ।'

তারপর একটুখানি লাজুক হাসি হেসে বললেন, 'আমি যে দিদিমা হতে চললুম ।'

তারপর রোজই গল্প হত তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে । আমাকে কতবার জিজ্ঞেস করলেন, বোম্বায়ে ভালো ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা আছে কি না । আমি বলতুম, লণ্ডনের মত না, তবে ব্যবস্থা মেশেদের চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো । ইস্তেক জর্মনিতে পাশ-করা ইহুদী ডাক্তারও বোম্বাইয়ে আছে ।

বললেন, 'ও কথা বলবেন না, মশাই ; মেশেদে আমাদের যে বুড়ী ধাইমা ছিলেন তাঁর হাতে কখনো কোনো পোয়াতী মরেনি, কোনো বাচ্চা কোনো জখম নিয়ে জন্মায়নি। আর তাঁর সব কেরদানি তো শুধুমাত্র দু'খানা খালি হাত দিয়ে—ডাক্তারদের যন্তরপাতির তো উনি ধার ধারতেন না।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে এখনো এ রকম ধাই আছেন তবে বোম্বাই শহর, সেখানে সুরেব-সুবোদের ব্যাপার।'

উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন কিন্তু আজকের দিনের বড় শহরে কেউ আর একথা মানে না। আমার মেয়েকে চিঠিতে ঐ কথা লিখেছিলুম, সে তো হেসেই উড়িয়ে দিল।'

চুপ করে থেকে বললেন, 'আর দেবেই না কেন ? ওর ছেলেবেলা ও মেশেদে কাটিয়েছে কিন্তু মেশেদের জন্য তো ওর এতটুকু দরদ নেই। আমার স্বামীরই মত, লণ্ডন-প্যারিসের নামে অজ্ঞান।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'আপনি এ নিয়ে এত শোক করেন কেন ? সে সব কাল গেছে, জমানা বদলে গিয়েছে ; এখনও মানুষ আঁকড়ে ধরে থাকবে নাকি মেশেদ-কারবালা, কান্দাহার-হিরাত ?'

বললেন, 'কেন, আপনি তো প্যারিস ভিয়েনা লণ্ডন বার্লিন দেখেছেন—তবু তো ফিরে যাচ্ছেন কোথাকার এক ছোট শহরে।'

আমি ঘাড় চুলকে বললুম, 'আমার যে মা রয়েছেন।'

বললেন, 'একই কথা ; মা যা মায়ের শহরও তা।'

* * *

বোম্বাইয়ে জাহাজ ভিড়েছে। এক সুন্দরী তরুণী আর ছোকরাকে দেখে আমার পরিচিতা মহিলা আকুল হয়ে উঠলেন। তাঁরা জাহাজে উঠতেই তিনজনে জড়াজড়ি কোলাকুলি। আমি একটুখানি কেটে পড়লুম।

তা হলে কি হয়, আমার নিষ্কৃতি নেই। আমাকে পাকড়ে ধরে নিয়ে মেয়ে জামাইকে বার বার বলেন, 'এই আমার বন্ধু, দিল-জানের দোস্ত. আমার সঙ্গে ফার্সী কথা কয়েছে, ফুর্তি-ফার্তি হৈ-হল্লা ছেড়ে দিয়ে।'

মেয়ে যতই জিজ্ঞেস করে, জাহাজে ছিলে কি রকম, খেলে কি, বাবা কি রকম আছেন, কেবা শোনে কার কথা, সত্য সত্যই জাহাজে যেন 'সমুদ্রে রোদন'। তিনি বার বার বলেন, বুঝলি, নয়মি, এঁকে আচ্ছাসে খাইয়ে দিতে হবে। পোলাওর সব মালমসলা আছে তো বাড়িতে ?'

ভেবেছিলুম হোটেলে উঠব। মহিলা শোনামাত্র আমাকে হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন তাঁদের সঙ্গে; আমাকে কড়া নজরে রাখলেন কাস্টম অফিসে, যেন আমি চোরাই মদ—পাছে কাস্টমস্ আমাকে পাকড়ে নিয়ে যায়।

তিন দিন তাঁদের সঙ্গে থেকে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি পাই।

সে তিন দিন কি রকম ছিলুম? মাছ যে রকম জলে থাকে। ভুল বলা হল; মাছকে যদি শুধান, 'কি রকম আছো?' তবে সে বলবে, সৈয়দের ব্যাটা যে রকম ইহুদি পরিবারে ছিল।' ॥

কোন্-ভিনারের মা

বরদায় চাকরি নেবার কয়েকদিন পরেই ডাঃ এর্নস্ট কোন্-ভিনারের (অর্থাৎ ভিয়েনার Cohn) সঙ্গে আলাপ হয়। যদিও নাম থেকে বোঝা যায়, 'কোন' পরিবার এককালে ভিয়েনায় বসবাস করতেন তবু ইনি বার্লিনেই জন্মান, পড়াশুনো করে সেখানে নামজাদা অধ্যাপক হন এবং হিটলার ইহুদীদের উপর চোটপাট আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সস্ত্রীক লণ্ডন চলে যান। বুড়ো মহারাজ তৃতীয় সয়াজীরাও তাঁকে সেখান থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এসে বরোদা জাদুঘরের বড়কর্তা বানিয়ে বসিয়ে দেন।

লোকটির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং তাঁর স্ত্রীও এতখানি লেখাপড়া জানতেন যে তিনি তাঁর স্বামীকে পর্যন্ত কাজকর্মে সাহায্য করতে পারতেন। সয়াজীরাওয়ের পাঠানো 'ভিনাস দি মিলো' মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরি 'মোজেস' ও 'মুমূর্ষু দাসের' প্লাস্টার-কাস্ট যেদিন বার্লিন থেকে বরদা এসে পৌঁছল, সেদিন ফ্রাউ কোন্-ভিনারের কী উত্তেজনা-উৎসাহ! স্টেশনে গিয়ে সেই বিরাট বিরাট বাক্স তদারকি করে নামালেন, আহারনিদ্রা শিকেয় তুলে দিয়ে কাস্টগুলোকে জাদুঘরে সাজালেন,—সে সময় তিনি জাদুঘরে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন,—তারপর ফোলা-ফোলা লাল-লাল চোখ নিয়ে বেরলেন, আমাদের খবর দিতে, প্রভুরা বহাল-তবিয়তে জাদুঘরে আসন জমিয়ে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। পাছে আমি হুজুরদের কিম্বৎ ঠিকমত মালুম না করতে পেরে তেনাদের 'তাচ্ছিল্যি' করি, তাই আমাকে

তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে গিয়ে হুজুরদের সঙ্গে নিজে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হুজুরদের নাম-গোত্র, হাল-হকিকৎ, হাড়-হদ্দ এমনি গটগট করে বয়ান করে দিলেন যে, তার থেকেই বুঝতে পারলুম যে এঁর এলেমের এক কাহন পেলেও আমি সুবে বোম্বাই-বরদা-আহমদাবাদের 'কলা-বাজারে' বাকী জীবন বেপরোয়া হয়ে দাবড়ে বেড়াতে পারব।

আর স্থাপত্য ভক্টর কোন্-ভিনারের পাণ্ডিত্য আমাকে ফলিয়ে বলতে হবে না। নন্দন-শাস্ত্র এবং বিশ্ব-স্থাপত্যের বিভিন্ন শৈলী সম্বন্ধে তিনি যেসব কেতাব লিখে গিয়েছেন, সেগুলো নাৎসী-পতনের পর ফের ছাপা হতে শুরু হয়েছে।

স্থাপত্যে পণ্ডিত অথচ বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শেখেন রাব্বিদের (ইহুদী পুরুত-পণ্ডিত) টোলে। তাই ইহুদী ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর; অথচ ইহুদীদের আচার-ব্যবহার, তাদের কঞ্জুসি নিয়ে তিনি ঠাট্টা-মস্করা করাতে ইহুদীর শত্রু ক্রীশ্চানের চেয়েও ছিলেন বাড়া। সেসব রসিকতা একদিন মোকা-মাফিক ছাড়বার বাসনা আমার আছে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পুত্র-কন্যা হয়নি, অথচ দুজনেরই হৃদয় ছিল স্নেহে ভরা। 'দেশের' পাঠক এই ইঙ্গিত থেকেই টক্ করে বুঝে যাবেন, আমি তাঁর ন'সিকে সুযোগ নিতে কসুর করিনি। যতদিন কোন্-ভিনাররা এদেশে ছিলেন, ততদিন জর্মন বই, মাসিক, খবরের কাগজের জন্য আমাকে কিছুমাত্র দুর্ভাবনা করতে হয়নি।

'সে বছরে ফাঁকা, পেনু কিছু টাকা ধরনে কি করে যে কিছু টাকা আমার হাতে '৩৮ ইংরেজিতে জমে গিয়েছিল, সেটা নিতান্ত আমি বলছি বলেই আজ আমার বিশ্বাস হয়—হায়, এখন যা অবস্থা, '৩৮-এর মুজ্‌তবা আলীকে পথে পেলে 'দাদা, বাছা' বলে তার কাছ থেকে দু-পয়সা হাতিয়ে নিতুম।

তা সে কথা যাকগে। সেই জমানো টাকাটা হাতে বড্ড বেশি চুলকোচ্ছিল বলে বাসনা হল জর্মনিতে গিয়ে সে-টাকাটা পুড়িয়ে আসি। বন্ধুবান্ধব সে-দেশে মেলা, ওদিকে হিটলার যা নাচন-কুদন আরম্ভ করেছে, কখন না দুম করে লড়াই লেগে যায়, আর তাঁরাও সেই বেপ্যাচে পড়ে প্রাণটা হারান।

বরদা ছোট্ট জায়গা—তাই খাসা জায়গা। তিন দিনের ভিতর পাসপোর্ট হয়ে গেল। বোম্বাই কাছে; ট্রাঙ্ককল করে জাহাজের টিকিট কাটা হয়ে গেল—আর গরম স্যুটসুট তো ছিলই। শিকের হাঁড়ি থেকে নামিয়ে ঝেড়েঝুড়ে তৈরি হয়ে নিলুম।

কোন্‌-ভিনায়দের বললুম, জর্মনি যাচ্ছি।

শুনে দুজনেই চমকে উঠলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। বুঝলুম, দেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—যে-দেশ আবার দেখবার সৌভাগ্য হয়ত তাঁদের জীবনে আর কখনো আসবে না। আর কিছু বুঝি না বুঝি বিদেশে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে বুকটা যে কি রকম তেলে-ফেলা বেগুনের মত ছ্যাৎ করে ওঠে, সেটা বিলক্ষণ বুঝি; এবাবতে আমি বিস্তর পোড়-খাওয়া গরু। চুপ করে রইলুম।

কোন্‌-ভিনায় শুধালেন, 'আপনি কি বার্লিন যাবেন?'

আমি বললুম, 'এবারে জর্মনি যাচ্ছি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। তারা তামাম জর্মনি ছড়িয়ে। বন্‌, কলোন, হানোফার বার্লিন অনেক জায়গায় যেতে হবে।'

কোন্‌-ভিনায় বললেন, 'আমরা বার্লিন ছাড়ি '৩৩—এ। এদেশে আসি '৩৪-এ এখানে আসার পর আমার পরিচিত কেউ বার্লিন যায় নি; আমার বুড়ী মাকে এই তিন বৎসরের ভিতর কেউ গিয়ে বলতে পারেনি যে সে আমাকে দেখেছে, আমি ভালো আছি। আমি ছাড়া আমার মায়ের এ-সংসারে আর কেউ নেই। আপনি যদি—'

আমি বললুম, 'আমি অতি অবশ্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

খানিকটা কিন্তু কিন্তু করে কোন্‌-ভিনায় শেষটায় বললেন, 'তবে দেখুন, একখানা পোস্টকার্ড লিখে তারপর যাবেন। আমার মার বয়স আশীর কাছাকাছি। আপনি যদি হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হন তবে তিনি জোর শক্‌ পাবেন। সেটা সামলাবার জন্য—'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি খবর দিয়েই যাব।'

কোন্‌-ভিনায় বললেন, 'আর দেখুন, আমার যে হার্ট-ট্রাবল সেটা একদম চেপে যাবেন। কি হবে বুড়ীকে জানিয়ে? আমার বাবাও হার্টে মারা যান।'

আমি বললুম, 'বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। এ-জিনিস সবাই করে থাকে। আমি ওঁকে বলব, আপনারা দুজনেই আরামে দিন কাটাচ্ছেন। এই তো?'

9

পবননন্দনপদ্ধতিতে এক লম্ফে বার্লিন পৌঁছইনি। বোম্বাই, জেনওয়া, জিনীভা, লেজাঁ, বন্, কলোন, ডুসেলডার্ফ, হানোফার হয়ে হয়ে শেষটায় বার্লিন পৌঁছলুম। পূর্বেই নিবেদন করেছি, বিষ্ণুচক্র কর্তিত খণ্ড খণ্ড সতীদেহের ন্যায় আমার বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে আছেন দেশ-বিদেশে।

'৩২-এ নাৎসিরা রাস্তায় কম্যুনিস্টদের উপর গুণ্ডামি করতো, '৩৪-এ তারা ছিল দম্ভী—এবারে '৩৮-এ গিয়ে দেখি, তাদের গুণ্ডামিটা চলছে ইহুদীদের উপর। তার বর্ণনা অনেকেই পড়েছেন, আমাকে আর নূতন করে বলতে হবে না।

পোস্টকার্ডে লিখলুম, 'আমি এর্নস্ট্ কোন্-ভিনারের মিত্র; বরোদা থেকে এসেছি, আপনার সঙ্গে বুধবার দিন সকাল দশটায় দেখা করতে আসব।'

যে মহল্লায় কোন্-ভিনারের মা থাকতেন আমি সে পাড়ায় পূর্বে কখনো যাইনি। যে বিরাট চক-মেলানো বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হলুম, সেখানে অন্তত চল্লিশটা ফ্ল্যাট থাকার কথা। অথচ অবাক হলুম, জর্মন বাড়ির দেউড়িতে যে রকম সচরাচর সব পরিবারের নাম আর ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা থাকে এখানে তার কিছুই নেই। ও'দিকে দেউড়ির চেহারা দেখে মনে হল, এককালে, নেমপ্লেটগুলো দেউড়ির পাশের দেয়ালে লাগানো ছিল। যে দু'-একটি লোক আনাগোনা করছে তাঁদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এরা ইহুদী—অনুমান করলুম, সমস্ত বাড়িটাই ইহুদিদের—এবং চোখেমুখে কেমন যেন ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব! আমার দিকে তাকালও সন্দেহের চোখে, আড়নয়নে।

বুড়ীর ফ্ল্যাটের নম্বর আমি জানতুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'বারো নম্বর ফ্ল্যাটে যেতে হলে কোন সিঁড়ি দিয়ে ক'তলায় যেতে হয় বলতে পারেন?' 'না' বলে লোকটা কেটে পড়ল। আরো দু'তিনজনকে জিজ্ঞেস করলুম, সবাই বলে 'না'।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলুম, কারণ আমার অজানা ছিল না যে, ইহুদিরা পাড়াপ্রতিবেশীর খবর রাখে সবচেয়ে বেশি—এবং বিশেষ করে প্রতিবেশী যদি আপন জাতের লোক হয়।

তখন হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে পড়ল, দশ বৎসর পূর্বে কাবুলেও আমার ঐ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেখানেও রাস্তায় কেউ কারো বাড়ি বাৎলে দেয় না। কারণ অনুসন্ধান করাতে এক বিচক্ষণ কাবুলী বলেছিলেন, 'বলতে যাবে কেন? তুমি যদি লোকটার বন্ধু হও, তবে তার বাড়ি কোথায়, সে-কথা তো তোমার জানা থাকার কথা। হয়তো

তুমি স্পাই, কিংবা রাজার কাছ থেকে এসেছ তাকে তলব করতে। সেখানে হয়তো তার ফাঁসি হবে। লোকটার বাড়ি বাৎলে দিয়ে আমি তার অপমৃত্যুর গৌণ কারণ হতে যাব কেন?'

এখানে ইহুদিরাও ঠিক সেই পন্থাই ধরেছে। হয়ত আমি নাৎসী স্পাই—কি মতলবে এসেছি কে জানে?

শেষটায় অনেক ওঠা-নামা করে বার নম্বর ফ্ল্যাট খুঁজে পেলুম—বহু ফ্ল্যাটের নম্বর পর্যন্ত ইহুদিরা সরিয়ে ফেলেছে। ঘণ্টা বাজাতে দরজার একটা কাচের ফুটো (এ ফুটোটা আবার পিতলের চাক্তি দিয়ে ভিতর থেকে ঢেকে রাখা হয়) দিয়ে কে যেন আমায় দেখে নিলে। আমি একটু চেঁচিয়ে আমার পরিচয় দিলুম।

একটি তরুণী—তারও মুখে উত্তেজনা আর ভীতি—দরজা খুলে দিল। আমি ঢুকতেই তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

আমাকে নিয়ে গেল ড্রয়িং-রুমে। সেখানে দেখি এক অথর্ব থুরথুরে বুড়ী কৌচের এক কোণে কৌচেরই চামড়ার সঙ্গে হাত আর মুখের শুকনো চামড়া মিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। আমি বললুম, 'করেন কি, করেন কি, আমি এর্নস্টের বন্ধু, আমার সঙ্গে লৌকিকতা করতে হবে না।'

তবু বুড়ী অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। দুখানা হাড্ডি-সার কালি কালি হাত দিয়ে আমার দু-বাহু ধরে বললেন, 'বারান্দায় চলুন—সেখানে আলোতে আপনাকে ভালো করে দেখব।'

বাইরে বসিয়ে আমাকে তাঁর ঘোলাটে চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

তারপর হঠাৎ ঝরঝর করে দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল—আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলুম, হঠাৎ যে এ রকম দু'চোখ ভেঙে জল নেমে আসবে তার কণামাত্র পূর্বাভাস পাইনি।

চোখ মুছে বললেন, 'মাপ করবেন, আমি কাঁদছিলুম না, আমার চোখ দিয়ে যখন-তখন এ রকম জল নেমে আসে। আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে। আমি এখন কাঁদব কেন? আমি কত খুশি! এর্নস্ট্ কি রকম আছে? তার বউ?'

আমি বললুম, 'বড় আরামে আছেন। জানেন তো, ভারতবর্ষ খারাপ দেশ

নয়। এর্নস্টের কাজও শক্ত নয়। ভালো বাড়িঘর পেয়েছেন। আর জানেন তো এর্নস্টের স্বভাব—দু'বছর হয়েছে মাত্র এরই মধ্যে অনেক বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়েছেন। আপনার বৌমা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাদের লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ান। আমাকে বড্ড স্নেহ করেন।'

দেখি বুড়ী কাঁপছেন আর বার বার রুমাল বের করে চোখ মুচছেন।

আমার হাত দুখানি ধরে বললেন,—'কিছু মনে করবেন না। আমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছি—কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিনে। আমার বুকের ভিতর কি যেন হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

'আপনি কাল আবার আসতে পারবেন? না,—হয়ত আপনার অনেক কাজ?'

আমি বুঝতে পারলুম, বুড়ী নিজেকে সামলাবার জন্য সময় চান। বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি কাল আসব। আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমার তো এখানে কোনো কাজ-কর্ম নেই; ছুটি কাটাতে এসেছি মাত্র।'

বানিয়ে বানিয়ে গল্প জমাচ্ছি না, তাই যদি বিবরণটি নন্দনশাস্ত্রসম্মত স্বরূপ গ্রহণ না করে তবে আশা করি সুশীল পাঠক অপরাধ নেবেন না। কোন্-ডিনারের মা'র বেদনা নিয়ে সুন্দর গল্প রচনা করা যায় জানি, কিন্তু আমার মনের উপর সে এমনই দাগ কেটে গেছে যে সেটাকে গল্পের খাতিরে ফের-ফার করতে আমার বড্ড বাধো বাধো ঠেকে। সুরসিক পাঠক সেটা হয়তো বুঝতে পারবেন না, তবে সহৃদয় পাঠকের সহানুভূতি পাব সে আশা মনে মনে পোষণ করি।

দ্বিতীয়বারে বুড়ী অতটা বিচলিত হলেন না। এবারেও কাঁদলেন তবে জর্মনি বিজ্ঞানের দেশ বলে তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিলেন; বললেন, চোখের কাছের যে স্যাক্ থেকে জল বেরোয়, বুড়ো বয়সে মানুষ নাকি তার উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। হবেও বা, কিন্তু বিদেশে ছেলের কথা ভেবে মা যদি অঝোরে কাঁদে তবে তার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন?

শুধালেন, 'এস্পেরেগাস্ খাবেন—একটুখানি গলানো মাখনের সঙ্গে?'

আমি তো অবাক। এস্পেরেগাস্ মানুষে খায় পশ্চিম বাঙলায় যে রকম আসল খাওয়া হয়ে গেলে টক খাওয়া হয়। বলা নেই কওয়া নেই, সকালবেলা দশটার সময় সুস্থ মানুষ হঠাৎ টক খেতে যাবে কেন?

মজাটা সেইখানেই। আমি এস্পেরেগাস্ খেতে এত ভালোবাসি যে রাত তিনটের সময় কেউ যদি ঘুম ভাঙিয়ে এস্পেরেগাস্ খেতে বলে তবে তক্ষুনি রাজী হই। ভারতবর্ষে এস্পেরেগাস্ আসে টিনে করে—তাতে সত্যিকার সোয়াদ পাওয়া

যায় না—তাজা ইলিশ নোনা ইলিশের চেয়ে বেশি তফাত। সেই এস্পেরেগাসের নামেই আমি যখন অজ্ঞান তখন এখানকার তাজা মাল!

মা-ই বললেন, 'আমি যখন এর্নস্টের কাছ থেকে খবর পেলুম, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তখন বউমাকে লিখলুম আপনি কি খেতে ভালোবাসেন সে খবর জানাতে। বউমা লিখলে, পুরো লাঞ্চ খাওয়াতে হবে না, শুধু এস্পেরেগাস্ হলেই চলবে। সৈয়দ সাহেব মোষের মত এস্পেরেগাস্ খান—বেলা অবেলায়।'

বুড়ী মধুর হাসি হেসে বললেন, 'পুরো লাঞ্চ এখন আমি আর রাঁধতে পারিনে, বউমা জানে। তাই আমার মনে কিন্তু-কিন্তু রয়ে গিয়েছে, হয়ত আমাকে মেহন্নত থেকে বাঁচাবার জন্য লিখেছে আপনি বেলা-অবেলায় এস্পেরেগাস্ খান।'

আমি বললুম, 'আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'দেশের' চতুর পাঠকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে আর কস্তু লভ্য যে আমি পেটুক। উল্টে তাঁরা বুঝে যাবেন, মিথ্যেবাদীও বটে।

এস্পেরেগাসের পরিমাণ দেখে আমার চোখ দুটো পটাং করে সকেট্ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। মহা মুশকিলে সেগুলো কার্পেট থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সকেটে ঢুকিয়ে এস্পেরেগাস্ গ্রাস করতে বসলুম।

জানি, এক মণ বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু প্রীজ, আধ মণ না মানলে আমাকে বড্ড বেদনা দেওয়া হবে। সুকুমার রায়ের 'খাই-খাই'খানেওয়ালাও সে-খানা শেষ করতে পারতো না।

আমি ঐ এক বাবদেই আমার মাকে খুশি করতে পারতুম—গুরুভোজনে। ধর্মসাক্ষী, আর সব বাবদে মা আমাকে মাফ্ করে দিয়েছেন। কোন্-ভিনারের মা পর্যন্ত খুশি হলেন, তাতে আর কিমাশ্চর্যম্!

হায়রে দুর্বল লেখনী—কি করে কোন্-ভিনারের মায়ের এস্পেরেগাস্ রান্নার বর্ণনা বঃরিবৎ বয়ান করি! অমিত্রাক্ষর ছন্দে শেষ কাব্য লিখেছেন মাইকেল, শেষ এস্পেরেগাস্ রেঁধেছেন কোন্-ভিনারের মা।

আহারাদি শেষ হলে পর কোন্-ভিনারের মা বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

আমি বললুম, 'আদেশ করুন।'

তিনি বললেন, 'আপনি যদি না করতে পারেন, তবে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না।'

একটি অপরূপ হিরে লাগানো সোনার আংটি বের করে বললেন, 'নাৎসিরা এখন আর কোনো দামী জিনিস জর্মনির বাইরে যেতে দেয় না—সে নিয়ে তাদের উপর আমার কোনো ক্ষোভ নেই—আমি কি করে জানবো দেশের মঙ্গল কিসে। কিন্তু এ আংটিটা এর্নস্টের প্রাপ্য। তার বাপঠাকুর্দা চোদ্দপুরুষ এই আংটিটা পরে বিয়ে করেছিলেন ; এ আংটিটা তাকে দেবেন।'

আমার আঙুলে ঠিক লেগে গেল। আমি বললুম, 'আপনাকে ভাবতে হবে না।'

একটা সোনার চেনে ঝোলানো জড়োয়া পদক দিয়ে বললেন, 'এটা এর্নস্টের বাপ আমাকে বিয়ের রাতে বাসরঘরে দিয়েছিলেন, (পঞ্চাশ বছর পরে সেই পরবের স্মরণে তিনি একটুখানি লাজুক হাসি হাসলেন) এটা বউমার প্রাপ্য। এটা আপনি তাকে দেবেন।'

আমি কলার খুলে গলায় পরে নিয়ে বললুম, 'নিশ্চিত থাকুন।'

কোন্-ভিনারের মা পইপই করে বললেন, 'কাস্টম্‌সের বিপদে পড়লে জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন কিংবা ওদের দিয়ে দেবেন। আমি কোনো শোক করব না। ছেলে, বউকে আমি চিঠিতে এ বিষয়ে কিছুই জানাচ্ছিনে। তাদেরও কোনো শোক হবে না।'

বরোদা ফিরে আমি কোন্-ভিনারকে আংটি দিলুম, তাঁর বউকে পদক দিলুম।

* * *

ছ'মাস পরে বুড়ী মারা যান। কোন্-ভিনার এক বছর পরে মারা যান। তাঁর স্ত্রী এখন কোথায় জানিনে।

কোদণ্ড মুখহানা

(জীবনী)

দ্বিতীয়বার বিলেত যাওয়ার সময় জাহাজে চড়ে যে অনুভূতিটা হয়, তার সঙ্গে দোজবরের মনের অবস্থা তুলনা করা যেতে পারে। ঔৎসুক্য, আশঙ্কা সব কিছুরই তখন কমতি ঘটে, বাড়তিতে থাকে শুদ্ধমাত্র হুঁশিয়ারিটা, অর্থাৎ প্রথমবারে যে-সব ভুল করেছি, আবার যেন সেগুলো নতুন করে না করতে হয়। প্রথমবারে উৎসাহের চোটে বউকে কুমারজীবনের দু'একটা রোমান্টিক কাহিনী বলে ফেলে যে মারাত্মক ভুল করেছিলুম, এবারে আর সেটি করব না। প্রথমবার বিলেত যাওয়ার সময় প্রকাশ করে ফেলেছিলুম যে পকেট লাইট-ওয়েটে চেম্পিয়ান, এবারে আর সে পাচালি না, এবার ব্লাফ দিয়ে স্টুয়ার্ড কেবিনবয় সকলের কাছ থেকে পুরোমাত্রায় খাতিরযত্ন উশুল করে মামুলিটিপ দিয়েই মোকামে পৌছব।

তারই ব্যবস্থা করতে করতে খানার ঘণ্টা বেজে গেল। প্রথমবার বিলেতে যাবার সময় ঘণ্টা শুনে জেলের কয়েদীর মত হন্তদন্ত হয়ে ছুট মেরেছিলুম খানা-কামরার দিকে, এবারে গেলুম ধীরে-সুস্থে, গজ-মন্থরে। এবারে ভয় নেই, ভরসাও নেই!

ভেবেছিলুম, গিয়ে দেখব, সায়েব-মেমের হৈ-হল্লার এক পাশে নেটিভরা মাথা গুঁজে ছুরি-কাঁটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে এমনি ব্যস্ত যে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাচ্ছেন না, কিন্তু যা দেখলুম, তাতে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

উত্তম বিলিতি কাটের ডবল-ব্রেস্ট কোট, মানানসই শার্টকলার, শিষ্ট-সংযত টাই-পরা এক শ্যামবর্ণের দোহারা গঠন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে গল্প বলে আসর জমিয়ে তুলেছেন আর আটজন ভারতীয় অন্নগেলা বন্ধ করে গোগ্রাসে তার গল্প গিলছে। আমি টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক অতিশয় সপ্রতিভভাবে গল্প বলা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে মৃদু হেসে বললেন, 'এই

যে আসুন, ডাক্তার সাহেব, আপনার জন্তেই অপেক্ষা করেছিলুম। টেবিলের মাথাটা আপনার জন্তেই রেখেছি, আর তো সব ছেলে-ছোকরার দল! এদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।' বলে বেশ গট গট করে বোস্, চাটুজ্যে গুপ্ত, মিশ্র, চৌধুরী ইত্যাদি আটজন ভারতীয়ের নাম অবলীলাক্রমে বলে যেতে লাগলেন।

লোকটি গুণী বটে! দশ মিনিট হল খাবার ঘণ্টা পড়েছে। এরি মধ্যে আটজন লোকের সঙ্গে শুধু-যে আলাপই করে নিয়েছে তাই নয়, সকলের নাম বেশ স্পষ্ট মনেও রেখেছে।

সব শেষে বললেন, 'আমার নাম মুখহানা।'

এ আবার কোন দিশী নাম রে বাবা! পরনে সুট্, মাথায় তুর্কী টুপি! গড়গড় করে ভুল-শুদ্ধে-মেশানো ইংরিজি বলছে। মিশরের লোক? উহুঁ! সিংহলী? কি জানি। মুসলমান তো নিশ্চয়ই—তুর্কী টুপি যখন রয়েছে।

ছু'খানা ফর্ক হাতে তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এঁদের রাসল্ পাশার গল্প শোনাচ্ছি'।* বলে গোড়ার দিকটা যে আমি শুনতে পাইনি, তার জন্তে যেন মাপ চাওয়ার মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'আশ্চর্য লোক রাসল্ পাশা। প্রথম তো মিশর থেকে তাড়ালেন হসীস। তারপর এসে জুটল ককেইন। সে যে কি অদ্ভুত কায়দায় মিশরে ঢুকতো, তার সন্ধান না পেয়ে সি. আই. ডি. যখন হার মানলো, তখন রাসল্ পাশাই কায়দাটা বের করলেন। কি করে যে লক্ষ্য করলেন, ভিয়েনা থেকে টেবিলের পায়ার ভিতরে করে গুপ্তি ককেইন আসছে, সেটা তাঁকে না জিজ্ঞেস করে সি. আই. ডি. পর্যন্ত ঠাহর করতে পারেনি। রাসল্ পাশাই বুঝিয়ে বললেন, 'ভিয়েনার চেয়ে কাইরোর কাঠের আসবাব অনেক বেশি মিহিন, সস্তাও বটে। তার থেকেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই কোনরকম শয়তানীর খেল রয়েছে। একটা টেবিলের পায়া ভাঙতেই ককেইন বেরিয়ে পড়ল।' বুঝুন, লোকটার কড়া চোখের তেজ। কাস্টম অফিসে কি মাল আসছে-যাচ্ছে, তাতে যেন এক্সরে হয়ে ঢুকছে বেরুচ্ছে।'

তারপর গল্প ক্ষান্ত দিয়ে নিপুণ হাতে ছু'খানা কর্ক দিয়ে মাছের কাঁটা বাছতে লাগলেন। ভদ্রলোকের খাওয়ার তরিবৎটা দেখবার মত হেকমৎ—যেন পাকা

---

* ৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সার্জনের অপারেশন। এবং তার চেয়েও তারিফ করবার জিনিস তাঁর গল্পকরা এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে-যাওয়ার মেকদার জ্ঞান। খাওয়ার সময় যারা গল্প বলতে ভালোবাসে, তাদের বেশির ভাগই খাওয়াটা অবহেলা করে শেষের দিকে হুড়হুড় করে সব কিছু গিলে ফেলে। এ ভদ্রলোক দুটোই একসঙ্গে চালালেন ধীরে-সুস্থে, তাড়াহুড়ো না করে। আমি বললুম, 'আপনি দেখছি মিশরের অনেক কথাই জানেন।' তাঁর মুখে তখন মাছ। কথা না বলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। ভাবখানা এই 'একটু দাঁড়ান, গ্রাসটা গিলি, তারপর বলব।'...বললেন, 'জানব না? আমি আঠার বছর কাইরোতে কাটালুম যে।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'মিশর ছাড়লেন কবে?' তিনি বললেন, 'ছাড়বো কেন, এখনও তো সেখানেই আছি।'

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। বললুম, 'বিলেত থেকে ফেরার মুখে কিছুদিন মিশরে কাটানো আমার বাসনা। কাইরোতেই থাকব ভাবছি।'

প্লেটের মাছের দিকে তাকিয়েই বললেন, 'হুঁ!'

আমি তো অবাক। এরকম অবস্থায় দেশের লোক অন্ততপক্ষে বলে, আসবার খবরটা দেবেন, সহৃদয় লোক নানা প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এ ভদ্রলোকের কথাবার্তা চালচলন দেখে তো মনে হয়েছিল, ইনি কাইরোর মত পাণ্ডববর্জিত দেশে স্বদেশবাসীকে লুফে নিন আর নাই নিন গতানুগতিক ভদ্রতার সম্বর্ধনাটা অন্তত করবেন। তাই তাঁর দরদহীন 'হুঁ'-টার ভেজা-কম্বল আমার সর্বাঙ্গে যেন কাঁপন লাগিয়ে দিল। আর পাঁচজনও যে একটু আশ্চর্য হয়েছেন স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। তারপর গালগল্প তেমন করে আর জমলো না।

খাওয়ার পর উপরে এসে ডেকচেয়ারে শুয়ে বিরস বিবর্ণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার মুখে তিনি ঈষৎ অবহেলার ভাব লক্ষ্য করলেন কিনা জানিনে, তবে বেশ সপ্রতিভভাবেই আমার পাশের ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'আপনি আমায় মাপ করুন।' আমি বললুম, 'সে কি কথা, কি হয়েছে?' বললেন, 'আমি ভারতবাসী, তাই ভারতীয়দের প্রতি আমার একটু অভিমান আছে। এই আঠার বৎসর ধরে আমি মিশর ভারতবর্ষ করে আসছি। প্রতিবারই দু'চারজন ভারতীয় উৎসাহের সঙ্গে কাইরো আসবে বলে প্রতিজ্ঞা করে—আজ পর্যন্ত কেউ আসেনি। আপনি আসবেন কিনা জানিনে, তবে স্ট্যাটিসটিক্স যদি পাকাপাকি

বিজ্ঞান হয়, না আসার সম্ভাবনাই বেশি। তাই আমার অভিমান, এখন কেউ কাইরো যাবার প্রস্তাব করলে আমি গা করিনে।'

তারপর তিনি হঠাৎ খাড়া হয়ে বসলেন। বেশ একটু গরম সুরে বললেন, 'আশ্চর্য হই বার বার এই স্বদেশবাসী ছাত্রদের দেখে। বিলেতে ডিগ্রী পাওয়া মাত্রই ছুট দেয় দেশের দিকে, সেই ক্যাশসার্টিফিকেট ভাঙাবার জন্যে। কতবার কত ছেলেকে বুঝিয়ে বলেছি, মিশরীয় সভ্যতা ভাল করে দেখবার জিনিস, ওর থেকে অনেক কিছু শেখবার মত আছে, এমনকি নেমন্তন্ন করেছি আমার বাড়িতে ওঠবার জন্যে, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। কি হবে এদের দিয়ে বুঝতে পারিনে।'

আমি চুপ করে শুনে গেলুম। কি আর বলব? তারপর বললেন, 'আমি নিজে লেখাপড়া করবার সুযোগ-সুবিধে পাইনি। বাবা অল্প বয়সে মারা যান বলে। তাই—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে কি কথা? আপনি তো চমৎকার ইংরিজী বলছেন।'

মুখহানা মুচকি হেসে বললেন, 'ইংরেজ চাষা আমার চেয়ে ভাল ইংরিজী বলে। তাই বলে সেও শিক্ষিত নাকি? আপনিও এই কথাটা বললেন? আপনি না হের ডক্টর!'

এক মাথা লজ্জা পেলুম।

বললেন, 'তবু আপনার নেমন্তন্ন রইল। ইউরোপ থেকে ফেরবার মুখে আসবেন? তবে আলেকজ্যান্ড্রিয়ায় নেমে আমাকে তার করবেন। আমার টেলিগ্রাফী ঠিকানা 'মোহিনী টী', আমার চায়ের ব্যবসা।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'মিশরের লোক কি চা খায়? বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আগে খেত না। এখন তার বাপ খায়। আমি খাইয়ে ছেড়েছি। আপনি কিন্তু ঠিকই জিজ্ঞেস করেছেন—আগে তারা শুধু কফি খেত।'

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে বললুম. 'আপনি খাইয়ে ছেড়েছেন, তার মানে?' খুব একগাল হেসে নিয়ে বললেন, 'তাহলে আপনার সামনে একটু উঁচু ঘোড়া চড়ে নিই। আপনাদের তো লেখাপড়া হাই-জম্প লঙ-জম্প। আমার ব্যবসায়ে। বলব সব?'

আমি বললুম, 'ভারতের লোক মিশরে চা বেচছে, একথা শুনে কার না আনন্দ হয়? আপনি ভাল করে সব কিছু বলুন।'

মুখহানা বললেন, 'তবে শুনুন। আমার বাড়ি কুর্গে। বাবা অল্প বয়সে

মারা যান, আগেই বলেছি। তাই ১৯১৬ সনে ঢুকে পড়লাম কুর্গ পল্টনে, জানেন তো, কুর্গের লোক আর সব ভারতীয়ের চেয়ে আলাদা। রাইফেলটা, লড়াইটার নাম শুনলে ভয় পায় না। আমাদের পল্টনের সঙ্গে সঙ্গে আমি গেলুম আলেকজ্যানড্রিয়া। তারপর তান্তা, দামনহুর, জগাজ্জিগ্ করে করে শেষটায় কাইরো। আড়াই বছর ছিলুম কাইরোতে। তারপর লড়াই থামল। মহাত্মা গাঁধী শুরু করেছেন অসহযোগ আন্দোলন। ইংরেজের উপর আমারও মন গিয়েছে বিগড়ে—বিশেষ করে লড়াইয়ের সময় কালো-ধলায় তফাত করার বাঁদরামি দেখে দেখে। ভাবলুম, কি হবে দেশে ফিরে গিয়ে। তার চেয়ে এখানে যদি জগলুল পাশার দলে ভিড়ে যেতে পারি, তবে ভারতবর্ষের আন্দোলনের সঙ্গে এদের স্বাধীনতা আন্দোলন মেলাবার সুবিধে হলে হয়েও যেতে পারে।

'পড়ে রইলুম কাইরোয়। পল্টন থেকে খালাসী পাওয়ার সময় যা-কিছু টাকাকড়ি পেয়েছিলুম, তাই দিয়ে বাঁধলুম ছোট একটি বাসা—অর্থাৎ ফ্ল্যাট। জগলুলের দলের সঙ্গে যোগাযোগও হল, কিন্তু মুশকিলে পড়লুম অন্নবস্ত্রের সমস্যা নিয়ে। ওঁরা অবিশ্যি আমার এ-সব ভাবনা পার্টির কাঁধে তুলে নিতে খুশি হয়েই রাজী হতেন, কিন্তু হাজার হোক ওঁরা বিদেশী, ওঁদের টাকা আমি নেব কেন? তাই ফাঁদতে হল ব্যবসা। খুললুম চায়ের দোকান। পার্টির মেম্বাররাই হলেন প্রথম খদ্দের। ওঁরা আমার ফ্ল্যাটে চা খেয়ে খেয়ে চায়ের তত্ত্ব সমঝে গিয়েছিলেন।

'তখন লাগল আমাতে কফিতে লড়াই। আর সে লড়াই এমনি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো যে, বাধ্য হয়ে আমাকে পলিটিক্স ছাড়তে হল। নেংটি পরে অসহযোগ করতে পারেন গাঁধী, আমি পারিনে। অবশ্য লড়াইয়ের লুট তখন কিছু কিছু আসতে আরম্ভ করেছে—অর্থাৎ দু'পয়সা কামাতে শুরু করেছি। পার্টি-মেম্বারদের চাটা-আঁসটা ফ্রি খাওয়াই, তাহাতেই তাঁরা খুশি। টাকাকড়িও মাঝে-মাঝে—কিন্তু সেকথা যাক।'

আমি দুটো শরবতের অর্ডার দিলুম। মুখহানা আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'আপনি এখনো কামাতে শুরু করেননি—আমি কারবারী, বিলটা আমিই সই করি।'

আমি কাচুমাচু হয়ে বললুম, 'সামান্য দু'পয়সা—।'

হেসে বললেন, 'ইকসেকৃটলি! বেশি হলে দিতুম না।'

আমি শুধালুম, 'আপনার সঙ্গে কফির লড়াইটা কতদিন চলেছিল ?'

'বহু বৎসর। এখনো চলছে। কিন্তু পয়লা রোঁদে মার খেয়েই বুঝতে পারলুম, মাত্র একখানা চায়ের দোকান সমস্ত দেশের কফির সঙ্গে কখনই লড়তে পারবে না। তাই আরম্ভ করলুম চায়ের পাতা বিক্রি। কিন্তু ব্রুকবণ্ড 'লিপ্টন বিক্রি করে আমার লাভ হয় কম, আর যে ইংরাজকে দেখলে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ধুঁয়ো বেরোয়, তার হয়ে যায় প'বারো। কাজেই আনাতে হল চায়ের পাতা আসাম থেকে, দার্জিলিঙ থেকে, সিংহল থেকে। কিন্তু ব্লেণ্ডিঙের জানিনে কিছুই, চায়ের স্বাদও ভাল করে বুঝতে পারিনে—ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি কফি, কারণ কুর্গের লোক মিশরীদের মতোই কফি খায়। তখন জিহ্বাটাকে স্বাদকাতর করবার জন্য বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল সিগার, খাবার-দাবার থেকে বর্জন করতে হল লঙ্কা আর সর্বপ্রকারের গরমমসলা।'

আমি বললুম, 'এর চেয়ে অল্প কৃচ্ছ্রসাধনে তো মিশরের রাজকন্যে পাওয়া যেত।'

'তা যেত। কিন্তু আমি তখনও কফির ড্রাগনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি। আরেকটা কথা ভুলবেন না। মিশরীয়েরা যদি ভারতের কফি খেত, তাহলে আমি ভারতীয় চা'কে ভারতীয় কফির পেছনে লেলিয়ে দিতুম না। ভায়ে-ভায়ে লড়াই আমি আদপেই পছন্দ করিনে। যাক্ সেকথা। আমি দেশ থেকে হরেক রকম চা আনিয়ে ব্লেণ্ড করে যে ব্র্যাণ্ড ছাড়লুম, তারই নাম দিলুম 'মোহিনী টী'; মোহিনী আমার মায়ের নাম।'

বলে যেন বড় লজ্জা পেলেন। আমি তো বুঝলুম না এতে লজ্জার কী আছে। কফির সঙ্গে একা লড়নেওয়ালা, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ঘড়েল ব্যবসায়ী মায়াদরদহীন কারবারের মাঝখানে যে মায়ের কথা স্মরণ রেখেছে, এ যেন মিশরীয় মরুভূমির মাঝখানে সুধাশ্যামলিম মরূদ্যান। কিন্তু আমাকে কোনও কথা বলতে না দিয়েই তিনি যেন লজ্জা ঢাকবার জন্যেই উঠে দাঁড়ালেন। 'আরেক দিন হবে', এরকম ধারা কি যেন খানিকটে বলে আস্তে আস্তে আপন কেবিনের দিকে রওয়ানা হলেন।

আমার তখন খেয়াল হল মোহিনী নামটার দিকে। মুসলমান মেয়ের নাম মোহিনী হল কি করে ? আর হবেই না কেন ? বাঙলাদেশে যদি 'চাঁদের মা' 'সুরুযের মা' হতে পারে কুর্গের মেয়ের 'মোহিনী' হতে দোষ কি ?

* * *

আস্তে আস্তে মুখহানা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলুম। কিন্তু সবচেয়ে

বেশি দুঃখ হল একদিন যখন শুনলুম, কফিকে খানিকটে হার মানিয়ে তিনি যখন মোহিনীকে চালু করতে সক্ষম হয়েছেন, তখন বাজারে এসে জুটল লিপ্‌টন আর ব্রুকবণ্ড। তারা তাঁর পাকা ধানে মই দিল না বটে, কিন্তু ধানের বেশ খানিকটা বড় ভাগ তুলে নিয়ে খেতে লাগল। মুখহানা বললেন, 'আমি হার মানিনি বটে, কিন্তু এদের সঙ্গে লড়বার মত পুঁজি আমার গাঁটে নেই। ভারতবর্ষের দু'একজন চায়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করে দেখলুম, তাঁরা আমার লড়াইটাকে বুনো মোষ তাড়া করার পর্যায়ে ফেলে দিয়েছেন—নাইলের জলে আপন রেস্ত ডোবাতে চান না।'

অথচ ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইংরেজের সঙ্গে তাঁর কোনও দুশমনি নেই। জাহাজ ভর্তি ইংরেজের প্রায় সব কটাই দেখি তাঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কয়। এ-লাইনের সব কটা জাহাজে তিনি ভাল করে চেনেন বলে কি ভারতীয় কি ইংরেজ সকলেরই ছোটখাট সুখ-সুবিধা অনায়াসে করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক যেন প্যাসেঞ্জার আর জাহাজ কর্তাদের মাঝখানে বেসরকারী লিয়েজোঁ অফিসার।

কিন্তু তাঁর আসল কেরামতি স্বপ্রকাশ হল আদন বন্দরে এসে।

আদন বন্দরে কোনও প্রকারের শুল্ক নেই বলে আদনের আরব ব্যবসায়ীরা দুনিয়ার হরেক রকম জিনিস জাহাজে বেচতে আসে। আর মেমসাহেবরাও এ তত্ত্বটা জানেন বলে হন্যে হয়ে থাকেন দেশের পাঁচজনের জন্য আদন বন্দরে সস্তায় সওগাত কিনবেন বলে।

ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে দরকষাকষি দেখছিলুম—আর সব ভারতীয়েরা আদন দেখতে গেছেন, প্রথম বারে আমিও গিয়েছিলুম। এমন সময় হেলেদুলে মুখহানা এসে উপস্থিত। আর যায় কোথায়? সব মেম একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'আসুন মিস্টার মুখহানা। এই আরবদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান।'

মুখহানা আশ্চর্য হবার ভান করে বললেন, 'সে কি মেদাম, ইংরেজ হল ব্যবসায়ীর জাত। তাকে ঠকাচ্ছে আরব? আর ব্যবসায়ে কাণা আমি ভারতীয় বাঁচাবো সেই ইংরেজকে? ড্রাগনকে বাঁচাবো ডেমসেলের হাত থেকে?

তারপর ছোটালেম আরবী ভাষায় তুবড়ী। সঙ্গে সঙ্গে কখনও ব্যঙ্গের হাসি, কখনও ঠাট্টার অট্টহাস্য, কখনও অপমানিত/অভিমানের জলদ গর্জন,

কখনও সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার ভয়ে দুর্বলের তীক্ষ্ণ আর্তরব, কখনও রুদ্রের দক্ষিণ মুখের প্রসন্ন কল্যাণ অভয়বাণী আর সর্বশেষে দু'চার পয়সা নিয়ে ছেলে ছোকরার মত কাড়াকাড়ি। আমি গোটা পাঁচেক স্ন্যাপশট্ নিলুম।

কিন্তু আরবরা বেহদ্দ খুশ। হুঁ। লোকটা দরদস্তুর করতে জানে বটে। এর কাছে ঠকেও সুখ। তার উপর মুখহানা কপচাচ্ছেন মিশরের আরবী— অতি খানদানী, তার সর্বশরীরে নীল নদের মত নীল রক্ত, আদনের আরবী তার সামনে সুকুমার রায়ের—

"কানের কাছে নানান্ সুরে
নামতা শোনায় একশো উড়ে।

দরদস্তুর, কারবার-বেসাতি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি মুগ্ধ হয়ে বললুম, 'কি চমৎকার আরবী বলতে পারেন আপনি।'

মুখহানা বললেন, 'আবার! মিশরের যে-কোনও গাড়োয়ান আমার চেয়ে ভাল আরবী বলতে পারে এবং গাড়োয়ানের মতই আমি না পারি আরবী লিখতে, না পারি পড়তে।'

আমি বললুম, 'খানিকটে নিশ্চয়ই পড়তে পারেন। মধ্যবিত্ত ঘরের সব মুসলমানই তো ছেলেবেলায় কুরান পড়তে শেখে।' মুখহানা বললেন, 'তুর্কী টুপি দেখে আপনিও আমাকে মুসলমান ঠাউরে নিয়েছেন, কিন্তু আমি তো মুসলমান নই।' তারপর একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'হিন্দুই বা বলি কি প্রকারে? হিন্দু ধর্মের কি-ই বা জানি, কি-ই বা মানি।'

তারপর বললেন, 'এবারে যখন মাকে দেখতে গেলুম কুর্গে, তখন গাঁয়ের মুসলমানরা আমার খানিকটা জমি কিনতে চাইল মসজিদ গড়ার জন্যে। আমি বললুম, 'এক-রত্তি জমির জন্য আর পয়সা নেব না। মুসলমান দেশের নুন-নিমক খাই, না হয় দিলুম তাদের জাতভাইদের মসজিদ বানাবার জায়গা।' ওদিকে মহীশূর দরবারে কে গিয়ে লাগিয়েছে আমি কিনা 'আজ্ঞা প্রভোকাতর', কম্যুনাল রায়ট লাগাবার তালে ইংরেজ আমাকে দেশে পাঠিয়েছে! কী মুশ্ কিল। এল এক ডেপুটি তদন্ত করার জন্যে। আমাকে দেখেই শুধাল, 'আপনি হিন্দু, আপনার মাথায় তুর্কী টুপি কেন?' আমি বললুম, 'আপনি হিন্দু, আপনার পরনে কেরেস্তানি সুট কেন? আপনি যদি বিলেতে না গিয়েও সুট পরতে পারেন তবে মিশরে আঠারো বৎসর থাকার পরও কি আমার তুর্কী টুপি পরার হক্ বর্তালো না?' আশ্চর্য, আপনিই বলুন তো, সিংহের মাথায়

'লর্ড' পরালে যদি মানুষ ইংরেজ না হয় তবে আমার মাথায় তুর্কী টুপি চড়ালেই আমি মুসলমান হয়ে যাব কেন? যে দেশে থাকবে, সেদেশের পাঁচজনকে হিন্দীতে যাকে বলে 'আপনাতে' হবে অর্থাৎ আপন করে নিতে হবে। তার জন্য বেশভূষা, আহার-বিহার, সব বিষয়েই মনকে সংস্কারমুক্ত না রাখলে চলবে কেন? কিন্তু আপনাকে এসব বলার কি প্রয়োজন? আপনিও তো অনেক দেশ দেখেছেন।'

এমন সময় আরব কারবারীরা এসে আমাদের কাছে দাঁড়াল। মুখহানা চেয়ার থেকে উঠে তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। কথা কইলেন এমনভাবে যেন জন্ম-জন্মান্তরের পরম আত্মজন! বুঝলুম, কারবারীরা এসেছিল বিশেষ করে তাঁর কাছ থেকেই বিদায় নেবার জন্যে। যাবার সময় বলে গেল, এ জাহাজে তাদের অর্থলাভ হয়নি বটে কিন্তু বন্ধুলাভ হল।

তারপর যে কদিন তিনি জাহাজে ছিলেন, প্রায় সমস্ত সময়টা কাটালেন গাদাগাদা চিঠিপত্র টাইপ করে। কিন্তু লৌকিকতার স্মিতহাস্য, সী সিক্‌দের তত্ত্বতাবাশ, পাঁচজনের সাতটা ফরমাইশ-সুপারিশ করাতে তৎপর। আর তুর্কী টুপির ট্যাসেল ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে খানা-টেবিল যে বিলক্ষণ তপ্ত-গরম রাখলেন, সে-কথা আমি না বললেও এন্‌কর লাইন জাহাজ কোম্পানী হলপ খেয়ে বলবে।

সুয়েজবন্দরে তিনি নেমে গেলেন—জাহাজ অন্ধকার করে। এর চেয়ে ভাল বর্ণনা আমি চেষ্টা করেও খুঁজে পেলুম না। এমন সব পুরোনো অলঙ্কার আছে যার সামনে হালফ্যাশান হামেশাই হার মানবে।

ইউরোপে দশমাস কেটে গেলো এটা-সেটা দেখতে দেখতে। তার প্রথম চারমাস কাটল কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক পণ্ডিত অজিত বসুর সঙ্গে। তিনি সস্ত্রীক ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ঘুরলেন যক্ষ্মা-হাসপাতাল দেখে দেখে—আমি ছিলুম দোভাষী হয়ে। কবি সাদী বলেছেন, 'কয়লাওয়ালার সঙ্গে দোস্তী করলে গায়ে কিছু না কিছু কয়লার গুঁড়ো লাগবেই, আতরওয়ালার সঙ্গে আশনাই হলে গায়ে কিঞ্চিৎ খুশবাই লাগবেই।' বিয়াল্লিশটা স্যানাটরিয়া ঘুরে আমার গায়ে কয়লা না আতর লাগল সে সমস্যা এখনও সমাধান করতে পারিনি তবে যক্ষ্মার যে বিশেষ কোনও চিকিৎসা নেই সে কথাটা দোভাষীগিরি করে করে বেশ ভাল করেই হৃদয়ঙ্গম হল।* ডাক্তারে ডাক্তারে কথা বলার সময় সাধারণত সত্য গোপন করে না।

---

* ১৯৩৩-৩৪-এর কথা: এখন অবস্থা অন্যরকম।

তারপর একদিন শুভ প্রাতে ভেনিস বন্দরে পৌঁছলুম। শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে লিডোতে সাঁতার কেটে, সিনমার্ক দর্শন করে, চন্দ্রালোকে গণ্ডোলা চড়ে, টুরিস্ট ধর্মের তিন আশ্রম পালন করার পর ভেনিস থেকে সন্ন্যাস নিলুম। তিন দিন পরে আলেকজ্যান্ড্রিয়া বন্দর। সেখান থেকে কাইরোর ট্রেনে চাপবার পূর্বে তার করলুম 'মোহিনী টী'কে।

এ দশমাস ইচ্ছে করেই মুখহানাকে কোনও চিঠিপত্র লিখিনি। স্থির করেছিলুম ভদ্রলোককে তাক লাগিয়ে দেব। আর পাঁচটা ভারতীয়ের তুলনায় বাঙালী যে প্রতিজ্ঞা পালনে জান-কবুল, সে কথাটা হাতে-নাতে দেখিয়ে দেব—"বাঙালীর বাত নড়ে তো বাপ নড়ে"।

কাইরো স্টেশনে নেমে কিন্তু তাক লাগল আমারই। যে-লোকটি নিজেকে মুখহানা বলে পরিচয় দিল তার সঙ্গে জাহাজের মুখহানার যে কোনোখানে মিল আছে সে কথা আপন স্মৃতিশক্তিকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস না করে মানবার উপায় নেই। ওর গায়ে সুটটি পরা ছিল যেন সার্জনের হাতে রবারের দস্তানা—এর গায়ে সুট ঝুলছে যেন ভিখিরির ভিক্ষের ঝুলি। ওঁর মুখে ছিল উজ্জ্বল হাসি, ওঁর ছিল পুরুষ্টু টোল-খেকো বাচ্চা ছেলের তুলতুলে গাল, এর দেখি কপালের টিপি আর দুই ভাঙা গালের উনুনের ঝিঁক। উঁচু কলারের মাঝখানে এই যে কণ্ঠা প্রথম দেখলুম, সেটাকে তিন ডবল সাইজ করে দিলেও মাঝখানের ফাঁক ভরবে না।

আর সেই চোখ দুটি গেল কোথায়? কেউ হাসে দাঁত দিয়ে, কেউ হাসে ঠোঁট দিয়ে, বেশির ভাগ লোক মুখ আর গাল দিয়ে—মুখহানা হাসতেন শুদ্ধ দুটি চোখ দিয়ে। আর তার ঝিলিমিলি এতই অদ্ভুত যে, তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে জোয়ার জলে চাঁদের ঝিকিমিকি।

এঁর বয়স তো এখনও আটচল্লিশ পোরোয়নি। এ বয়সে তো চোখে ছানি পড়ে না।

ট্যাক্সি ডাকলেন। আমার তো আবছা-আবছা মনে পড়ল, নিজের গাড়ির কথা যেন কোনও কথার ফাঁকে আপন অনিচ্ছায় জাহাজে বলেছিলুম। কি জানি, হয়ত গাড়ি কারখানায় গিয়েছে।

কস্তারা-তুল-দিকা স্টেশন থেকে দূর নয়। ফ্ল্যাট পাঁচতলায়। মুখহানা ড্রয়িংরুমের সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে প্রাণপণ হাঁপাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার কী হয়েছে বলুন।' বিরক্তির সঙ্গে বললেন,

'কিছু না, একটু কাশি'। এই মুখহানা সেই মুখহানা। আমি চুপ করে গেলুম।

স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। নাম হেলেনা। সাইপ্রিস দ্বীপের গ্রীক মেয়ে। গ্রীক ছাড়া জানেন অতি অল্প কিচেন-আরবী আর তার চেয়েও কম ইংরিজি। আমি জানি গ্রীক ব্যাকরণের শব্দরূপ ধাতুরূপ—ক্লাস নাইনের ছোকরা যেমন উপক্রমণিকা জানে। অনুমান করলুম, গ্রীক রমণী বিদেশীর মুখে ভুল উচ্চারণে আপনার ভাষায় ধাতুরূপ শোনার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হবে না। তাই আরবী ইংরিজির গুরু-চণ্ডালী দিয়ে যতটা পারি ভদ্রতা রক্ষা করলুম। মুখহানা গ্রীক বললেন অক্লেশে।

দুবার যে ভুল করেছি সে ভুল আর করলুম না। শুধু জিজ্ঞেস করলুম, গ্রীক শিখতে আপনার ক'বৎসর লেগেছিল?' বললেন, 'এই আঠারো বছর ধরে শিখছি। এখানকার কারবারী মহলে গ্রীক 'না জেনে ব্যবসা করা কঠিন।' ব্যস্, শুষ্ক প্রশ্নের উত্তরটুকু। জাহাজে হলে এরই খেই ধরে আরো কত রসালাপ জমত।

খানা কামরা নেই। ড্রইংরুমের টেবিল সাফ করে খানা সাজানো হল। একটি ন'দশ বছরের ছোকরা, ছুরিটা, কাঁটাটা এগিয়ে দিল। মোটা খাটুনিটা গেল হেলেনার উপর দিয়ে। বুঝলুম রেঁধেছেনও তিনিই; চমৎকার পরিপাটি রান্না।

খাওয়ার সময় টেবিলে বসলেন মুখহানার বিধবা শালী তাঁর ছোট মেয়ে নিয়ে। আভাসে ইঙ্গিতে অনুমান করলুম, এঁরা তাঁর পুষ্যি।

ইতিমধ্যে আমার মনে আরেক দুর্ভাবনার উদয় হল। হাত ধুতে যাবার সময় চোখে পড়েছে মাত্র দু'খানা শোবার ঘর। আমি তবে শোবো কোথায়? হোটেলে যাবার প্রস্তাব মুখহানার কাছে পাড়ি-ই বা কি প্রকারে? ভদ্রলোক যে-রকম ঠোঁট সেলাই করে নীরবতার উইয়ের ঢিবির ভিতর শামুকের মত বসে আছেন তাতে আমি সূচ্যগ্রও ঢোকাবার মত ভরসা পেলুম না। তবে কি ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করব, মমিকে যেরকম এদেশে কাঠের কফিনে পুরে রাখে অতিথিকেও তেমনি রাত্রে কাঠের বাক্সে তালাবন্ধ করে রাখার রেওয়াজ আছে কিনা!

আহারাদির পর হেলেনা আমার প্রথম সিগারেটটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রাত্রের মত বিদায় নিলেন। খানিকক্ষণ পরে রান্নাঘরে বাসনবর্তন ধোয়ার শব্দ শুনতে পেলুম।

মুখহানা সোফায় শুয়ে ছিলেন। আমাকে বললেন, 'পাশে এসে বসুন, কথা াছে।' আমি আরেকটি সিগারেট ধরালুম। বললেন, 'আপনি আমার দেশের লোক, আপনাকে সবকথা বলতে লজ্জা নেই। সংক্ষেপেই বলব, আমার বশি কথা বলতে কষ্ট হয়।'

'জাহাজে আপনার সঙ্গে অনেক কথাই খোলাখুলি বলেছিলুম। তার থেকে হয়ত আপনি আন্দাজ করেছিলেন, আমার দু'পয়সা আছে, বাড়ি গাড়িটাও আছে, আর এখন দেখছেন আপনাকে শুতে দেবার মত আমাদের একখানা ফালতো কামরা পর্যন্ত নেই। হয়ত আপনি ভাববেন, আমি ধাপ্পা দিয়েছিলুম আপনি কখনো মিশরে আসবেন না এই ভরসায়।'

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু মুখহানা তাঁর হাড্ডিসার হাতখানা তুলে আমাকে ঠেকালেন। বললেন, 'না ভেবে থাকলে ভালই। আপনাদের শরৎ-বাবুর এক উপন্যাসে—আমি মাতৃভাষা কানাড়ায় পড়েছি, যে অবিশ্বাস করে লাভবান হওয়ার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকা ভাল। যাক সে কথা।' বলে বেশ একটু দম নিয়ে কি বলবেন সেটা যেন মনের ভিতর গুছিয়ে নিলেন।

'সংক্ষেপেই বলি। যে গ্রীক রাস্কেলটার হাতে আমি আমার ব্যবসা সঁপে দিয়ে দেশে গিয়েছিলুম, ফিরে দেখি সে সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে। বাড়িভাড়া দেয়নি, ওভার ড্রাফ্ট নিয়েছে, শেষটায় স্টকের চা পর্যন্ত জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে। এখানে ওখানে কত ছোট-খাটো ধার যে নিয়েছে, তার পুরো হিসাব এখনও আমি পাইনি। আমার নাম জাল করেছে যখনই দরকার হয়েছে। আপনি ভাবছেন আমি এরকম লোকের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে গেলুম কেন? কি করে জানব বলুন? দশ বৎসর ধরে সে আমার সঙ্গে কাজ করছে, বিয়ারটা সিগারেটটা পর্যন্ত স্পর্শ করত না। আর সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে—' একটুখানি হেসে বললেন, 'ফাস্ট উইমেন আর স্লো হর্সের পিছনে।'

নিজ দুর্দৈবের কাহিনী বলার ভিতরেও রসিকতা করতে পারেন যাঁর মনের কোণে—হয়ত নিজের অজানাতেই ধনজনের প্রতি জন্মলব্ধ বৈরাগ্য সঞ্চিত হয়ে আছে। 'বহু দেশ ঘুরেছি' এ কথাটা বলতে আমার সব সময়েই বাধো বাধো ঠেকে, কিন্তু এখানে বাধ্য হয়ে সে কথাটা স্বীকার করতে হল, মুখহানার এই দুর্লভ গুণটির পরিপ্রেক্ষিত দেখাবার জন্য।

জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার স্ত্রীও জানতে পারেননি?' বললেন, 'তিনি তখন

সাইপ্রিসে, বাপের বাড়িতে। কিন্তু আজকের মত থাক এ-সব কথা। আমার সংসারের অবস্থা দেখে আপনি বাকীটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন।

'শুয়ে শুয়ে তাই নিয়ে কিন্তু অত্যধিক দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আবার সব কিছু গড়ে তুলবো। এই আপনার চোখের সামনেই। এখন শুয়ে পড়ুন, আমি ওমরকে ডেকে দিচ্ছি। সে আপনার বিছানা ঐ কোণে দিভানটার উপর করে দেবে। কষ্ট হবে—।' আমি বাধা দিলুম। মুথহানাও চুপ করে গেলেন।

সেই ছোকরা চাকরটি এসে বেশ পাকা হাতে বিছানা করে দিল। বুঝলুম, থহানার অতিথিদের জন্য প্রায়ই তাকে এরকম বিছানা করে দিতে হয়।

ঘর থেকে বেরুবার সময় মুথহানা শেষ কথা বললেন, 'আমি কিন্তু সব কিছু াবার গড়ে তুলব। আমি অত সহজে হার মানিনে।' একমাত্র জর্মন বৈজ্ঞানিক-ের গলায় আমি এরকম আত্মবিশ্বাসের অকুণ্ঠ ভাষা শুনেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুথহানার গলা থেকে বেরুল একটু খুসখুসে আওয়াজ।

অতি অল্প, কিন্তু আমার ভাল লাগল না।

শুনেছি রাজশয্যায় নাকি যুবরাজেরও প্রথম রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। সত্যি মিথ্যে জানিনে, কিন্তু কাইরোতে যে হবে না সে বিষয়ে আমার মনে দ্বিধা নেই। আধো ঘুম আধো জাগরণে সেই পাঁচতলার উপর থেকে শুনেছিলুম সমস্ত রাত ধরে ফারাও-প্রজাদের ফুর্তির পিছনে ছুটোছুটি হুটোপুটির শব্দ।

কলকাতা ঘুমোয় এগারোটায়, বোম্বাই বারোটায় আর কাইরো দেখলুম অন্ধকারে ঘুমোতে ভয় পায়। সকালবেলা আটটার সময় বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখি, কাইরো শহর রাত বারোটার ভাতঘুমে অচেতন। স্থির করলুম, একদিন ভোরের নমাজের সময় মসজিদে গিয়ে দেখতে হবে ইমাম (নমাজ পড়নেওয়ালা) আর মুয়াজ্জিন (আজান দেনেওয়ালা) ছাড়া কজন লোক মসজিদে সে সময় হাজিরা দেয়। অনুমান করলুম ব্যাপারটা—দত্তের প্রবন্ধ লেখার মত। তিনি লেখার ইমাম আর কম্পজিটর পড়ার মুয়াজ্জিন। কিন্তু যাক এসব কথা—আমি কাইরোর জীবনী লিখতে বসিনি।

সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে মুথহানা পরের চিন্তায় মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন সকালবেলা থেকে। দেখি, দুনিয়ার যত বিপদগ্রস্ত লোক আস্তে আস্তে তাঁর ড্রইংরুমে জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। বেশির ভাগ ভারতীয়, প্রায় সকলেরই পাসপোর্ট নিয়ে শিরঃপীড়া। এদের সকলেই দর্জি—এ দেশে

আর্মি কন্ট্রাক্টারদের সঙ্গে এসেছিল চাকরি নিয়ে। কন্ট্রাক্টাররা চলে যাওয়ার পরে এখানেই ঘর বেঁধেছে—কাইরোর অতি সাধারণ মেয়েও পাঞ্জাবী দর্জির হৃদয়খানা খান্‌খান্‌ করে ফেলতে আরে। কারো কারো হৃদয় ইতিমধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছে অর্থাৎ নেশা কেটে গিয়েছে। এখন কেটে পড়তে চায়, কিন্তু পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছে—মুখহানা যদি ব্রিটিশ কন্‌সুলেটে গিয়ে একটুখানি সুপারিশ করেন। কারো বা মিশরে বসবাস করবার মেয়াদ পেরিয়ে গেছে—মুখহানা যদি মিশরের বিদেশী দপ্তরে গিয়ে একটুখানি ধস্তাধস্তি করে আসেন। কেউ বা তার পাসপোর্টখানা কালোবাজারে ইহুদিকে বিক্রি করে দিয়েছিল (ইহুদী কেমিকাল দিয়ে তার ফটো মুছে ফেলে প্যালেস্টাইনী আততায়ীর জন্য তাই দিয়ে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে ধর্ম আর অর্থ দুইই সঞ্চয় করবে), এখন মুখহানা যদি কোনও মালজাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলে কয়ে কিংবা 'টু পাইস' দিয়ে তাকে চোরাই মালের মত দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেন।

দু-একজন পয়সাওয়ালা পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টারও এলেন। মুখহানা যদি রেজিমেণ্টের কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে একখানা নতুন বুইক ভেট দিয়ে আসেন। না অন্য কোনও রকম লুব্রিকেশনের খবর তিনি বলতে পারেন ?

দুপুরবেলা খাবার সময় মুখহানাকে দু'একখানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পারলুম, জাহাজে যে-রকম তিনি প্যাসেঞ্জার ও কর্তাদের মাঝখানের বেসরকারী লিয়েজোঁ অফিসার ছিলেন এখানেও তিনি তেমনি দুঃস্থ ভারতীয় ও মিশরী, ইংরেজ সর্বপ্রকার কর্তাব্যক্তির মধ্যিখানের অনাহারী লিয়েজোঁ অফিসার।

শরীর সুস্থ থাকলে বনের মোষ তাড়ানোটা বিচক্ষণ জনের কাছে নিন্দনীয় হলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা ভাল, কিন্তু এই দুর্বল শরীর নিয়ে ভদ্রলোক কেন যে হয়রান হচ্ছেন সে-কথার একটু ইঙ্গিত দিতেই মুখহানা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আ আমি কি করব ? আমি যে এখানকার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'মেম্বার কারা ?'

'ঐ দর্জির পাল আর দু-চারটে ভ্যাগাবণ্ড।'

'আর কেউ সেক্রেটারি হতে পারে না ?'

'সব টিপসইয়ের দল। কন্‌সুলেটে গিয়ে ইংরিজিতে কথা বলবে কে ?'

'তাহলে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন না কেন?'

'প্রেসিডেন্টের পক্ষে কন্‌সুলেটে ছুটোছুটি করা কি ভাল দেখায়? এসোসিয়েশনের তো একটা প্রেস্টীজ দেখানো চাই।'

'প্রেসিডেন্ট কে?'

'এক বুড়ো দর্জি। ইংরিজিতে নাম সই করতে পারে।'

আমি আর বাক্যব্যয় করলুম না। এরকম লোককে কোনো প্রকারের সদুপদেশ দেয়া অরণ্যে রোদন—এবং সেই অরণ্যেই যেখানে সে মোষ তাড়াচ্ছে, শুনেও শুনবে না।

মুখহানা আপিসে চলে গেলেন। আমি হেলেনাকে জিজ্ঞেস করলুম, মুখহানার এই কাশিটা কবে হল এবং কি করে?'

হেলেনা বললেন, 'থেটে থেটে। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসে যখন দেখলেন কারবার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন গাড়ি বেচে দিয়ে বড় বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে উঠলেন। তারপর নূতন করে ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্য এই দশ মাস ধরে দিন নেই রাত নেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করছেন। বাড়ি ফেরেন রাত ছুটো, তিনটে, চারটে। কথা শোনেন না, ফিরে এসে ঠাণ্ডাজলে স্নান করেন, কখনও কখনও আবার খেতেও রাজী হন না, বলেন খিদে নেই। আগে তিনি সব সময় আমার কথামত চলতেন, এই নূতন করে কারবার গড়ে তোলার নেশা যবে থেকে তাঁকে পেয়েছে তখন থেকে তিনি আর আমার কোনও কথা শোনেন না। এর চেয়ে তিনি যদি অন্য কোনো স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়েও আমাকে অবহেলা করতেন, আমি এতটা দুঃখ পেতুম না। তবু তো তিনি সুস্থ থাকতেন।'

আমি কথাটার মোড় ফেরাবার জন্য বললুম, 'জ্বর-টর হয়েছিল?' বললেন, 'প্রায় মাস তিনেক আগে তিনি ভেঙে পড়েন। দিন পনেরো শুয়ে ছিলেন, আর সেই পনেরো দিনেই যেন শরীর থেকে সব মাংস-চর্বি খসে পড়ে গেল। আর জানেন, তিনি কখনও ডাক্তার ডাকাননি।'

আমি বললুম, 'এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না।'

হেলেন উঠে চলে গেলেন। আমি থামলুম না। একা একা যতক্ষণ খুশি কাঁদা যায়।

চায়ের সময় আমি মুখহানাকে বেশ পরিষ্কার, জোর গলায় বললুম, তিনি যদি ভাল ডাক্তার না ডাকান, তবে আমি কাল সকালেই বিছানা-পত্র নিয়ে

তাঁর বাড়ি ত্যাগ করব। তিনি যদি অভিমান করতে পারেন, ভারতীয়েরা প্রতিজ্ঞা করেও কাইরো আসে না বলে, তবে আমি অভিমান করতে পারি যে-ভারতীয় স্বদেশবাসীর সামান্যতম অনুরোধ পালন করে না, তার মুখদর্শন না করলেও আমার চলবে।

ডাক্তার এল। যক্ষ্মা। বেশ এগিয়ে গেছে। এক্সরে না করেই ধরা পড়ল।

তারপর যে এগোরো মাস আমি কাইরোতে কাটালুম তার স্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। ওমর খৈয়াম বলেছেন—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে, তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই
বিচার কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই॥

—সত্যেন দত্ত।

আর আইনস্টাইনও নাকি বলেছেন, পৃথিবীর সব কিছু চলে এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে। ওমর খৈয়াম ছিলেন আসলে জ্যোতির্বিদ—কাজের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি রুবাইয়াৎ লিখেছেন মাত্র—এবং আইনস্টাইনের চোখও উপরের দিকে তাকিয়ে। এই দুই পণ্ডিত গ্রহনক্ষত্রের নিয়ম-মানা দেখে যা বলেছেন, আমি মুখহানার জীবনে তাই দেখতে পেলুম।

কত অনুনয় বিনয়, কত সাধ্যসাধনা, কত চোখের জল ফেললেন—হেলেনা—আমার কথা বাদ দিচ্ছি—না, না, না, তিনি তাঁর কারবার ফের গড়ে তুলবেনই। ডাক্তার পইপই করে বলে গিয়েছেন, কড়া নজর রাখতে হবে তিনি যেন নড়াচড়া না করেন—কিন্তু থাক্ ডাক্তারের বিধানের কথা তুলে আর কি হবে, মধ্যবিত্ত কোন বাঙালী পাঠক সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে যক্ষ্মার সঙ্গে পরিচিত নয়—সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি বেরুতেন রোজ সকালে চায়ের কারবারে। তাও না হয় বুঝতুম তিনি যদি শুধু অফিসে ডেক চেয়ারে শুয়ে থাকতেন। কতদিন মর্নিং-কলেজ থেকে ফেরবার মুখে দেখেছি মুখহানা চলেছেন ক্লান্ত শ্লথ গতিতে, দ্বিপ্রহর রৌদ্র উপেক্ষা করে, বড়-বড় খদ্দেরের আপিসে আরও কিছু চা গছাবার জন্য। বাড়ি ফিরতেন রাত আটটা, ন'টা, দশটায়।

খৈয়াম আইনস্টাইন ঠিকই বলেছেন সবকিছু চলেছে এক অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য নিয়মের বেত্রাঘাতে। মুখহানা-পতঙ্গ ধেয়ে চলেছে কারাবারের আগুনে আপন পাখা পোড়াবে বলে।

খুক্‌খুক্‌ তখন অদম্য হয়ে উঠেছে। শালী টের পেয়ে মেয়েকে নিয়ে পালালেন। সুভাষিতে আছে, 'পরান্নং দুর্লভং লোকে' কিন্তু সে পরান্ন যদি যক্ষ্মার বীজাণুতে ঠাসা থাকে, তবে তা সর্বদা বর্জনীয়।

হেলেনা কিন্তু হাসিমুখে বোনকে গাড়ীতে তুলে দিলেন।

আশ্চর্য এই মেয়ে হেলেনা! মুখহানাকে যা সেবা করলেন, তার কাছে মনে হয়, বাঙালী মেয়ের সেবাও হার মানে। অন্য কোনও দেশে আমি এ জিনিস দেখিনি, হয়ত এ রকম দুর্যোগ চোখের সামনে ঘটেনি বলে।

ঘুম থেকে উঠে কতবার যে তিনি মুখহানার শরীর মুছে দিতেন, সে শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা যক্ষ্মা রোগীর সেবা করেছেন। ডাক্তার নিশ্চয়ই বারণ করেছিলেন, তবু হেলেনা মুখহানার সঙ্গে এক খাটেই শুতেন। আমি তাই নিয়ে যখন হেলেনাকে একদিন অত্যন্ত কাতর অনুনয়বিনয় করলুম, তখন তিনি বললেন, 'আমি কাছে শুয়ে তাঁর বুকের উপর হাত রাখলে তিনি কাশেন কম, ঘুম হয় ভাল।' আমি বললুম, 'এ আপনার কল্পনা।' হেসে বললেন, 'ঐ কল্পনাটুকুই তো তিনি বিয়ে করেছেন। আমি তো আর আসল হেলেনা নই।' আমি চুপ করে গেলুম।

কত-না হাঁটাহাঁটি খোঁজাখুঁজি করে তিনি নিয়ে আসতেন বাজার থেকে সবচেয়ে সেরা জাফার কমলালেবু, কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তৈরি করতেন টমাটোর রস, রান্না করতেন স্বামীর কাছ থেকে শেখা ভারতীয় কায়দায় মাংসের ঝোল, কোপ্তা-পোলাও, মাদ্রাজী রসম্‌, স্নান করিয়ে দিতেন স্বামীকে আপন হাতে, মুখহানা বেশি কাশলে জেগে কাটাতেন সমস্ত রাত! তিনি নিজে রোগা, কিন্তু ধন্বন্তরী যেন তখন তাঁকে বর দিয়েছেন যমের সঙ্গে লড়বার জন্য।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় বছরে দেড় না আড়াই ইঞ্চি আমার মনে নেই। দিনের পর দিন মেঘমুক্ত নীলাকাশ দেখে দেখে বাঙালীর মন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। যখনই উপরের দিকে তাকাই, দেখি নীল আকাশ প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। প্রথমবার যখন ইয়োরোপের পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তখন মাঝে মাঝে নীলচোখা মেমসাহেবরা আমার দিকে

তাকিয়ে থাকত—এই অদ্ভুত জংলী লোকটার বিদঘুটে চেহারা দেখে, আর অস্বস্তিতে আমার সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠত। কাইরোর সেই নীলাকাশ সেই নির্লজ্জাদের নীল চোখের মত হরবকত আমার দিকে তাকিয়ে আছে, একবার পলক পর্যন্ত ফেলে না; মেঘ জমে না, দরদরে অশ্রুবর্ষণ বিদেশী বিরহীর জন্য একবারের তরেও ঝরল না।

পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে কত রকমের হাওয়া কাইরোর উপর দিয়ে বয়ে গেল, কত না মুখের বোরকা সরিয়ে ক্ষণেকের তরে নিশিকৃষ্ণ চোখের বিদ্যুৎ ঝলক দেখিয়ে দিলে, কিন্তু তাদের কেউই এক রত্তি মেঘ সঙ্গে নিয়ে এলো না। সাহারা থেকে, লাল দরিয়া পেরিয়ে, হাবশী মুল্লুকের পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে, মধ্যসাগরের মধ্যিখান থেকে চার রকমের হাওয়া বইল, যেন হলদে, লাল, কালো, নীল রঙ মেখে কিন্তু মেঘ আর জমে ওঠে না।

ভুল বুঝলুম, মেঘ জমে উঠতে লাগল হেলেনার মুখের উপর। পূর্ব-সাগরের পার হতে একদা যে নীল মেঘ সাইপ্রিস রমণীর চিত্তাকাশ প্রেমের বেদনায় ভরে দিয়েছিল, আজ সে মেঘ তার সমস্ত মুখও ছেয়ে ফেলল। দু'চোখের চতুর্দিকে যে কাল ছায়া জমে উঠল, সে যেন চক্রবাল-বিস্তৃত বর্ষণ-বিমুখ খরা মেঘ; আমি মেঘের দেশের লোক, আমার বাড়ি চেরাপুঞ্জির গা ঘেঁষে, ছেলেবেলা থেকে মেঘের সঙ্গে মিতালি—কিন্তু হে পর্জন্য! এ রকম মেঘ যেন আমাকে আর না দেখতে হয়।

কানাড়া ভাষায় উত্তম বিরহের কবিতা আছে, এ কথা কখনো শুনিনি। কুর্গের লোক খুব সম্ভব মেঘের দিকে নজর দেয় না। মুখহানা হেলেনার মুখের উপর জমে-ওঠা মেঘ দেখতে পেলেন না।

দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস অর্জুন, লক্ষ্যবস্তু ভিন্ন অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? তোমার ভ্রাতৃগণ, তোমার আচার্য, তোমার পিতামহ?'

অর্জুন বললেন, না গুরুদেব, আমি শুধু লক্ষ্যবস্তু দেখতে পাচ্ছি।'

মুখহানার নজর কারবারের দিকে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার মনে ধোঁকা লাগল, মুখহানা লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন কি না। বিশেষ করে যেদিন শুনলাম, তাঁর রেস্ত নেই বলে তিনি ব্যাঙ্কের মুচ্ছুদ্দিগিরিতে মাল ছাড়াচ্ছেন। সে মাল মজুদ থাকে ব্যাঙ্কেই—মুখহানা কিছুটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করে দাম শোধ করলে আরো খানিকটা পান। ওদিকে ব্রুকবণ্ড, লিপ্টন অঢেল মাল ঢেলে দিয়ে যায় দোকানে দোকানে

বিনি পয়সায় বিনি আগামে। ব্যাঙ্কের গুদোমে রাখা মাল লড়বে দোকানে দোকানে মালের সঙ্গে!

ব্যাঙ্কের টাকার সুদ তো দিতেই হয় বুকের রক্ত ঢেলে, তার উপর গুদোম-ভাড়া। মিশরী ব্যাঙ্কের নির্দয়তার সামনে সাহারা হার মানে।

কাজেই মুখহানার মাথার ঘাম যদি ব্যবসা গড়ে-তোলাকে এগিয়ে দেয় এক কদম, যক্ষ্মাকে এগিয়ে দেয় এক ক্রোশ।

এ-তত্ত্বটা মুখহানা বুঝতে পারেননি। তিনি ব্যবসা নিয়ে মশ্‌গুল। আমি তো ব্যবসা জানিনে। কিন্তু সিগারেট যে খায় না, গন্ধ পায় সেই বেশি।

মুখহানার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল ঐ পাঁচতলা বাড়ির বিরাশিখানা সিঁড়ি। সুস্থ মানুষ আমরা ফ্ল্যাট চড়তে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাই, ড্রইংরুম পৌঁছে প্রথম দশ মিনিট সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে ম্যালেরিয়া রোগীর মত ধোঁকি অথচ মুখহানাকে ভাঙতে হচ্ছে প্রতিদিন অন্তত দুবার করে এই গৌরীশঙ্কর। একতলা বাড়ির জন্য মুখহানা যে চেষ্টা করেননি তা নয়, কিন্তু কাইরোতে নতুন বাড়ির সন্ধান নতুন কারবার গড়ে তোলবার চেয়েও শক্ত। সেলামীর টাকা যা চায়, তা দিয়ে কলকাতায় নতুন বাড়ি তোলা যায়।

ছোকরা চাকর ওমরকে না কি মুখহানা কোনও এক ড্রেন থেকে তুলে এনে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তার বয়স যখন চার। মুখহানার তখন পয়সা ছিল, ওমরের তখন সেবা করেছে এক ফ্যাশনেবল আয়া আর স্বয়ং হেলেনা। আজ দশ বৎসরের ওমর নিজের থেকে ছোকরা চাকরের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির ছেলের মত অনায়াসে সব কাজ করে, আমার ভুল আরবী শুনে মিটি-মিটিয়ে হাসে আর হেলেনার গ্রীক পড়ানো থেকে পালাবার জন্য অন্ধিসন্ধির সন্ধানে থাকে।

এইটুকু ছেলে, কিন্তু মুখহানার প্রতি তার ভক্তি ভালোবাসার অন্ত ছিল না। রান্নাঘরে কাজ করছে কিন্তু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ দীর্ণ করে তার কান যেন গিয়ে সেঁটে আছে ফুটপাথের সঙ্গে। আমরা কেউ কিছু শুনতে পাইনি—হঠাৎ কাজ-কর্ম ফেলে ছুটলো বেতের হালকা চেয়ার নিয়ে নিচের তলার দিকে। কি করে যে সামান্যতম খুক্‌খুক্ শুনতে পেত, তা সেই জানে। প্রতি তলায় সে চেয়ার পাতবে, মুখহানা বসে জিরোবেন। এই করে করে সে মুখহানাকে পাচ তলায় নিয়ে আসত। কেউ বাৎলে দেয়নি, আবিষ্কারটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। মুখহানাকে কখনো দেখিনি ওমরের সঙ্গে আদর করে কথা কইতে। অল্প কথা

বলতেন, না অন্য কোনও কারণে জানিনে, কিন্তু এটা জানি তাঁর চলাফেরাতে আচারব্যবহারের কি যেন এক গোপন জাদু লুকোনো ছিল, যার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে থাকা যেত না—বাচ্চা ওমরও বাদ পড়েনি।

পয়লা ট্রায়েলেই খুশ হয়ে ওমর ঈদের জোব্বা আঁকড়ে ধরেছিল। মুখহানা কিন্তু তিন-তিন বার এদিকে কাটালেন, ওদিকে ছাঁটালেন। ঈদের দিন ওমর যখন নূতন জোব্বা পরে আমাদের সবাইকে সেলাম করল, তখন মুখহানা বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওমর তো আমাদের ডাগর হয়ে উঠেছে, কনের সন্ধানে লেগে যাও।'

মিশরেও আমাদের দেশের মত অল্প বয়সে বিয়ে হয়। ওমর তিন লম্ফে ঘর ছেড়ে পালালো। মিশরের বাচ্চারাও বিয়ের কথা শুনলে লজ্জা পায়।

এ-রকম মানুষকে পরোপকার করার প্রবৃত্তি থেকে ঠেকানো আজরাঈলেরও (যমেরও) অসাধ্য। আমি গিয়েছিলুম ব্রিটিশ কন্‌সুলেটে পাসপোর্ট রেজিস্ট্রি করাতে। গিয়ে দেখি, মুখহানা কন্‌সুলেটের এক কেরানীকে আদি, রৌদ্র, বীর, হাস্য সর্বপ্রকারের রস দিয়ে ভিজিয়ে ফেলে কোন্ এক ভবঘুরের জন্য একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করতে লেগে গেছেন। সাহেব যতই বুঝিয়ে বলে, 'ভারতীয় জন্মপত্রিকা না দেখানো পর্যন্ত আমরা কি করে জানব লোকটা ভারতীয়, আর ভারতীয় সপ্রমাণ না হলে আমরা পাসপোর্ট দেব কি করে?' মুখহানা ততই ইমান-ইনসাফ্, দয়াধর্মের শোলোক কপচান, কখনো সাহেবের হাত দুখানা চেপে ধরেন, কখনো রেডক্রসে পয়সা দেবেন বলে লোভ দেখান, কখনও 'দি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন লিমিটেড, কাইরো'র প্রতিভূ হিসাবে সদম্ভে সগর্বে দু'হাতে বুক চাপড়ান!

রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মোছেননি—নবরসের ঐটুকুই বাদ পড়েছিল। সাহেব না হয়ে কেরানী মেম হলে সেটাও বোধ হয় বাদ পড়ত না।

সাহেব যখন শেষটায় রাজী হল, তখন দেখা গেল, লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরেটার কাছে পাসপোর্টের দাম পাঁচটি টাকা পর্যন্ত নেই। এক লহমার তরে মুখহানা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সামলে নিয়ে অতি সপ্রতিভভাবে জেব থেকে টাকাটা বের করে দিলেন।

এ টাকা তিনি কখনও ফেরত পাননি। আমি যখন বললুম, 'টাকাটা এসোসিয়েশনের খর্চায় ফেলুন,' তখন তিনি হঠাৎ তেড়ে উঠে খেঁকখেঁকিয়ে বললেন, 'লোকটা হজে যেতে চায়। সুদিন থাকলে আমি কি শুধু পাসপোর্ট—'

আমি তাড়াতাড়ি মাপ চাইলুম। মুখহানা চুপ করে গেলেন। উঠে যাবার সময় আমার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললেন, 'আমার মেজাজটা একটু তিরিক্ষি হয়ে গেছে। আপনি আমায় মাফ করবেন।' আমি তাঁর হাত দুখানি ধরে বললুম, 'আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত।'

আমি কাইরো আসার পর'ও মুখহানা আট মাস কারবার গড়ে তোলবার জন্য লড়াই করেছিলেন। তার পর একদিন হার মানলেন। কারবারের কাছে নয়, যক্ষ্মার কাছে।

গ্রীসের রাজকুমারীর সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজকুমারের বিয়ে। কাইরোবাসী হাজার হাজার গ্রীক আনন্দে আত্মহারা। সবাই যেন জাতে উঠে যাচ্ছে, চাঁড়াল যেন দৈবযোগে পৈতে পেয়ে যাচ্ছে। এবার থেকে গ্রীকদের সমঝে চলতে হবে। রাজপুত্তুরের শালার জাত, বাবা, চালাকি নয়! আমাদের পাড়ার গ্রীক মুদিটা পর্যন্ত পিরামিডের মত মাথা খাড়া করে মোরগটার মত দোকানের সামনের ফুটপাথে গটর-গটর করে করে টহল দেয়, আমাকে আর সেলাম করে না। কি আর করি, রাজপুত্তুরের শালা, বাবা, চাট্টিখানি কথা নয়, আমিই সেলাম করে জিজ্ঞেস করি, 'বর-কনে কিরকম আছেন?' মিশর রাণী গ্রীক-রমণী ক্লিওপাত্রার দম্ভ মুখে মেখে আমার দিকে সে পরম তাচ্ছিল্য-ভরে তাকিয়ে বলে, 'কনগ্রেচুলেট করে তার করেছি, জবাব এলেই খবর পাবে।

আমি তো ভয়ে মর-মর। সিন্ধী ভাষায় প্রবাদ আছে সিংহটাও নাকি শালাকে ডরায়।

সেই বিয়ের পরবের ফিল্ম এলো কাইরোয়। গ্রীক-মেয়ের গর্ভের বাচ্চা পর্যন্ত ছুটলো সে ছবি দেখতে। আমাদের ওমর আধা-ভারতীয়, আধা-গ্রীক (যদিও রক্তে খাশ মিশরী)। সে ধরে বসলো ছবি দেখতে যেতেই হবে। আমিও সায় দিলুম। ভাবলুম মুখহানার মনটা যদি চাঙ্গা হয়। হেলেনা বায়োস্কোপ যেতে ভালবাসতেন। কিন্তু স্বামীর অসুখ হওয়ার পর থেকে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

গিয়ে দেখি, 'কিউ' লম্বা হতে হতে প্যাঁচ খেয়ে 'ইউ' হয়ে তখন 'ডবল ইউ' হওয়ার উপক্রম। আমরা সবাই একটা কাফেতে গিয়ে বসলুম। ওমর কালা-বাজার থেকে টিকিট আনল।

ভিতরে গোলমাল, চেঁচামেচি, চিৎকার। বাঙালী যজ্ঞিবাড়িকে চিৎকারে

গ্রীকরা হার মানায়। মুখহানা যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আমরা লক্ষ করিনি। সিনেমা থেকে ফিরেই গলা দিয়ে অনেকখানি রক্ত উঠল। আমরা বিচলিত হয়ে পড়েছি দেখে হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রীকগুলো হন্যে হয়ে উঠেছে। ওদের দেখলে ভাবখানা কি মনে হয় জানেন ?'

আমি বললুম 'না'।

বললেন, 'মনে হয় না, যেন বলতে চায় 'হেই, ঐ ড্যাম দুনিয়াটার দাম কত বল্ তো, আমি ওটা কিনব ?'

হাসলেন না কাশলেন ঠিক বুঝতে পারলুম না। অসুখ খিটখিটেমি আর খাপছাড়া রসিকতা—এ তিনের উদ্ভট সংমিশ্রণের সামনে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম।

অনেক রাত অবধি ঘুম এলো না। মনটা বিকল হয়ে গিয়েছে। যক্ষ্মাতে মরে বহু লোক, তার উপর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এ মানুষটা রক্ত-সূত্র দিয়ে দিনের পর দিন মরণ-বঁধুর ডান হাতে রাখী বেঁধেই চলেছে। যে ব্যবসা-মন্ত্র এতদিন তাঁকে অন্ন-বস্ত্র ভোগ-বিলাস দিচ্ছিল, আজ যেন সে-ই হঠাৎ এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মত তাঁর হাতছাড়া হয়ে তাঁরই কণ্ঠরুদ্ধ করে সবলে দুই বাহু দিয়ে নিষ্পেষিত করে বিন্দু-বিন্দু রক্ত নিঙড়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ শুনি হেলেনার কান্না। দরজা খুলে বেরুতেই দেখি, মুখহানার শোবার ঘরের দরজা খোলা আর মুখহানা ঠাস-ঠাস করে হেলেনার গালে চড় মারছেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরতেই তিনি যেন চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন এরকমভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে খাটে শুইয়ে দিয়ে আপন ঘরে ফিরে এলুম।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে আর হেলেনা আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। আমি আশ্চর্য হলুম না, বললুম 'বসুন।'

আমি স্থির করেছিলুম, সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁকে বুঝিয়ে বলব, তিনি যেন মুখহানাকে মাপ করেন। অসুখে ভুগে ভুগে মানুষ কি-রকম আত্ম-কর্তৃক হারিয়ে ফেলে, সে কথা বুঝিয়ে বলব। অন্তত এটা তো বলতেই হবে—তা সে সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক— সেবার পরিবর্তে ভারতবাসী আঘাত দেয় না।

কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হল না। হেলেনা চোখের জল দিয়ে আমাকেই অনুনয়-বিনয় করলেন আমি যেন মুখহানাকে ভুল না বুঝি। এ

মুখহানা সে মুখহানা নয় যিনি তিন বৎসর ধরে তাঁকে সাধ্যসাধনা করেছিলেন তাঁর প্রেম গ্রহণ করতে। বাড়ি-গাড়ি টাকা-পয়সা, তাঁর সর্বস্ব তিনি হেলেনাকে দিয়ে তিন বৎসর ধরে বার বার তাঁকে বলেছিলেন, তিনি তাঁকে গ্রহণ না করলে তিনি দেশত্যাগী হবেন।

হেলেনা বললেন, 'আপনি ভাবছেন, দেশত্যাগী হবেন শুধু কথার কথা। তা নয়। আমার মামা তো ব্যবসায়ের ভিতর দিয়ে মুখহানাকে চিনতেন দশ বৎসর ধরে। তিনিই বলেছেন, 'এই কাইরোর মত শহরে মুখহানা কোনও মেয়ের দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকাননি। সাত বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে, টাকা-পয়সা যখন তাঁর ছিল তখন কত ফরাসী কত হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে তাঁর পিছু নিয়েছে, কিন্তু এই সাত বছরের ভিতর একদিন একবারের তরেও আমার মনে এতটুকু সন্দেহ হয়নি যে তিনি আমায় ফাঁকি দিতে পারেন। মুখহানা তো ফাঁকির মানুষ নন।'

আমি চুপ করে শুনতে লাগলুম। বললেন, 'আজ না হয় তিনি দুরবস্থায় পড়েছেন বলে আমাকে তাঁর ব্যাঙ্কের হিসেব দেখান না, কিন্তু এমন দিনও তো ছিল যখন তিনি ব্ল্যাঙ্ক চেক্ দিয়ে বলতেন 'সব টাকা উড়িয়ে দাও হেলেনা, আমি তাহলে বেশি কামাবার উৎসাহ পাব।'

'আমার গায়ে হাত তুলেছেন? তুলুন, তুলুন। ঐ করে যদি তাঁর রোগ বেরিয়ে যায় তবে তিনি জুড়োবেন, তাঁর শরীর সেরে যাবে।'

তারপর বললেন, 'বলুন, আপনি মুখহানাকে ভুল বোঝেননি?'

আমি বললুম, 'না। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। আপনি মুখহানাকে যে সেবা করেছেন, তার চেয়ে বেশী সেবা আমার মাও আমার বাবাকে করতে পারতেন না।'

এর বাড়া তো আমি আর কিছু জানিনে। হেলেনার মুখে গভীর প্রশান্তি দেখা গেল। বললেন, 'আপনি আমায় বাঁচালেন। সব সময় ভয় মুখহানা হয়ত ভাবেন, বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে তিনি হয়ত মনের মত সেবা পেলেন না। আমার বুকের কতটা ভার নেবে গেল আপনি বুঝতে পারবেন না।'

কথাটা ঠিক। আমি অতটা ভেবে বলিওনি। পরদিন ছুটি ছিল। মুখহানা এসে কোনও ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'কথা আছে।'

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'স্থির করেছি, কারবার গুটিয়ে ফেলব।'

আমি আশ্চর্য হলুম, খুশিও হলুম, বললুম, 'সেই ভাল।' বললেন, 'আমি

হায় মানিনি। গুটোতে হচ্ছে অন্য কারণে। আমার দম নিতে বড্ড কষ্ট হয়। আর এই কাইরোতে আমার শরীর সারবে না। কুর্গে একমাস থাকলেই আমার শরীর সেরে যাবে।' তারপর খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনি তো কখনও কুর্গে যাননি, তা না হলে আমার কথাটার মর্ম বুঝতে পারতেন। এই সাহারার হাওয়া আমি একদম সইতে পারিনে। আমার বুক যেন ঝাঁঝরা করে দেয়।'

কিছু বললুম না। কারণ জানতুম, জেনে-শুনে মিথ্যে কথা বলছেন না। সাহারার এই বালু-ছাঁকা শুকনো বাতাস দিয়ে ফুসফুস পরিষ্কার করার জন্য অগুণতি ইয়োরোপীয় যক্ষ্মা রোগী প্রতি বৎসর মিশরে আসে।

উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'জানেন হের ডক্টর, ট্যামারিণ্ড ট্রি কাকে বলে?' আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।' আমার বাড়ির সামনে এক বিরাট তেঁতুল গাছ আছে। তারই ছাওয়ায় যদি আমি তিনটি দিন ডেক-চেয়ারে শুতে পারি তাহলে সব কাশি সব ব্রঙ্কাইটিস ঝেড়ে ফেলতে পারব। যক্ষ্মা না কচু! হোয়াট রট্!'

আপন মনে মুচকি মুচকি হাসলেন। বললেন, 'আমি কী বোকা! এতদিন একথাটা ভাবিনি কেন বুঝতে পারিনে। আর কাঁজির কথা কেন মাথায় খেলেনি তাও বুঝতে পারিনে। খাবো মায়ের হাতে বানানো কাঁজি, শুয়ে থাকব তেঁতুল-তলায়, দম নেবে তেঁতুল-পাতা-ছাঁকা হাওয়া। ব্যস্! তিন দিনে সব ব্যামো বাপ্ বাপ্ করে পালাবে। যক্ষ্মা! হোয়াট ননসেন্স!'

তারপর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল। বললেন, 'হেলেনা যে খারাপ রাঁধে তা নয়। কিন্তু কাঁজি বানানো তো সোজা কর্ম নয়! আর এ মিশরী চালে কাঁজি হবেই বা কি করে?'

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কারবার গুটোনোও তো কঠিন কাজ।' তারপর খুব সম্ভব ঐ কথাই ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি রাম উল্টো বুঝলাম। মুখহানা খাটতে লাগলেন টপ গিয়ারে। আমি জেলে নই তাই বলতে পারব না, জাল ফেলাতে মেহনত বেশি না গুটোতে। তবে এ কথা জানি, নদী-পুকুরে আবর্জনা থাকে বলে জাল আকসারই হেথা-হোথা জড়িয়ে যায় আর ছাড়াতে গিয়ে চোখের জলে নাকের জলে হতে হয়। মুখহানারও হল তাই।

এখন শুধু আর ওমরের চেয়ারে চলে না। দারোয়ান ধরে ধরে উপরের তলায় উঠিয়ে দিয়ে যায়। আর কথা বলা বেড়ে গিয়েছে।

'বুঝলেন হে ডক্টর, আমার মা অজ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। নামটা পর্যন্ত সই করতে জানে না। আপনার মা জানেন ?'

ভাঁড়াবার প্রলোভন হয়েছিল কিন্তু মিথ্যেবাদীর স্মরণশক্তি ভাল হাওয়া চাই।

একটু যেন নিরাশ হয়ে বললেন, তাহলে আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমাদের অঞ্চলের সবাই জানে, হেন ব্যামো নেই মা যার দাওয়াই জানে না। আসলে কিন্তু দাওয়াই নয়, ডক্টর। মা সারায় পথ্যি দিয়ে। কচু, ঘেচু, দুনিয়ার যত সব বিদঘুটে আবোল-তাবোল দিয়ে মা যা রাঁধে, তা একবার খেলেই আপনি বুঝতে পারবেন ওর হাতে জাদু আছে। কিন্তু ওসব কিছুরই দরকার হবে না আমার। ঐ যে বললুম কাঁজি আর তেঁতুলের ছায়া! তারপর ফিরে এসে দেখিয়ে দেব ব্যবসা গড়া কারে কয়!'

একদিন লক্ষ্য করলুম, আগে বরঞ্চ মুখহানা মাঝে মাঝে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরতেন, এখন প্রতি দিন হেঁটে। তাই নিয়ে একটুখানি মতামত প্রকাশ করলে পর মুখহানা বললেন, 'আপনাকে সব কথা খোলসা করে বলিনি, শুনুন। আমি চাই হেলেনাকে যতদূর সম্ভব বেশি টাকা দিয়ে যেতে। ওর তো কেউ নেই যে ওকে খাওয়াবে। আমি অবিশ্যি শিগ্‌গিরই ফিরে আসব। কিন্তু ও বেচারী এ ক'মাস বড্ড খেটেছে, এখন একটুখানি আরাম না করলে ভেঙে পড়বে যে!'

আমি বললুম, 'ওঁকে বলেছেন যে আপনি একা দেশে যাচ্ছেন ?'

মুখহানা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'হুঁ, বড্ড কাঁদছে।'

আমি বললুম, 'দেখুন মিস্টার মুখহানা, আর যা করুন—করুন, কিন্তু দুটি টাকা বেশি রেখে যাবার জন্য ব্যামোটা বাড়াবেন না।'

বুনো শূয়োরের মত মুখহানা ঘোঁৎ করে উঠলেন। বললেন, 'যান, যান, বেশি উপদেশ কপচাতে হবে না। বিয়ে তো করেননি যে বঝতে পারবেন হেলেনা আমার কে ?'

তারপর গট গট করে রান্নাঘরে গিয়ে লাগালেন ওমরকে দুই ধমক। সে অবশ্যি এসব ধমককে থোড়াই কেয়ার করে।

ফিরে এসে বললেন, 'সৈয়দ সাহেব ?'

'জী ?'

'রাগ করলেন ?'

'পাগল না কি।'

বললেন, 'আমার মা'র কথা বলছিলুম না আপনাকে ? অদ্ভুত মেয়ে। বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমার বয়স এক। বিশেষ কিছু রেখে যেতেও পারেননি। কি দিয়ে যে আমায় মানুষ করলো, এখনও তার সন্ধান পাইনি। এই যে আমি কারবারে হার মানিনে, কন্‌সুলেটে ঘাবড়াইনে, ইংরেজ গুপ্তচরকে ডরাইনে—সে-সব ঐ মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। আপনি বললেন, 'লেখাপড়া শেখেনি।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি কক্‌খনো বলিনি।'

চোখ দুটি অগাধ স্নেহে ভরে নিয়ে বললেন, 'যদি কোনোদিন কুর্গ আসেন তবে নিজেই দেখতে পাবেন।' তারপর হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন, আমি না থাকলেও আসতে পারেন—নিশ্চয়ই আসবেন। শুধু বলবেন 'আমি মুখহানাকে চিনি', ব্যাস, আর দেখতে হবে না। বুড়ী আপনাকে নিয়ে যা মাতামাতি লাগাবে। কিন্তু কথা কইবেন কি করে ? মা তো কানাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না।'

* * *

পূর্ণ তিনটি মাস আমি মুখহানার কাছ থেকে তাঁর মায়ের গল্প শুনেছি। এই গল্প পাঁচ সাত বার করে। আমার বিরক্তি ধরেনি। কিন্তু এ কথাও মানি আর কেউ বললে আমি এ কথা বিশ্বাস করতুম না। এক মাস যেতে না যেতেই আমার মনে হল, ফটোগ্রাফের দরকার নেই, গলার রেকর্ডের দরকার নেই, মুখহানার মাকে আমি হাজার পাঁচেক অচেনা মানুষের মাঝখানে দেখলেও চিনে নিতে পারব।

কুর্গ গেলে আমি প্রথম দিন কি খাবো তাও জানি, নাইতে যাবার সময় লাল না নীল কোন রঙের গামছা পাবো তাও জানি, শুধু-গায়ে চলা ফেরা করলে মায়ের যে আপত্তি নেই তাও জানি এবং বিশেষ করে জেনে নিয়েছি, বিদায় নেবার সাত দিন আগের থেকে যেন রোজই যাবার তাগাদা দিই, না হলে বোম্বায়ে এসে জাহাজ ধরতে পারব না।

এ তিন মাসের প্রথম দুমাস মুখহানার জীবনে মাত্র দুটি কর্ম ছিল। খুঁকতে খুঁকতে ঠোক্কর খেয়ে পড়ি-মড়ি হয়ে এ দোকান, ও দোকান, ঘুরে ঘুরে সমস্ত দিন ব্যবসা গুটোনো, আর রাত্রে আমাকে মায়ের গল্প বলা।

তারপর মুথহানাকে শয্যা নিতে হল। এদিকে আমার পয়সাও ফুরিয়ে এসেছে। মুথহানা জানতেন, আমি একমাস পরেই দেশে ফিরব। টাকা থাকতেই আমি টিকিট কেটে রেখেছিলুম। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আরও কিছু দিন থাকার কিন্তু তাহলে হেলেনার হিস্সায় ভাগ বসাতে হত। সে তো অসম্ভব।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান পেতে অপেক্ষা করছেন, আমি কখন বাড়ি ফিরব।

'হের ডক্টর।'

'আপনি আমাকে সব সময় 'ডক্টর' 'ডক্টর' করেন কেন?'

'রাগ করেন কেন? আমি তো লেখাপড়া শিখিনি। আমার বন্ধু 'ডক্টর', সেটা ভাবতে ভাল লাগে না? কিন্তু সে কথা যাক। বলছিলুম কি, আমার মা—না থাক।

আমি বললুম, 'আপনাকে বলতেই হবে।'

'আপনি শকৃট্ হবেন। আর কেন যে বলছি তাও জানিনে। আমার মা ব্লাউজ-সেমিজ পরেন না, শুদ্ধ একখানা শাড়ি।'

আমি বললুম, 'আমার মাও গরমের দিনে ব্লাউজ পরেন না।

'আঃ বাঁচালেন।'

* * *

কাইরো ছাড়ার দিন সাতেক আগে মুথহানা তাঁর ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। খান ত্রিশেক খাম দিয়ে বললেন, 'এই ঠিকানা সব খামে টাইপ করে দিন তো।'

দেখি লেখা,

C. D. MUTHANA

VIRARAJENDRAPETH

MARCARA

South Coorg, India.

বললেন, 'হেলেনা শুধু গ্রীক লিখতে পারে। তাই এই খামগুলো দেশে যাবার সময় তার কাছে রেখে যাব। আমাকে চিঠি লিখতে তাহলে তার কোনও অসুবিধে হবে না। আমিও তো শিগ্‌গিরই দেশে যাচ্ছি।'

টাইপ করছি, আর ভাবছি, এর কটা খামের প্রয়োজন হবে? এ বড়

অমঙ্গল চিন্তা, পাপ চিন্তা কিন্তু শত চেষ্টা করেও মনকে তার থেকে মুক্ত করতে পারলুম না।

কাইরো ছাড়ার আগের দিন মুখহানা আমাকে ডেকে বললেন, 'ওমর, বলছিল আপনি নাকি বিকেলের দিকে আজহর অঞ্চলে যাবেন। আমার জন্যে তিনখানা কুরান শরীফ কিনে আনবেন?'

আমি বললুম, 'কার জন্য কিনছেন?'

'আমার গাঁয়ের মোল্লাদের জন্য। তারা বলছিল, ভারতবর্ষে ছাপা কুরানে নাকি বিস্তর ছাপার ভুল থাকে। কাইরোর কুরান নিয়ে গেলে তারা যা খুশিটা হবে।'

আমার ভুল অমূলক। বিদায় নেবার দিন দেখি মুখহানা ভারি খুশি-মুখ। বার বার বললেন, 'শিগ্‌গিরই ভারতবর্ষে দেখা হবে।' হেলেনা—থাক সে কথা। ও-রকম অসহায়ের কান্না আমি জীবনে কখনও দেখিনি, কখনও দেখতে হবে না, তাও জানি।

দেশে ফিরেই মুখহানাকে চিঠি লিখলুম, জবাব পেলুম না। তখন অতি ভয়ে ভয়ে তাঁর মাকে লিখলুম, 'কোদণ্ডের শরীর একটুখানি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে তিনি কিছুদিনের জন্য দেশে আসবেন বলেছিলেন। আপনার কথা আমাকে সব সময় বলতেন আর দেশের ঘরবাড়ির জন্য তাঁর মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমি তাঁর সঙ্গে এক বৎসর একই বাড়িতে ছিলুম। আপনার কথা সব সময় ভাবতেন আর আমাকে রোজই আপনার কথা বলতেন। কম ছেলেই মাকে এত ভালোবাসে। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।'—বহু ভেবে-চিন্তে এই কটি কথা লিখেছিলুম, পাছে আমার কোনও কথা তাঁর মনে ব্যথা দেয়।

এ চিঠিরও উত্তর পেলুম না।

তার মাস খানেক পর কাইরো থেকে খবর পেলুম, কোদণ্ড মুখহানা আমি চলে আসার তিন দিন পর ইহলোক ত্যাগ করেন।

মাদ্রাজ উপকণ্ঠের বেলাভূমি

এই যে সামনের বালুপাড়ের উপর জেলেপাড়া এর সঙ্গে মানব সভ্যতার কোথায় যোগসূত্র—এই পাড়ার বাইরে যে সংসার তার উপরে সে কতটা নির্ভর করে, কি পরিমাণ সহযোগিতা পায় ?

এদের ঘরে যা তৈজসপত্র তা বিক্রি করলে দু টাকার বেশি উঠবে না। যেসব বাসনকোসন সামনের রাস্তার কলতলায় ধুতে নিয়ে আসে তার অধিকাংশ মাটির। দৈন্য বোধ হয় এদের চরম, কারণ হাঁড়ি-কলসীগুলোও অত্যন্ত মামুলী—তাদের আকারপ্রকারে সামান্যতম সৌন্দর্যের সন্ধান নেই। এমনই এবড়ো-খেবড়ো যে কোনো গতিকে দাঁড করানো যায় মাত্র—ভারকেন্দ্র বলে কোন জিনিস বেশির ভাগ হাঁড়ি-কলসীতে নেই।

পুরুষরা কাজকর্ম করে শুদ্ধু একখানা কালো রঙের এক বিঘৎ চওড়া নেংটি আর ঘুনসি পরে। সন্ধ্যেবেলায় দেখেছি কেউ কেউ লুঙ্গি-শার্ট পরে—বেশির ভাগ যে জামা-কাপড় পরে সেগুলো দেখে মনে হয় যেন মাছের বদলে কুড়িয়ে-নেওয়া পরিত্যক্ত বুশ-শার্ট, বোতামহীন শার্ট। ময়লা ঝোলাঝালা শর্ট-শার্ট দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, নিতান্ত হিম বাতাসের কন্‌কনানিতে বাধ্য হয়ে পরেছে।

মেয়েরা পরেছে উত্তর ভারতে তৈরী মিলের শাড়ি। দক্ষিণ ভারতের সুন্দর সবুজ-সোনালি, মেরুন-নীল রঙের মামুলী শাড়ি কেনার পয়সা এদের নেই। একরঙা জামা যা পরেছে তা সে এমনি বিবর্ণ আর রুক্ষ যে সেটা পরার কোনো অর্থ বোঝা যায় না—পরার কি প্রয়োজন ?—আমাদের জেলেনীরা তো পরে না। দু'একজনের পায়ে আংটি, হাতে বালা, নাকে ফুল—সবই রূপোর।

এরা কেরোসিনের ডিবে জ্বালায় না রেড়ির তেলের পিদিম এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। আর সে জ্বালানোই বা কতক্ষণের জন্য ? সন্ধ্যে ভালো করে ঘনাতে না-ঘনাতেই সাঁঝের পিদিম দেখিয়ে এরা আলো নিভিয়ে ফেলে।

এদের মাছ ধরার জাল, খানকয়েক এবড়ো-খেবড়ো তক্তায় জোড়া কাটা-মারুন ভেলা, দড়াদড়ি সব কিছুই এদের নিজের হাতে তৈরি—সামান্য সীসের গুলি আর লোহার পেরেক হয়ত সভ্য মানবের কাছ থেকে কিনে নেওয়া।

এদের ছেলেমেয়েরা ইস্কুল যায় না, ব্যামো শক্ত না হলে ডাক্তার-হাসপাতালের সন্ধান করে না।

শহরের সভ্যতার কাছ থেকে এই নগণ্য,—প্রায় উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ—ন্যাকড়াটুকু গুলিপেরেকটার বদলে এরা সকাল-সন্ধ্যা খাটে। যে মাছ ধরে তার অতি সামান্য অংশ খায়, বেশির ভাগ 'বিক্রি' করে দিতে হয় ঐ ন্যাকড়াটুকু, ঐ পেরেকটা আর দু'মুঠো চালের জন্য। 'বেচাকেনার' নামে এই নগ্ন প্রবঞ্চনা চোখের সামনে যুগযুগ ধরে চলে আসছে।

'নগ্ন-প্রবঞ্চনা ?' চক্ষুষ্মান লোকের সামনে এ নগ্নতা ধরা পড়ে।

আর সবাই দেখছে সেই গল্পের রাজা যেন ফক্কিকারের জামা-কাপড় পরে শোভাযাত্রায় চলেছেন। 'সভ্যতার' এই শোভাযাত্রার মাঝখানে সেই সরল বালকের চেঁচানো কেউ শুনতে পায় না—কিংবা চায় না।

* * *

সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের হাহাকারে যতক্ষণ বারান্দা মুখরিত থাকে, ততক্ষণ রাস্তার কলতলার শব্দ কানে আসে না—শুধু দেখি সমুদ্রপারের জেলেরা আসছে পথের পাশের কলতলায় নাইতে অথবা কাপড় কাচতে; মেয়েরা আসছে জল নিতে, বাসন ধুতে, কাপড় কাচতে, কাচ্চা-বাচ্চাদের নাওয়াতে, মাথা ঘষতে। কল থেকে জল বেরোয় অতি মন্দগতিতে—একটি কলসী ভরতে আধ ঘণ্টাটাক লাগে।

বেশী ভিড় না থাকলে দূর গাঁয়ের মেয়েরা শহরে যাবার মুখে মাথা থেকে চুবড়ি নামিয়ে দুদণ্ড জিরিয়ে নেয়, কলে হাত পা ধোয়।

আপিস কিংবা কারখানা যাওয়ার তাড়া থাকলে নিশ্চয়ই কলতলায় ঝগড়া-ঝাঁটি বেধে যেত। এখানে সব কিছু ধীরে-সুস্থে এগোয়। ঐ যে জেলেটা আরাম করে কলতলায় গা এলিয়ে দিয়েছে তার জন্য কলসীহাতে মেয়েটার কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। কথাবার্তা হচ্ছে তা সমুদ্রের গর্জনে আর বাতাসের শনশনানিতে শোনা যাচ্ছে না।

আজ বাদলার দিন। নাইবার চাড় নেই বলে কলতলায় ভিড় কম। কাচ্চা-বাচ্চারা তো একদম আসেনি। কিন্তু কড়া গরম পড়লে এখানে রীতিমত হাট বসে যায়। কড়া গরম পড়ার মানে যে তখন হাওয়া বন্ধ, কাজেই তখন একটু আধটু চিৎকারও শোনা যায়—মেজাজও তখন কড়া হয়ে যায় বলে।

কলতলার ভিড় কমে এসেছে। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে

দেখি, একটি জেলেনী কলসী ভরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—কলতলায় আর কেউ নেই যে কলসীটা মাথায় তুলে দেবে।

এমন সময় এক রিক্‌শওলা যাচ্ছিল। রিক্‌শ দাঁড় করিয়ে সে কলসীটা তুলে দিয়ে ফের রিক্‌শ টানতে টানতে চলে গেল।

মেয়েটা একবার কৃতজ্ঞ নয়নে তাকালো পর্যন্ত না। রিক্‌শওয়ালাও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাহায্যটুকু করে গেল—যেন এরকম ধারা করাটা তার হামেশাই লেগে আছে।

একেই বলে খাঁটি ভদ্রতা।

আনিকি পাসিকিভি

এক বাঙালী দম্পতির সঙ্গে জিনীভার এক বড় হোটেলে উঠেছি। প্রথম দিনই খানাঘরে লক্ষ্য করলুম, আমাদের টেবিলের দিকে মুখ করে বসেছেন এক দীর্ঘাঙ্গী যুবতী। দীর্ঘাঙ্গী বললে কম বলা হয়, কারণ আমার মনে হল এঁর দৈর্ঘ্য অন্তত পক্ষে পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি হবে—আমরা তিনজন বাঙালী গড়পড়তায় পাঁচ ইঞ্চি হই কি না-হই।

দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মিলিয়ে সুগঠিত দেহ—সেইটেই ছিল তাঁর সৌন্দর্য, কারণ মুখের গঠন, চুলের রঙ এবং আর পাঁচটা বিষয়ে তিনি সাধারণ ইয়োরোপীয় রমণীদেরই মত।

ভদ্রতা বজায় রেখে আমরা তিনজনেই যুবতীটিকে অনেকবার দেখে নিলুম। ফিসফিস করে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ভিতরে আলোচনাও হল। কখন লক্ষ্য করলুম, আমাদের দিকে তিনিও দু'চারবার তাকিয়ে নিয়েছেন।

সেই সন্ধ্যেয় বাঙালী ভদ্রমহিলাটি হোটেলের ড্রয়িংরুমে বারোয়ারী রেডিয়োটা নিয়ে স্টেশন খোঁজাখুঁজি করছিলেন; আমি একপাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ সেই যুবতী ঘরে ঢুকে সোজা মহিলাটির কাছে গিয়ে পরিষ্কার ইংরিজিতে বললেন, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি? আপনি কি কোনো বিশেষ স্টেশন খুঁজছেন? আমার বেতারবাই আছে।'

পরিচয় হয়ে গেল। রোজ খাবার সময় আমাদের টেবিলেই বসতে আরম্ভ করলেন। নাম আনিকি পাসিকিভি—দেশ ফিনল্যাণ্ডে

ফিনল্যাণ্ডের আর কাকে চিনব ? ছেলেবেলায় ফিন্ লেখক জিলিয়াকুসের 'রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস' পড়েছিলুম আর তাঁর ছেলে জিলিয়াকুসও বিখ্যাত লেখক—প্রায়ই 'নিউ স্টেটসম্যানে' উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। ব্যাস্।

কিন্তু তবু যেন পাসিকিভি নামটা চেনা চেনা বলে মনে হল। সে কথাটা বলতে আনিকি একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বললেন, 'আমার বাবা ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট।'

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে বললুম, 'অ।'

আনিকির সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমাদের ভারি সুবিধে হল। বাঙালী দম্পতি ইংরিজি আর বাঙলা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানতেন না, কাজেই আমাকে সব সময়ই ওঁদের সঙ্গে বেরতে হত। আনিকি অনেকগুলো ভাষা জানতেন ; তিনি তাঁদের নিয়ে বেরতেন আর আমি য়ুনিভার্সিটি, লাইব্রেরি, মিটিং-মাটিং করে বেড়াতুম।

সুইস খানা যদিও বেজায় পুষ্টিকর তবু একটুখানি ভোঁতা—আনিকি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কয়ে তার পরিপাটি ব্যবস্থা করে দিলেন। শামুনিক্স্ দেখতে যাবার জন্য মোটর ভাড়া করতে যাচ্ছি—আনিকি এক দোস্তের গাড়ি ফিরি-গ্র্যাটিস-অ্যাণ্ড-ফরনাথিং যোগাড় করে দিলেন। তা ছাড়া জিনীভা, লজান, মস্ত্রো, ভিল্নভ্ (রমাঁ রলাঁ সেখানে থাকতেন) সম্বন্ধে দিনের পর দিন নানাপ্রকারের খবর দিয়ে আমাদের ওয়াকিবহাল করে তুললেন !

সূক্ষ্ম রসবোধও আনিকির ছিল। আমি একদিন শুধালাম, 'আপনি অতগুলো ভাষা শিখলেন কি করে ?'

বললেন, 'বাধ্য হয়ে। ইয়োরোপের খানদানী ঘরের মেয়েদের মেলা ভাষা শিখতে হয় বরের বাজার কর্নার করার জন্য। ইংরেজ ব্যারন, ফরাসি কাউণ্ট, ইতালিয়ান ডিউক সকলের সঙ্গে রসালাপ করতে না পারলে বর জুটবে কি করে ?'

তারপর হেসে বললেন, 'কিন্তু সব শ্যাম্পেন টক্ ! এই পাঁচ ফুট এগারোকে বিয়ে করতে যাবে কোন ইংরেজ, কোন ফরাসি ? তাকে যে আমার কোমরে হাত রেখে নাচতে হবে বিয়ের রাতের বল ডান্সে ! যা দেখতে পাচ্ছি শেষটায় জাতভাই কোনো ফিন্কেই পাকড়াও করতে হবে !'

আমি শুধালুম, 'ফিন্রা কি বেজায় ঢ্যাঙা হয় ?'

বললেন, 'ছয়' ছয় তিন, ছয় ছয় হামেশাই। তাই তো তারা আর পাঁচটা জাতকে আকসার হাইজাম্পে হারায়।'

রসবোধ ছাড়া অন্য একটি গুণ ছিল আনিকির। হাজির-জবাব। কিছু বললে চট করে তার জুৎসই জবাব তাঁর জিভে হামেহাল হাজির থাকত।

একদিন বেড়াতে বেরিয়েছি তাঁর সঙ্গে। এক ডেপো ছোকরা আনিকির দৈর্ঘ্য দেখে তাকে চেঁচিয়ে শুধালেন, 'মাদমোয়াজেল, উপরের হাওয়াটা কি ঠাণ্ডা?'

আনিকি বললেন, 'পরিষ্কার তো বটেই। তোমার বোটকা প্রশ্বাস সেখানে নেই বলে।'

আনিকির সঙ্গে আমাদের এতখানি হৃদ্যতা হয়েছিল যে তিনি আমাদের সঙ্গে লজান, মস্ত্রো, লুৎসেন, ইণ্টেরলাকেন, ৎসুরিশ সব জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন।

বিদায়ের দিন শ্রীমতী বসু তো কেঁদেই ফেললেন।

* * *

দু'এক বৎসর আমাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার ছিল। তার পর যা হয়—আস্তে আস্তে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

তারপর বহু বৎসর কেটে গিয়েছে, এখানে এক ফিন্ মহিলার সঙ্গে আলাপ। শুধালুম, 'প্রেসিডেণ্ট পাসিকিভির মেয়েকে চেনেন?'

গুম্ হয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ। তারপর শুধালেন, 'আপনার সঙ্গে এখন কি তাঁর যোগাযোগ নেই?'

আমি বললুম, 'বহু বৎসর ধরে নেই।'

বললেন, তিনি চার মাস ধরে হাসপাতালে। পেটের ক্যানসার। বাঁচবেন না। আপনি একটা চিঠি লিখুন না। অবশ্য অসুখের কথা উল্লেখ না করে।

সে রাত্রেই লিখলুম।

দিন চারেক পরে আরেক পার্টিতে সেই ফিন্ মহিলার সঙ্গে দেখা। শুধালেন, 'চিঠি লিখেছেন?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

বললেন, 'দরকার ছিল না। কাল দেশের কাগজে পড়লুম, মারা গেছেন।'

বিদেশে

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে হয়, 'সব চেয়ে কোন্ দেশ ভাল ?'

'মাই কানট্রি রাইট অর রঙ, মাই মাদার ড্রাঙ্ক অর সোবার' জাতীয় পাঁড় লোক হলে তো কথা নেই, চট করে বলবে, তার দেশই সব চেয়ে ভালো। কিন্তু আপনি যদি সে গোত্রের প্রাণী না হন তবে কি উত্তর দেবেন ? কেউ যদি প্রশ্ন শুধায়, 'সব চেয়ে খেতে ভালো কি ?' তা হলে যে রকম মুশকিলে পড়তে হয়।

তখন উল্টে শুধাতে হয়, 'ভালো দেশ' বলতে তুমি কি বোঝো ? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া, আহারাদি, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, সৌন্দর্যের পূজা, ধন-দৌলত, আতিথেয়তা, তুমি চাও কোনটা ?' 'সব কটা মিলিয়ে হয় না ?' 'আজ্ঞে না।'

তবু যদি কেউ পিস্তল উঁচিয়ে বলে, 'এখ্খুনি তোমায় এদেশ ছাড়তে হবে ; কোথায় যাবে বলো !' (যাঁদের ভ্রমণের শখ তাঁরা অবশ্য উল্লসিত হয়ে বলবেন, 'পিস্তল ওঁচাতে হবে না, একবার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেই হল') তা হলে বোধ হয় সুইটজারল্যাণ্ডের নামই করব।

ধরে নিচ্ছি খর্চাটা আপনিই দিচ্ছেন—কারণ খর্চা যদি না দেন তবে তো সক্কলের পয়লাই ভাবতে হবে কোন্ দেশে গেলে দু' মুঠো অন্ন জুটবে। তা হলে 'সাউথ সী আয়লেণ্ড' বা আফ্রিকার এমন কোনো দেশের কথা ভাবতে হবে যেখানে এন্তার কলা-নারকোল রয়েছে, জীবন সংগ্রাম কঠোর নয়—বেঘোরে প্রাণটা যাবার সম্ভাবনা কম। সেদিক দিয়ে অবশ্যি মালদ্বীপ সব চেয়ে ভালো। ওদেশে কেউ কখনো শখ করে যায় নি তাই 'অতিথি' শব্দটা মালদ্বীপের ভাষায় ঝাঁ চক্চকে নূতন হয়ে পড়ে আছে, কখনো ব্যবহার হয় নি। মালদ্বীপের প্রত্যেকটি দ্বীপ এত ছোট যে, যে-কেউ যে-কোনো মুহূর্তে আপন বাড়ি ফিরে যেতে পারে—অতিথি হতে যাবে কে কার বাড়ি ?—এখানে অবশ্য পালা নেমন্তন্নের কথা উঠছে না। তাই কেউ যদি কখনো পাকে-চক্রে মালদ্বীপ পৌঁছয় তবে তাকে এর বাড়িতে ওর বাড়িতে এ দ্বীপে ও দ্বীপে দু'দিন চারদিন

থাকতে গিয়ে হেসেখেলে বছর তিনেক কেটে যায়। আমার জীবনে আমি মাত্র একটি মালদ্বীপবাসীর সঙ্গে কাইরোতে পরিচিতি হই। প্রতিবার দেখা হলেই ভদ্রলোক মালদ্বীপ যাবার আমন্ত্রণের কথাটি আমায় স্মরণ করিয়ে দিতেন।

তাই বলছিলুম খর্চা যখন আপনিই দিচ্ছেন তবে সুইটজারল্যাণ্ড সই। সুইটজারল্যাণ্ডের মত আক্রা দেশ ইয়োরোপে আর নেই—সেখানকার খর্চা যদি আপনি বরদাস্ত করতে পারেন তবে আর সব দেশ তো ফাউ। টুক করে প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ঘুরে আসতে পারেন। খর্চা সুইটজারল্যাণ্ডে থাকলে যা বার্লিন ঘুরে এলেও তা।

স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন, তখন ভাত কেন, পোলাওই খান (সিন্ধী প্রবাদে বলে, 'স্বপ্নের পোলাওই যখন রাঁধছো তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করছো কেন?') স্বপ্নেই যখন ভ্রমণ করছেন তখন থার্ড ক্লাস কেন, গোটা জাহাজ চার্টার করে ডি লুক্স কেবিনে কিংবা প্রেশারাইজড্ প্লেনে করে জিনীভা চলে যান।

লেক অব জীনিভার পাড়ে একটি ছোট, অতি ছোট কুটির (শালে) ভাড়া নেবেন আর একটি রাঁধুনী যোগাড় করে নেবেন।

শুনেই নাভিশ্বাস উঠলো তো? বিদেশে-বিভূঁই জায়গা; তার চুরি-চামারি ঠেকাবে কে? হিসেবে আলুর সের আড়াই টাকা দেখিয়ে বলবে না তো, 'কত্তা, দাঁওয়ে মেরেছি, না হলে আসলে দাম তিন টাকা'?

এই হল সুইটজারল্যাণ্ডের প্রথম সুখ। ছুঁচোমো, ছ্যাছড়ামো ওদেশ থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে। সুইটজারল্যাণ্ডের হোটেলেও তাই। আক্রা বটে— বসবাস খাই-খরচের জন্য হয়ত দৈনিক কুড়ি টাকা নিল কিন্তু তার পরও আপনাকে মাখনটাতে ফাঁকি, মুর্গীটাতে জুচ্চোরি এসব করে না। আপনার খাওয়া দেখে যদি তার সন্দেহ হয় আপনি পেটভরে খাননি তবে এসে বলবে, 'আপনি বিদেশী, এ রান্না আপনার হয়ত পছন্দ হয় নি। আপনি কি খেতে চান বাংলে দিন, আমরা সে রকম রেঁধে দেব।'

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আপনার রাঁধুনি আপনাকে ফাঁকি দেবে না।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই বিছানার পাশের বোতামটি টিপবেন। পাঁচ মিনিটের ভিতর গরম কফি, মুড়মুড়ে রুটি আর শিশির-ভেজা মাখনের গুলি! রাঁধুনি বলবে, 'স্যর, চমৎকার ওয়েদার। আপনি বেরুচ্ছেন তো? আমি বাজার চললুম।'

লেকের ধারে এসে একখানা বেঞ্চিতে বসবেন। খবরের কাগজটি পাশে রেখে তার উপর হ্যাট চাপা দেবেন।

আহা কী গভীর নীল জল জিনীভা লেকের। লেকের ওপারে যে আল্প‌স্ সেও যেন নীল, আর তার মাথায় মাথায় সাদা সাদা বরফের টুপি। তার উপর চুড়োর কাটা কাটা সাদা ঝালরে সাজানো আকাশের ঘন নীল চন্দ্রাতপ। আর আকাশ-বাতাস, হ্রদের জল, পাহাড়ের গা, বরফের টুপি সব কিছু ভরে দিয়েছে কাঁচা হলুদের সোনালি রোদ। সকালবেলার বাতাস একটু ঠাণ্ডা; কিন্তু প্রতিক্ষণে আপনার গালে কানে আদর করে করে সে বাতাস কুসুম-কুসুম গরম হতে থাকবে। ওভার-কোটের বোতামগুলো খুলে দিয়ে, পাইপটা ঠাসতে আরম্ভ করবেন। হয়তো গুন্‌গুন্ করতে আরম্ভ করবেন, 'আমি চিনি, চিনি, চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী'।

নীল জলের উপর দিয়ে সাদা জাহাজের এ-পার ও-পার খেয়া। জলের উপর আল্প‌সের কালো ছায়া পড়েছে, ফাঁকে ফাঁকে নীল জল, তার উপর সাদা জাহাজ। সেই আয়নার উপর জাহাজের চাকার তাড়ায় ভেঙে পড়ছে লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চুমকি। যেন কোন্ খেয়ালি বাদশা টাকশাল থেকে এইমাত্র বেরনো টাকা নিয়ে খোলামকুচির খেলা লাগিয়েছেন।

পাল তুলে দিয়ে চলেছে জেলের নৌকো। অতি ধীরে অতি মন্থরে। জাল টেনে তোলার সময় রোদ এসে পড়ছে ভেজা জালে। কালো জাল জাদুর ছোঁয়া লেগে রূপোর জাল হয়ে গেল।

এই রকম রূপোর জাল দিয়ে আপনার প্রিয়া তার খোঁপা জড়াতো না?

তৎক্ষণাৎ বুকটা চড়চড় করে ইস্-পার-উস্-পার ফেটে যাবে। কোন্ মূর্খ বলে দেশ-ভ্রমণে অবিমিশ্র আনন্দ?

রববারে জিনীভার লেকের পাড় আরও চমৎকার।

বিস্তর নরনারী জাহাজ চড়ে বেরিয়েছে ফুর্তি করতে। এসব জাহাজ 'ইস্পিশাল'—লম্বালম্বি লেকের এপার ওপার হয়। সমস্ত দিন জাহাজে কাটিয়ে উত্তম আহারাদি করে (হে বাঙালী, লেকের মাছ খেতে চমৎকার।

বাপরে সে কি বিরাট মাছ উদর আওতাময়

মুখে দিলে মাখন যেন জঠর ঠাণ্ডা হয়),

জাহাজের ব্যাণ্ডের সঙ্গে টাঙ্গোর ধাগিনাতি নাকধিন আর ওয়াল্‌ট্‌সের ধা ধিন

না, ধা তিন না নেচে, কিংবা মাউথ-হারমনিয়াম বাজিয়ে, ছোঁড়াছুড়িদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করে, কিংবা জাহাজের এক কোণে আপন মনে বসে খুদাতালার আসমান-পানি, পাহাড়-পর্বত দেখে দেখে সমস্ত দিনটা দিব্য কেটে যায়।

সুইসরা ইংরেজের মত গেরেমভারী লোক নয়। যদি দেখে, আপনি বিদেশী, এক কোণে একা বসে আছেন তবে কোনো একটু ছুতো ধরে আপনার সঙ্গে আলাপ করে নেবেই নেবে। অবশ্য আপনি যদি খেঁকিয়ে ওঠেন তবে আলাদা কথা, কিন্তু আপনি তো বদরসিক নন—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি 'পঞ্চতন্ত্র' পড়েন—আপনি খুশী হয়েই সাড়া দেবেন।

কিন্তু সুশীল পাঠক, এই বেলা তোমাকে বলে রাখি। দেশ ভ্রমণের ষোল-আনা আনন্দই বরবাদ-পয়মাল যদি তুমি সে দেশের ভাষায় কথা কইতে না পারো। ভুল বললুম, বলা উচিত ছিল যদি বুঝতে না পারো। কথা কইবার প্রয়োজন অত বেশী নয়, সুইস যদি দেখে যে তুমি তার ভ্যাচর ভ্যাচর বুঝতে পারছো, মাঝে মাঝে মোকা-মাফিক 'হুঁ' 'হুঁ' করছো কিংবা বুড়া রাজা প্রতাপ রায়ের মত সমে সমে মাথা নাড়ছো তা হলেই সে খুশী।

সুইস কেন, পৃথিবীর প্রায় সব জাতের লোকই বিদেশী সম্বন্ধে কৌতূহলী। বিশেষ করে মেয়েদের উৎসাহ এ বাবদে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ মেয়েরা লাজুক তাই তারা পুরুষকে অগ্রদূত হিসেবে পাঠায় কলেকৌশলে আলাপ জমাবার জন্য। তারপর

'দীন যথা যায় দূর, তীর্থ দরশনে
রাজেন্দ্র সঙ্গমে,—'

কিংবা কালিদাসের বজ্র মণি সমুৎকীর্ণ হওয়ার পর সূত্র যে রকম সুড়ুৎ করে উৎরে যায় (সংস্কৃতটা আর ফলালুম না, ভুল হয়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা) মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেবে।

সাবধানী পথিক, ভয় পেয়ো না। যে মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য ছোঁড়াটাকে পাঠিয়েছিল সে ফালতো। তার বোন ছোকরাটির ফিয়াঁসে। বোন সঙ্গে আছে, সে বেচারী একা একা কি করে?

চামড়া আর চুলের রঙ তাজ্জব জিনিস।

আমরা ফর্সা রঙের জন্য আকুল, যার চুল একটুখানি বাদামী তার তো দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। আর বেশীর ভাগ উত্তর এবং মধ্য

...য়োপীয় বাদামী চামড়া আর কালো চুলের জন্য জান্ কোরবানী দিতে করুন।

চট করে একটা ঘটনার উল্লেখ করে নি। এ ঘটনা অধমের জীবনে একাধিকবার হয়েছে।

এরকম এক জাহাজে এক কোণে একা বসে আছি। আমার থেকে একটু দূরে এক পাল ইস্কুলের মেয়ে মাস্টারনীর সঙ্গে ফুর্তি করতে জাহাজে চেপেছে। সবাই আপন আপন স্যাণ্ডউইচ বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। স্যাণ্ডউইচগুলো টেবিলের মধ্যিখানে ঝরোয়ারি করে রাখা হয়েছে, আর জাহাজ থেকে তারা অর্ডার করেছে লেমনেড।

কী চেঁচামেচি। 'দেখ দেখ, ফ্রিডির মা কি রকম খাসা বেকন্-স্যাণ্ডউইচ পাঠিয়েছে' ফ্রিডি লজ্জায় টম্যাটো হয়ে বলছে, 'না, না মাস্টার্ড ছিল না বলে স্যাণ্ডউইচ ভালো হয়নি' 'ক্লারার মা'র পাঠানো স্যালাডটা খা ভাই, জানিস, ওঁর বাগানে যা লেটিস আর টম্যাটো হয়!' আর টীচার শুধু বলছেন, 'চুপ চুপ অত করে চ্যাচাতে নেই। লোকে কি ভাববে?

ধর্ম সাক্ষী লোকে কিছু ভাবে না। বরঞ্চ ওরা না চ্যাচালে পাঁচজন অস্বস্তি অনুভব করত; ভাবত কালা-বোবাদের ইস্কুল পিকনিকে বেরিয়েছে।

সব কটা মেয়ে—ইস্তেক টীচার—আড়নয়নে ভদ্রতা বজায় রেখে আপনার কালো চুল আর বাদামী রঙের দিকে তাকাবে।'

পরের স্টেশনে হুড়মুড় করে সবাই নেমে গেল। আমার মনটা উদাস হয়ে গেল।

তখন দেখি একটি আট ন' বছরের মেয়ে টেবিলের তলায় লুকিয়ে ছিল গুড়ি গুড়ি আমার কাছে এসে কার্টসি করে (অর্থাৎ দুহাতে ফ্রক একটুখানি তুলে হাঁটু ভেঙে) বললে, 'গুটেন্ টাখ (সুপ্রভাত)!'

আমি চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললুম, 'গুটেন টাখ, মাইন ক্লাসবেন (সুপ্রভাত, মিষ্টি মেয়ে)।'

লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে, চুলের ডগা পর্যন্ত লাল করে বললে, 'আপনি রাগ করবেন না?' আমি বললুম, 'নিশ্চয় না।' তবে বলুন তো, আপনি কি রঙ দিয়ে চুল কালো করেছেন। আমি কাউকে বলবো না, তিন সত্যি।'

আমি তখন তার সোনালি চুলের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে। বললুম, 'ডার্লিং, তোমার কী সুন্দর সোনালি চুল!'

গাল ফুলিয়ে বললে, 'রাবিশ, আমি কালো চুল চাই।'

কিছুতেই বোঝাতে পারিনে, আমি চুলে রঙ মাখাইনি।

শেষটায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলল। কোটের আস্তিন সরিয়ে দেখালুম, আমার লোমও কালো! বললুম, 'ওগুলো তো আর বসে বসে কালো করিনি।'

বিশ্বাস তখন তার হল। মুখে গভীর বিষাদ মেখে, মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে জাহাজ থেকে নেমে গেল।

দু'টাকা জোর ন' সিকে দিয়ে টিকিট কেটে বসেছেন। এমন আর কি আক্রা হল? সমস্ত দিন কাটাতে গেলে বায়স্কোপেও তার চেয়ে বেশি খরচা হত।

হুবহু গোয়ালন্দী জাহাজ। কেবিনের বালাই নেই—সব খোলা ডেক। রেলিঙের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চারজনের বসবার মত ছোট ছোট টেবিল সাজানো। নীল সাদায় ডোরা কাটা ঝকঝকে টেবিল ক্লথ। ক্লিপ দিয়ে টেবিলের সঙ্গে সাঁটা পাছে হাওয়াতে ভর করে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে লেকের 'হে-পারে' চলে যায়।

'হে-পারে?' চট করে মনটা পদ্মার দিকে ধাওয়া করলো তো?

আমারও মনে পড়েছিল পদ্মার কথা। জীবনে কতবার প্রদোষের আধা-আলো-অন্ধকারে চাঁদপুর থেকে জাহাজ করে গোয়ালন্দের দিকে রওয়ানা হয়েছি। বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তিতে সর্বদেহমন আসন্ন—বাড়ি ছাড়ার সময় মা অমঙ্গলের চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি, সে কথা বার বার বুকের ভিতর কাঁটার মত খোঁচা দিচ্ছে, বহু চেষ্টা করেও মন থেকে সেটাকে সরাতে পারছিনে।

পদ্মার সূর্যোদয় মনের অনেকখানি বেদনা প্রতিবারই কমিয়ে দিয়েছে। রেলিঙের পাশে বসে, তারই উপর মাথা কাৎ করে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে, সেখানে কালো-সাদার মাঝখানে আস্তে আস্তে গোলাপি আভা ফুটে উঠছে। পদ্মার জল রাঙা হয়ে গেল, মহাজনী নৌকার পাল ফুলে উঠে মাঝখানটায় গোলাপি মেখে নিয়েছে, দূরের পাখি আর এ-পৃথিবীর পাখি বলে মনে হচ্ছে না, কোন নন্দনকাননের মেহদি পাতার রস দিয়ে যেন ডানা দুটি লাল করে নিয়েছে।

ঐ তো সূর্য, ঐ তো সবিতা!

জাহাজ জোর ফালতো স্টীম ছাড়ছে। তারই উপর ক্ষণে ক্ষণে রামধনুর রঙ খেলে যাচ্ছে। মাঝি-মাল্লাদের চেঁচামেচি কেমন যেন আর কর্কশ বলে মনে

হচ্ছে না। পাশে মোল্লাজীর নমাজ পড়া শেষ হয়েছে। সুর করে কোরান পড়তে আরম্ভ করেছেন। হাওয়াতে তাঁর দাড়ি দুলছে, পাগড়ীর ন্যাজ দুলছে। বরযাত্রীর দল যাচ্ছে, না কনে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, কে জানে—একমাথা সিঁদুর-মাখা একটি মেয়ে ঘন ঘন শাঁখ বাজাচ্ছে। হিঁদু বাড়িতে তো শাঁখ শুনেছি সন্ধ্যেবেলায়, ভোরেও বাজায় নাকি? কে জানে?

উত্তমার্ধ নগ্ন, জাহাজের রশির মত মোটা ধবধবে পৈতে-ঝোলানো এক ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেখো তো, মিয়া, ঠিক ঠিক রাজবাড়ির টিকিট দিয়েছে তো। যা ভিড় ছিল, কি দিতে কি দিয়ে বসেছে কে জানে? চশমাটাও হারিয়ে গিয়েছে।'

রসভঙ্গ হল অস্বীকার করিনে, কিন্তু কাতর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; অবহেলা অবিনয় করলে মর্শীদ-মুরুব্বীর মারাত্মক অভিসম্পাৎ লাগবে। বেশ করে দেখে নিয়ে বললুম, 'আজ্ঞে (আগে হলে একথা বলার প্রয়োজন হত না যে, মুরুব্বীরা ছেলেবেলায়ই আমাদের পই-পই করে শিখিয়েছিলেন, হিন্দু গুরুজনদের সঙ্গে কথা কইতে হরদম 'আজ্ঞে'—বাঙাল ভাষায় 'আইগা' বলতে হয়), ঠিকই দিয়েছে; আপনাকে ঠকাতে যাবে কোন্ পাষণ্ড?'

ব্রাহ্মণ ভারি খুশী। আমার পাতাবিছানাতে পরম পরিতৃপ্তি ভরে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

তরকারি-বেচনে-ওলা গেছে জাহাজ ইস্টিশানে টিকিট কাটতে—

'বাবু—অ—অ—অ, অ—বাবু, নারনজোর (নারায়ণগঞ্জ) এ্যাখ্খান টিকস্ দিবাইন নি?'

বাবু বললেন, 'ছ আনা!'

তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ—অ, চারি আনায় অইব না?'

বাবু পশ্চিম বাঙলার লোক, ওনাদের মেজাজ আমাদের ত্যাশে এলে একটুখানি মিলিটারি হয়ে যায়। খেঁকিয়ে বলেন, 'দে ব্যাটা দে, ছ' আনা দে।'

গভীর বেদনা সহকারে তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ—, তুমি আমার দোকানে রোজ রোজ আও। কলাডা মুলাডা কিনো। দরদাম করো! আর আমি আইলাম তোমার দোকানে এগ্ দিন। দরদাম করতা গেলাম—তুমি অমন থাটাশের মতন মুখডা করলা ক্যান্?'

মনে আমার সন্দেহ জাগছে, চতুর পাঠক বিশ্বাস করতে চান না, জিনীভার জাহাজে বসে আমার এ 'নারানজী' (নারায়ণগঞ্জী) গল্প সত্যই মনে পড়েছিল কি না।

কেন পড়েছিল বলছি।

ইয়োরোপের সব দেশের ভিতর সুইটজারল্যাণ্ডই সবচেয়ে 'এক দরে বিক্রি'। সেখানে দরদস্তুর করতে গেলে (আমি বাঙাল, তাই করেছিলুম। সুইস এমনই বোকার মত তাকায়, কিংবা খেঁকিয়ে ওঠে যেন তাকে আমি ড্যাম্ মিথ্যেবাদী বলে সন্দ করছি।

অথচ দেখুন, ইয়োরোপীয়রা আমার দেশে হামেশাই দরদস্তুর করে। আমি যদি তরকারি-ওলার মত ওদেশে একবার গিয়ে দরদস্তুর করি, তবে ওরা 'খাটাশের মত মুখ করবে ক্যান্ ?'

ইতিমধ্যে মধ্য দিনের তপ্ত হাওয়া আমার মন উদাস করে দিয়েছে। মেঘের ডাকে, নব বরষণে বাঙালীর মন কেমন যেন গভীর বেদনায় ভরে যায়, আর সে মনটা উদাস হয়ে যায় দুপুরবেলার আকাশের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন বুকে বেজে ওঠে, আমি এ সংসারের নই, এখানকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু ওরকম ধারা মন খারাপের দাওয়াই জাহাজে মজুদ। হঠাৎ অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল :

'গোলাপবাগানে, সান্‌সুসির গোলাপবাগানে—'

কি হয়েছিল ?

'সেই গোলাপবাগানে, আমি মেরিকে চুমো খেয়েছিলুম—

প্রথম চুম্বন তো মানুষ জীবনে কখনো ভুলতে পারে না'

ট্রেনে বসে আছেন, চট করে আপনার সঙ্গে কেউ আলাপ জমাতে যাবে না—আপনি হয়ত চুপ করে বসে থাকাটাই পছন্দ করেন। কিন্তু ফুর্তির জাহাজে যখন বসেছেন, তখন নিশ্চয়ই ফুর্তি করতে চান—বাঙলা কথা। একা বসে বসে ফুর্তি হয় না, তাই কেউ যদি আপনার সঙ্গে পরিচয় করে সুখদুঃখের গল্প জুড়তে চায়, তা হলে আপনার আপত্তি না থাকারই কথা এবং আশ্চর্য, মানুষ অনেক সময় পরদেশীর সঙ্গে যতদিন প্রাণ খুলে কথা কইতে পারে, স্বদেশবাসীর সঙ্গে ততটা পারে না। প্রাণের কোণে বছরের পর বছরের জমানো কোনো এক গভীর বেদনা আপনি লজ্জায় কখনো কাউকে স্বদেশে

প্রকাশ করেন নি; হঠাৎ একদিন দেখতে পাবেন, অজানা-অচেনা বিদেশ-বিভূঁইয়ে এক ভিনদেশীর সামনে আপনি আপনার সব দুঃখ-কাহিনী উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। তার সঙ্গে জীবনে আপনার আর কখনো দেখা হবে না—সেই কারণেই হয়ত আপনার হৃদয়ের আঁকুবাঁকু তার বুকের উপর চেপে বসা জগদ্দল পাথর সরিয়ে ফেলে নিষ্কৃতির গভীর আরাম পায়। ইয়োরোপের লোক তাই কোনো এক গোপন বেদনা নিয়ে যখন হ'তবার উপক্রম করে, তখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায়—সেখানে বেদনার বে 'মিয়ে ফিরে সে আবার সুস্থ মানুষ হয়ে সংসারের দুঃখ-কষ্টের সামনাসামনি হয়।

বোধ হয়, ঐ একই কারণে কখনো কখনো মানুষ বিদেশে স্বদেশবাসীর কাছেও তার বেদনার দ্বার খুলে দেয়।

একদা প্রাগ শহরে দেখি, এক ভারতীয় বৃদ্ধ—খুব সম্ভব দাক্ষিণাত্যের—রাস্তায় বেকুবের মতন দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের ফ্যালফ্যাল ভাব দেখে অনুমান করলুম, হয়ত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন, কিংবা হয়ত পার্সটাও গেছে। কাছে গিয়ে শুধালুম, 'ব্যাপার কি?'

ভদ্রলোক তো আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন আর কি। শুধু যে হোটেল হারিয়ে বসেছেন তাই নয়, হোটেলের নামটা পর্যন্ত বেবাক ভুলে গিয়েছেন।

কি করে তাঁর হোটেল খুঁজে পেলুম, সে এক নয়, পাঁচ—মহাভারত। দ্বিজেন্দ্রলাল তো আর মিছে বলেন নি, 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।' লঙ্কা রাক্ষসের দেশ, প্রাগে ভদ্রসন্তানের বসবাস। আমার মত লেখাপড়ায় পাঁঠা বঙ্গ সন্তানের মাথায় এসব ফন্দিফিকির বিস্তর খেলে—সাক্ষাৎ শার্লক হোম্‌স্ আর কি—সে কথা 'দেশের' পাঠককে হাইজাম্প-লঙজাম্প দিয়ে বোঝাতে হবে না।

কিন্তু আমি মনে মনে পাঁচশবার তাজ্জব মানলুম, এই নিরীহ তামিল ব্রাহ্মণের প্রাগে আসার কি প্রয়োজন? তখনকার দিনে প্রতি শহরে মেলা ইণ্টারন্যাশনাল কনফারেন্স বসত না যে, তিনি ভেটেরানারির 'রিওয়ারপেস্ট' কিংবা ভারতে বিদেশে ক' শ' মন গাঁজাগুলি চালান করতে পারবে, তাই নিয়ে পাণ্ডববর্জিত প্রাগে ভারতের প্রতিভূ হয়ে আলোচনা করতে আসবেন।

হোটেলে পৌঁছতে দেখি, সেখানেও আরেক কুরুক্ষেত্র। এরকম নিরীহ বিদেশী প্রাণী হোটেলের লোকও কখনো দেখেনি—প্রাগ তো প্যারিস নয়—

তাই তারা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে দশটায় বেরিয়ে লোকটা আটটা অবধি ফেরোন কেন? তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি সেখানে শার্লক হোমসেরই কদর পেলুম।

ভদ্রলোক চেপে ধরলেন, তাঁর সঙ্গে খানা খেয়ে যেতে হবে।

অপেরার টিকিট আমার কাটা ছিল—প্রাগের অপেরা ডাকসাঁইটে—কিন্তু আমার মনে হল, 'প্রালে তামিল ব্রাহ্মণ' যে-কোনো অপেরার টাইটলকে হার মানাতে পারে।

বললেন, 'খানাটা কিন্তু আমার ঘরেই হবে—ডাইনিংরুমে না!'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

ঘরে ঢুকেই তড়িঘড়ি স্যুট খুলে ফেলে ধুতি বের করে মাদ্রাজী কায়দায় সেটাকে লুঙ্গি বানিয়ে পরলেন, গায়ে চাপালেন শার্ট, আর কাঁধে ঝোলালেন তোয়ালে।

চেয়ারে বসে খাটে দু-পা তুলে দিয়ে বললেন, 'আঃ!'

এরকম দরাজ-দিল লোক আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি।

ওয়েটার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যখন বলে, এটা আনবো কি, সেটা আনবো কি, তিনি মাথা দুলিয়ে বলেন, 'ইয়েস, ইয়েস, ব্রিং, ব্রিং।'

বড় হোটেল। সেখানে 'আ লা কার্তে' অন্তত একশ' পদ রান্না হয়, তিনশ' রকমের মদ মজুত আছে। আমি বাধা দিতে গেলে তিনি বলেন, 'কি জ্বালাতন, ভালো করে খেতে দেবে না নাকি?'

অথচ তিনি খেলেন, আলু-কপি-মটর-সেদ্ধ, রুটি-মাখন, স্যালাড্ আর চা। বললেন, 'বুড়ো বয়সে আর মাছ-মাংসটা ধরে কি হবে?'

তবে তিনি নিশ্চয়ই এই প্রথম ইয়োরোপ এসেছেন। যে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে অন্যকে মাংস খাওয়ায় সে যৌবনে এলে নিজেও চেখে নিত।

ক্রমে ক্রমে পরিচয় হল। আই সি এস থেকে পেন্সন নিয়েছেন। ওদিকে শাস্ত্রী ঘরের ছেলে—বিস্তর সংস্কৃত সুভাষিত মুখস্থ। একটানা নানা রকমের গল্প বলে যেতে লাগলেন—প্রধানত শঙ্কর রামানুজের জীবনের চুটকিলা ঘটনা নিয়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে, 'লাইটার সাইড'। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে লাগলুম।

তবে কি রাতের অন্ধকার যেমন যেমন ঘনাতে লাগে, মানুষের মনের অন্ধকার ঘর তার দরজা আস্তে আস্তে খুলে দেয়? আমরা আহারাদির পর

বেলকনিতে ডেকচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়েছি, চোখ আকাশের দিকে। চতুর্দিকের ফ্ল্যাটের আলো আর রাস্তার বাতি নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারা জলজল করে ফুটে উঠছে। চেনা ঘরদোরের তুলনায় মানুষ তেমন কিছু ক্ষুদ্র জীব নয়, কিন্তু বিরাট গম্ভীর আকাশের মূর্তি যখন তারায় তারায় ফুটে ওঠে, তখন তার ক্ষুদ্র হৃদয় আর তার ক্ষুদ্রতর লৌকিকতা, সঙ্কীর্ণতা কেমন যেন আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যায়!

কোনো ভূমিকা না দিয়ে বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন, 'যার সঙ্গে গারি হয়, সেই ভাবে, এ-বুড়ো ইয়োরোপ এসেছে কি করতে? কি যে বলব, ভেবে পাইনে।'

এ তো তিনি আমাকে বলছেন না, আপন মনে ভাবছেন এবং হয়ত তাঁর অজানাতেই গলা দিয়ে সে ভাবনা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। আমি যে শুধু চুপ করলুম, তাই নয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও প্রায় বন্ধ করে আনলুম, যাতে তাঁর চিন্তাধারা কোনো প্রকারের টক্কর না খায়।

না, ভুল বুঝেছি। তিনি আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

বললেন, 'দেশের অনেকেই জানে, কিন্তু কেউ আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করেনি। এদেশে জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দিই নে। কিন্তু তোমাকে বলি। এতে অসাধারণ কিংবা কেলেঙ্কারির কিছুই নেই—থাকলে মানুষ চুপ করে থাকে না, সব সময়েই ফলিয়ে বর্ণনা করে আপন সাফাই গায়।

'আমি বড় সুখী ছিলুম। স্ত্রী, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। দুটি ছেলেই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে এম. এ.-তে সংস্কৃতে আর ইকনমিক্সে। মেয়েটির বিয়ে ঠিক—জামাইয়ের চেহারা কন্দর্পের মত।

'চাকরি জীবনে মাদুরা, কাঞ্চী, তাঞ্জোর বহু জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু পৈতৃক ভদ্রাসনে যাবার কখনো সুযোগ হয়নি; আমিও গ্রাম ছেড়েছি, ষোল বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পরেই।

'হঠাৎ গৃহিণী চেপে ধরলেন—আমি তখন সবেমাত্র পেন্সন নিয়েছি—তিনি তাঁর শ্বশুরের ভিটে দেখতে যাবেন। ছেলেরাও বলে যাবে, মেয়েটার তো কথাই নেই। আমি অনেক করে বোঝালুম, সেখানে এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই; সাপ আছে, খবরের কাগজ নেই, মশা আছে, পাইখানার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, তারা যাবেই যাবে। আমারও যে সামান্য দুর্বলতা হয়নি, সে কথা হলফ করে বলতে পারব না।

'বিশেস করবে না, বাবা, তারা গ্রাম দেখে মুগ্ধ। আমি তো ট্রেনে পই-পই করে গ্রামটাকে যতদূর সম্ভব কালো করে এঁকেছিলুম, তাদের শক্‌টা যেন বড্ড বেশি কঠোর কঠিন না হয়। তারা গাইলে উল্টো গান। ইঁদারা থেকে জল তুললো হৈহৈ করে—মাদ্রাজে কলের জল বন্ধ হলে এরাই 'দি হিন্দু' কাগজে কড়া কড়া চিঠি লিখত—, মেয়েটা দেখি, ছোট ছোট ইঁট নিয়ে বাস্তু-ভিটের গর্তগুলো বন্ধ করছে, গৃহিণী শুকনো তুলসীতলায় অনবরত জল ঢালছেন।

'বড় আরাম পেলুম। গৃহিণীর কথা বাদ দাও, তিনি সতী-সাধ্বী, কিন্তু আমার 'মর্ডার্ন' ছেলেমেয়েরাও যে আমার চতুর্দশ পুরুষের ভিটেকে তাচ্ছিল্য করল না, তাই দেখে আমার চোখে জল ভরে এল!

'আমার ছেলেবেলায় যারাই গ্রাম থেকে চলে যেত, তারা আর ফিরে আসত না। আমায় বাবা তাই আমাকে কতবার বলেছেন, তার ঠিক নেই, 'বেণুগোপাল, দেশের ভিটেমাটি অবহেলা করিস নি, আর যা কর কর।'

'চাকরির ধান্দায় আমি তাঁর সে আদেশ পালন করতে পারিনি। এখন দেখি, আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর সে আদেশ পালন করছে। বসে বসে প্ল্যান করছে, কোথায় রজনীগন্ধা ফোটাবে, কোথায় পাঁচিল তুলবে, কোথায় নাইট স্কুল খুলবে। আমার গৃহিণী সার্থক গর্ভধারিণী।'

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। আমি আরো বেশি চুপ। বললেন, 'এর পর আর বলার কিছুই নেই, তাই সংক্ষেপে বলি। মাত্র দুদিন কেটেছে; তিন দিনের দিন সকালবেলা মেয়েটার কলেরা হল ঘণ্টাখানেকের ভিতরে ছেলে দুটোরো। লোক ছুটিয়ে মাদ্রাজে তার করলুম। আরো লোক ছুটলো এখানে-সেখানে ডাক্তার-বদ্যির সন্ধানে। দশ ঘণ্টার ভিতরে তিনজনই চলে গেল। গৃহিণীর চোখের সামনে।

'তিনি গেলেন তার পরদিন। কলেরায় না অন্য কিছুতে বলতে পারিনে।

আমি তখন সম্বিতে ছিলুম না।'

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'থাক, আর না।'

আমার আপত্তি যেন শুনতে পাননি। বললেন, 'মাদ্রাজে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে আমার ব্যাঙ্কার আমার স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা কইতে চাইলে—সে জানতো আমাদের টাকা-পয়সার বিষয় আমি কিছুই জানিনে। তার কাছ থেকে শুনলুম, গৃহিণী ভালো ভালো শেয়ার কিনে লাখ তিনেকের মত জমিয়েছিলেন!

'তাই বেরিয়ে পড়েছি। টমাস কুক যেখানে নিয়ে যায়, সেখানেই যাই।'

'ওদের ছবি দেখবে? চলো, ঘরের ভিতরে যাই।'

মনোজ বসুর ভাষায় জাহাজে বসে 'কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে' চলে গিয়েছিলুম, হঠাৎ হুঁশ হল আমি পদ্মায় নই, প্রাগে নই, আমি বসে আছি জিনীভা লেকের জাহাজে।

জাহাজে অর্কেস্ট্রা গানের পর গান বাজিয়ে যাচ্ছে আর ডেকের মাঝখানে বিস্তর লোক টাঙ্গো, ওয়াল্‌ট্‌স্, ফক্স ট্রট নাচছে। আর সে কত জাতবেজাতের লোক,—বড় বড় চেক কাটা কোট-পাতলুন-পরা মার্কিন (আমাদের মাড়োয়ারী ভাইয়ারা যে রকম 'বড়া বড়া বুট্টাদার' নক্সা পছন্দ করেন), নিখুঁত নিপুণ লিপ-স্টিক-রুজ-মাখা তন্বঙ্গী ফরাসিনী, গাদা-গাদা হাব্বা-হাব্বা জর্মন আর ডাচ্, গায়ে কালো নেট্ আর লেসের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎনয়নী হিস্পানী রমণী, আপন হাম্বড়াইয়ের দম্ভে-ভরা একটুখানি আলগোছে-থাকা ইংরেজ আর তাদের উঁচু-নিচুর-টক্করহীন হকির বাঘিনী, টেনিস-পাগলিনী স্পোর্ট্‌স রমণী।

এই হরতন রুইতন সায়েব বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান কল্কে পাবে কি?

তা পায়—আকসারই পায়।

তার প্রধান কারণ, আর পাঁচটা ইয়োরোপীয় এবং মার্কিন জাত সুইটজারল্যাণ্ডে এসেছে ফুর্তি করতে, এদেশের মেয়েদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে। তার কলকৌশল নাচের ভিতর দিয়ে, ভাষার অজ্ঞতার ভান করে, দামী দামী মদ খাইয়ে—এরা বিলক্ষণ জানে এবং কাজে খাটাতে কিছুমাত্র কসুর করে না। এদের সম্বন্ধে তাই সুইস বাপ, ভাই, মা, দিদি এমনকি মেয়েরাও একটুখানি সাবধান।

ভারতীয় মাত্রই যে এদের তুলনায় 'ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির' এ-কথা আমি বলব না। কিন্তু ইয়োরোপ বাসের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় মদ খেতে কিংবা খাওয়াতে জানে না, নাচতে পারে না এবং সবচেয়ে বড় কথা তার ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে সে কণামাত্র তালিম পায়নি বিদেশিনীর সঙ্গে কি করে দোস্ত-ইয়ার্কি জমাতে হয়।

আমি 'ৎসুরিশ সংবাদ' পড়ছিলুম। পড়া শেষ হতে কাগজখানা টেবিলের

উপর রাখামাত্রই আমার পাশের টেবিলের এক ছোকরা এসে আমাকে 'বাও' করে বললে, 'আমার 'বাজেল সংবাদে'র বদলে আপনার 'ৎসুরিশ সংবাদ'খানা এক মিনিটের জন্য পেতে পারি কি ?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।'—এ ছাড়া আপনি আর কি বলবেন ?

কিন্তু পষ্ট বোঝা গেল আলাপ জমাবার জন্য সরকারি রাস্তা ধরেই সে যাত্রা শুরু করেছে। কারণ এতক্ষণ ধরে সে তার সঙ্গের দু'টি মেয়ের সঙ্গেই গল্প গুজব বা নাচ-গান করছিল—কাগজ পড়ার ফুর্সৎ কই ?

তবু কাগজখানা যখন নিয়ে গিয়েছে তখন দু' মিনিট পড়ার ভান করতে হয়। তাই করল। ফেরত দেবার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে হেসে বললে, 'আজকাল কিস্সু নূতন খবর মেলে না।'

আমি বললুম, 'একদম না ; সব যেন দড়কচ্চা মেরে গিয়েছে।'

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললো, 'যা বলেছেন।'

এরপর আপনাকে অবশ্যই বলতে হয়, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ; বসুন।'

কিন্তু কিন্তু করে বসবে, তারপর আরো দু' মিনিট না যেতেই বলবে 'তার চেয়ে চলুন না আমাদের টেবিলে। আমার সঙ্গে দু'টি বান্ধবী রয়েছেন। তাঁরা বড্ড একলা পড়ে গেলেন।'

আপনি বলবেন, 'রাম রাম ! বড্ড ভুল হয়ে গেল আপনাকে ঠেকিয়ে রেখে।'

ছোকরা বলবে, 'সে কি কথা, সে কি কথা।'

এই হল প্রধান সরকারি পন্থা, আলাপ পরিচয়-করার—অবশ্য আরো বহু গলিঘুঁচিও আছে।

বড়টির নাম গ্রেটে, ছোটটি ট্রুডে। ছেলেটার নাম পিটু। পিটু বলবে 'কিছু একটা পান করুন।'

আমি বললুম, 'এইমাত্র কফি খেয়েছি ; এখন আর থাক—অনেক ধন্যবাদ।'

এইবারে যে আলাপচারি আরম্ভ হবে তার চৌহদ্দী বাতানো সরল কর্ম নয়। সাধু সন্ন্যাসীরা সত্যি পেরেকের বিছানায় দিনের পর দিন কাটাতে পারেন কিনা, গোখরোর বিষ ওঝা নামাতে পারে কিনা, কিংবা যোগাভ্যাস করে মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উঠে যেতে কাউকে কখনো আমি দেখেছি কিনা ?

ছেলেটা যদি দর্শনের ছাত্র হয় তবে হয়ত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসবে, মেয়েটির যদি বাজনায় শখ থাকে তবে আপনাকে শুধিয়ে বসবে, ভারতীয় সঙ্গীতে ক' রকমের তাল হয়।

এসব তাবৎ প্রশ্নের সদুত্তর কে দেবে? ব্রজেন শীল, সুনীতি চাটুয্যে, বিশ্বকোষ, সুকুমার রায়ের 'নোটবুক', গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা সব মিলিয়ে ককটেল্ বানালেও ঐ প্রশ্নমরু তাকে বেমালুম শুষে নেবে।

বিদেশী একথা বোঝে না যে, তার ঠিক যে জিনিসে কৌতূহল আপনার তাতে মহত্ত্বৎ নাও থাকতে পারে। তার উপর আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আমরা ইস্কুল-কলেজে যে তালিম পাই তাতে ক্রুসেডের তারিখ মুখস্থ করানো হয়—অজন্তা, ধ্রুপদ শেখানো হয় না।

তবে অতি অবশ্য স্বীকার করবো, একটি প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিষ্ঠান আমি চিনি যিনি এসব প্রশ্নের উত্তম উত্তম উত্তর দিতে পারেন।

হেদোর ওতর-পূর্ব কোণের 'বসন্ত রেস্টুরেন্ট'! সেখানে আমরা সুবো-শাম রাজা-উজীর কতল করি, হেন সমস্যা, হেন বখেড়া নেই যার ফৈসালা আমরা পত্রপাঠ করে দিতে পারিনে।

'বসন্ত রেস্টুরেন্টের' আমি আদি ও অকৃত্রিম সভ্য। তস্য প্রসাদাৎ আমি হরমুল্লুকে হর-সাওয়ালের জবাব দিতে পারি।

বিদেশীদের সম্বন্ধে ভারতীয়ের কৌতূহল কম। কলকাতায় বিস্তর চীনা থাকে; আমি আজ পর্যন্ত একজন বাঙালীকেও দেখেনি, যিনি উৎসাহী হয়ে চীনাদের সঙ্গে আলাপচারি করেছেন। মাত্র একটি বাঙালী চিনি, যিনি ছেলেবেলা থেকে কাবুলীওয়ালাদের সঙ্গে ভাব করে দোস্তী জমিয়েছিলেন—কাবুলীরা এখন এদেশে দুর্লভ হয়ে যাওয়াতে তাঁর আর শোকের অন্ত নেই।

ইয়োরোপীয়রা সংস্কৃত যে রকম পড়ে, আরবী চীনা ভাষারও তেমনি চর্চা করে! তাই আমার মনে সব সময়েই আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, ভারতীয় সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি কেন?

পিট্‌কে জিজ্ঞেস করতে সে বললে, 'পণ্ডিতেরা কেন ভারতপ্রেমী হন, সে কথা আমরা বলতে পারবো না, তবে আমার মত পাঁচজন সাধারণ লোকের কথা কিছু বলতে পারি।

'প্রাচ্যের তিন ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় আছে। ভারত, আরবভূমি আর চীন। তুর্কদেরও আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি কিন্তু তারা অনেকখানি ইয়োরোপীয় হয়ে গিয়ে গিয়েছে, আর তিব্বত সম্বন্ধে কৌতূহল পুষে আর লাভ কি? তিব্বতীরা তো এদেশে আসে না।

'আরবরা সেমিটি, চীনারা মঙ্গোলীয়। এদের ধরনধারণ এত বেশি

আলাদা যে, এরা যেন অন্য লোকের প্রাণী বলে মনে হয়। অথচ ভারতীয়রা আর্য—তাই এরা চেনা হয়েও অচেনা। এই ধরুন না, যখন চীনা বা আরব ফরাসী-জর্মন বলে, তখন কেমন যেন মনে হয় ভিন্ন বাজছে। অথচ ভারতীয়রা যখন ঐ ভাষাগুলোই বলে তখন মনে হয় একই যন্ত্র বাজছে, শুধু ঠিকমত বাঁধা হয়নি।

আরেকটা কারণ বোধহয় খ্রীষ্টের পরই—সময়ের দিক দিয়ে নয়, মাহাত্ম্যে —মহাপুরুষ বলতে আমরা বুদ্ধদেবের কথাই ভাবি। এখন অবশ্য অনেকখানি মন্দা পড়েছে, কিন্তু এককালে এখানে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে প্রচুর বই বেরিয়েছিল। তার কারণ উনবিংশ শতাব্দীর লোক ভগবানে বিশ্বাস হারায়, অথচ একথা জানত না যে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও শুধু যে ধার্মিক জীবনযাপন করা যায় তাই নয়, ধর্মপত্তনও করা চলে। তাই যখন বুদ্ধের বাণী এদেশে প্রথম প্রথম প্রচার হল, তখন বহু লোক সে বাণীতে যেন হারানো মাণিক ফিরে পেল। কেউ কেউ তো আদমশুমারীর সময় নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে জাহির করল।

'এযুগে গাঁধী পরম বিস্ময়ের বস্তু। অস্ত্রধারণ না করে বিদেশী ডাকুকে তাড়ানো যায় কিনা জানি নে। কিন্তু গাঁধীর প্রচেষ্টাটাই বিশ্বজগৎকে একদম আহাম্মুখ বানিয়ে দিয়েছে। আমি অনেক ধার্মিক ক্রীশ্চানকে চিনি, যাঁরা গাঁধীর নাম শুনলেই ভক্তিতে গদ্‌গদ হন। একজন তো বলেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন খ্রীষ্ট এবং মাত্র একটি লোক সে ধর্ম স্বীকার করেছেন, তিনি গাঁধী।'

ট্রুডে বললে, 'টেগোরের নাম করলে না?' পিট্ বললে, 'টেগোরকে চেনে এদেশের শিক্ষিত লোক। তার কারণও রয়েছে। এযুগে সাধারণ লোক পড়ে প্রধানত খবরের কাগজ। খবরের কাগজে গাঁধীর কথা দুদিন অন্তর অন্তর বেরয়, কিন্তু টেগোরের কথা বেরয় তিনি যখন এদেশে আসেন।'

ট্রুডে বললে, 'আর বুদ্ধদেবের কথা বুঝি খবরের কাগজে নিত্যি নিত্যি বেরয়, না তিনি প্রতি বৎসর এখানে স্কেট করতে আসেন?'

গ্রেটে বললে, 'ছিঃ, বুদ্ধদেবকে নিয়ে ওরকম হাল্কা কথা কইলে বুদ্ধদেবের দেশের লোক হয়ত ক্ষুণ্ণ হবেন।'

আমি বললুম, 'আদপেই না। আমাদের দেশে দেবতাদের নিয়ে মজার মজার গল্প আছে।'

পিট্ বললে, 'বুদ্ধদেব যে একশ' বছরের স্টার্ট পেয়ে বসে আছেন।'

ট্রুডে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনাদের ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে যে সব মজার গল্প আছে, তারই একটা বলুন না।'

আমি শিব বেজায়গায় একবার বর দিয়ে যে কি বিপদে পড়েছিলেন, আর শেষটায় বিচক্ষণ নারদ তাঁকে কি কৌশলে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গল্পটি বললুম।

তিনজনেই হেসে কুটিকুটি।

ট্রুডে জিজ্ঞেস করলে, 'শিব কি ভাণ্ডর দেবতা?'

আমি বললুম 'নিশ্চয়। তবে কিনা তিনি শ্মশানে থাকেন, ভূতের নৃত্য দেখেন, কাপড়চোপড়ও সব সময় ঠিক থাকে না। দেবতাদের পার্লিমেন্টে সচরাচর যান না।'

সবাই অবাক হয়ে শুধায়, 'তবে তিনি ভাণ্ডর হলেন কি করে?'

এইখানে আমি হামেশাই একটু বিপদে পড়ে যাই। নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য যে এদেশের ঘোর সংসারী মনকেও মাঝে মাঝে ব্যাকুল করে তোলে, সেটা ইয়োরোপীয়রা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। 'আরো চাই', 'আরো চাইয়ের' দেশে 'কিছু না', 'কিছু না'র তত্ত্ব বোঝাই কি প্রকারে? আমি যে বুঝেছি তা-ও নয়।

তবে ইয়োরোপের সর্বত্রই মেয়েরা হরপার্বতীর বিয়ের বর্ণনা শুনতে বড ভালোবাসে। বিশেষ করে যখন বরযাত্রায় বলদের পিঠে শিবকে দেখে মেনকা চিৎকার করে তাঁকে খেদিয়ে দেবার জন্যে আদেশ দিলেন, আর যখন শুনলেন তিনিই বর এবং ভিরমি গেলেন—তখন মেয়েরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আমি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে উত্তেজনাটা বাড়ানোর জন্য ধীরে ধীরে একটি সিগ্রেট ধরাই।

'তারপর, তারপর?' সবাই চেঁচায়।

জানি অসম্ভব। তবু তখন এ-ক'টি ছত্র অনুবাদ করার চেষ্টা করি।

ভৈরব সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে, তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্য রুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবীবল্লরী মূলে
ভালে মাথা পুষ্পরেণু—চিতাভস্ম কোথা
গেছে মুছি

কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে-
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে
কবির পরাণে ॥

এদৃশ্য আমি একমাত্র সুইটজারল্যাণ্ডেই দেখেছি।

পশ্চিমের সূর্য হেলে পড়েছে আর তার লাল আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলোর হাজার হাজার কাচের সার্শীতে। সার্শীগুলো লালে লাল হয়ে গিয়ে একাকার—মনে হয় বাড়িগুলো বুঝি মিনিটখানেকের ভিতরই পুড়ে খাক হয়ে যাবে। আগুনের জিভের মত লালের আঁচ উঠছে আকাশের দিকে, আর তারই রঙ গিয়ে লেগেছে দূর পাহাড়ের চুড়োয় সাদা বরফে। সেখানেও লেগে গেছে দাউদাউ করে আগুন। পাহাড়ের কোলে-বসা-মেঘগুলোও সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাচ্ছে; ওদিকে আকাশের এখানে-ওখানে যে সব মেঘের টুকরো সমস্ত দিন সাদা ভেড়ার মত আকাশের নীল মাঠে শুয়ে ছিল তারা দেখি পূর্ব-পশ্চিমের আগুনে তেতে গিয়ে গোলাপি হয়ে উঠেছে। সেই লাল রঙের আওতায় পড়ে নীল পাহাড় আর হ্রদের নীল জল ঘন বেগুনী রঙ মেখে নিয়েছে।

চতুর্দিকে হুলস্থূল কাণ্ড; কিন্তু নিঃশব্দে। মেঘে মেঘে, আকাশে-আকাশে পাহাড়পর্বতে, ঘড়বাড়িতে এমনকি জলেবাতাসে এই যে বিরাট অগ্নিকাণ্ডটা হয়ে যাচ্ছে তাকে নেভাবার জন্য চেঁচামেচি-চিৎকার হচ্ছে না, আগুনের তাপে কাঠ-বাঁশ ফেটে-যাওয়ার ফট্ ফাট্ দুম্-দড়াম্ শব্দ হচ্ছে না, ঐ যে লেকের পাড়ে সোনালী বেঞ্চিতে বসে আছে মেয়েটি তার সাদা ফ্রকে আগুন লেগেছে, সেও তো চিৎকার করে কেঁদে উঠছে না। এ কী কাণ্ড!

এ আগুনের জ্বালা নেই, না, এদেশের জনমানব-পশুপক্ষীকে কোনো এক ভানুমতী ইন্দ্রজাল দিয়ে অসাড়-অচেতন করে দিয়েছেন? হাঁ, এ তো ইন্দ্রজালই বটে। এতখানি আগুন, লক্ষ লক্ষ কলসী থেকে উজাড় করে ঢেলে-দেওয়া এতখানি গলানো সোনা, হাজার হাজার মণ গোলাপি পাপড়ি লোধ্র-রেণু, না জানি কত-শত জালা আবীর-গুলাল এ রকম অকৃপণ হাতে ঢেলে দিলে, ছড়িয়ে ফেললে স্বর্গপুরীকেও লাল বাতি জ্বালাতে হবে—হয়ত এ আগুন থেকেই পিদিম ধরিয়ে নিয়ে।

এ তো কনে-দেখার আলো নয়; এ তো সতীদাহের বহ্নিকুণ্ড।

গ্রেটে আর ট্রুডের ব্লণ্ড্ চুল অদৃশ্য হেয়ার-ড্রেসারের হাতে সোনালি হয়ে গেল। পিট্ কথা বলবার সময় ঘন ঘন হাত নাড়ে; মনে হচ্ছে যেন সোনালি জলে হাত দুখানি সাঁতার কাটছে।

সূর্য পাহাড়ের পিছনে অতি ধীরে ধীরে অস্তাচলে নেমে গিয়েছেন। আবার সেই ভানুমতী এসেছে। অদৃশ্যে তিনি ঘন ঘন এখানে-ওখানে উড়ে গিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে মেঘের গা থেকে আবির তুলে নিয়ে কাজল মাখিয়ে দিচ্ছেন, ফুঁ দিয়ে এক এক সার সার্শী থেকে আগুন নিবিয়ে দিচ্ছেন, কখনো বা দেখি লেকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি জলের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন—যেন গোবর দিয়ে আঙিনা লেপে দেওয়া হল।

এ দৃশ্য সুইটজারল্যাণ্ডেও নিত্যি নিত্যি ঘটে না। জাহাজের ব্যাণ্ড তাই দুই নাচের মাঝখানে এখন অনেকখানি সময় নিচ্ছে। জাহাজের বহু নরনারী স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এরকম সূর্যাস্ত কমই হয় যেখানে তুমি আমিও হিস্সেদার—স্পষ্ট দেখলুম তোমার কাপড়ের আগুন লেগে গিয়েছিল আমার কাপড়েও। আপন অজানাতে আমাদের দেহ, আমাদের বেশভূষা এ রসের সায়রে ছোট ছোট দ' সৃষ্টি করে তুলেছে।

ট্রুডে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দেশে এরকম সূর্যাস্ত হয়?'

আমি বললুম, 'কাশ্মীরে হয়; সেখানে বরফ আছে, পাহাড় আছে, লেক আছে। কিন্তু হাজার হাজার চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে জানালার সার্শী নেই বলে হয়ত এতখানি আগুন ধরে না। তবে যদি হিমালয়কে ভারত বলে গোণা হয় তবে নিশ্চয়ই এর চেয়েও বেশী আগুন-জ্বালা সূর্যাস্ত সেখানে হয়—সুইস পর্যটকদেরই দেখাতে পড়েছি।'

ভানুমতী দিকে দিকে কাজলধারা বইয়ে দিয়েছে। চতুর্দিক অন্ধকার।

শুধু ফুটে উঠেছে অন্ধকার-ঘাসের উপর লক্ষ লক্ষ বিজলি-বাতির ফুল। আকাশের ফরাশেও দেবতারা জ্বালিয়ে দিয়েছেন অগুণতি তারার মোমবাতি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, পাহাড়ের উপরের দিকে যে আলোগুলো জ্বলছে সেগুলো মানুষের প্রদীপ না দেবতার তারা। মানুষ স্বর্গের দিকে ধাওয়া করে উঠেছে পাহাড়ে, আর দেবতারা নেমে এসেছেন পৃথিবীর দিকে ঐ পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত—একে অন্যকে অন্ধকারের এপার-ওপার থেকে সাঁঝের পিদিম দেখাবার জন্য

"মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব'লে।
সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে।
সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশিস আনি,
অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জ্বলে।"

পিট বললে, 'একটি প্রেমের গল্প বলুন।'

আমি বললুম, ভারতবর্ষে সত্যকার প্রেমের গল্প আছে একটি, যার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের গল্প পাল্লা দিতে পারে না। সে কাহিনীতে মাটির মানুষ তার আপন বিরহবেদনার বর্ণনা শুনতে পায়, আবার ভগবদপ্রেমের জন্য ব্যাকুল জনও সেই কাহিনীতে আপন আকুলি-বিকুলির নিবিড়তম বর্ণনাও শুনতে পায়। কিন্তু রাধামাধবের সে কাহিনী বলবার মত ভাষা আমার নেই।'

ট্রুডে বললে, 'আমি একখানা ছবি দেখেছি তাতে রাধা কৃষ্ণের গায়ে পিচকারি দিয়ে লাল রঙ মারছেন। চমৎকার ছবি!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি পিট্‌কে বললুম, 'তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি আপনার প্রেমের গল্প বলুন না।'

পিট্ তো বেশ খানিকটা ঠা ঠা করে হাসল—দু পাত্রের পর মানুষ অল্পতেই হাসে কাঁদে—তারপর বললে, 'হ্যারগট্ হ্যারগট্ (রামচন্দ্রর!), এ যুগে কি আর সে রকম প্রেম কারো জীবনে আসে যা নিয়ে রসিয়ে গল্প জমানো যায়?'

ট্রুডে বললে, 'বলেই ফেল না ছাই তোমার সাদা-মাটা গল্পটা।'

গ্রেটে দেখি চুপ করে আছে।

পিট্ বললে, 'আমার প্রেমে পড়ার কাহিনীতে মাত্র সামান্য একটু বিশেষত্ব আছে। সেইটুকু বুঝিয়ে বলি।

'আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। ফার্স্ট পিরিয়েডে ক্লাস থাকত না বলে আমি বাড়ি থেকে বেরতুম ন'টার সময়। একদিন ন'টার কয়েক মিনিট পরে কলেজের কাছেই একটি মেয়ে আমার পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। হাবভাব

দেখে মনে হল কলেজেরই ছাত্রী কিন্তু আসল কথা সেইটে নয়—আসল কথা হচ্ছে ওরকম সুন্দরী আমি আর কখনো দেখিনি।

'আমার বুকের রক্ত হুম্ করে জমে গেল; আমার হার্টটা যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে পৌঁছে গেল। আমি অনেকক্ষণ সেই রাস্তার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। সেদিন আর ক্লাস করা হল না; কলেজের বাগানে বসে বসে সমস্ত সকালটা কাটল।

'পরদিন ঠিক ঐ সময়ই মেয়েটি আমাকে রাস্তায় ক্রস্ করল। এবারে দুজনাতে চোখাচোখি হল—এক ঝলকের তরে। তারই ফলে আমাকে রাস্তার পাশের রেলিঙ ধরে সে নজরের ধাক্কা সামলাতে হল।

'তারপর রোজই ঐ সময় রাস্তায় দেখা হয়, এক লহমার চোখাচোখি হয়। বুঝলাম, মেয়েটির সেকেণ্ড পিরিয়েড ফ্রী তাই বোধহয় বাড়ি কিংবা অন্য কোথাও যায়।

'আগেই বলেছি, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। রোজ সকালে ন'টার পর তার সেই এক ঝলকের তরে আমার দিকে তাকিয়ে দেখা যেন আমার গলায় এক পাত্র সোনালি মদ ঢেলে দিত আর বাদবাকি দিন আমার কাছে আসমানজমীন গোলাপি রঙে রাঙা বলে মনে হত।

'করে করে তিন মাস কাটল।'

পিট্ মদের গেলাসে মুখ ঠেকাতে আমি শুধালুম, 'পরিচয় করবার সুযোগ হল না, তিন মাসের ভিতর? কলেজ ডান্সে, কলেজ রেস্তোরাঁ।—কোথাও?'

পিট্ বললে, 'ভয়, ভয়, ভয়। আমার মনে হত এরকম সুন্দরী কখনোই কোন অবস্থাতেই আমার মত সাদা-মাটাকে ভালোবাসবে না, বাসতে পারে না, অসম্ভব, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশ্বাস করবেন না, পাছে আলাপচারি হয়ে যায় আর সে আমায় অবহেলা করে সেই ভয়ে কোনো নাচের মজলিসে দেখা হলে আমি তৎক্ষণাৎ উর্ধ্বশ্বাসে সে স্থল পরিত্যাগ করতুম। তার চেয়ে পরিচয় না হওয়াটাই ঢের ঢের ভালো।'

আমি বললুম, 'টেগোরেরও গান আছে—

'সেই ভালো সেই ভালো আমারে না হয় না জানো
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে কাছে কেন লাজে লাজানো?'

পিট্ বলল, 'আশ্চর্য, টেগোর তো অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি এরকম মর্মান্তিক অনুভূতিটা পেলেন কোথায়?'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু মেয়েটিও তো আপনার দিকে তাকাত।'

'ঠিক বলেছেন, কিন্তু আমার মনে হত, মেয়েটি শুধু দেখতে চায়, এই বেশরম বাঁদরটা কত দিন ধরে এ তামাশা চালায়।'

আমি শুধালুম, 'তারপর?'

'তিন মাস হয়ে গিয়েছে। আমি প্রেমের পাখায় ভর করে চন্দ্রসূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রেমের এ পাখা দানা-পানি অর্থাৎ প্রতিদানের তোয়াক্কা করে না বলে এর কখনো ক্লান্তি হয় না; এ প্রেম আমার মনের বাগানে ফোটা জুঁই,—কারো অবহেলা-অনাদরের খরতাপে এ ফুল কখনো শুকবে না।

'কলেজের বাগানে বসে একদিন চোখ বন্ধ করে আমি আমার প্রিয়াকে দেখছি এমন সময় কাঁধে হাত পড়ল। চোখ মেলে দেখি আমার গ্রামের একটি পরিচিত ছেলে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার স্বপ্নের ফুল। পালাবার পথ ছিল না, পরিচয় হয়ে গেল।'

'তারপর?'

'আমার একদম মনে নেই। যেটুকু মনে আছে বলছি। হঠাৎ দেখি ছেলেটি উধাও, আর আমার স্বপ্ন তখনো মূর্তি ধরে পাশে বসে আছে। কিন্তু আসল কথায় ফিরে যাই। সেই যে ভয়ের কথা বলছিলুম। প্রথম আলাপেই আমি যে তার সঙ্গে পরিচয় করতে ডরাই সে কথা কি জানি কি করে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি অবাক হয়ে শুধাল, 'কিসের ভয়?' আমি বললুম, 'আপনি বড় বেশী সুন্দর।' তখন যা শুনলুম সে আমি তখনো বিশ্বাস করিনি এখনো করিনে—তার বিশ্বাস আমি একটা আস্ত এ্যাডনিস্ এবং তাই আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে সে ভয় পেয়েছিল! শুনুন কথা!'

আমি বললুম, 'আপনারা দুজনাই দেখতে চমৎকার কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা আছে এক ফার্সী প্রবাদে, 'লায়লীরা বায়দ্ ব্ চশ্মে মজনূন দীদ!' লায়লীকে দেখতে হয় মজনুর চোখ দিয়ে।'

জাহাজ পাড়ে এসে ভিড়ল। সবাই নেমে পড়লুম। 'আবার দেখা হবে' বলে পিট্, গ্রেটে, ট্রুডে বিদায় নিল।

আপন মনে বাড়ির দিকে চলতে চলতে একটা কথা ভাবতে লাগলুম; এই যে ইয়োরোপীয়রা প্রাণ খুলে ফুর্তি করে, হৈ-হল্লা করে, আমরা এ-রকম ধারা আপন দেশে করতে পারিনে কেন? সায়েবসুবোদের লেখাতে পড়েছি, আমরা

নাকি বড্ড সিরিয়স্, সংসারকে আমরা নাকি মায়াময় অনিত্য ঠাউরে নিয়ে মুখ গুমসো করে বসে আছি, ফুর্তি-ফার্তি করার দিকে আমাদের আদপেই মন নেই।

'জাতক' তো খ্রীষ্টের বহু পূর্ব লেখা। তাতে যে হরেক রকম পালা-পরবের বর্ণনা পাই তার থেকে তো মনে হয় না, আমরা সে যুগে বড্ড রাশভারি মেজাজ নিয়ে আত্মচিন্তা আর তত্ত্বালাপে দিন কাটাতুম। স্পষ্ট মনে পড়ছে কোন এক পরবের দিন এক নাগর তার প্রিয়ার মনস্তুষ্টির জন্য রাজবাগানে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে শূলের উপর প্রাণ দেয়। মরার সময় সে আক্ষেপ করেছিল, 'প্রিয়া, আমি যে মরছি তাতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কিন্তু তুমি যে পরবের দিনে ফুল পরে যেতে পারলে না সে দুঃখ আমার মরার সময়ও রইল।'

আমাদের কাব্যনাটক রাজরাজড়াদের নিয়ে—সেখানে হদীস মেলে না আমাদের সাধারন পাঁচজন আনন্দ উৎসব করত কি না এবং করলে কী ধরনে করত। শুধু 'মৃৎশকটিকা' আর 'মালতীমাধবে' সাধারণ লোকের সবিস্তর বর্ণনা রয়েছে এবং এ দুটি পড়ে তো মনে হয় না এ সময়ের সাধারণ পাঁচজন আজকের দিনের ইয়োরোপীয়দের তুলনায় কিছু কম আয়েস করত। মৃৎশকটিকায়' রান্না-ঘরের যে বর্ণনা পাই তার তুলনায় সুইটজারল্যাণ্ডের যে-কোনো রেস্তরাঁ নস্যাৎ। আর 'মালতীমাধবের' নাগর মাধববাবু তো জাহাজের পিট্টু সায়েবকে প্রেমের লীলাখেলায় দু কলম তালিম দিতে পারে।

তবে কি নিতান্ত এ যুগে এসেই আমরা হঠাৎ বুড়িয়ে গিয়েছি? তাও তো নয়। হুতোমের কেতাবখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিন—বাবুরা তো কিছুমাত্র কম চলাঢলি করেননি। তবে কি এই বিংশ শতক এসে হঠাৎ আমাদের ভীমরতি ধরল? তাও তো নয়। ফুটবল খেলা দেখতে এক কলকাতা শহরই যা পয়সা উড়োয় তার অর্ধেক বোধ হয় তামাম সুইটজারল্যাণ্ডও করে না।

ফুটবল সিনেমা লোকে দেখুক—আমার আপত্তি আছে কি নেই সে প্রশ্ন উঠছে না। আমি শুধু ভাবি এসব আনন্দে উত্তেজনার ভাগটা এতই বেশি যে মানুষ যেন সেখানে স্থায়ী কোনো কিছু সন্ধান পায় না। আমার মনে হয়, স্টিমারে বা ট্রেনে, সত্যযুগে, যখন ভিড় বেশি হত না তখন ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করাতেও আনন্দ ছিল অনেক বেশি। বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে তবু এখনো ...ন পড়ছে দু'একজন যথার্থ সুরসিককে। এঁরা কামরায় উঠেই পাঞ্জাবির

বোতাম খুলে দিয়ে কোঁচা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে যা গল্প জুড়তেন তার আর তুলনা হয় না। আমরা গুটিকয়েক প্রাণী রোজই এক কামরায় উঠতুম আর এঁরা কামরাখানিকে গালগল্প দিয়ে প্রতিদিন রঙীন করে দিতেন। অসুখ করে আমাদের কেউ দু'দিন কামাই দিলে এঁরা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, কোনো কৌশলে দুটো ডাব কিংবা চারটি ডালিম পাঠানো যায় কি না তার আন্দেশা করতেন কিন্তু যাক্, এ বাবতে 'রূপদর্শী' আমার চেয়ে ঢের বেশি ওকাব-হাল।

আমি ভাবছি, সেই সব আনন্দের কথা যেখানে অজানা জনকে চেনবার সুযোগ হয়। উদয়াস্ত তো আমরা বসে আছি সাংসারিকতার মুখোশ পরে। আপিসে যারা আমার কাছে আসে তারা আসে স্বার্থের খাতিরে, বাড়িতে যাঁরা আসেন তাঁরা বন্ধুজন, তাঁদের আমি চিনি, তাঁরা আমায় চেনেন কিন্তু নূতন পরিচয় হবে কি প্রকারে?

তাই ট্রেনের স্বল্পক্ষণের পরিচয় অনেক সময় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ট্রেনে তুমি আমাকে চেন না, আমি তোমাকে চিনিনে। আলাপচারিটা কোনো স্বার্থের খাতিরে আরম্ভ হয় না বলে শেষ পর্যন্ত সে যে কত অন্তরঙ্গতায় দুজনকে নিয়ে যেতে পারবে তার কোনো স্থিরতা নেই।

অবশ্য এখন আমরা সব মেকি সায়েব হয়ে গিয়েছি। আগের আমলের মত কেউ যদি শুধান, 'বাবাজীর আসা হচ্ছে 'কোন্ থেকে' কিংবা 'বাবাজীরা—?' অর্থাৎ 'বাবাজী বামুন, কায়েত না বদ্যি?' তাহলে আমরা বিরক্ত হই। কেন হই, তা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারিনে।

ইংরেজ শুনেছি হয়। আমি বলতে পারব না। কারণ আমি পারতপক্ষে কোনো ইংরেজের সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইনে। অবশ্য কোনো ইংরেজ আলাপ করতে চাইলে আমি খেঁকিয়ে উঠে তাকে প্লাবও করিনে। কিন্তু ফরাসী জর্মন সুইস অন্য ধরনের। তারা অনেক বেশি মিশুকে। কাফে বা মদের দোকানে তারা যে রোজ সন্ধ্যায় আড্ডা জমায় সেখানে কোনো সদস্য যদি কোনো নূতন লোক নিয়ে উপস্থিত হয় তবে আর পাঁচজন আনন্দিত হয়। ইংরেজের ক্লাবে যদি কোনো সদস্য আপন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তবে আর পাঁচজন তার দিকে ষাড়নয়নে তাকায়। কোনো কোনো ক্লাবে তো কড়া আইন, আপনি মাসে ক'দিন ক'জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন।

জর্মন, ফরাসী, সুইসদের ভিন্ন রীতি। 'পাবে', কাফেতে ইয়ারদোস্ত যোগাড়

করার পরও তাদের প্রাণ ভরে ওঠে না বলে যায় ফূর্তির জাহাজ চড়তে। সেখানে কত দেশের কত লোকের সঙ্গে আলাপ হবে—

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

কলকাতায় এসে শুনতে পেলুম, বর্তমানে নাকি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মরসুম যাচ্ছে। আশ্চর্য লাগলো। বঙ্কিম আরম্ভ করলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সামাজিক—কিঞ্চিৎ রোমান্টিক-ঘ্যাঁষা—উপন্যাস, শরৎচন্দ্র লিখলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ে, তারাশঙ্কর তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায় নিয়ে। এর পর আবার হঠাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস কি করে যে ডুব-সাঁতারে রিটার্নজার্নি মারলে ঠিক বোঝা গেল না। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি; কাজেই আর পাঁচজনের মত হতভম্ভ হতে আমার কোন আপত্তি নেই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাকি এখন জোর কাটতি। আবার একাধিক জন বলছেন, এগুলো রাবিশ। পাঁচজনের মত আমি আবার হতভম্ভ।

কিন্তু এতে করে আমার ব্যক্তিগত উপকার হয়েছে। বছর পঁচিশেক পূর্বে আমাকে বিশেষ কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। সে যুগের প্রায় সব কেতাবপত্রই ফার্সীতে। বহু কষ্টে তখন অনেক পুস্তক যোগাড় করেছিলুম। তার কিছু কিছু এখনো মনে আছে। মাঝে মাঝে আজকের দিনের কোনো ঘটনা হুবহু 'শেষ মোগলদের' সঙ্গে মিলে যায় এবং লোভ হয় সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু সে সব কেতাবপত্র এখন পাই কোথায়? স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে।

কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক উপন্যাসই এক্ষণে আমার পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। ধরে নিন্, আমি ঐতিহাসিক উপন্যাসই লিখছি।

মারাঠারা যখন গুজরাত সুবা (বা সুবে অর্থাৎ প্রদেশ, প্রভিন্স) দখল করে তার রাজধানী অহমদাবাদে ঢুকল তখন সেখানকার দেওয়ান (প্রাদেশিক প্রধান-মন্ত্রী) মুস্তাফিজ্‌খানার (আর্কাইভ্‌স্-এর তাবৎ কাগজপত্র বাড়ি নিয়ে গিয়ে গুজরাত-কাঠিয়াওয়াড়ের একখানা প্রামাণিক ইতিহাস লেখেন। বইখানি তিনি

দিল্লীর বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলাকে ডেডিকেট করেন। ইতিহাসের নাম 'মিরাৎ-ই-আহমদী'। পুস্তকের মোকদ্দমায়* তিনি বাদশা-সালামৎকে উদ্দেশ করে বলেন, যে-রাজনীতি অনুসরণ করার ফলে দিল্লীর বাদশারা গুজরাতের মত মাথার-মণি প্রদেশ হারালেন সে-নীতি যদি না বদলানো হয় তবে তাবৎ হিন্দুস্থানই যাবে। সেই নীতির প্রাথমিক স্বর্ণযুগ, ক্রমবিকাশ ও অধঃপতন তিনি সেই ইতিহাসে ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেই ইতিহাস থেকে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে লিখছি—তাই আবার বলছি ভুলচুক হলে ধরে নেবেন, এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একবার পর পর কয়েক বৎসর ধরে গুজরাতে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দলে দলে লোক অহমদাবাদ পানে ধাওয়া করে; সেখানে যদি দু'মুঠো অন্ন জোটে। অগণিত পিতামাতা তাদের পুত্র-কন্যাকে দাস-দাসীরূপে বিক্রয় করে দেয়। গুজরাতি মেয়েরা যে টাকা-মোহর ফুটো করে অলঙ্কার হিসেবে পরে সেগুলো পর্যন্ত বিক্রয় করে দেয়। বিস্তর লোক উপবাসে মরলো।

গুজরাত সুবার সুবেদার (গভর্নর, কিন্তু বর্তমান গভর্নরের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা ধরতেন এবং দেওয়ানের সঙ্গে এক জোটে প্রদেশ চালাতেন) তখন অহমদাবাদের সব চেয়ে ধনী শ্রেষ্ঠীকে পরামর্শের আমন্ত্রণ জানালেন। এইসব শ্রেষ্ঠীরা প্রধানত জৈন, এবং স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে করে বহু অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন (বর্তমান দিনের শ্রেষ্ঠী কস্তুরভাই লালভাই, হটিসিং এই গোষ্ঠীরই লোক)।

সুবেদার সেই শ্রেষ্ঠীকে শুধালেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কিছু করা যায় কি না। শ্রেষ্ঠী বললেন, মালওয়া অঞ্চলে এবারে প্রচুর ফসল ফলেছে, সেখানে গম-চাল পাওয়া যাবে। তবে দুই প্রদেশের মাঝখানে দারুণ দুর্ভিক্ষ। মালবাহী গাড়ি লুট হবে। অতএব তিনি দুই শর্তে দুর্ভিক্ষ-মোচনের চেষ্টা করতে পারেন: ১)

* বাংলায় মোকদ্দমা বলতে মামলা, 'কেস' বোঝায়। আরবীতে অর্থ অবতরণিকা। 'কদম' মানে পদক্ষেপ ('কদম কদম বঢ়হায়ে যা'); মোকদ্দমা প্রথম পদক্ষেপ, অবতরণিকা। আবার প্রথম পদক্ষেপ বলে তার অর্থ মামলা রুজু করার প্রথম কদম—এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে লাতিনে যাকে বলে প্রিমা ফাশি কেস্—কিন্তু বাঙলায় এখন মোকদ্দমা বলতে পুরো কেসটাই বোঝায়।

সুবেদার নিরাপদে মাল আনানোর জন্য সঙ্গে গার্ডরূপে ফৌজ পাঠাবেন, ২) মাল এসে পৌঁছুলে সুবেদার শ্রেষ্ঠীতে মিলে যে দাম বেঁধে দেবেন মুদীরা যদি তার বেশী দাম নেয় তবে তদ্দণ্ডেই তাদের কঠোর সাজা দেবার জিম্মাদারী সুবেদার নেবেন। সুবেদার সানন্দে সম্মতি দিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠী সুবেদারের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য চান নি।

বাড়িতে এসে শ্রেষ্ঠী বংশানুক্রমে সঞ্চিত অর্থ, অলঙ্কার-জওহরাৎ বের করলেন; স্ত্রী কন্যাকে তাঁদের অলঙ্কার পর্যন্ত খুলে দিতে বললেন।

সেই সমস্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডার নিয়ে শ্রেষ্ঠীর কর্মচারীরা সুবেদারের ফৌজ সহ মালওয়া পানে রওয়ানা দিলেন। কিছুদিন পরেই মুখে মুখে অহমদাবাদে খবর রটে গেল, মাল পৌঁছুল বলে। পথে লুটতরাজ হয় নি।

সেই সব গম ধান ও অন্যান্য শস্য যখন অহমদাবাদে পৌঁছুল তখন শ্রেষ্ঠী তাঁর একাধিক হাভেলি—বিরাট চক-মেলানো বাড়ি, এক সঙ্গে গোষ্ঠীর বহু পরিবার একই বাড়িতে বসবাস করতে পারে—খুলে দিয়ে আঙিনার উপর সেসব রাখলেন। তারপর সুবেদারের সঙ্গে হিসেব করলেন, কি দরে কেনা হয়েছে, রাহ-খর্চা (ট্র্যানস-পোর্ট) কত পড়েছে এবং তাহলে এখন কি দর বেঁধে দেওয়া যায়? সুবেদার বললেন, 'আর আপনার মুনাফা?' শ্রেষ্ঠী বললেন, 'যুগ যুগ ধরে মুনাফা করেছি ব্যবসা-বাণিজ্যে। এ ব্যবসাতে করবো না। যা খর্চা পড়েছে সেই দর বেঁধে দিন। মুদীর সামান্য লাভ থাকবে।' দাম বেঁধে দেওয়া হল।

এবারে শুনুন, সব চেয়ে তাজ্জবকী বাৎ। শ্রেষ্ঠী শহরের তাবৎ মুদীদের ডেকে পাঠালেন, এবং কোন্ মুদী কটা পরিবারের গম যোগায় তার শুমারী (গণনা) নিলেন। সেই অনুযায়ী তাদের শস্য দেওয়া হল। সোজা বাঙলায় আজকের দিনে একেই বলে রেশনিং। এবং তার সঙ্গে গোড়াতেই ব্যবস্থা, যাতে হোর্ডিং না হতে পারে। এবং ফেয়ার প্রাইস।

অহমদাবাদে চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস। ইতিমধ্যে শ্রেষ্ঠীর চর এসে জানালে অমুক মহল্লার দু'জন মুদী ন্যায্যমূল্য থেকে এক না দু' পয়সা বেশী নিয়েছে।

শ্রেষ্ঠী তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সেই মহল্লায় গিয়ে সর্বজন সমক্ষে তদন্ত করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সোজা সুবেদারের বাড়ি গেলেন। সুবেদার তখন ইয়ার-বক্সী* সহ

* বক্সী বা বখ্শী (বখ্শিশ কথা একই ধাতু থেকে) অর্থ, একাউন্টেন্ট জেনারেল, অডিটার জেনারেল ও ফৌজের চীপ পে-মাস্টার—এ তিনের সমন্বয়। কায়স্থরা প্রধানত এই দায়িত্বপূর্ণ চাকরি করতেন। প্রধান বা মীর বখ্শী নিয়োগ করতেন স্বয়ং দিল্লীর বাদশা-সালামৎ। আর

...াগমন সেলেব্রেট করছিলেন। কিন্তু পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বেরিয়ে এসে সব কিছু শুনে সেপাই পাঠালেন মুদীদের ধরে আনার জন্য। সাক্ষীসাবুদও যেন সঙ্গে সঙ্গে আনা হয়।

তদ্দণ্ডেই সুবেদারের সামনে সাক্ষীসাবুদ তদন্ত-তক্ক তীশ হয়ে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল সত্যই তারা বেশী দাম নিয়েছে।

সুবেদার হুকুম দিলেন, বড্ড বেশী 'খেতে চেয়েছিল' বলে মুদী দু'টোর পেট কেটে ফেলা হোক। তাই করা হল। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেল।

সবাই যেন এই দৃষ্টান্ত থেকে সজাগ সতর্ক হুঁশিয়ার খবরদার হয় সেই উদ্দেশ্যে সুবেদার হুকুম দিলেন, শহরের সব চেয়ে উঁচু দুটো উটের পিঠে তাদের লাশ বেঁধে দিয়ে নগর-পরিক্রমা করা হোক।

সমস্ত রাত ধরে তাই করা হল।

এরপর ঐতিহাসিক যেন নিতান্ত সাদা-মাটা ডালভাতের কথা বলছেন, ঐভাবে মন্তব্য করছেন, 'অতঃপর আর কেউ অন্যায্য মুনাফা করার চেষ্টা করে নি।'

(আমার হাতে যে পাণ্ডুলিপিখানা পৌঁছেছিল তাতে দেখি এ জায়গাটায় এ যুগের কোন্ এক সুরসিক পাঠক লিখছেন, 'we are not surprised!')

* * *

আমি আর কি মন্তব্য করবো? রেশনিং, ফেয়ার-প্রাইস, নো চান্স্ ফর হোর্ডিং, তন্মুহূর্তে তদন্ত, তদ্দণ্ডে দণ্ড, জনগণকে হুঁশিয়ারী দেওয়া এসবই হয়ে গেল চোখের সামনে। অবশ্য আমি নিরীহ প্রাণী, পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করার আদেশ শুনলে আমার গা শিউরে ওঠে। তবে যারা দিনের পর দিন রেশন-শপের লাইনে দাঁড়িয়েছেন, চোখের সামনে কালো-বাজার এবং যাবতীয় অনাচার দেখেছেন, পুত্রকন্যাকে কুচঘেচু খাওয়াতে বাধ্য হয়েছেন এবং বিত্তশালীরা কি কৌশলে তোফা খানাপিনা করছেন সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁরা হয়তো উল্লাস বোধ করবেন। আমি আপত্তি করবো না—কারণ পূর্বেই বলেছি, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি॥

সরাসরি নিয়োগ হতেন কাজী উল কুজ্জাৎ অর্থাৎ চীফ জাস্টিস, সদর্-উস্-সদর্ (সেই অঞ্চলে বাদশা-সালামতের আপন জমিজমা তদারকের জন্য, তথা কেউ নিঃসন্তান মারা গেলে তার সম্পত্তি অধিকার করতে)। সরকার = চীফ-সেক্রেটারী, কানুনগো = লিগেল রিমেম্-ব্রেনসার পদে নিযুক্ত হতেন। বখ্শীর কাছ থেকে টাকা পেয়ে ব্যবসায়ীরা সঙ্গে সঙ্গে সামনের বাজারে হুণ্ডি কাটতো বলে সে বাজারকে 'বখ্শী বাজার' বলা হত। বখ্শী সরকার ইত্যাদি বড় বড় এডমিনিসট্রেটিভ চাকরি প্রধানত কায়স্থরাই করতেন। ইংরেজ মোটামুটি এই পদ্ধতিই চালু রাখে।

কচ্ছের রাণ

ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে কথা হচ্ছিল। আর বলছিলুম, এতে করে আমার বড্ডই উপকার হয়েছে। ইতিহাস নিজেকে মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করে। চোখের সামনে যখন তাই কোনো কিছু একটা ঘটে, তখন স্মৃতিপথে আসে প্রাচীন দিনের ঐরকম কোনো একটি ঘটনা। প্রথম যৌবনে কোনো এক প্রাচীন ইতিহাসে পড়েছি। সে বই এখন আর পাবো না। একে ফার্সীতে লেখা, তদুপরি বইখানা হয়তো সে ভাষার পুস্তকের মাঝেও দুষ্প্রাপ্য। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ঐতিহাসিকের প্রতি অবিচার করা হবে।

ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কেউ যদি ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দেয় তবে নিঃশরমে বলবো, আমি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছি।

গুজরাতের ইতিহাস 'মিরাৎ-ই আহমদীর' কথা হচ্ছিল। বইখানা লেখা হয়, নাদির শাহ যখন ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে যান মোটামুটি সেই সময়। এ পুস্তক গ্রন্থকার আরম্ভ করেছেন জৈন সাধু মেরুতুঙ্গাচার্যের সংস্কৃতে লেখা গুজরাতের প্রাক্-মুসলিম যুগের ইতিহাসের* সারাংশ নিয়ে। তারপর আছে গজনীর সুলতান মাহমুদ† কর্তৃক সোমনাথ আক্রমণ।

সুলতান মাহমুদ এমনিতে বলতেন, তিনি কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন, কিন্তু সিন্ধুদেশ সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলমান অধিকারে। সে দেশ কি করে আক্রমণ করা যায়? সুলতান বললেন, 'সিন্ধুদেশের মুসলমানরা যদিও কাফির নয়, তবু কাফির-তুল্য—তারা হেরেটিক, অতএব আক্রমণ করা যায়।'

তা সে যাই হোক, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল কাঠিয়াওয়াড়ের সোমনাথ মন্দিরের বিরাট ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করা। সেটা সিন্ধুদেশ জয় না করে হয় না।

কিন্তু তার পরই আসে কচ্ছের রাণ। সেটা অতিক্রম করা সিন্ধু-বিজয়ের চেয়েও কঠিন। মাহমুদের সাঙ্গোপাঙ্গ তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা দিয়ে নিষ্ফল হলেন।

---

* সংস্কৃত বইখানার নাম আমার মনে পড়ছে না। বোধ হয় 'প্রবন্ধ চিন্তামণি'।

† মাহমুদ ও মুহম্মদ দুই ভিন্ন নাম। যে রকম হাসন হুসেন ও হাস্‌সান (হুস্সাওয়ার্দী) তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম।

কচ্ছের রাণ অতিক্রম করতে গিয়ে মাহমুদের ফৌজের অসংখ্য সৈন্য ও অশ্ব তৃষ্ণায় প্রাণ হারালো। চোরাবালিতেও অনেকে। তখনকার দিনের ঐতিহাসিকরা তার জন্য গাইডকে জিম্মেদার করেছেন ; সে নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু মাহমুদকে বাধ্য হয়ে ঐ পথেই ফিরে যেতে হয়েছিল। মাহমুদ ছিলেন ল্যাণ্ডলকট্ (অর্থাৎ যে দেশের সঙ্গে সমুদ্রের কোনো সংস্পর্শ নেই) দেশের লোক—হিটলারেরই মত।* তাই দ্বারকা থেকে নৌবহর জোগাড় করে 'ঠাট্টা' (করাচীর কাছে প্রাচীন বন্দর) যাবার সাহস করেন নি।

* * *

এর পর পাগলা রাজা মুহম্মদ তুগলুক এই কচ্ছের রাণের কাছে মার খান।

ফার্সী ঐতিহাসিক লিখেছেন 'তগী', ফার্সীতে 'ঠ' ধ্বনি নেই—শব্দটা বোধ হয় তাই 'ঠগি'। সেই তগী মধ্য-পশ্চিম ভারতে লুটতরাজ আরম্ভ করে। বাদশাহী ফৌজ বারবার তার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে বারবার বিফলমনোরথ হয়ে দিল্লী ফিরে আসে। মুহম্মদ রেগে টঙ। বললেন, 'আমি স্বয়ং যাবো।'

একটা সামান্য ডাকুর বিরুদ্ধে স্বয়ং হুজুর যাবেন !

না যাবোই।

হুজুর স্বয়ং আসছেন জেনে তগী অহমদাবাদ পালালো। হুজুর বললেন, চলো অহমদাবাদ। পরিষদরা মহা অসন্তুষ্ট। সেই সুদূর অহমদাবাদ—দিল্লী থেকে কত দিনের রাস্তা! হুজুর কিন্তু গোঁ ছাড়লেন না। অহমদাবাদে পৌঁছলে পর জানা গেল, তগী পালিয়েছে কাঠিয়াওয়াড়ে। হুজুর বললেন, 'চলো কাঠিয়াওয়াড়।' কিন্তু তখন বর্ষা নেমে গিয়েছে। এবং শ্রান্তি-ক্লান্তিতে হুজুরের হল জ্বর। কি জ্বর, আমি বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি নি। ম্যালেরিয়া খুব সম্ভব নয়। ম্যালেরিয়া বোধ হয় এ-দেশে পরে এসেছে। তা সে যাই হোক, হুজুর তামাম বর্ষাকালটা অহমদাবাদে জ্বরে ধুঁকে ধুঁকে রোগা-দুবলা হয়ে গেলেন। কিন্তু বর্ষা-শেষেও গোঁ

* ফ্রান্স জয়ের পর হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এর নাম অপারেশন 'সী লায়েন' (সমুদ্রসিংহ, জে ল্যোয়ে') কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা বাতিল করে দেওয়া হয়। তার বহুবিধ কারণ নিয়ে নানা গুণী নানা আলোচনা করেছেন। অন্যতম কারণ বলা হয়, হিটলার ল্যাণ্ডলক্ট্ দেশের লোক ছিলেন ব লে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে দুম্মাদুম্মা করতেন। গ্রীস জয় করার পর তিনি তাই ক্রীটদ্বীপ আক্রমণ ক্রমাগত পিছিয়ে দিয়ে ভুল করেন। ফলে রমেলও পুরো সাহায্য পেলেন না। এ দেশের মোগল-পাঠান রাজাদের বেলাও তাই। নৌবাহিনীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না বলে তাঁরা ইংরেজকে অবহেলা করেন। ফলে ভারতবর্ষ সমুদ্রপথে বিজিত হয়।

ছাড়লেন না—তাঁকে যে পাগলা রাজা বলা হত সেটা প্রধানত তাঁর গোঁর জন্যই—চললেন কাঠিয়াওয়াড়। তগী পালালো কচ্ছে। হুজুর গেলেন কচ্ছ। তগী পালালো কচ্ছের রাণের উপ দিয়ে সিন্ধুদেশে। সে ডাকাত—রাণের কোথায় কি, জানে—সেথানে একাধিক বার আশ্রয় নিয়েছে। তদুপরি সে তো আর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাচ্ছে না ; তার দানাপানীর আর কতটুকুই বা দরকার!

এবারে পারিষদরা তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। গজনীর মাহমুদ বাদশা যে রাণে কি রকম নাজেহাল হয়েছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাজসভার সরকারী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী (ইনি 'দিল্লী দূর অস্ত'-এর সাধু নিজামুদ্দীন আউলিয়া ও কবি আমীর খুসরুর নিত্যালাপী বন্ধু ছিলেন); তিনিও নিশ্চয়ই প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করেছিলেন। তদুপরি তুগলুক নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত। ইতিহাস ভূগোল উত্তমরূপেই জানতেন। কিন্তু হিটলার যদিও অত্যুত্তমরূপেই নেপোলিয়নের রুশ-অভিযান ও তার মারাত্মক ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং যদিও তাঁর সেনাপতিরা তাঁকে বারবার রুশ-অভিযান থেকে নিরস্ত থাকতে উপদেশ দেন, তবুও তিনি সেই কর্মটি করেছিলেন। এখানেও তাই হল। তুগলুক নিরস্ত হলেন না।

কচ্ছের রাণে বাদশা মুহম্মদ তুগলুকের কী নিদারুণ দুরবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা একাধিক ঐতিহাসিক দিয়েছেন। আজ আমার আর ঠিক মনে নেই, তাঁর সৈন্য এবং ঘোড়া-খচ্চরের ক'আনা বেঁচেছিল, আর ক'আনা মরেছিল।

এ সময়ের একটি ঘটনা ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন। রোগে জীর্ণ দুর্বল দেহ নিয়ে ঘোড়ার উপরে বসে মুহম্মদ তুগলুক ধুঁকতে ধুঁকতে এগচ্ছেন। এমন সময় তিনি ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীকে ডেকে পাঠালেন—কাউকে ডেকে না পাঠালে হুজুরের কাছে যাবার কারো অনুমতি ছিল না। বরনী কাছে এলে তুগলুক তাঁকে বললেন, 'আচ্ছা বরনী, তুমি তো জানো আমি আমার প্রজাদের কতখানি ভালোবাসি। আমি যে-সব ফরমান হুকুম জারি করেছি সে তো একমাত্র তাদেরই মঙ্গলের জন্য। তবে তারা একগুঁয়েমি করে আমার আদেশ অমান্য করে কেন?' তারপর শুধোলেন, 'আচ্ছা বরনী, তোমার কি মনে হয়, আমি বড্ড কড়া হাতে শাসন করেছি, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত শাস্তি দিয়েছি? তবে কি এখন আমার উচিত আরো ক্ষমা-দয়ার সঙ্গে শাসন করা?'

বরনী লিখছেন, 'এই শেষকালে যদি হুজুর হঠাৎ তাঁর নীতি বদলান তবে হয় তো আরো বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে ভেবে আমি নীরব থাকাটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলুম।'

এদিকে দিল্লীতে বসে তুগলুকের প্রধানমন্ত্রী পড়েছেন মহাবিপদে। হুজুরের কোনো খবর নেই। রাণ থেকে তো দূত পাঠানো যায় না, যে দিল্লী আসবে। দূত আর তার পার্টি পথে জল পাবে কোথায়? পিছন পানে অবশ্য মৃত্যু—সম্মুখ দিকে তবু বাঁচবার আশা আছে। কাজেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, হুজুরের কোনো খবর নেই। প্রধানমন্ত্রীর ভয়, খবরটা রটে গেলে তুগলুকের কোনো আত্মীয় বা অন্য কোনো দুঃসাহসী রাজা মরে গেছেন এই সংবাদ রটিয়ে কিছু সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে দিল্লীর তখতে না বসে যায়। রাজকোষ তখন তার হাতে এসে যাবে এবং ফলে সে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে নেবে। হুজুর যখন ফিরে আসবেন তখন তাঁর সঙ্গের সৈন্যদল পরিশ্রান্ত ক্লান্ত। হুজুর তখন লড়াই দেবেন কি করে? প্রধানমন্ত্রী তখন শুরু করলেন স্রেফ ধাপ্পা। হুজুর রোজ সকালে যে ঝরোকায় দাঁড়িয়ে দেখা দিতেন সেখানে প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলতেন, 'বড় আনন্দের বিষয়, আজও হুজুরের চিঠি পেয়েছি। হুজুর বহাল তবীয়তে আছেন। শিগগীরই রাজধানীতে ফিরে আসছেন।' তারপর আচকানের (অঙ্গরখা) ভিতরের জেব থেকে বগাস্ চিঠি বের করে, গভীর সম্মানের সঙ্গে সেটি চুম্বন করে উচ্চকণ্ঠে সেটি পড়ে শোনাতেন—আগাগোড়া নিছক গুল। তারপর আরো সসম্মানে চিঠিখানা চুম্বন করে পকেটে রেখে দিতেন।

প্রধানমন্ত্রী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ধাপ্পা, গুল, থিয়েটারি সব কুছকা এলেম পেটে ধরতে হয়।

ওদিকে অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জে হুজুর সিন্ধুনদের তীরে এসে পৌঁচলেন। তারপর কি হল আমার মনে নেই। পৌঁছেই হুজুর দিল্লী পানে ঘোড়-সওয়ার রওনা করলেন। তারা দিল্লী পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রীর ধড়ে জান এল।

হুজুর আর কচ্ছের রাণ ধরে দিল্লী ফিরলেন না। স্থির হল, নৌকায় করে সিন্ধু উজিয়ে উজিয়ে তারই উপনদী দিয়ে লাহোর পৌঁছবেন। উত্তম ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে রোজার মাস বা রমজান এল। হুজুর বললেন, 'উপোস করবো।' আমীর-ওমরাহ্ বললেন, 'হুজুর একে অসুস্থ, দুর্বল। তদুপরি ভ্রমণকালে উপবাস করা ইচ্ছাধীন—কুরান শরীফের আদেশ।' হুজুর তেড়ে বললেন, 'যে মুসাফিরীতে (ভ্রমণে) তকলীফ হয় আল্লাতালা সেইটের কথাই বলেছেন। আমরা তো যাচ্ছি আরামসে নৌকায় শুয়ে শুয়ে। আমি উপোস করবই।' পুনরায় গোঁ। তর্ক করবে কে? মুহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করবার মত এলেম কারো পেটে ছিল না। (আরেক ধনুর্ধর পণ্ডিত ছিলেন ঔরঙ্গজেব)।

কয়েক দিন পরে ধরা পড়ল একটি চমৎকার মাছ। কিন্তু এ জাতের মাছ দিল্লীবাসীরা কখনো দেখেন নি। তাঁরা বললেন, 'যে মাছ চিনি নে সেটা খাব না।' হুজুর বললেন, 'কুরান, হদীস কোনো শাস্ত্রে এ জাতীয় মাছের বর্ণনা দিয়ে খেতে যখন বারণ করা হয় নি তখন আমি ইটি খাবই।' আবার গোঁ।

খেলেন। দারুণ তেলওলা মাছ ছিল। হুজুরের শরীরও ছিল রোগা, রাগের ধকলে দুর্বল। পেট ছাড়লো। কিছুতেই বন্ধ হয় না। বোধ হয় তৃতীয় দিনে হুজুর ইন্তিকাল করলেন, অর্থাৎ পটল তুললেন।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন লিখছেন, 'এই প্রকারে হুজুর তাঁর অবাধ্য প্রজাকুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রক্ষা পেলেন; প্রজাকুলও হুজুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচলো।

* * *

আমি বঙ্গসন্তান। মাছের নামে অজ্ঞান। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, বাদশা-সালামৎ কি মাছ খেয়ে শহীদ হলেন।

বরনী, মিরাৎ দিয়েছেন মুসলিম চান্দ্র মাসের হিসাবে তুগলুকের মৃত্যুদিবস। তার থেকে কোন্ ঋতুতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ধরা যায় না। বিস্তর ক্যালেণ্ডার ঘেঁটে যোগবিয়োগ করে বের করলুম ঋতুটি।

আমার এক সিন্ধী দোস্ত আছেন; ইতিহাসে তাঁর বড়ই শখ। তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে শুধালুম।

তিনি বললেন, 'নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, পাল্লা মাছ।'

* * *

গঙ্গা উজিয়ে যেটা আসে বা একদা আসতো, সেটা ইলিশ—হিল্সা। নর্মদা উজিয়ে ঐ মাছই যখন আসে তখন ব্রোচের (Broach—ভৃগুকচ্ছ) লোক এটাকে বলে মদার, পার্সীরা বলে বিম্। সিন্ধু উজলে এই মাছকেই বলে পাল্লা।

অনেকেই অনেক কিছু চড়ে স্বর্গে যান; ঐরাবত, পুষ্পকরথ, কত কি?

শাহ-ইন্-শাহ বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ তুগলুক শাহ ইলিশ চড়ে স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে যাবেন না তো কোথায় যাবেন? ইলিশ খেয়ে যেপ্রাণ দেয় সে তো শহীদ—মার্টার।

দর্শনাতীত

ছন্নের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি বিরাট বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে। সবে এসেছি 'গ্যাশ' থেকে—হাইকোর্টটি দেখিয়ে দেবার মতও কোনো খাটাশকে পাচ্ছি নে। কিন্তু রমণীজাতি দয়াশীলা—বেদরদীরা বলে হরবকৎ শিকার-সন্ধানী—আমার সঙ্গে কথা কইলে নিজের থেকে। আমি তখন বিবর্ণ বিস্বাদ বদখদ কোন এক মাংস, তদধিক বিজাতীয় হর্স-ক্যাবেজ (সচরাচর এ বস্তু ঘোড়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেওয়া হয়) খাবার চেষ্টা করছি, চোখের জলে নাকের জলে। সব শুনে বললে, 'দর্শন? তা হলে শ্মিটকে মিস্ করো না; বুড়ার বয়স আশী পেরিয়ে গেছে, কখন যে পটল তুলবে (জর্মনে বলে 'আপজেগ্‌লেন') ঠিক নেই।'

পোড়ার দেশে লেকচার-রূমে সীট রিজার্ভ করতে হয়। প্রাগুক্ত যুবতীটি ধানী-লঙ্কার মত এফিশেন্ট। সাত দিন পরে প্রথম লেকচারে গিয়ে দেখি, একদম পয়লা কাতারে পাশাপাশি দু'খানা চেয়ার রিজার্ভ করে বসে আছে প্রফেসারের চেয়ার থেকে হাত আষ্টেক দূরে।

অধ্যাপক এলেন ঘণ্টা পড়ার মিনিট পাঁচেক পরে। বয়েস আশী না, মনে হবে সোয়া-শো—যেভাবে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকলেন। ইয়া বিরাট লাশ। ফ্রলাইন উরজুল লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। বুড়া রোষকষায়িত লোচনে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাত দু'খানা অল্প তুলে ধরলেন। উরজুল এক দিকের ওভারকোটটা তাঁর দেহ থেকে মুক্ত করার পর তিনি অতি কষ্টে শরীরে একটু মোচড় দিলেন। এই গুহ্যতম তান্ত্রিক মুষ্টিযোগ প্রসাদাৎ তিনি তাঁর ওভারকোটের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করলেন। শেষনাগকেও বোধ হয় তাঁর বাৎসরিক খোলস থেকে মুক্ত হতে এতখানি মেহন্নৎ বরদাস্ত করতে হয় না।

ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে উঠে চেয়ারে আসন নিলেন। সচরাচর অধ্যাপকরা প্ল্যাটফর্মের নিকটতম কোণে উঠেই বক্তৃতা ঝাড়তে আরম্ভ করেন। ইনি চুপচাপ বসে রইলেন ঝাড়া পাঁচটি মিনিট। ধবধবে সাদা কলারের উপর হাঁড়াপানা তাঁর বিরাট মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তাতে অন্তত ডজনখানেক কাটাকুটের দাগ। লেকচার আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইতে বারণ নেই। আমি উরজুলকে শুধালুম, 'মুখে ওগুলো কিসের দাগ?'

'ফেনসিঙের। সিনমাতে দেখ নি, লম্বা সরু লিকলিকে তলওয়ার দিয়ে একে অন্যের কলিজা ফুটো করার পাঁয়তারা কষে? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তলওয়ার নাকের কাছে এলেও ইনি পিছু-পা তো হোনই নি, মাথাটা পর্যন্ত পিছনের দিকে ঠেলে দেন নি। প্রত্যেকটি কাটাতে ক'টা স্টিচ লেগে ছিল ওঁকে শুধোতে পারো।'

আমি বললুম, 'উনি না দর্শনের অধ্যাপক!'

হ্যাঁ, কিন্তু ওঁর বাপ-পিতামো ছিলেন কট্টর প্রাশান ঐতিহ্যের পাঁড় জেনারেল গুষ্টি; তাঁদের বর্মের মত শক্ত হৃদয় ভেঙে ইনি দর্শনের অধ্যাপক হয়ে গেলেন। কৈশোরে বোধ হয় সে মতলব ছিল না। তাই ছুঁদে ছুঁদে ফেনসারদের চেলেঞ্জ করে এসব অস্ত্র-লেখার কলেক্‌শন্ আপন মুখে নিয়ে বাকী জীবন দর্শন পড়াচ্ছেন। তাইতে বাপ-দাদার ততোধিক মনস্তাপ যে, এমন পয়লানম্বরী তলওয়ারবাজ হয়ে গেল মেনিমুখো মেস্টার-মেলের একজন।'

আমি বললুম, 'পেন্ ইজ মাইটিয়ার দেন সর্ড!'

'ছোঃ! ভদ্রলোক জীবনে এক বর্ণ কাগজে কলমে লেখেন নি—সাত ভলুমি কেতাব দূরে থাক, এক কলমের প্রবন্ধ পর্যন্ত না। কলমই ওঁর নেই। বোধ হয় টিপসই দিয়ে—'

অধ্যাপক ছাদ-ছোঁয়া গ্যালারির উপরনিচ ডান-বাঁ'র উপর চোখ বুলিয়ে আরম্ভ করলেন—ওঃ সে কি গলা! যেন নাভিকুণ্ডলী থেকে প্রণবনাদ বেরুচ্ছে, 'মাইনে ডামেন্ উন্‌ট্ হেরেন্!'—'আমার মহিলা ও মহোদয়গণ!' তার পর দম নিয়ে বললেন, অন্যবারের মত এবারেও আমি রেকটরকে'—তার পর গলা নামিয়ে বিড়-বিড় করে বললেও সমস্ত ক্লাশই শুনতে পেল—'আস্ত একটা গাধা—'

আমার তো আক্কেল গুড়ুম। রেকটর যিনি কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা, তাঁকে গর্দভ বলে উল্লেখ করা—তা সে বিড়বিড় করেই হোক আর রাসভকণ্ঠেই হোক—এ যে অবিশ্বাস্য!

অধ্যাপক বলে যেতে লাগলেন, 'রেকটরকে আমি অনুরোধ জানালুম, আমাকে এই টার্ম থেকে নিষ্কৃতি দিতে। অর্বাচীন বলে কিনা, আমাকে না হলে তার চলবে না। এ উত্তর আমি ইতিপূর্বেও শুনেছি। তার পূর্বের রেকটর—' আবার বিড়বিড় করলেন, 'বলদ, বলদ! স্রেফ বলদ—তাকেও আমি একই অনুরোধ করেছিলুম, এবং একই উত্তর পেয়েছিলুম। তার পূর্বের রেকটর—কিন্তু কাহিনী সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন নেই—এবং তার পূর্বেরও সবাই একই উত্তর দেয়। বস্তুত, মাইনে ডামেন্ উন্‌ট্ হেরেন্, গত বাইশটি বৎসর ধরে আমি এই একট উত্তর

শুনে আসছি। মনে হচ্ছে, অরিজিনালিটি রেকটর সম্প্রদায়কে এড়িয়ে চলেন। তা সে যাক, তাদের বক্তব্য, আমাকে ছাড়া চলবে না, আমি ইনডেস্‌পেন্‌সিবিল।'

এবারে তিনি স্বয়ং সিন্ধী বলদের মত ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে কি সাতিশয় সন্তাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, জর্মনি এমনই চরম অবস্থায় পৌঁছেছে যে, এদেশে আর দার্শনিক নেই ? কিন্তু এই আমার শেষ টার্ম। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।' তার পর চোখ বন্ধ করে খুব সম্ভব প্রথম বক্তৃতায় প্রথম কি বস্তু দিয়ে আরম্ভ করবেন তার চিন্তা করতে লাগলেন। উরজুল আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'তাঁর শেষ টার্ম! এ ভয় তিনি দিচ্ছেন পঁচিশ বছর ধরে দেখাচ্ছেন—প্রতি টার্মের গোড়ায়।' বুড়ার চোখ বন্ধ হলে কি হয়, কান দিব্য সজাগ। চোখ খুলে বললেন, 'নো' আবার নো। এই আমার শেষ টার্ম—কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

তার পর গ্রীক দর্শন নিয়ে আরম্ভ করলেন। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি অনুকরণ করা অসম্ভব। কারণ, তাঁর পড়ানোটা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো তাঁর স্মৃতিশক্তির উপর। সে স্মৃতিশক্তি বিধিদত্ত। কোন্‌ সালের, কোন্‌ বইয়ের, কোন অধ্যায়ে, এমন কি মাঝে মাঝে কোন্‌ পাতায় কি তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো বলে যেতে লাগলেন কোনো প্রকারের নোট না দেখে। প্রত্যেকটি সেণ্টেন্স স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভাষা সরল। এবং মাঝে মাঝে প্লাতো, আরিস্ততল বোঝাতে গিয়ে হঠাৎ মারেন দু'হাজার বছরের ডুব-সাঁতার। এ যুগের কে তার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা করেছেন, কোথায়, কোন্‌ পরিচ্ছেদে—তার সবিশদ বর্ণন। আমি হতভম্ব।

ঘণ্টা পড়তে আস্তে আস্তে উঠলেন। ফ্রলাইন উরজুল তাঁকে পুনরায় ওভার-কোট পরিয়ে দিলেন। ধীরে মন্থরে করিডরে নামলেন।

আমি উরজুলকে বললুম, 'এ কী কাণ্ড। গণ্ডাখানেক রেকটরকে ইনি গাধা-বলদের সঙ্গে—?'

'ওঃ! এঁরা সবাই এসব জানেন। এঁরা সবাই তাঁর ছাত্র।'

'ওঁকে ছুটি দেয় না কেন ?'

'সকলেরই বিশ্বাস, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাল তুলবেন বলে। মাধ্যাকর্ষণ নয়, দর্শনাকর্ষণ তাঁকে ইহলোকে আটকে রেখেছে।'...

এখানে রোল-কল হয় না। টার্মের গোড়াতে ও শেষে আপন আপন 'স্টুডেণ্টস বুকে' অধ্যাপকের নাম দু'বার সই করিয়ে নিতে হয়।

গোড়ার দিকে ভিড় ছিল বলে হাল্কা হলে পর আমি আমার 'বুক' নিয়ে

পাতলুম। এ যাবৎ অন্ত কারো সঙ্গে তিনি বাক্যবিনিময় করেন নি। আমাকে দেখে চেয়ারে আরামসে হেলান দিয়ে বললেন, 'আঃ! বাঃ বাঃ! তার পর? আচ্ছা। বলুন তো আপনি কি জর্মন বেশ বুঝতে পারেন?'

আমি বললুম, 'অল্প, অল্প।'

'বেশ, বেশ। তা—তা, আপনি কোন্ দেশ থেকে এসেছেন?' 'ইণ্ডিয়া।'

কেন যে এতখানি তাজ্জব হয়ে তাকালেন বুঝতে পারলুম না। বললেন, 'ইণ্ডিয়া? কিন্তু ইণ্ডিয়াই তো দর্শনের দেশ। আপনি এখানে এলেন কেন?'

আমি সবিনয় বললুম, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু আধুনিক দর্শনে জর্মনির সেবা ও দান তো অবহেলার বিষয় নয়।'

কী আনন্দে, কী গর্বে অধ্যাপকের সেই কাটাকুটি-ভরা মুখ যে প্রসন্ন হাস্যে ভরে গেল, সেটি অবর্ণনীয়। শুধু মাথা দোলান আর বলেন,'বস্তুত তাই,প্রকৃতপক্ষে তাই।'

এবারেও যখন তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করলেন তখন আমি যেন 'তুমি' শুনতে পেলুম। তাঁর বিরাট সাদা মাথাটা আমার দিকে ঠেলে কাছে এনে বেদনা-ভরা গলায় বললেন,'কিন্তু জানো,ভারতীয় দর্শন—অবশ্য সব দর্শনই দর্শন—শেখবার সুযোগ আমি পাই নি। ব্যাপারটা হয়েছে কি, আমার যৌবনে ভারতীয় দর্শনের জর্মন-ইংরিজি অনুবাদ পড়তে গিয়ে দেখি সব পরস্পরবিরোধী বাক্যে পরিপূর্ণ। আমি বললুম, "এ কখনই হতে পারে না। ভারতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরকম কথা বলতে পারেন না। যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা কতখানি জর্মন জানেন জানি নে, কিন্তু দর্শন জানেন অত্যল্প, এবং ভারতীয় দর্শনে তাঁদের অপরিচিত যে দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ সেটা আদৌ বুঝতে পারেন নি।" ছেড়ে দিলুম পড়া, বিরক্তিতে। কিন্তু জানো, বছর দশেক পূর্বে আমার ছাত্র—' তিনি রেকটরের নাম করলেন—'অমুক—ভারী ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে—আমাকে বললে, এখন নাকি কম্পিটেণ্ট অনুবাদ বেরুচ্ছে। কিন্তু ততদিনে আমি বড্ড বুড়িয়ে গিয়েছি। নূতন করে নূতন 'স্কুলে' যাবার শক্তি নেই। বড় দুঃখ রয়ে গেল।'

আমি একটু ভেবে যেন সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'তার জন্য আর অত ভাবনা কিসের, স্যর? হিন্দুরা পরজন্মে বিশ্বাস করে। আপনি এবারে জন্ম নেবেন কাশীর কোন দার্শনিকের ঘরে।'

এবারে তাঁর যে কী প্রসন্ন অট্টহাস্য! শুধু বলেন, 'ঐ তো! ঐ তো! বাঃ বাঃ! বেশ, বেশ। যাক, শেষ দুশ্চিন্তা গেল।'

তারপর শুধালেন, 'বক্তৃতা সব বুঝতে পারো তো?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে, জর্মন ভালো জানি নে বলে মাঝে মাঝে বুঝতে অসুবিধে হয়।'

অধ্যাপক বললেন, তখন হাত তুলো ; আমি সব ভালো করে বুঝিয়ে বলবো।'

আমি কাচুমাচু হয়ে বললুম, 'আমার জর্মন জ্ঞানের অভাব বশত সমস্ত ক্লাস সাফার করবে—এটা কেমন যেন—'

গুরু গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমার বুকের উপর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে—'আমি একশজনকে পড়াবো না একজনকে পড়াবো, কাকে পড়াবো আর কাকে পড়াবো না, সেটা স্থির করি একমাত্র আমি।'

*　　　　*　　　　*

আমার দুর্ভাগ্য, আমি খুব বেশী দিন তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইনি। পরের টার্মেই তিনি ওপারে চলে যান।

তার পর প্রায় ৩৫ বৎসর কেটে গিয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত সংস্কার যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পৃথিবী নামক জায়গাটিতে এক বারের বেশী দু'বার পাঠান না। একই নিষ্ঠুর স্থলে একাধিকবার পাঠিয়ে একই দণ্ড দেওয়ার মধ্যে কোনও বৈদগ্ধ্য (রিফাইনমেন্ট) নেই। তবু যখন কোনো যুবাজনের মুখে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা শুনে মনে হয়, এ-তরুণ এর কিছুটা গভীরে ঢুকতে পেরেছে, তখন আপন অজান্তে তার চেহারায় জর্মনগুরুর বিরাট কাটাকুটি-ভরা, হাঁড়াপানা চেহারার সাদৃশ্য খুঁজি॥

মা-মেরীর রিস্ট-ওয়াচ

একদা রম্য রচনা কি রীতিতে উত্তমরূপে লেখা যায়, এই বাসনা নিয়ে কলেজের ছেলের বয়সীরা আমাকে প্রশ্ন শুধাতো ; অধুনা শুধোয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস কি প্রকারে লেখা যায় ? আমি বাঙালী, কাজেই বাঙালীর স্বভাব খানিকটে জানি—পাঁচু, ভূতো আর পাঁচজন যে ব্যবসা করে—যথা পাব্লিশিং হাউস কিংবা লণ্ড্রী—পয়সা কামিয়েছে, সে সেইটেই করতে চায়, নূতন ব্যবসার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ। অতএব হাল-বাজারে যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস ছেড়ে দিয়ে কালোবাজারের চেয়েও সাদা-বাজারে লাভ বেশী, তবে চলো ঐ লালকেল্লা ফতেহ্ করতে ; মা-মেরীতে বিশ্বাস রাখলে কড়ি দিয়েও কিনতে হবে না, সায়েবের মুন্সীও ঐ আশ্বাস দিয়েছেন।

যাঁরা পণ্ডিত লোক, ইতিহাস জানেন ও উপন্যাস লেখার কায়দাটাও যাঁদের রপ্ত আছে, তাঁরাই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে পারেন। আমি ও আমার মত আর পাঁচজন পারে না, আমরা পণ্ডিত নই। কিন্তু পণ্ডিত না হয়েও দিব্য বুঝতে পারি, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে যাওয়ার বিপদটা কি?—পাখীর মত উড়তে না জেনেও চমৎকার বুঝতে পারি মনুমেন্টের উপর থেকে লাফ দিয়ে পাখীর মত ওড়বার চেষ্টা করলে হালটা মোটামুটি কি হবে।

এই তো হালে একটি সপ্তাহিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অলস নয়নে পড়লুম, "তুমি ওমরাহ নও।'

সর্বনাশ! এটা কি প্রকার হল? 'ওমরাহ' তো 'আমীরে'র সাদামাটা বহুবচন—যে রকম 'গরীব' থেকে 'গুরবাহ'; তাই বলি 'গরীব-গুরবো'। সেই আইনেই বলি 'আমীর-ওমরাহ' ('আমীর-ওমরো' শুনেছি; আকারান্ত শব্দ বাঙালায় 'এ' 'ও' তে আকছারই পরিবর্তিত হয়, যেমন 'ফিতে' 'জুতো'—এর কোনো পাকা নিয়ম নেই)। আরবী বা ফার্সী শব্দের একবচন এবং বহুবচন পাশাপাশি বসিয়ে আমরা অনেক সময় বাঙলায় কালেকটিভ নাউন তৈরি করি—যেমন 'আমীর-ওমরাহ্' অর্থাৎ 'আমীরসম্প্রদায়' কিংবা 'গরীব গুরবো' 'দীনসম্প্রদায়' 'দীনজন'। তা সে যাই হোক, 'ওমরাহ' কথাটা বরহক্ বহুবচনেই আছে। কাজেই যে রকম আপনি 'আমীরসম্প্রদায় নন' ব্যাকরণে ভুল, তুমি 'ওমরাহ নও' ভুল।

(ঠিক সেই রকম 'আলিম্' পণ্ডিতের বহুবচন 'উলেমা'—জমিয়ৎ-ই-উলাম-ই হিন্দ: অনেকেই না জেনে ইংরিজীতে লেখেন ulemas।)

কাজেই প্রথম চোরাবালি শব্দ নিয়ে। ঠিক ঠিক অর্থ না জানলে আমাদের মত অপণ্ডিত জন খায় মার। ঠিক সেই রকম গুপ্তযুগের উপন্যাস লিখতে গিয়ে না ভেবে ফুটিয়ে দিলুম রজনীগন্ধা, কৃষ্ণচূড়া—শব্দ দুটো থেকে বিশেষ করে যখন সংস্কৃতের সুগন্ধ বেরিয়েছে—অথচ দুটো ফুলই এদেশে এসেছে অতি হাল আমলে। এবং শুধু শব্দার্থ জানলেই হয় না—রূঢ়ার্থে তার ব্যবহার জানতে হয়। তসবী*-

* কত না হৃদ্য চুমিলাম আমি
তসবীমালার মত,
কেউ খুলিল না কিস্মতে ছিল
আমার গ্রন্থি যত।

অর্থাৎ তসবীমালা জপ করে এক সাধু অন্য সাধুর হাতে তুলে দেন, কিন্তু কেউই দয়া করে মালার সুতোটি কেটে মুক্তোগুলোকে মুক্তি দেন না।

খানা কথাটির দুটো শব্দই আমরা চিনি—যে ঘরে বসে বাদশা তসবীমালা জপ করেন। মোগল আমলে কিন্তু ঐ ঘর ছিল অতিশয় গোপন (top secret) মন্ত্রণালয়।

কেউ যদি লেখেন 'অতঃপর সম্রাট ঔরঙ্গজেব সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত রাত কুরান শরীফ ঘেঁটেও কোনো হদীস পেলেন না', তবে বাঙালী পাঠক এ-বাক্যে কোন দোষ পাবেন না। কারণ হদীস বা হদিশ বলতে বাঙালা পাঠক প্রিসিডেন্স বা পূর্ব উদাহরণ বোঝে। কিন্তু কুরানে হদীস খোঁজা আর বেদে মনুসংহিতা খোঁজা একই রকমের ভুল। কুরানে আছে পয়গম্বরের কাছে প্রেরিত ঐশী বাণী—আপ্তবাক্য। আর হদীসে আছে পয়গম্বর কি ভাবে জীবন যাপন করতেন, কাকে কখন কি করতে আদেশ বা উপদেশ দিয়েছিলেন ইত্যাদি (এগুলোও অতিশয় মূল্যবান—কিন্তু আপ্তবাক্য নয়)। কাজেই এগুলোর (হদীসের) সন্ধান কুরানে পাওয়া যাবে কি করে? বস্তুত কোনো অর্বাচীন সমস্যা ও তার সমাধান কুরানে না পেলে আমরা হদীসে (শাস্ত্রে 'স্মৃতির' সঙ্গে তুলনীয়) যাই। সেখানে না পেলে ইজমাতে এবং সর্বশেষে কিয়াসে। কিন্তু শেষের দুটো স্মৃতিশাস্ত্রের গভীরে—ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যল্প। তা সে যাই হোক, মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যে, কিছুটা জ্ঞান বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেটা প্রধানত বিস্ময়বোধক বাক্যে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ফরাসী উপন্যাসের ইংরিজী অনুবাদে 'মঁ দিয়ো' 'পার ব্ল্যু' 'ভঁত্র ব্ল্যু'-গুলো ইংরেজ ফরাসীতেই রেখে দেয়; জর্মন উপন্যাসের অনুবাদে 'মাইন গট্' 'হ্যার গট্' 'ডনার ভেটার' মূলের মত রেখে দেয়। এগুলোর অনুবাদ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, মঁ দিয়ো, মাইন গট্ এবং মাই গড একই জিনিস, একই বাক্য হলেও ইংরেজের পক্ষে 'মাই গড' বলা নিন্দনীয়, নিতান্ত বিপাকে না পড়লে ইংরেজ 'মাই গড' বলে না। পক্ষান্তরে ফরাসী জর্মন কথায় কথায় 'মঁ দিয়ো' 'মাইন গট্' বলে থাকে। তাই ইংরিজী অনুবাদের সময় মূলের আবহাওয়া রাখবার জন্য অনুবাদক এগুলো অনুবাদ করেন না।

অলহমদুলিল্লা, মাশাল্লা, ইয়া আল্লা, তওবা তওবা, বিসমিল্লা এগুলো অবস্থাভেদে ব্যবহৃত হয়। 'আপনার ছেলে এম-এ পাশ করেছে? তওবা তওবা!' (বা তোবা তোবা!) বললে যে ভুল হয় সেটা সাধারণ জনও বোঝে। তাই এসব বাক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনেকটা কারো প্রথম বংশধর জন্মালে আপনি

যদি উচ্চকণ্ঠে 'বল হরি, হরিবোল' বলে ওঠেন, তা হলে যেরকম হয়। এসব ভুল সাধারণ সামাজিক উপন্যাসে থাকলে পাঠক শুধু একটুখানি মুচকি হাসে, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস যিনি লেখেন তাঁর কাছ থেকে পাঠক একটু বেশী প্রত্যাশা করে।

'শার্ঙ্গদেবের' মত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গভীরে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরাই জানেন, পাঠান-মোগল যুগের সঙ্গীত তথা এদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল ; এ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের কতখানি ফার্সী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের অতখানি ফার্সী জানার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি যদি রানী রিজিয়ার দরবারে সেতার বাজাতে আরম্ভ করেন তবে বোধ হয় সঙ্গীতজ্ঞদের অনেকেই আপত্তি জানাবেন। আমি বিশেষজ্ঞ নই, তাই পণ্ডিতেরা যখন কিছু বলেন তখন সেটা মনে রাখবার চেষ্টা করি। মৌলানা আজাদ আমাকে বলেন, "সেতার তৈরি করেন আমীর খুসরো। এটা বীণার অনুকরণে তৈরি, কিন্তু বীণার চেয়ে সহজ।'

আমি উত্তরে বললুম, 'আমি আরেক পণ্ডিতের কাছে শুনেছি, বাদ্যযন্ত্র-নির্মাতার পক্ষে সেতার-নির্মাণ বীণার চেয়ে কঠিনতর। কিন্তু বাজানেওলার পক্ষে সেতার বাজানো সহজতর। ঐ পণ্ডিত আমাকে বলেন, "অনেক সময় যে জটিল বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করা হয় সেটা বাজানেওলার পক্ষে বাজানো সহজ করে দেবার জন্য"।' (শার্ঙ্গদেব হয়তো খাঁটি খবর রাখেন।)

এসব ঝামেলার মাঝখানে পাঠান বা মোগল দরবারের গানের মজলিস বর্ণনা করা যে বিপদসঙ্কুল, সে কথা পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন।

ঠিক তেমনি মোগল আমলের ফিস্টির বর্ণনা। কোরমা, কালিয়া, কোফ্‌তা, কবাব (শিক্‌-কবাব প্রাক-মুসলিম যুগেও ছিল—শূল্যপক, মাংস—কিন্তু সেটা আঁকা-বাঁকা শিকের ভিতর ঢুকিয়ে করা হত, না শূলের ডগায় ঝুলিয়ে ঝলসানো হত, তা জানি নে) যে সব কটাই যাবনিক খাদ্য তা জানি, কিন্তু মোগল ফিস্টিতে বাঁধাকপির পাতার ভিতর কিমা দিয়ে যে দোলমা তৈরি হয়, সেটা কি চলবে ? কপি জাতীয় জিনিস এদেশে এল কবে ? এমন কি যে সিম জিনিসটা ঘরোয়া বলে মনে হয় সে সম্বন্ধেও একখানি চিরকুটে দেখি ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীকে শুধোচ্ছেন, 'সংস্কৃতে আপনি সিম জিনিসটার উল্লেখ পেয়েছেন কি ?'

মোগল ছবিতে তাদের জামাকাপড় গয়নাগাঁটি পরিষ্কার দেখতে পাই। কিন্তু সব কটার নাম তো জানি নে। মা-দুর্গার নাকের নথ দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ চিত্রকারকে শুধান, 'নথ কি মুসলমান আগমনের পূর্বে ছিল ?'

কিন্তু আপত্তি কি গদাযুদ্ধে নামার সময় ভীমের পকেটে যদি কাউন্টেনপেন দেখা যায়, তবে কী আপত্তি! জেরুজালেমের এক মেরী মূর্তির বাঁ-কব্জীতে দেখি, ছোট্ট দামী একটি রিস্টওয়াচ! ভক্তের চোখে মা-মেরীর বাঁ-হাতখানা বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছিল, তাই। জানি নে, বারোয়ারি দুর্গাপুজোয় মা-দুর্গা নাইলন পরতে আরম্ভ করেছেন কি না।

অনুবাদ সাহিত্য

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, অনুবাদ যে অনুবাদ সেটা স্বীকার করতে প্রকাশক, সম্পাদক, স্বয়ং লেখকেরও কেমন যেন একটা অনিচ্ছা। কেন, এ প্রশ্ন শুধাতে একজন প্রকাশক সোজাসুজি বললেন, 'বাঙালী অনুবাদ পড়তে ভালবাসে না, তাই অসাধু না হয়ে যতক্ষণ পারি ততক্ষণ তথ্যটা চেপে রাখি।' কিছুকাল পূর্বে আমিও একটি বড়-গল্প অনুবাদ করি ও তার প্রথম বিজ্ঞাপনে সেটি যে অনুবাদ সে কথা প্রকাশিত হয় নি। আমি সেই সম্পাদককে বেনিফিট অব্ ডাউট দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই বুঝিয়ে যে, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে এই গাফিলতি মেরামত করা হবে। ঐ সময়ে আমারই সহকর্মী (কারণ দু'জনাই 'দেশ'-সেবক, এবং তিনি অন্যার্থেও) শ্রীযুত বিদুর ঐ নিয়ে কড়া মন্তব্য করে যা বলেন তার নির্যাস, যত বড় লেখকই হোন না কেন, তিনি যদি অনুবাদ-কর্ম করেন তবে সেটা যেন পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়। অতিশয় হক্ কথা। তবে এটা আমি গায়ে মাখছি নে, কারণ আমি 'যত বড়' কেন অ্যাট্টুন বড় লেখকও নই। আমি বরঞ্চ গোড়াতেই চেয়েছিলুম যে ফলাও করে যেন বলা হয়, এটি অনুবাদ। এবং সেই মূল প্রখ্যাত লেখকের অনুবাদ প্রসাদাৎ তাঁর সঙ্গ পেয়ে আমিও কিছুটা খ্যাত হয়ে যাবো— 'রাজেন্দ্র সংগমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।'* কিংবা কালিদাস রঘুবংশের

*এই সুবাদে একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। গুরুদেব আমাকে কয়েক পাতা প্রুফ মেরামত করতে দেন। সেটা তৈরী হলে ওঁর কাছে নিয়ে যেতে গিয়ে দেখি তিনি ৺ক্ষিতিমোহন ও ৺বিধুশেখরের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি থামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে শুনি, তিনি বলছেন, 'বনমালী (কিংবা সাধুও হতে পারে, কিন্তু সে গুরুদেবের সঙ্গে ছিল অল্প দিন) তো গেল আমার সঙ্গে এলাহাবাদ। আমি বললুম, "ওরে বনমালী, প্রয়াগে এসেছিস; স্নান করে নিস্।" কিন্তু বলাই কি বলবো 'সে ও-পাশই মাড়ালো না। বোধ হয়, আমার সঙ্গে থেকে থেকে দেবদ্বিজে ওর আর ভক্তি নেই।' কিংবা ঐ ধরনেরই। মাইকেলের কথা তা হলে সব সময়ে ফলে না।

অবতরণিকায় যে কথা বলেছেন—বজ্র কর্তৃক মণি সছিদ্র হওয়ার পর আমি সুতো। প্রবেশ করে বেতকৃমিক উৎরে যাবো।

এবং এস্থলে এটাও স্মরণ রাখা উচিত, কালিদাস বা মধুসূদন কেউই বাল্মীকির আক্ষরিক কেন, কোনো প্রকারেরই অনুবাদ করেন নি। সম্পূর্ণ নিজস্ব, মৌলিক কৃতিত্ব দেখিয়েও এঁরা অতখানি বিনয় দেখিয়েছেন। মডার্ন কবিতা যে আমার পিত্তি চটিয়ে দেয়, তার অন্যতম কারণ এঁদের অনেকেরই অভ্রংলিহ দম্ভ। 'আধুনিক' গাওয়াইদের কণ্ঠেও সেই সুর শুনতে পাই। আর মডার্ন পেন্টাররা কি করেন—অন্তত তাঁদের দু'জনার ব্যবহার সম্বন্ধে তো অনেক কথাই বেরিয়েছে।

কিন্তু সেকথা থাক। আমার প্রশ্ন, অনুবাদ পড়তে বাঙালী ভালবাসে না কেন?

আমার কিন্তু কথাটা কেন জানি বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে যায় না।

বাংলা ভাষার কচিকাঁচা যুগে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অতি বিশুদ্ধ আক্ষরিক অনুবাদ করেন। আজ পর্যন্ত যে তার কত পুনর্মুদ্রণ হল তার হিসেব হয়তো আজ বসুমতীই দিতে পারবেন না। পাঠকদের শতকরা ক'জন নিছক পুণ্য-সঞ্চয়ার্থে এ অনুবাদ পড়েছে? এমন কি রাজশেখর বসুর অনুবাদও—যদিও একটি বারো বছরের ছেলেকে বলতে শুনেছি, 'ঐ বসুমতীরটাই ভালো। বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা—ধীরেসুস্থে পড়া যায়। রাজশেখর বাবুরটায় বড্ড ঠাসাঠাসি।' 'বেতালপঞ্চবিংশতি' 'বত্রিশ সিংহাসন' এযুগের ছেলেমেয়েরাও তো গোগ্রাসে গেলে। (বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্রের' আরবী অনুবাদ ইরাক থেকে মরক্কো পর্যন্ত আজও 'আরব্য রজনীর' সঙ্গে পাল্লা দেয়)। ঈশান ঘোষের জাতক জনপ্রিয় হওয়ার পূর্বেই বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল—(পরম পরিতাপের বিষয় যে এখনো তার পুনর্মুদ্রণ হল না) অথচ তার থেকে নেওয়া বাচ্চাদের জাতক তাদের ভিতর খুব চলে। জ্যোতিঠাকুরের সংস্কৃত নাটক ও ফরাসী কথা-সাহিত্যের অনুবাদ এককালে বিদগ্ধ বাঙালীই পড়তো। ওদিকে এসবের বহু পূর্বে আলাওল অনুবাদ করলেন—যদিও আক্ষরিক নয়—জয়সীর 'পদুমাবৎ'। এবং তারপর, পর পর বেরুলো 'ইউসুফ-জোলেখা', 'লায়লা-মজনু' ইত্যাদি। মোল্লার বাড়িতে এবং পূব-বাঙলার খেয়াঘাটে, বটতলায় এখনো তাদের রাজত্বের অবসান হয় নি। ওদিকে কাশীরাম, কৃত্তিবাস। 'আরব্যোপন্যাস', 'হাতিমতাই', 'চহারদরবেশ' ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাঙলা দেশে নাম করছে। তারপর 'রবিনসন ক্রুসো', 'গালিভার্স ট্রেভল' এবং ফরাসী থেকে 'লে মিজেরাবল' এদেশে তোল কী পাড়ই না সৃষ্টি করলো।

আমি অতি সংক্ষেপে সারছি। কিন্তু আমার প্রবেসী কোন্ পাঠক 'তীর্থসলিল' 'তীর্থরেণু'র কথা ভুলতে পারবেন? সত্যেন দত্ত অনুবাদের জাদুকর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্তের শোকসভাতে বলেছিলেন, যে-দিন দেখলুম সত্যেন আমার চেয়ে ঢের ভালো অনুবাদ করতে পারেন ও ছন্দের উপর তাঁর দখল আমার চেয়ে অনেক বেশী, সেই দিনই অনুবাদ-কর্ম থেকে অবসর নিলুম। তারপর ভাল কবিতা চোখে পড়লেই সত্যেনকে অনুবাদ করতে বলতুম।' (এস্থলে যদিও অবান্তর তবু স্মরণে আনি, রবীন্দ্রনাথ নিজের মৌলিক রচনা কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিয়ে সত্যেন দত্তের 'চম্পা' কবিতাটির ইংরিজি অনুবাদ করেন)।

আর বর্তমান যুগের হীরেন দত্ত মশায়ের 'তিন সঙ্গী' যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন, এরকম অনবদ্য অনুবাদ হয় না।

এর একটু তথাকথিত 'নিম্নপর্যায়ে' নামলেই দীনেন্দ্রকুমারের 'রহস্যলহরী'। বাংলাদেশের হাজার হাজার নারী-নরকে এঁর অনুবাদ আনন্দ দিয়েছে। দীনেন্দ্রকুমার লিখতেন অতি সরল, ছলছল-গতির বাংলা—পাঠককে কোন জায়গায় হোঁচট খেতে হত না। তাঁর মৌলিক গ্রন্থ 'পল্লীচিত্র'—নামটি আমার ঠিক মনে নেই—পড়লে তাঁর বাংলা-শৈলী ও ভাষার সরলতা ও আপন বৈশিষ্ট্য পাঠককে আরাম ও চমক দুই-ই দেয়। (অরবিন্দ ঘোষ যখন বরোদায় চাকরি নিয়ে বাংলা শেখার জন্য গুরুর সন্ধান করেন, তখন দীনেন্দ্রকুমারকে সেখানে পাঠানো হয়। পরবর্তী যুগে যখন তিনি তাঁর অতুলনীয় মধুর বাংলায় পাঠকের কৌতূহল সদাজাগ্রত রেখে তাঁর জীবনস্মৃতি—বিশেষ করে বরোদার ইতিহাস ও শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্য সম্বন্ধে লেখেন, তখন তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে দু'একটি বিতর্কমূলক তথ্য বলে ফেলেন। আমার ব্যক্তিগত মতে তিনি সম্পূর্ণ সত্যভাষণই করেছিলেন। ও আমার অগ্রজ কাঙাল হরিনাথ, দীনেন্দ্রকুমার, মীর মূশর্‌রফ হুসেন সম্বন্ধে কুষ্টিয়ায় সরজমিনে গবেষণা করে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছন। ফলে তখনকার দিনের মাসিক-সাহিত্য মহলের এক বলবান ক্লিক দীনেন্দ্রকুমারকে, জাস্ট হাউণ্ডেড্ হিম্ আউট অব বেঙ্গলী লিটারেচার। সেই অনুপম জীবনস্মৃতি শেষ করার সুযোগও তখন তিনি পান নি। অথচ আমি যখন তাঁর লিখিত শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী খাসেরাও যাদব অংশ বরোদার যাদব গোষ্ঠী ও অন্যান্য মারাঠাদের অনুবাদ করে শোনাই তখন তাঁরা অশ্রুবিসর্জন করে বলেন, 'বাংলাদেশই শুধু সে যুগের মারাঠী বিপ্লবীদের স্মরণে রেখেছে। বাঙালী প্রাদেশিক, এ কুসংস্কার আমাদের ভাঙলো।' এর পর হঠাৎ যখন দীনেন্দ্রকুমারের ধারাবাহিক বন্ধ হয়ে গেল, তখনো তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতে

চাইলেন পরের পর্বের কথা। আমি কোন্ লজ্জায় স্বীকার করি কেন তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেল।)

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আমার বহুদিনের মনস্তাপ—আজ বেমোকায় বেরিয়ে গেল, পাঠক ক্ষমা করবেন।

আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে। প্রাচীন যুগের সব অনুবাদই যে উত্তম ছিল, একথা ঠিক নয়। কিন্তু এঁদের বেশীর ভাগই উত্তম সংস্কৃত ও তৎকালীন প্রচলিত বাঙলা ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। এবং পণ্ডিত জন যত বাঁকা বাংলাতেই অনুবাদ করুন না কেন, তাঁদের শব্দভাণ্ডারে দৈন্য ছিল না বলে অনুবাদ মূল থেকে দূরে চলে যেত না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত পিয়ের লোতির 'ইংরেজবর্জিত ভারত'-এর অনুবাদ পড়লেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। লোতির শব্দভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত (উত্তর-মেরু সমুদ্রের আলো-বাতাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি পর পর তিনটি শব্দ দিয়েছেন, ডায়াফনাস, এফিমেরাল, কাইমেরিক—এর অনুবাদ তো দীন শব্দ-ভাণ্ডার নিয়ে হয় না।)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানতেন অত্যুত্তম সংস্কৃত—ভাসের নাটক তখনো ছাপায় প্রকাশিত হয় নি বা তাঁর হাতে পৌঁছয় নি—ভাসকে বাদ দিলে তিনি সংস্কৃতের প্রায় সব নাট্য-লেখকের অনুবাদ করছেন—তাই সে ভাষা থেকে তিনি অনায়াসে শব্দচয়ন করে মূলের বৈচিত্র্যের মর্যাদা রক্ষা করতে পারতেন। অক্ষম অনুবাদকের হস্তে সে স্থলে অনুবাদ হয়ে যায় একঘেঁয়ে—পড়তে গিয়ে পাঠকের ক্লান্তি এসে যায়।

অধুনা একাধিক যোগ্য ব্যক্তি অনুবাদ-কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ ইংরিজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। এঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশী যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন, ইংরিজী সাহিত্য বহু ভাষা থেকে বহু বস্তু অনুবাদ করে কি ভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে, নব নব অনুপ্রেরণা পেয়েছে, নব নব অভিযানে বেরিয়েছে—সেই আদিযুগের শুভক্ষণ থেকে।

আমি অনুবাদ করতে গিয়ে পদে পদে নিজের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছি। এই লেখাটি তারই অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

এদেশে তিন রকমের ইংরেজ এসেছিল। বড় দলের কাজ ছিল পৃথিবীর সামনে আমাদের হেয় প্রমাণ করে এদেশে শ্বেত (আমি বলি ধবল কুষ্ঠ) রাজত্ব যুক্তি ও নীতির উপর খাড়া করা। এক কথায় যাকে বলে, 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন' যে কী ভীষণ ভারী এবং ইংরেজ স্বদেশের বেকন-আণ্ডা ঘোড়দৌড়ের জুয়োখেলা, খেঁক-শেয়ালি-শিকার করা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এই 'নচ্ছার' দেশে এসে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কী অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, সেটা সপ্রমাণ করা। অতি দৈবে-সৈবে দু' একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সহৃদয় মহাজন এ ভণ্ডামি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁরই একজন প্রখ্যাত হাস্যরসিক জেরম কে জেরম। তিনি মারাত্মক ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—পড়ে মনে হয়, তিনি যেন সিকনি ঝাড়ছেন—বার্ডেন যদি হেভিই হয় তবে ওটা বইছিস কেন, মাইরি? আমি তো খবর পেয়েছি, ইণ্ডিয়ানরা সেই সেবা, সেই হোলি ক্রুসেডের জন্য থ্যাঙ্ক্যু-টি পর্যন্ত বলে না। তবে ফেলে আয় না ঐ লক্ষ্মীছাড়া বোঝাটা ঐ হতভাগাদেরই ঘাড়ে!'

কিন্তু প্রাগুক্ত ঐ বড় দলের ইংরেজদের একটি 'আপ্তবাক্য' নিয়ে আজ আমার আলোচনা। এরা মোকা বেমোকায় বলতো, 'পাঠান-মোগল আদৌ ইতিহাস লিখতে জানতো না—শুধু লড়াই আর লড়াই।'

অন্য দল সংখ্যায় নগণ্য। এঁরা এসব কথায় কান না দিয়ে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী শিখতেন, বাঙলায় বাইবেল অনুবাদ করতেন, এবং প্রাচ্যভাষায় লিখিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই ইংরিজীতে অনুবাদ করতেন। ফার্সী ইতিহাস যে শুধু 'লড়াই আর লড়াই' নয় (আহা! তাই যদি হত আর আমরা তাই পড়ে ক্ষেপে গিয়ে সেই আমলেই ইংরেজকে ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করতুম!) সেটার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ তাঁরা জানিয়েছেন ফার্সী ইতিহাস অনুবাদ করে।

এক তৃতীয় শ্রেণীর পিচেশও এদেশে এসেছিল। এরা প্রথম শ্রেণীর মত অশিক্ষিত বর্বর নয়, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর মত নিরপেক্ষ সাধুজনও নয়। এরা অল্পবিস্তর সংস্কৃত আরবী ফার্সী চর্চা ক'রে, অল্প বিদ্যা যে ভয়ঙ্করী সেইটে আপন অজানতে প্রমাণ করে দিত এই বলে, 'ওসব তাবৎ মাল আমাদের পড়া আছে; সব রাবিশ!'

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের ইংরিজী 'শিক্ষিতেরা' এদেরই বিশ্বাস করে বসলেন।

আমার বক্তব্য, নিজের মুখেই ঝাল চেখে নিলে পারেন। বিশেষত যখন কিছু দিন ধরে 'শেষ মোগলদের' সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাস বেশ কিছুটা জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে অ

এই করেই উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়। আমারই হ্যাওটা একটি ম্যাট্রিক-ফেল ছোকরা—কিন্তু র‍্যাপিড-রীডিঙের ফলে সে দিব্য শিলিং-শকার, পেনিথ্রিলার পড়তে পারতো—আমার কাছ থেকে রোম সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আই ক্লাউডিউস' পড়ে এমনই 'ক্ষেপে যায়' যে, সে তারপর দুনিয়ার যত রোমান ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করে, এস্তেক জুলিয়াস সীজারের 'ব্রিটন বিজয়' পর্যন্ত।

হালে বাবুর বাদশার আত্মজীবনী বেরিয়েছে—বাঙলা অনুবাদ। অবশ্য সে অনুবাদ এসেছে তিন ঘাটের জল খেয়ে। বাবুরের মাতৃভাষা ছিল তুর্কী—চুগতাই-তুর্কী অর্থাৎ তুর্কোমানিস্তানের তুর্কী; টার্কির (যার রাজধানী আঙ্কারা) ভাষা ওসমানলি-তুর্কী। আমার যতদূর জানা আছে, মোগল আমলে যদিও দরবারী ভাষা ছিল ফার্সী, তবু শেষ বাদশা বাহাদুর শাহ্ পর্যন্ত অন্তঃপুরে তুর্কীতেই কথা-বার্তা বলেছেন, উর্দুতে কবিতা লিখেছেন*—দিল্লীর বিখ্যাত বিখ্যাত মুশায়েরায় (কবি-সম্মেলনে) দূত মারফৎ আপন কবিতা পাঠিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন (সে আমলের প্রখ্যাত কবি ছিলেন উর্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গালিব)—এবং রাজকার্য করেছেন ফার্সীতে।

বাবুরের সেই আত্মজীবনী অনূদিত হয় ফার্সীতে, ফার্সী থেকে ইংরিজীতে ও বিবেচনা করি, এই বাঙলা অনুবাদ সেই ইংরিজী থেকে। তাতে করে যে খুব মারাত্মক ক্ষতি হবে সে ভয় আমার নেই, কারণ অনুবাদে সবচেয়ে বেশী জখম হয় গীতিরস, এবং বাবুরের সাহিত্যসৃষ্টি গীতিরসপ্রধান নয়। এবং লড়াইয়ের কথা যদিও এটাতে আছে, তবু সেইটেই প্রধান কথা নয়। আসল কথা বাবুরের পর্যবেক্ষণশক্তি। ভারতবর্ষ—প্রধানত দিল্লী-আগ্রা অঞ্চল—তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আমি যখন কাবুলে ছিলুম তখন বাবুর বর্ণিত কাবুল পাঞ্জ্‌শীর (পাঞ্জ্‌শীর অর্থ পঞ্চ-ক্ষীর, সংস্কৃত 'ক্ষীর'

---

* 'শুনেছ, রাজা কবিতা লেখে. এ আবার কেমন রাজা!' এই বলে তখনকার দিনের, ইংরেজ বাদশা-হুসালামৎকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতো। পরবর্তী যুগের এক জহুরী ইংরেজ এই নিয়ে মন্তব্য করে লেখেন, 'ঐসব বর্বর ইংরেজ জানতো না যে, ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন, এবং বাহাদুর শা'র তুলনায় অতিশয় নিরেস।'

শব্দ ফার্সীতে 'শীর', কিন্তু অর্থ দুধ, আর পাঞ্জ্ অর্থ পঞ্চ—ঐ জায়গায় পাঁচটি নদী বয়; আমাদের পায়েসকে কাবুলীরা বলে শীর-বিরঞ্জ্—বিরঞ্জ্ অর্থ চাল) ইত্যাদি আমি আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। বস্তুত বাবুর বর্ণিত কাবুল ও আমার দেখা কাবুলে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। হালে যাঁরা কাবুল দেখে ফিরেছেন তাঁরা বলেন, গত দশ বৎসরে নাকি কাবুলের চেহারা একদম পালটে গিয়েছে।

কাবুলীরা বাবুরকে ঘৃণা করে। কারণ ইব্রাহিম লোদী ছিলেন আফগানিস্থানের পাঠান। তাঁকে পরাজিত করে হিন্দুস্থানের তখৎ ছিনিয়ে নেন তুর্কমানিস্থানের মোগল বাবুর। আমাকে এক সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত বিশ্বপর্যটক পাঠান কূটনৈতিক বেদনাবিকৃত কণ্ঠে বলেন, 'আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, ডক্টর, এই বর্বর বাবুর কি করেছিল? কল্পনা করুন

পুণ্যশীলা অসূর্যম্পশ্যাদের খোলা বাজারে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রয় করেছিল। এ শুধু বর্বর যাযাবর তুর্কীদের পক্ষেই সম্ভব।'

কাজেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বাবুরের কবরের উপর না ছিল আচ্ছাদন (একদা নাকি ছিল, কিন্তু সেটা লুট হয়ে, কিংবা ভেঙে পড়ে যাওয়ার পর আফগানরা স্বভাবতই সেটা মেরামত করে দেবার কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি), না ছিল কোনো অলঙ্কার-আভরণ; কয়েক ফালি পাথর দিয়ে তৈরী অতিশয় সাদামাটা একটি কবর। হালে নাকি আফগান সরকার বাবুরের ঐতিহাসিক মর্যাদা অনুভব করতে পেরেছেন—জাত্যভিমান কিঞ্চিৎ সংযত করার ফলে—এবং কবরের সুব্যবস্থা করেছেন।

আজকের দিনের বাঙালী ইনফ্লেশন কারে কয়, সেটা চোখের জলে নাকের জলে শিখেছে। রোক্কা একটি টাকার ক্রয়মূল্য আজ কতখানি, সে তা বিলক্ষণ জানে। বাঙালী তাই বাবুরের ইনফ্লেশনজ্ঞান দেখে আনন্দিত হবেন। দিল্লী-জয়ের পর বাবুরের আমীর-ওমরাহ্ বিস্তর ধনদৌলত লুট করে বললেন, 'এ বারে চলো কাবুল ফিরে গিয়ে নবাবি করা যাক।' বাবুর তখন তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, তাদের সিন্দুকে কাঁড়া কাঁড়া টাকা থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাবুল উপত্যকার শরাব-কবাবের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। যেখানে আণ্ডার দাম আগে এক পয়সা ছিল সেখানে ওদের এখন দিতে হবে আট গণ্ডা (কিংবা ঐ ধরনের কিছু-একটা —বইখানা আমার হাতের কাছে নেই)। কারণ সেপাই-পেয়াদারাও কিছু কম মাল লুট করে নি, তারাও এখন নিত্যি নিত্যি আণ্ডা খেতে চাইবে।

এর পর যে বইখানা পড়ে বাঙালী পাঠক আনন্দ পাবেন সেটি ফার্সীতে লেখা

বাঙলার (খুব সম্ভব প্রথম পূর্ণাঙ্গ) ইতিহাস। 'বাহারিস্তানে গায়েবী'*—অজানা বসন্তভূমি। লেখক দিল্লী-আগ্রা-বিহারের শুকনো দেশ দেখে দেখে বাঙলার দেহলিপ্রান্তে এসে পেলেন, চতুর্দিকে শ্যামলে শ্যামল আর নীলিমায় নীল। তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল।

এর কথা আরেক দিন হবে॥

ফের্ডিনাণ্ট্ জাওয়ারব্রুখ

বৈদ্যরাজ জাওয়ারব্রুখকে নিয়ে আবার সুইস জর্মন কাগজে বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দলের বক্তব্য, সত্যই বৃদ্ধ বয়েসে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল; অন্য দলের বক্তব্য তিনি পূর্ব-বার্লিনের সোভিয়েৎ কূটনীতির বলির পাঁঠা হয়েছেন। বার্লিনের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল 'শারিতে' (charite—চ্যারিটি—খয়রাতি) প্রতিষ্ঠানের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বার্লিন ভাগাভাগির পর শারিতে পড়েছিল পূর্ব-বার্লিনে, রাশান আওতায়।

এই কলকাতা শহরের অন্তত একজন খ্যাতনামা চিকিৎসককে আমি চিনি, যিনি জাওয়ারব্রুখের শিষ্য। তিনি ম্যুনিকে তাঁর কাছে বুকের যক্ষ্মার অপারেশন শেখেন—জাওয়ারব্রুখ বহু বৎসর ম্যুনিক হাসপাতালেরও বড় কর্তা ছিলেন। এছাড়া তাঁর অন্যান্য শিষ্যও হয়তো কলকাতায় আছেন। অবশ্য বুকের, মাথার ও ক্যানসারের সার্জারি নিয়ে যাঁদেরই কারবার তাঁরাই জাওয়ারব্রুখের গবেষণার সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত।

জর্মন সার্জন-সমাজ মনে করেন, পৃথিবীর তিনজন সার্জনের নাম করতে হলে জাওয়ারব্রুখের নাম কালানুক্রমে তৃতীয়। অন্য দুজন বোধ হয় হিপপোক্রাতেস ও নেপোলিওনের সার্জন—কিন্তু আমি কি চিকিৎসা-শাস্ত্র, কি সে শাস্ত্রের ইতিহাস কোনোটারই বিন্দুবিসর্গ মাত্র জানি নে বলে হলফ খেয়ে কিছুই বলতে পারবো না। তদুপরি এ ধরনের নির্ঘণ্ট নির্ণয় সব সময়ই কিঞ্চিৎ উদ্দাম হয়ে থাকে—যেরকম পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য নির্ণয়ে ভিন্ন লোক ভিন্ন নির্ঘণ্ট দেয়।

* বাঙলা আজগুবী অর্থ 'আজ' মানে 'হতে, 'from'; 'গায়েবী' মানে 'অজানা' 'লুপ্ত' 'অদৃশ্য' 'বিধিকৃত।' অর্থাৎ অজানা থেকে আগত বলে অদ্ভুত।

অতএব অতিশয় সারবান আপত্তি উঠতে পারে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিছুই যখন আমি জানি নে, তখন হাতের নাগালের বাইরে যে শল্যরাজ জাওয়ারব্রুখ বিরাজ করছেন, তাঁর প্রতি আমি উদ্বাহু হয়েছি কেন? উত্তর অতি সরল। এই শল্যরাজ মৃত্যুর পূর্বে একখানি নাতিবৃহৎ আত্মজীবনী লেখেন—বস্তুত পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর এবং সেটি আদৌ শল্যরাজ বা বৈদ্য-সম্প্রদায়ের উদ্দেশে রচা হয় নি; রচনা হয়েছে আপনার আমার মত মামুলী জনের জন্য। এমন কি সে পুস্তকে ক্যানসার সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী গবেষণার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটিও সাধারণ জনের উদ্দেশে লিখিত, কারণ তিনি সেটি সর্বসাধারণের উপকারার্থে জর্মন রেডিয়ো থেকে বেতারিত করেন। অতি সরল জর্মনে, সর্বপ্রকারের চিকিৎসা সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ সযত্নে বর্জন করে তিনি এই বেতার-ভাষণটি নির্মাণ করেছিলেন বলে সেটি জর্মনবালকেও বুঝতে পারে—বাঙলায় অনুবাদ করলে বঙ্গবালকও বুঝতে পারবে।*

কিন্তু এইটেই সর্বপ্রধান বা সর্বশেষ তত্ত্ব নয়। তাঁর আত্মজীবনীর সাহিত্যিক মূল্য আছে, এবং তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল নীল চোখ দুটি প্রকাশ পায়। তার সামান্য একটি উদাহরণ দি।

ব্যঙ্গরস অতিশয় প্রাচীন রস—করুণ ও বীর রসের সমবয়সী সে। প্রাচীনতম গ্রীক সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু অসূয়া সে-রসের উৎস বলে আমাদের রসপ্রিয় মনও সেটা সব সময় গ্রহণ করতে পারে না। বিশুদ্ধ হাস্যরস—যেটা সৃষ্টি করার জন্য কাউকে পীড়া দিতে হয় না, নট অ্যাট দি কস্ট অব এনি ওয়ান—আপন আনন্দে উচ্ছল এবং সেটা ব্যঙ্গরসের বহু পরবর্তী যুগের রস। এবং আমার ব্যক্তিগত শাবাসী সেই হাস্যরসের, সেই ব্যঙ্গরসের উদ্দেশে যেখানে রসস্রষ্টা

* এবং এর অনুবাদ করার বাসনা আমার ছিলও—অবশ্য সাবধানের মার নেই বলে ক্যানসার রোগ-বিশেষজ্ঞ আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দিয়ে সেটি সেনসর করিয়ে নিতুম। এ বেতারভাষণটি এখনো আদৌ গাজীমিয়ার বস্তানীতে আশ্রয় নেয় নি, অর্থাৎ আউট-অব-ডেট হয়ে যায় নি। ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রীর আদেশে আমি সর্বাধুনা প্রকাশিত জর্মন-বিশ্বকোষে সবিস্তর লিখিত ক্যানসার প্রবন্ধটি পড়ি। এবং যদিও সব জিনিস বুঝতে পারি নি (বিশেষ করে কুআন্টুম্ থিয়োরি দিয়ে ক্যানসার রোগের কারণ নির্ণয়ের আধুনিক প্রচেষ্টা (!) তবু এটা লক্ষ্য করলুম যে ক্যানসারের পূর্বাভাস সম্বন্ধে জাওয়ারব্রুখ অজ্ঞজনকে যেসব দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন, সর্বাধুনিক জর্মন-বিশ্বকোষও তাই বলেছেন।... উল্লেখযোগ্য যে, ক্যানসার গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বে জাওয়ারব্রুখ বার্লিনের ইণ্ডলজি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খবর নেন, প্রাচীন ভারতীয় বৈদ্যেরা ক্যানসার সম্বন্ধে কি বলে গিয়েছেন।

নিজেকে নিয়ে নিজে হাসেন, নিজেকে ব্যঙ্গ করেন, লাফস অ্যাট হিজ ওন কস্‌ট তারই একটি উদাহরণ দি :

জাওয়ারব্রুখ বলছেন, তাঁর সময়কার এক বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ছাত্রদের মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষা নেওয়ার পর প্রতিবারেই অতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে বলতেন, 'এই পৃথিবীতে বিস্তর গর্দভ নিজেদের ডাক্তার রূপে পরিচয় দিয়ে নির্ভয়ে অগুনতি লোক মেরে বেড়াচ্ছে ; তার উপর যদি আরো একটা গর্দভ বাড়ে তাতে করে কণামাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। তুমি পরীক্ষা পাস করলে।' জাওয়ারব্রুখও তাই তাঁর যুগের শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। কিন্তু অন্তত একবার তাঁরও শিক্ষা হয়ে যায় এ বাবদে। জাওয়ারব্রুখ লিখছেন, 'সকাল দশটায় তিনটি ছেলে আসবে আমার কাছে ভাইভা দিতে। আমি নার্সকে বললুম, ক্যাণ্ডি-ডেটরা এলে অমুক রোগীকে পাঠিয়ে দিয়ো—তার পেটে ছিল টিউমার। ওরা এলে আমি কাগজপত্র দস্তখৎ করতে করতে একজনকে বললুম, রুগীকে পরীক্ষা করে বলতে তার কি হয়েছে। আমি কাজে ডুব মারলুম। দশ মিনিট পরে শুধালুম, কি হল ? ছেলেটা ভয়ে ভয়ে বললে, "কিছুই তো পেলুম না, স্যর।" আমি হুঙ্কার দিয়ে বললুম "গেট আউট"—আর নামে দিলুম ঢ্যারা কেটে। তারপর একই আদেশ দিলুম দু নম্বর ক্যাণ্ডিডেটকে। একেও যখন শুধালুম, কি পেল সে—সে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে একই উত্তর দিল। ছাড়লুম আরেক হুঙ্কার, কাটলুম আরেক ঢ্যারা। এবারে তিন নম্বরের পালা। সে-ও যখন ফেল মারলে তখন আমি ছাড়লুম শেষ হুঙ্কার। এ ছেলেটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া না হয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, 'তা হলে আপনি দেখান না, স্যর, কি হয়েছে।' কী! এত বড় আস্পর্দ্ধা! দেখাচ্ছি! লম্ফ দিয়ে গেলুম রুগীর কাছে, পেটে দিলুম হাত। ও হরি! কোথায় টিউমার! ভুলে অন্য লোক পাঠিয়েছে নার্স! তখন শুরু হয় আমার আর্তরব। আরে, আরে, কোথায় গেল সেই দুই ক্যাণ্ডিডেট। নিয়ে এসো ওদের।' এস্থলে যে-ক্যাণ্ডিডেট বিশ্ববিখ্যাত জাওয়ারব্রুখকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, তাকে বোধ হয় আর কোনো পরীক্ষাতে না ফেলে সঙ্গে সঙ্গে পয়লা নম্বরী ডিগ্রী দেওয়া উচিত।

এ রকম আরো বহু মজার মজার কথা আছে এই অসাধারণ পুস্তকে ; বস্তুত পুরো বইখানাই হাস্যরসের কুমকুমে কুমকুমে ভর্তি। পাঠকের চটুল হৃদয়ে একটুখানি চাপ পড়লেই আবীরে আবীরে ছয়লাপ। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে আবার ট্র্যাজেডির করুণ রসও আসে বলে সে রস যেন জল এনে দেয় চোখের পাতায় বুক ভরে দেয় নিবিড়তর ব্যথায়—আরো বেশী।

একবার একটি মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন, তাঁর নিশ্চয়ই ক্যানসার হয়েছে। ডাক্তার তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরিতে যেখানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগের জাতগোত্রের বিচার হয়। নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা সবাই এক বাক্যে সমস্বরে বললেন, 'ক্যানসার নয়।'

সব শুনে মহিলাটি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, হ্যের প্রফেসর, এটা ক্যানসারই বটে।'

মহিলাটি কয়েক দিন পর আবার এসে ক্যানসারের ফরিয়াদ করলেন। আবার গোড়ার থেকে তাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল, আবার নির্দ্বন্দ্ব নেতিবাচক উত্তর এল। এই করে করে ছ' মাস ধরে মহিলাটি আসেন—তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই, তাঁর উদরবেদনা ক্যানসারজনিত।

শেষটায় জাওয়ারব্রুখ স্থির করলেন, কাটাই যাক পেট। মাদামকে তখন বলতে পারবেন, স্বচক্ষে দেখেছি পেটে কোনো ক্যানসার নেই। কিংবা হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, অনেক বর্ষীয়সী মহিলার এই অপারেশন-মেনিয়া থাকে; হয়তো তাঁরা আপন জানা-অজানায় সেণ্টার অব অ্যাট্রাকশন বা কৌতূহলের কেন্দ্র হতে চান। তাঁকে অস্ত্রোপচারের জন্য তৈরি করা হল।

তারপর কবিরাজ জাওয়ারব্রুখ যা বলেছেন, তার মোদ্দা কথা: 'আমরা তো নিশ্চিন্ত মনে পেট খুললুম। সর্বনাশ! এ কি দেখি! পেট ভর্তি ক্যানসার! এবং এখন যে চরমে পৌঁচেছে সে অবস্থায় অপারেশনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সন্তপ্ত চিত্তে আমরা পেট সেলাই করে দিলুম। মহিলা সম্বিতে ফিরলে আমি তাঁকে বললুম, 'হ্যাঁ, ক্যানসারই ছিল; আমরা সেটা কেটে সরিয়ে দিয়েছি।'

মহিলাটি এক মাস পরে মারা যান।

জাওয়ারব্রুখ তার পর বলেছেন, 'মহিলাটি প্রথম যেদিন আমার কাছে এসেছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি অপারেশন করতুম, তবে হয়তো তাঁকে বাঁচাতে পারতুম।' কিন্তু প্রশ্ন, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যখন নঙর্থক উত্তর দেয়, তখন শুধুমাত্র রোগীর অনুমানের উপর নির্ভর করে পেট কাটা যায় কি প্রকারে?'

জাওয়ারব্রুখ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আপনাদের কাছে আরো নিবেদন করার বাসনা রইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কোনো বাঙলাভাষী সার্জন সেটা করলেই ভালো হয়; আমার মত আনাড়ী তা হলে অনধিকার-প্রবেশ থেকে নিষ্কৃতি পায়।

কলকাতা ও বোম্বায়ে যে সব ক্যানসার-প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁরা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বিবৃতি প্রকাশ করে সাধারণ জনকে সাবধান করে দেন, শরীরে

কোন্ কোন্ আকস্মিক বা মন্দগতিতে বর্ধমান পরিবর্তন দেখলে ক্যানসারের সন্দেহ করতে হয়। এগুলি আমি সর্বদাই শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পড়ি।

ঠিক ঐ একই সুবাদে প্রফেসর ডক্টর গেহাইম্‌রাট জাওয়ারব্রুথ অবতরণিকা হিসাবে কয়েকটি কথা বলেছেন এবং আপন বক্তব্য বোঝাতে গিয়ে এমন একটি অত্যুৎকৃষ্ট বিরল তুলনা দিয়েছেন, যেটি ব্যবহার করতে পারলে যে কোন যশস্বী সাহিত্যিকও শ্লাঘা অনুভব করবেন। বৈদ্যরাজ যা বলেছেন, তার নির্যাস: অধিকাংশ রোগই কোন না কোনো সাবধান-বাণী, ইঙ্গিত, ওয়ার্নিং, দিয়ে আসে। যেমন, সামান্য মাথা ধরলো—সেইটে ওয়ার্নিং—পরের দিন জ্বর হল। কিন্তু ক্যানসার কোনো ওয়ার্নিং তো দেয়ই না, বরঞ্চ সে নিতান্ত নিরপরাধীর মত দেখা দেয়। যেমন, আপনার জিভে একটি দানা দেখা দিল। সেটাতে কোনো বেদনা নেই, আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না, আপনি ভাবলেন, এরকম তো কত দানা এখানে সেখানে দেখা দেয় আবার মিলিয়ে যায়, এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার বা চিকিৎসকের কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর সেটা অতি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো, কিন্তু কোনো বেদনা বা অস্বস্তি নেই বলে আপনি তখনো কোনো প্রতিকার করলেন না। তারপর একদিন ঢোক গিলতে, খাবার গিলতে আপনার অসুবিধা হতে লাগলো। আপনি তখন গেলেন ডাক্তারের কাছে, কিন্তু হায়, ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে, তখন আর অপারেশন করা যায় না। আপনি যদি দানা যখন ছোট ছিল, তখন আসতেন, তবে সার্জন আপনাকে অনায়াসে ক্যানসারমুক্ত করতে পারতেন—অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর। তাই জাওয়ার-ব্রুথ বলছেন, 'দানাটি আদৌ অপরিচিত শত্রুরূপে বেদনা যন্ত্রণা সঙ্গে নিয়ে এল না। ক্যানসার এল যেন আপনার কোনো বন্ধুজনের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে একটি মুখোশ তৈরি করে সেটা পরে। তারপর কাছে এসে হঠাৎ মুখোশ সরিয়ে ফেলে আপনার বুকে মারলো ছোরা।'

এর পরই অধ্যাপক কতকগুলো চিহ্নের উল্লেখ করেছেন—এগুলোকে তিনি ওয়ার্নিং বলেন নি বটে, কিন্তু সেগুলো দেখলেই তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। জিভেতে বা অন্য কোথাও দানা বা ঐ জাতীয় বস্তু বা পরিবর্তন, কণ্ঠস্বর অকারণে কর্কশ হয়ে যাওয়া, আপনার পেটের অসুখ ছিল না—হঠাৎ আরম্ভ হল দিনের পর দিন পেট খারাপ হতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এটা আমার অনধিকার প্রবেশ। আপনার উচিত, আমাদের যে কোনো ক্যানসার-প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁদের সুলিখিত প্রামাণিক বিবৃতি সংগ্রহ করা। বিবৃতিতে সব ক'টা চিহ্নের

সম্পূর্ণ (exhaustive) লিস্ট থাকে। আমি এ যাবৎ যা লিখেছি, সেটা ভুলে গিয়ে ঐ বিবৃতি মন দিয়ে পড়বেন। কারণ, এগুলো আমাদের জন্যই লেখা—ডাক্তারদের জন্য নয়* ॥

হিভজিভাই পি মরিস্

একদা 'স্ট্র্যান্ড্' পত্রিকা একটি নূতন ধরনের অনুসন্ধানের সূত্রপাত করে সাহিত্যের মহা মহা মহারথীদের শুধোয়, তাঁরা সর্বজন-সম্মানিত, সর্বশিক্ষিতজনের অবশ্যপাঠ্য কোন্ কোন্ পুস্তক, যে কোনো কারণেই হোক, পড়ে উঠতে পারেন নি। উত্তরে এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হল যাকে 'মোহনের' ভাষায় লোমহর্ষক বলা যেতে পারে: যেমন, কথার কথা কইছি—বার্নার্ড শ পড়েন নি অলিভার টুইস্ট, কিংবা মনে করুন—রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি 'একেই কি বলে সভ্যতা?'

কাজেই বিখ্যাত সাহিত্যিকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই অখ্যাত সাহিত্যসেবক যে তাঁরা যেন তড়িঘড়ি শ্রীযুত বিশী মহাশয়ের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বইখানা পড়ে নেন।

এই পুস্তকে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' জাতীয় দু'চারটি চরিত্রের উল্লেখ করে বিশী মহাশয় বহু প্রাক্তন শান্তিনিকেতনবাসীদের সাধুবাদ পেয়েছেন। তাঁদেরই একজন হিভজিভাই মরিস্।

তাঁর পুরো নাম হিভজীভাই পেস্তনজী মরিসওয়ালা। গুজরাতীদের প্রায় সকলেরই পারিবারিক নাম থাকে; যেমন গাঁধী, জিন্না (আসলে ঝিঁড়া ভাই), হটিসিং ইত্যাদি। পার্সীদের অনেকেরই ছিল না বলে কেউ কেউ তাঁদের ব্যবসার নাম পারিবারিক নাম রূপে গ্রহণ করতেন। যেমন ইঞ্জিনীয়ার, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি। এই নিয়ে পার্সীরা ঠাট্টা করে একটি চরম দৃষ্টান্ত দেন—সোডাওয়াটার-বট্‌ল্‌ওপ্‌নারওয়ালা।

*এ-প্রবন্ধ "দেশে" প্রকাশিত হওয়ার পর আমি চিকিৎসক অচিকিৎসক একাধিক সজ্জন পাঠকের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়েছি, ক্যানসার সম্বন্ধে জাওয়ারলালের প্রাগুক্ত প্রবন্ধটি যেন আমিই অনুবাদ করি। আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, কারণ অসুস্থতাবশত আমার দেহে শক্তি মনে উৎসাহ বড়ই হ্রাস পেয়েছে। তবে এটাও নিবেদন, আমৃত্যু দুটি প্রবন্ধ অনুবাদ করতে পারার দুরাশা আমি কখনো সম্পূর্ণ ত্যাগ করবো না; ক্যানসার সম্বন্ধে প্রবন্ধটি ও অধ্যাপক ভিন্টারনিতস্ রচিত ক্ষুদ্রাকার রবীন্দ্র-জীবনী।

বোম্বাইয়ের পতীত্ পরিবার বিখ্যাত। এঁরা ফরাসী 'পতী' (Petit) কার্যে কাজ করতেন বলে প্রথমে পতীত্ওয়ালা ও পরে পতীত্ নামে পরিচিত হন। ঠিক সেইরকম মরিস কোম্পানিতে কাজ করে আমাদের অধ্যাপক মরিস-ওয়ালা পরে শুধু মরিস নামে বোম্বাই অঞ্চলে নাম করেন।

অত্যুত্তম ফরাসী ও লাতিন শেখার পর না জানি কোন্ যোগাযোগে তিনি শান্তিনিকেতন পৌঁছে সেখানে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

দুটো বিষয়ে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী—সেন্টিমেণ্টাল এবং আদর্শবাদী। আমার আশ্চর্য লাগতো, কারণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে যেসব গুজরাতী ছেলেরা—এবং পাঠিকারা অপরাধ নেবেন না, মেয়েরাও—শান্তিনিকেতন আসে, তারা পর্যন্ত টাকা আনা পাই হিসেব করতো; শুনেছি, ছাত্রেরা আকছারই আদর্শবাদী হয়। (নইলে অত নিঃস্বার্থ ট্রাম-বাস পোড়ানোর সৎকর্মটা করে কে ? কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কথা না। হক্ কথা কইলে পুলিসে ধরবে)। তাই গুজরাতী মরিস সাহেবের আদর্শবাদ আমাকে বিস্মিত করেছিল।

সামান্য বাঙলা শেখার পরই মরিস সাহেবের প্রেম উপছে পড়ল রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি এবং তিনি সম্মোহিত হলেন।

"তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার" শুনে।

অন্যত্র আলোচনা করেছি, ভারতের বাইরে কোনো ভাষাই 'ত' এবং 'ট'-র উচ্চারণে পার্থক্য করে না; এমন কি ভারতীয়দের ভিতর যাঁদের গায়ে প্রচুর বিদেশী রক্ত তাঁরাও এ-দুটোতে গুবলেট করেন। উদাহরণ স্থলে, গুজরাতের বোরা সম্প্রদায়—এখানকার রাধাবাজারে এঁদের ব্যবসা আছে—ব্রহ্মউপত্যকার আসামবাসী ও পার্সী সম্প্রদায়।

তাই মরিস সাহেবের উচ্চারণে ছত্র দু'টি বেরুতো :

"টাহাটে এ জগটে ক্ষটি কার
নামাটে পারি যডি মনোভার।"

আমরা আর কি করে ওঁকে বোঝাই যে 'ত' 'দ'-এর অনুপ্রাস ছাড়াও গুরুদেবের গান আছে।

মরিস সাহেব নূতন বাঙলা শেখার সময় যে না বুঝে বিশীদাকে 'বেটা ভূত' বলেছিলেন তার চেয়েও আরো মারাত্মকতম উদাহরণ আমি শুনেছি। তিনি আমাদের ফরাসী শেখাতেন, এবং শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন এবং আরো

কিছু অধ্যাপকও তাঁর ক্লাসে যেতেন। আমার হাসি পেত যখন গুরু মরিস ছাত্র বিধুশেখরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন ও ছাত্র বিধুশেখর তাঁকে 'তুমি' বলে। একদিন হয়েছে কি, ফরাসী ব্যাকরণের কি একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছেন অধ্যক্ষ বিধুশেখর। মরিস সাহেব বললেন, 'চমৎকার! শাসট্রী মশায়। সট্যি, আপনি একটি আস্টো ঘুঘু।'

শাস্ত্রী মশাইয়ের তো চক্ষুস্থির! একটু চুপ করে থাকার পর গুরু গুরু—যদ্যপি ছাত্র তথাপি গুরু-কণ্ঠে শুধালেন, 'মরিস, এটা তোমাকে শেখালে কে?'

নিরীহ মরিস বোধ হয় কণ্ঠনিনাদ থেকে বিষয়টার গুরুত্ব খানিকটে আমেজ করতে পেরে বললেন, 'ডিন্‌ডা (দিনদা', দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। উনি বলেছেন ওটার অর্ট "অসাডারণ বুড্‌ডিমান"। টবে কি ওটা ভুল?'

শাস্ত্রী মশাই শুধু ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, আমি দিনেন্দ্রনাথকে বোঝাবো।

দিনুবাবু নাকি বিদেশীকে ভাষা শেখাবার সময় কর্তব্যবোধহীন চপলতার জন্য বেশ কিছুটা ভালোমন্দ শুনেছিলেন শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছ থেকে।

ঐ সময় প্যারিস থেকে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। উভয়েই একাধিকবার বলেন, মরিস সাহেব উল্লেখ না করা পর্যন্ত তাঁরা কখনো বিশ্বাস করতে পারেন নি, ফ্রান্‌স্ না গিয়ে মানুষ কি করে এরকম বিশুদ্ধ ফরাসী শিখতে পারে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে রনার 'যীশুজীবনী' পড়ান। এ বই আমার মহদুপকার করেছে এবং করছে।

বলা বাহুল্য এই সরল সজ্জন যুবা পণ্ডিতটি সকলেরই হৃদয়ে স্থান পেয়েছিলেন। গুরুদেবের তো কথাই নেই, মরিস সাহেব ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথেরও অশেষ স্নেহ পেয়েছিলেন। বড়বাবু বিদেশী পণ্ডিতদের সঙ্গে বাক্যালাপ কালক্ষয় বলে মনে করতেন; বলতেন, 'এরা সব তো জানে কোন্ শতাব্দীতে প্রজ্ঞাপারমিতা কিংবা একাক্ষরপারমিতা প্রথম লেখা হয়, প্রথম ছাপা হয়। ওসব জেনে আমার কি হবে? তার চেয়ে নিয়ে আসো না ওদের কোনো একজন, যে কাণ্টের দর্শন সমর্থন করতে পারে, আর আমি নেব বিরুদ্ধ মতবাদ, কিংবা সে নেবে বিরুদ্ধ মতবাদ, আমি নেব কাণ্টপক্ষ—তার যেটা খুশী।' মরিস সাহেব তাঁকে তখন অনুনয়-বিনয় করে সম্মত করাতেন বিদেশী পণ্ডিতকে দর্শন দিতে। অবশ্য দু'মিনিট যেতে না যেতেই বড়বাবু সব ভুলে গিয়ে কোনো কিছু অন্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় তন্ময় হয়ে

যেতেন। আমাদের মতন ছেলে-ছোকরাদের কিন্তু তাঁর কাছে ছিল অবাধ গমন। আমার মনে পড়তো খৃস্টের কথা; তিনি যেহোভার মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিস্তর তথাকথিত কুলাঙ্গার ভি আই পি-কে, এবং আদেশ দিতেন 'লেট দি চিলড্রেন্ কাম্ আনটু মী।'

মরিস সাহেব প্রথমটায় সম্মত ছিলেন না; আর সকলের চাপাচাপিতে তিনি প্যারিসের সরবনে গিয়ে ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হতে রাজী হলেন।

প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাঁর সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা। আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করাতে আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। তিনি বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়েছ; জর্মনিতে ডক্টরেট করবে। আমিও এখানে তাই করছি। আমরা এখন এক বয়েসি।' আমার বয়েস তখন চব্বিশ, তাঁর বত্রিশ। তারপর আমাকে রেস্তোরাঁয় উত্তমরূপে খানদানী ডিনার খাওয়ালেন। বিনয় এবং সঙ্কোচের সঙ্গে পরের দিন বললেন, 'তোমাকে ভালো করে এন্টারটেন করতে পারলুম না। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আমার এ মাসের টাকাটা এখনো দেশ থেকে আসে নি।' আমি তারস্বরে প্রতিবাদ জানালুম। বহু বৎসর পরে ঐ সময়কার এক প্যারিসবাসী ভারতীয়ের কাছে শুনতে পাই, মরিস সাহেব অন্যান্য দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্রদের টাকা 'ধার' দিয়ে দিয়ে মাসের বেশীর ভাগ দেউলে হওয়ার গহ্বর-প্রান্তে পড়ি পড়ি করে বেঁচে থাকতেন। আসলে তাঁর পরিবার বিত্তশালী ছিল।...তাঁর সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। কিন্তু এখনো তাঁর সেই শান্ত সংযত প্রসন্ন বদনটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু তার পূর্বের একটি ঘটনা চিরকাল ধরে আমার ও আমার সতীর্থদের চিত্তে কৌতুক রস এনে দেবে, প্রতিবার সেটার স্মরণে।

গুরুদেব শারদোৎসবের মোহড়া নিচ্ছেন। তিনি স্বয়ং, দিনুবাবু—এমন কি জগদানন্দবাবুর মত রাসভারী লোক—অজিন ঠাকুর এঁরা সব অভিনয় করবেন। এক প্রান্তে বসে আছেন শুকান্ত বিষণ্ণবদন মরিস সাহেব। আমি হোমটাস্‌ক্ না করলে তাঁর মুখে যে বিষণ্ণতা আসতো তিনি যেন তারই [illegible] 'হেলপিং' নিয়েছেন। মোহড়ার শেষে দিনুবাবু কাঁচুমাচু হয়ে গুরুদেবকে অনুরোধ জানালেন, মরিস সাহেবকে ড্রামাতে একটা পার্ট দিতে।

গুরুদেবের ওষ্ঠাধর প্রান্তের মৃদুহাস্য সব সময় ঠাহর করা যেত না। এবারে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে সব পার্টেরই বিলিব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। গুরুদেব বললেন, 'ঠিক আছে। একে শ্রেষ্ঠীর পার্ট দিচ্ছি।' হয় মূল নাটকে শ্রেষ্ঠীর পার্ট আদৌ ছিল

না, ঐটে মারিস সাহেবের জন্য 'ইস্‌পিসিলি' তৈরি হয় কিংবা হয়তো তখন মাত্র বড় বড় পার্টগুলোর বণ্টনব্যবস্থা হয়েছে।

তা সে যা-ই হোক, শ্রেষ্ঠীর অভিনয় করবেন 'নটরাজ' মরিস—শাস্ত্রী মশাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন মরীচি (ব্রহ্মার পুত্র, কশ্যপের পিতা ও তিনি সূর্যকিরণও বটেন) —মরিসও সগর্বে কাঁচা-হাতে সেই নামই সই করতেন। এবারে শুনন, পার্টটি কি?

রাজা : ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী : আদেশ করুন, মহারাজ!

রাজা : এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুনে দাও।

শ্রেষ্ঠী : যে আদেশ!

ব্যস্‌! ঐটুকু! আমার শব্দগুলো ঠিক ঠিক মনে নেই, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে মরিসকে ঐ পাঁচটি শব্দ বলতে হবে; গুরুদেব সায়েবের বাঙলা উচ্চারণ সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকীব-হাল ছিলেন বলে। কিন্তু মরিস সাহেব বেজায় খুশ, জান্ তর্‌বুর্‌—ড্যাম্‌গ্ল্যাড—হোক না পার্ট ছোট, তাতেই বা কি? বলেন নি স্বয়ং গুরুদেব, 'The rose which is single need not envy the thorns which are meny'?

কিন্তু এইবারে শুরু হল ট্রবল। গুরুদেবের ভাষাতেই বলি, মরিসকে শুতে হল কণ্টকশয্যায়, গোলাপ-পাপড়ির আচ্ছাদিত পুষ্পশয্যায় নয়—যদিও থর্ন মাত্র একটি। গুরুদেব যতই বলেন 'আদেশ করুন, মহারাজ' মরিস বলেন, 'আডেশ করুন, মহারাজ'। মহা মুশকিল। মরিস আপন মরীচি-তাপে ঘর্মাক্তবদন। শেষটায় গুরুদেব বরাত দিলেন দিনুবাবুকে, তিনি যেন সাহেবের 'ত' 'ট'র জট ছাড়িয়ে দেন। আকটার অল—তিনিই তো খাল কেটে ঘরে কুমির এনেছেন; বিপদ, এক্‌স্‌কিউজ মি—বিপডটা টো টাঁরই টৈরি।

মরিস সাহেব ছন্নের মত হয়ে গেলেন। সেই প্রকেট জরথুস্ত্রের আমল থেকে কোন্ পার্সী-সন্তান এই 'ত' 'ট'য়ের গর্দিশ মোকাবেলা করেছে—এই আড়াই হাজার বছর ধরে—যে আজ এই নিরীহ, হাড্ডিসার মরিস বিদেশ-বিভূঁইয়ে একা একা এই 'ত'য়ের তাবৎ 'দ'য়ের দানব—আই মীন ডানব, টাবট ডানবের সঙ্গে লড়াই দেবে?

মরিস ছন্নের মত আশ্রমময় ঘুরে বেড়ান—দৃষ্টি কখনো হেথায় কখনো হোথায়, আর ঠোঁট দুটি বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। আমি বললুম, 'নমস্কার, স্যার।' সম্বিতে এসে বললেন, 'আ! সায়েড (সৈয়দ)—' ও হরি! এখনো 'সায়েড'! তবে তো আডেশ এখনো মোকামে কায়েম আছে, রাজাদেশেরই মত—'শোনো টো ঠিক হচ্ছে কি না 'আডেশ করুন, মহারাজ।' আমি সন্তপ্ত চিত্তে চুপ করে রইলুম।

বার দশেক আভেশ আভেশ করে বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়ে এগিয়ে গেলেন।

একটা ডরমিটরি-ঘরের কোণ ঘুরতেই হঠাৎ সমুখে মরিস—বিড়বিড় করছেন 'আভেশ আভে—।' রেললাইনের কাছে নির্জনে 'আভেশ—।' দূর অতি দূর খোয়াইয়ের নালা থেকে মাথা উঠছে সায়েবের, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রালোকে, খেলার মাঠে মরিস, আসন্ন উষার প্রদোষে শ্মশানপ্রান্তে কার ঐ ছায়ামূর্তি? মরিস। হিন্দী কবি সত্যি বলেছেন,গুরু তো লাখে লাখে,উত্তম চেলা কই। আশ্রমের ছেলেবুড়ো এখন সবাই সায়েবের গুরু। এস্তেক শিশুবিভাগের কানাই, সাগর কেউ বাদ পড়ে নি। পড়ে থাকলে তাদের দোষ। সবাইকে টেস্ট করতে অনুরোধ করেন তাঁর আভেশ আভেশানুযায়ী হচ্ছে কি না। ইতিমধ্যে এক সন্ধ্যায় মোহড়া শেষে দিনুবাবু গুরুদেবকে ভয়ে ভয়ে অনুরোধ জানালেন 'আদেশের' বদলে অন্য কোনো শব্দ দিতে যেটাতে 'ত' 'দ' নেই। গুরুদেব বললেন, 'না; মরিসকে 'ত' 'দ' শিখতেই হবে।'

এর পর দ্বিতীয় পর্ব। হঠাৎ সকলের সামনে এক দিন বেরিয়ে গেল 'আদেশ' অত্যুত্তম 'দ' সহ। আমি ইয়াল্লা' বলে লম্ফ দিলুম। কেউ 'সাধু সাধু', কেউ বা 'কনগ্রাচুলেশনস্' বললেন। কিন্তু হা অদৃষ্ট! আমরা বন থেকে বেরুবার পূর্বেই-হর্ষধ্বনি করে ফেলেছি! সায়েব পরক্ষণে আভেশ-এ ল্যাপস্ করেছেন। তারপর তাঁর ক্ষণে আসে 'দ' ক্ষণে 'ড'! কলকাতার বাজারে মাছ ওঠা-না-ওঠার মত বেটিঙের ব্যাপার! এই করে করে চললো দিন সাতেক। সমুখে আশার আলো।

এর পর তৃতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের মত এটাও অপ্রত্যাশিত। সায়েব এখন চাঁচাছোলা, ভোরবেলার নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশিরবিন্দুর ন্যায় 'দ' বলতে পারেন। পয়গম্বর জরথুস্ত্র এবং তাঁর প্রভু আহুর মজদাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমরাও আমাদের সঙ্কটটা ভুলে গেলুম। মোহড়ায় প্রতিবার ঋষি মরীচি বৈদিক পদ্ধতিতে 'দ' উচ্চারণ করেন।

মরিস সায়েব স্টেজে নামলেন পার্সী দস্তুর বা যাজকের বেশ পরে। সব-কিছু ধবধবে সাদা। শুধু মাথার টুপিটি দাদাভাই নোরজী স্টাইলের লেটার-বকস্ প্যাটার্নের কালোর উপর সফেদ বুট্টাদার। গুরুদেব এই বেশই চেয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা পার্সীরা বাপু এ দেশের শ্রেষ্ঠী। তোমরা যা পরবে তাই হবে শ্রেষ্ঠীর বেশ।'

নাট্যশালা গমগম করছে। ওঃ, সে কী অভিনয়! গুরুদেবকে দেখাচ্ছে দেবদূতের মত। অজিনের চেহারা এমনিতেই খাপসুরত, এখন দেখাচ্ছে রাজপুত্রের মত। গুরুমশাই জগদানন্দ রায়ের কী বেত্রাস্ফালন! আশ্রমে বেতের বেসাতি

বিল্‌কুল বে-আইনি। এ মোকায় জগদানন্দবাবু যেন হৃতোপবীত-দ্বিজ লুণ্ঠিত যজ্ঞোপবীত ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কঠিনদর্শন মুখচ্ছবি ঈষৎ স্নিগ্ধতা ধরেছে।

মরিস সাহেব প্রবেশ করলেন রঙ্গমঞ্চে।

রাজা দিলেন ডাক।

মরিস সাহেব—হে ইন্দ্র, তোমার বজ্র কেন তৎপূর্বেই অবতীর্ণ হল না।

উৎকণ্ঠা, উত্তেজনায় মরিস বলে ফেলেছেন, 'আ ডে শ!'

অট্টহাস্যে ছাদ যেন ভেঙে পড়ে। তিনি কিন্তু ঐ একই উত্তেজনার নাগপাশে বদ্ধ বলে সে অট্টহাস্য শুনতে পান নি।

সে সন্ধ্যার অভিনয়ের জন্য অধ্যাপক হিড্‌জিভাই মরিসই পেয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনন্দন। আমাদের বিবেকবুদ্ধি সেই আদেশই দিয়েছিল—খুব সম্ভব আডেশই।*

'আধুনিক' কবিতা

'সুশীল পাঠক—'

ছেলেবেলায় এ ধরনের সম্বোধন পড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হত। মনে হত, কত মহান লেখক এই কালীপ্রসন্ন সিঙ্গি, যিনি কিনা মহাভারতের মত বিরাট গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, তিনি আমাকেই সম্বোধন করে কথা বলছেন। এটা যে নিছক সাহিত্যিক ঢং, বলার একটা আড়, সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না। বিশেষ করে যখন আমার ধারণা হল—সেটা হয়তো ভুল—যে দরদ-ভরা কথা কয়ে যখন তিনি আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চান, তখনই 'পাঠক' বলে সম্বোধন করেন। এবং আরো বেশী করে 'সহৃদয় পাঠক' বলে সম্বোধন করতেন সিঙ্গি মশাইয়ের মত দরদী লেখককুল যখন তাঁরা এমন কোনো অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে যেতেন, যেটার মোক্ষম মার বেশীর ভাগ পাঠকই খেয়েছে। এ অধম প্রাচীনপন্থী। সে এখনো পাঁচকড়ি দে পেলে গোপনে পড়ে। এবং বটতলাতে কিছুদিন হল একখানা 'সচিত্র প্রেমপত্র' কিনে সে বড় ভরসা পেয়েছে। যৌবনে ভাষার উপর দখল ছিল না—এখনই বা হল কই?—মরমিয়া প্রেমপত্র লিখতে পারতো না বলে

* মরিস সর্বদাই ঈষৎ বিষণ্ণ বদন ধারণ করতেন—খুব সম্ভব এটাকেই বলে 'মেলানকলিয়া।' প্যারিস থেকে ফেরার পথে তিনি জাহাজ থেকে অন্তর্ধান করেন। আমার মত আর পাঁচজন তার কারণ জানে না। শুনেছি, তিনি উইল করে তাঁর সর্বস্ব বিশ্বভারতীকে দিয়ে যান।

রায়ের ভাষায়, "উনিষটি যার প্রেমেতে সে ঘায়েল করে থামলো শেষে।" আর ভয় নেই। এখন এই অমূল্য গ্রন্থ থেকে নকল করে ফিলিমস্টার থেকে মেয়ে-পুলিস সকলেরই 'সজল নয়নে হৃদয়-দুয়ারে ঘা' দেওয়া যাবে। বইখানার প্রথম চার লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ এর থেকে কতখানি পিছিয়ে আছেন :—

'প্রিয়তমা চারুশীলা পিতৃগৃহে গিয়ে
আছ তো সুখেতে তুমি গোষ্ঠিজন নিয়ে ?
তুমি মোর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ধন।
তুমি মোর হৃদয়ের শান্তিনিকেতন।'

জানি, জানি—বাধা দেবেন-না, জানি আপনারা বলবেন, এই মডার্ন যুগে এসব পণ্য অচল। কিন্তু আপনারা কি এ তত্ত্বটাও জানেন না যে, ফ্যাশান হর-হামেশা বদলায় এবং আকছারই প্রাচীন যুগে ফিরে যায় ? পিকাস্‌সো ফিরে গেছেন প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীর দেয়াল-ছবিতে, অবনঠাকুর মোগলযুগে, নন্দলাল অজন্তায়, যামিনী রায় কালীঘাটের পটে। কাব্যে দেখুন, দুর্বোধ্য মালামে র‍্যাঁবো যখন অনুবাদের মারফৎ ইংলণ্ডও জয় করে বসে আছেন, তখন হাউসম্যান লিখলেন সরল প্রাঞ্জল 'শ্রপশার ল্যাড'। বলা হয়, ইংলণ্ডে কবির জীবিতাবস্থায় তাঁর একখানা বইয়ের এত বিক্রির অন্য উদাহরণ নেই। কোনো ভয় নেই। বাঙালাদেশের মডার্ন কবিতাও একদিন 'পাখি সব করে রবের' অনবদ্য শাশ্বত ভঙ্গিতে লেখা হবে।

আমি মডার্ন কবিতা পছন্দ করি নে, তাই বলে মডার্ন কবিতার কোনো 'রোজো দেত্রর্‌' রীজন দর এগজিস্‌টেনস্‌ অর্থাৎ পুচ্ছটি তার উচ্চে তুলে নাচাবার 'রোজোঁ' রীজন, ন্যায্যহক্ক নেই এ কথা কে বলবে।

প্রথমেই নিন মিলের অত্যাচার। এবং এই মিলটা আমাদের খাঁটি দিশি জিনিস নয়। সংস্কৃতের উত্তম উত্তম মহাকাব্যে, কাব্যে মিল নেই। যদিস্যাৎ থাকে, তবে সেটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রায় কবির অনিচ্ছায় ঘটেছে। সংস্কৃতে প্রথমে মিল পাই—আমার জানা মতে—মোহমুদ্গরে। এবং তিনিও সেটা বহিরাগত ভাষা থেকে নিয়েছিলেন, এমত সন্দেহ আছে। সংস্কৃতের সহোদরা ভাষা গ্রীক-লাতিনে কি মিল আছে ? এ দেশেই দেখুন, উর্দু তার জননী সংস্কৃত ভাষা থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে, জোব্বা-জাব্বা পরে প্রায় মুসলমান হয়েছে (প্রায় বললুম কারণ এখনো বহু হিন্দুর মাতৃভাষা উর্দু; উর্দু কবি-সম্মেলনে তাঁরা সম্মানিত সক্রিয় অংশীদার। কিঞ্চ, পণ্ডিত নেহরু, তেজবাহাদুর সপ্রু ইত্যাদির মাতৃভাষা ছিল উর্দু), তথাপি আজও উর্দুতে বিনা মিলে দোহা রচনা করা হয়,

সংস্কৃত সুভাষিতের অনুকরণে। 'মিল' শব্দটা কি শুদ্ধ সংস্কৃত? সংস্কৃতে একে বলে 'অন্ত্যানুপ্রাস'—স্পষ্ট বোঝা যায়, বিপদে পড়ে মাথায় গামছা বেঁধে ম্যানুফেকচার্ড এরজাৎস্ মাল। অতএব যদি মডার্ন কবিরা সে-বস্তু এড়িয়ে চলেন তবে পাঠক তুমি গোস্সা করো ক্যান্? ওঁরা তো মাইকেলেরই মত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করছেন। এই যাবনিক ম্লেচ্ছাচারের যুগে সেটি কি চাট্টিখানি কথা!

তারপর ছন্দ? ছন্দহীন কবিতা হয় না, আপনাকে বলেছেন কোন্ অলঙ্কার-শাস্ত্রের গোঁসাই? উপনিষদ পড়েছেন? তার ছন্দটি কান পেতে শুনেছেন? ছন্দে-বাঁধা কবিতা আসতে পারে তার কাছে? বস্তুত বেদমন্ত্রে ছন্দ মেনে মেনে হায়রান হয়ে ঋষিকবি উপনিষদে পৌঁছে কি যুগপৎ তাঁর আধ্যাত্মিক ও কাব্যিক মোক্ষ লাভ করলেন না? এ অধম অশিক্ষিত—তথাপি গুণীজনের কাছে শোনা উপনিষদের একটি সামান্য সাদামাটা প্রশ্ন নিন :—

'সূর্য অস্ত গেছে, চন্দ্রও অস্ত গেছে, অগ্নি নির্বাপিত (অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে যে একে অন্যকে দেখবো তার উপায় নেই), কথাও বন্ধ (অর্থাৎ চিৎকার করে ডাকবারও উপায় নেই)। তখন কোন্ জ্যোতি নিয়ে মানুষ (বেঁচে) থাকে, বলুন তো যাজ্ঞবল্ক্য?'

এবার সংস্কৃতটা শুনুন :—

'অস্তমিতে আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে, শান্তেঽগ্নৌ, শান্তায়াং বাচি, কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?'

প্রচলিত মন্দাক্রান্তা বা শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এই অতুলনীয় সঙ্গীতমন্দ্রিত-স্পন্দিত ছত্র বেঁধে দিলে কি প্রভু যীশুর ভাষায় লিলিফুলের উপর তুলি নিয়ে রঙ বোলানো হত না?

এতেও যদি আপনাদের মন না ভরে তবে পড়ুন ইংরিজী অনুবাদে বাইবেল—রাজা দায়ুদের গান, সুলেমান বাদশার গীতি (সং অব্ সংস, সং অব্ সলোমন)। সে তো গদ্যে, এবং স্বয়ং বার্নার্ড শ বলেছেন, ঐ সলোমনের গীতিটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা।

আর আপনি যদি মুসলমান হন তা হলে তো কথাই নেই। আপনি জানেন প্রাক-পয়গম্বর যুগেও আরবদের ছিল বহু বিচিত্র ছন্দে, মিলের কঠোরতম আইনে বাঁধা অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি। গদ্য ছিল না, কিংবা প্রায় না থাকারই মত। তথাপি আল্লা-তালা পয়গম্বরকে যে কুরানের বাণী পাঠালেন সে তো গদ্যে। অথচ

আরবীভাষা নিয়ে যাঁরা সামান্যতম চর্চা করেছেন তাঁরাই শপথ করে বলবেন, এঁর ছন্দোময় গদ্য যে কোনো ছন্দে বাঁধা কাব্যকে হার মানায়। পয়গম্বরকে যখনই তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ কোনো প্রকারের মিরাক্‌ল্ (অলৌকিক কীর্তি) দেখাতে আহ্বান করতো তখনই তিনি সবিনয় বলতেন, 'আমি নিরক্ষর আরব। তৎসত্ত্বেও আল্লা-তালা আমার কণ্ঠ দিয়ে যে কুরান পাঠালেন তার কাছে কি আসতে পারে তোমাদের শ্রেষ্ঠতম কাব্য ? এইটেই হল সবচেয়ে বড় মিরাক্‌ল্।'

অতএব মডার্ন কবিরা যদি ছন্দ অস্বীকার করেন তবে আপনি চটেনক্যান্ ?

তৎসত্ত্বেও মডার্ন কবিতার দুশ্‌মনরা হয়তো বলবেন, তারা সুন্দর সুন্দর জিনিসের সঙ্গে বিৎকুটে সব জিনিসের তুলনা দেয়—যেমন তালগাছের ডগায় চাঁদ দেখে লিখলে, এ যেন আকাশের সুচিক্কণ সুমসৃণ তাল! কিংবা প্রিয়ার বিনুনি দেখে কবির মনে এল পানউলীর দোকানে ঝোলানো অগ্নিমুখ নারকোলের পাকানো দড়ি—যার ডগায় লাগিয়ে আমি আকছারই বিড়ি ধরাই। সেই দড়ি হাওয়ায় দুলে কবির কুর্তা পুড়িয়ে দিয়ে পিঠে ছ্যাঁকা দিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রিয়ার বিনুনি দেখা মাত্রই তাঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

এটা পড়ে তাজ্জব মানছেন কেন ?

রাজা শূদ্রকের 'মৃৎ-শকটিকা' পড়েন নি ? জর্মনরা সংস্কৃতের সমজদার এস্তেক গ্যোটে হাইনে সংস্কৃত না জেনেও ভারতীয় নাট্যের স্মরণে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতেন। শূদ্রকের এই নাটকটি জর্মন ভাষাতে ক'বার যে ভিন্ন ভিন্ন রসিকজন দ্বারা অনূদিত হয়েছে বলা কঠিন, ক'বার যে জর্মনিতে মঞ্চস্থ হয়েছে সেটা বলা তার চেয়েও কঠিন। সেই নাট্যে আছে, ক্ষুধিত সূত্রধার বাড়ি ফেরার সময় গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন—বাড়িতে তো চালডাল কিছুই নেই, গৃহিণী কি আদৌ রন্ধন করতে পেরেছেন ? বাড়ি ঢুকেই সূত্রধার সানন্দে সবিস্ময়ে দেখেন, সাদা মাটির উপর লম্বা লম্বা কালো কালো আঁজি আঁজি দাগ—কালিমাখা হাঁড়ি মাটিতে ঘষে ঘষে গৃহিণী সাফসুৎরো করেছেন। অতএব ধূম্র দেখলে যে রকম বহ্নির উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়, হাঁড়ি পরিষ্কার করা হয়ে থাকলে রান্নাও যে হয়েছে সে বিষয়ে কি সন্দেহ ? সূত্রধার তখন সোল্লাসে উপমা দিয়ে বললেন, ওহো! সাদা মাটির উপর এই কালো কালো আঁজি যেন তুষারধবলা গৌরীর ললাটে কৃষ্ণাঞ্জন-তিলক!

কী মারাত্মক গন্ধময় হাঁড়িকুঁড়ি, মাটিতে সেগুলো ঘষার ফলে নোংরা কালো আঁজির সঙ্গে শিবানী গৌরীর অসিত তিলকের তুলনা! এ যে রীতিমত হেরেসি, এ হেন তুলনা চার্বাকের বেদ-নিন্দার চেয়েও ধর্মম্ন কটু-ভাষণ।

এর পরও আপনি আপত্তি করে বলবেন মডার্ন কবিতা ন দেবায় ন ধর্মায় ?

বুদ্ধিমান তথা না-ছোড়-বান্দা পাঠক, আমি বিলক্ষণ জানি, আপনার প্রধান আপত্তি কোন্‌খানে—ছোটখাটোগুলো উপস্থিত না হয় বাদই দিলুম। আপনি বলবেন ওদের কবিতা পড়ে মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারি নে। আম্মো পারি নে —ধাপ্পা না মেরে হক্ক কথাই কই। সে তো আপনার দোষ, আমার দোষ। আপনি আমি পয়সাওলার ছেলে হয়ে জন্মালে সত্যকার অপ্‌ টুডেট্, chic, dernier cri, লেটেস্ট মডেলের হাইয়ার এড়ুকেশন পেতুম ; আপনি, আমি আমরা নিদেন যদি অধ্যাপক হতুম, তারো নিদেন যদি আমরা তাঁদের শিষ্য হবার সুযোগ পেতুম, তবে তো আজ এ প্রশ্ন তুলতুম না। কিন্তু এহ বাহ্য।

'বুঝতে পারি নে' কথাটার অর্থ কি ? আপনি ভৈরবী বা পূরবী শুনে যদি রস না পান তবে কি গায়ককে এ প্রশ্ন শুধান, 'ভৈরবীর অর্থ আমায় বুঝিয়ে দাও ?' আরো সহজ দৃষ্টান্ত দি। পদ্মাবক্ষে আপনি সূর্যোদয় দেখে মুগ্ধ হলেন, মাঝি হলো না। সে যদি আপনার তন্ময় ভাব দেখে শুধোয়, 'কত্তা, সূয্যি তো উঠলেন, কিন্তু আপনি এমন বে-এক্কেয়ার হলেন কেন ? এ সূয্যি ওঠাতে কি আছে আমাকে বুঝিয়ে দেন', তা হলে আপনি কি বোঝাবেন ? তাজমহল দেখে হাক্‌সলি মুগ্ধ হন নি, কিন্তু তিনি তো গাইডকে এ প্রশ্ন শুধোন নি, 'তাজমহলের অর্থ আমায় বুঝিয়ে বলো।' কিংবা ভরত নাট্যম দেখে আপনি যদি 'অর্থ' বুঝতে চান, তবে হয়তো অভিনয়াংশের অর্থ আপনাকে বোঝান যাবে কিন্তু বিশুদ্ধ নাট্যরসের (যেমন যন্ত্রসঙ্গীতের) 'অর্থ'-ই বা কি, আর বোঝাবেই বা কে ? চিত্রে একদা লোকে কোনো বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখে কিছুটা অর্থ পেত কিন্তু এখন ক্যুবিজম্, দাদাইজমে কেউ সাদৃশ্য খোঁজে না, অর্থও খোঁজে না। কাঠের একটা গুঁড়ি নিয়ে বিখ্যাত ভাস্কর ছ'মাস ধরে প্রাণপণ খাটলেন ; প্রদর্শনীর মধ্যকক্ষে সেটি স্থাপিত করে তলায় নাম লিখলেন, কাঠের একটা গুঁড়ি। কাঠের গুঁড়ি, কাঠের গুঁড়ি ; ভৈরবী, ভৈরবী। তার আবার অর্থ কি ?

মনে হচ্ছে আপনি তন্ত্রের কিছুই জানেন না। তন্ত্রের নিগূঢ়তম মন্ত্রের অর্থ শাধান না গুরুকে ? যদি তিনি প্রকৃত গুরু হন তবে আপনার হাড় ক'খানা আর আস্ত থাকবে না। আর অত গভীরে যাবার কি প্রয়োজন ? এই যে পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারী উপাসনা করে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, তার ক'টা ভাষা লোকে বোঝে ? আপনি উত্তরে হয়তো বলবেন, আমরা রস নিয়ে বিচার করছি। তা হলে স্মরণে আসুন, সেই বুড়ি—দাড়িওয়ালা কথকঠাকুরের কথকতা শুনে হাউ-হাউ

করে কেঁদেছিল—কথকতার এক বর্ণ না বুঝেও। তার স্মরণে কি এসেছিল সেটা অবান্তর। তার কান্নাটা সত্য। তার রসবোধটা সত্য।

অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তলিয়ে দেখুন, অর্থ বোঝা মাত্রই রসোৎপন্ন হয় না—অর্থ পেরিয়ে যে ব্যঞ্জনা যে ধ্বনি যে অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি হয়, রস সেই গভীর গুহায়। উপনিষদে আছে সত্য (এবং সত্যই অনুভূতির ক্ষেত্রে রস—কারণ সৎ আনন্দ এবং চিৎ নিয়ে সচ্চিদানন্দ) আছেন সোনার পাত্রে লুকানো। সাধারণ জন সোনার পাত্র দেখেই মুগ্ধ, ভিতরে তাকিয়ে দেখে না। কাব্যে, সঙ্গীতে সর্বত্রই অর্থ জিনিসটা সুবর্ণপাত্র, তাই দেখে লোক মুগ্ধ। রস কিন্তু ভিতরে। তার সঙ্গে পাত্রের কি সম্পর্ক? পাত্রস্থিত অমৃতরসের সঙ্গে যে ধাতু (অর্থ) দিয়ে পাত্র নির্মিত হয়েছে তার কি সম্পর্ক? কিছুই না। তাই, এ সব বুঝেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন,

'জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ।'

৪।১।৬৫

মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রাশ্রেয়ঃ

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন শুধান, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে যে অফুরন্ত কাহিনী কিংবদন্তী আছে—যেরকম যমদূত একবার ভুল করে মৃত্যুর নির্ধারিত দিবসের পূর্বে এক নায়েবকে নরকে নিয়ে যাওয়ার ফলে কি রকম তুমুলকাণ্ড ঘটেছিল—মুসলমানদের ভিতরও তেমনি আছে কি না। আছে, কিন্তু সেগুলো প্রধানত লোকশিক্ষার জন্য এবং অনেকগুলোতেই প্রচুর হাস্যরসও আছে। এসব গল্পের প্রাচুর্য ইরানেই বেশী, এবং তুর্কীতে খুবই কম। তুর্কীরা নাকি বড্ড বেশী সিরিয়াস। অতএব গোঁড়া। অতএব রসকষহীন।

আমার একটি গল্প মনে পড়ল এবং সেটা সকলেরই কৌতূহল জাগাবে। কারণ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদি, কি খৃষ্টান—সকলেই জানতে চায় মহা-প্রলয় (আরবীতে কিয়ামৎ) কবে আসবে? সর্ব ধর্মের শাস্ত্র-গ্রন্থেই তার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু পাকাপাকি কোনো-কিছু জানার উপায় নেই। একদা নাকি খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল, খৃষ্টজন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ণ হলে মহাপ্রলয় আসবে। শুনতে পাই, অনেক লোকেই নাকি তার কিছুদিন পূর্বে সর্বস্ব বিক্রয় করে দান-

খয়রাতে উড়িয়ে দেয়।

১০০০খৃষ্টাব্দ পূর্ণ হওয়ার দিনে শেষটায় যখন মহাপ্রলয় হল না তখন এরা পস্তিয়ে ছিলেন কি না জানি নে, তবে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া ভালো। এখন ১৯৬৬। যদি রটে যে, ২০০০-এ মহাপ্রলয়, তবে এখন যারা যুবা এবং বালক তারা যেন ঐ সময়টায় একটু ভেবেচিন্তে দান-খয়রাৎ করেন।

মহাপ্রলয় কবে আসবে, সে সম্বন্ধে আরবদের ভিতর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

আল্লা-পাক নাকি একদিন প্রধান ফিরিশ্‌তা (বাঙালায় ফেরেস্তা লেখা হয়; অর্থ এঞ্জেল, দেবদূত) জিব্রাইলকে (ইংরিজিতে গেব্রিয়েল) ডেকে আদেশ দেবেন, যাও তো, মানুষের ছদ্মবেশ ধরে পৃথিবীতে। যে কোনো একজন মানুষকে শুধোও জিব্রাইল এই মুহূর্তে কোথায় আছেন? জিব্রাইল পৃথিবীতে নেমে একজন মর্ত্য-বাসীকে সেই প্রশ্ন শুধোলেন। লোকটা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললে, 'এরকম বেকায়দা প্রশ্ন করে লাভটা তোমার কি? আমার এসব জিনিসে কোনো কৌতূহল নেই, তবে যখন নিতান্তই শুধোলে তবে—দাঁড়াও, বলছি।' লোকটি দুই লহমা চিন্তা করে বলল, 'হুঁ, ঠিক বলতে পারবো না—তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সে (আরবীতে ইংরিজীর মত he-র সম্মানার্থে কোনো 'তিনি' শব্দ নেই) এখন পৃথিবীতে। বেহেশ্‌তে নয়।' জিব্রাইল স্বর্গে ফিরে আল্লাকে উত্তরটা জানালে তিনি বলবেন, 'ঠিক আছে।' তার পর কেটে যাবে আরো বহু সহস্র বৎসর। তার পর আবার আল্লা-পাক ঐ একই প্রশ্ন একই ভাবে শুধোবার জন্য জিব্রাইলকে পৃথিবীতে পাঠাবেন। এবারে যে মর্ত্যবাসীকে শুধোনো হল, সে বিরক্ত হল আরো বেশী। বললে, 'কি আশ্চর্য! এখনো মানুষ এরকম সম্পূর্ণ বাজে বেকার প্রশ্ন করে! হিসেব কষলে যে এরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না তা নয়, তবে দেখো, এসব ব্যাপারে আমার কোনো উৎসাহ নেই। আচ্ছা…' এক সেকেণ্ড চিন্তা করে লোকটা বললে, 'স্বর্গে তো নয়, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে…' ফের দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, 'পৃথিবীতেই যখন, দাঁড়াও, হাঁ, কাছেপিঠেই কোথাও—আমি চললুম।' জিব্রাইল বেহেশ্‌তে ফিরে এসে আল্লাকে সব কিছু বয়ান করলেন। আল্লা বললেন, 'ঠিক আছে।' তার পর কেটে যাবে আরো কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লক্ষ বৎসর। আবার জিব্রাইল সেই হুকুম নিয়ে ধরাভূমিতে আসবেন। এবার যাকে শুধালেন সে তো রীতিমত চটে গেল—'এসব বাজে বাজে প্রশ্ন…ইত্যাদি।' জিব্রাইল বেশ কিছুটা কাকুতি-মিনতি করাতে সে নরম হয়ে বললো, 'তাহলে

দেখি। হুঁঃ, স্বর্গে নয়, পৃথিবীতে।' তারপর আরেক সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, 'কাছে-পিঠে কোথাও'। তারপর আরো দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে তাজ্জব মেনে বলবে, 'কী আশ্চর্য, যে এরকম মস্করা করো। তুমিই তো জিব্রাইল—তবে শুধাচ্ছো কেন ?' এবারে জিব্রাইল সব খবর দিলে আল্লা-পাক হুকুম দেবেন মহা-প্রলয়ের শিঙা বাজাতে।

কথিকাটির তাৎপর্য কি ?

প্রথমত, মানুষ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে করে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যে স্বর্গের খবর পর্যন্ত তার কাছে আর অজানা থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, কিন্তু, তার তাবৎ জ্ঞানবিজ্ঞান বিদ্যাচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সাংসারিক, বৈষয়িক, প্র্যাকটিকাল জিনিস নিয়ে।* ইহলোক ভিন্ন পরলোক, পাপপুণ্যের বিচার, সে সর্গে যাবে না নরকে জ্বলে পুড়ে খাক হবে—এ সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল থাকবে না, কারণ স্বয়ং জিব্রাইলকে হাতের কাছে পেয়েও সে এসবের কোনো অনুসন্ধান করলো না। এমন কি সৃষ্টিকর্তা আল্লা—দীন দুনিয়ার মালিক যাঁকে পাবার জন্য কোটি কোটি বৎসর ধরে শত শত কোটি মর্ত্যের মানুষ স্বর্গের দেবদূত আমৃত্যু দেবদুর্লভ সাধনা করেছে, তাঁর প্রতিও সে উদাসীন।

তৃতীয়ত, যেহেতু সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন অতএব কল্পনা করা কঠিন নয় যে, সে তখন বিশ্বভুবন তার খেয়াল-খুশী মর্জি-মাফিক নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টায় লেগে যাবে। তারই ফলে হয়তো বেরুবে শত শত আইষমান কোটি কোটি ঈশ্বরসৃষ্ট জীবকে বিনাশ করতে।

* * *

ভরসা হচ্ছে, বিশ্ববিবর্তনে যদ্যপি সেই চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ মানুষ ক্রমেই সত্যসুন্দরের (অল্-হক্, অল্-জমীল) সাধনার পথ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তবু এখনো বোধ হয় পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌঁছতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। পক্ষান্তরে ইসলাম একথাও বলেন, কিয়ামৎ যে-কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। তার অর্থ,

* ইমাম গজ্জালি মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ—কেউ কেউ বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ—মনীষী। তিনি একাধারে দার্শনিক, শাস্ত্রী ও সুফী (রহস্যবাদী ভক্ত) ছিলেন। আব্বাসীয় যুগের বিখ্যাত বাগদাদ নগরীর বিশ্ববিদ্যালয় সে যুগের মধ্যপ্রাচ্যের সর্বোত্তম জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। ইমাম গজ্জালী তার রেক্টর (শেখ) ছিলেন। অধুনা তাঁর একখানা বইয়ে দেখি. তিনি মনস্তাপ করছেন যে, তাঁর কালের (মৃত্যু ১১১১ খৃষ্টাব্দে) লোক শুধু প্র্যাকটিক্যাল বিদ্যা শেখে। আমি ভরসা পেলুম।

মানুষ হয়তো হঠাৎ এক লম্ফে পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌঁছে যেতে পারে।

পয়গম্বর বলেছেন, "আল্লার থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায় শয়তান।" সেই শয়তান জড়বাদের প্রতিভূ এবং প্রতীক। অতএব প্রত্যেক সত্য-জ্ঞানান্বেষীর প্রধান কর্তব্য জড়বাদ অর্থাৎ শয়তানের কীর্তিকলাপ কি প্রকারে বাহ্যজগতে স্বপ্রকাশ হয় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা—তথা শয়তান প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হলে আত্মহারা না হয়ে জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা তার স্বরূপ চিনতে পারা। শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সরল জীবন যাপনই যথেষ্ট নয়; জ্ঞানানুসন্ধান নিত্য-প্রয়োজনীয় অবশ্যকর্তব্য। এই মর্মে আরেকটি কাহিনী আছে :—

একদা শয়তানের রাজা, ধাড়ি শয়তান এক বাচ্চা শয়তানকে তালিম দিচ্ছিল, সৎপথগামীদের কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে বিপথগামী করা যায়। ধাড়ি শয়তান অতিশয় ধুরন্ধর গুরু এবং বিশ্বপর্যটক (জাহানদীদা) রূপে অপর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সম্যক অবগত আছে, কোন্ প্রকারের মানুষ কোন্ পদ্ধতিতে চলে, কাকে সমঝে চলতে হয়, আর কেই বা অগা আহাম্মুখ। ঐ অনুচ্ছেদে এসে ধাড়ি বললে, কিন্তু বৎস, হুঁশিয়ার! আচারনিষ্ঠ সাধুজনকে বরঞ্চ আমাদের পথে (মানবীয় ভাষায় কুপথে) নিয়ে যাবার চেষ্টা করো কিন্তু জ্ঞানী পণ্ডিতকে সমঝে-বুঝে চলো। ওরা বড়ই ভীষণ প্রাণী। সৃষ্টির আদিম কাল থেকে ওরাই আমাদের আদিম দুশমন।'

শাগরেদ খুদে শয়তান আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে কি কথা! আচারনিষ্ঠ জন তো সদাই জপতপ নিয়ে ব্যস্ত থাকে; আমার কথা ভাববার তার ফুরসৎ কই? আর পণ্ডিতদের কথা যখন বললেই, প্রভু, তবে নিবেদন করি, আজকের দিনে তাদের অবস্থাটা একটু পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। খেতে পায় না, পরতে পায় না আর আকাট-মূর্খ নিষ্কর্মারা বড় বড় চাকরির পদবী নিয়ে ওদের মাথায় ডাণ্ডা বোলায়। নিজে মেস্টার, ওদিকে ছেলেটাকে কলেজে পাঠাতে পারে না। এসব হাভাতেদের লোভ দেখিয়ে পথ ভোলাতে কতক্ষণ?'

ধেড়ে হেসে বললে, 'খুব তো মুখে মুখে হাই-জাম্প লঙ-জাম্প দেখালি। কাজের বেলা কি হয় সেটা বোঝা যাবে পরশু দিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে।'

পরশু দিনের দিন প্র্যাকটিকাল। সে বড় কঠিন তালিম। তাবৎ হপ্তার এলেম হাতেনাতে বাৎলাতে হয়। আমাদের ইস্টুডেন্টরা টুকলি-নকল করলে আমরা যে রকম সেটাকে 'শয়তানী' নাম দিয়ে চোটপাট করি, এখানে তেমনি সাধু সরল পন্থায় কর্ম উদ্ধার করতে গেলে সেটাকে 'সাধুমী' বলে গুরু কান মলে দেয় শিষ্যের।

খেড়ে আদেশ দিলেন, 'ঐ যে হোথা একটি সরল সাধু জপ করছে ওকে আমাদের পথে নিয়ে আসার ডিমনস্ট্রেশনটি করো তো, বৎস।'

বাচ্চা শয়তান প্রমাদ গুণলো। এই সৌম্যদর্শন, কৃচ্ছ্রসাধনজনিত-পাণ্ডুর তথাপি মধুরবদন সাধুকে ধর্মপথ থেকে বিচলিত করা কি তার মত চ্যাংড়া শাগরেদের কর্ম! না জানি, আজ কপালে কি আছে!

ক্লাসে যে নোট দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সে দফে দফে স্মরণে আনলো। তার পরে বিএলজব্‌ব, ইব্‌লিস, ডিয়াবলুস, শয়তান-উস্‌-শয়াত্তীন সবাইকে মনে মনে হাজার হাজার আদাব-বন্দেগী জানিয়ে গেল বেশ ধারণ করতে।

আহা! সে কী চিত্তহারিণী ভূষা! খেড়ে, আণ্ডা, সব শয়তানকে লড়তে হয় ফিরিশ্‌তা অর্থাৎ দেবদূতদের সঙ্গে—তাই ওঁদের চালচলন বেশভূষা তারা খুব ভালো করেই চেনে। এ যুগে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করার পূর্বে মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত কিছু জর্মনদের পরিয়ে দেন পোলিশ সৈন্যের উর্দী। সেই উর্দী পরে তারা 'আক্রমণ' করে একটি জর্মন বেতারকেন্দ্র—পোলিশ-জর্মন সীমান্তে। সেই 'আক্রমণের' ও 'আক্রমণে নিহত পোলিশ সৈন্যের' ছবি হিটলার বিশ্বময় প্রকাশ করে সপ্রমাণ করেন যে, পোলরাই প্রথম জর্মনি আক্রমণ করে!

হিটলার, হিমলার, আইষমান, হোস এঁরা তো খাস শয়তানের তুলনায় শিশু।* ছদ্মবেশ ধারণে এনারা এমন আর কি 'কৈশল' দেখাবেন!

বাচ্চা শয়তান ধারণ করলো দেবদূত—ফিরিশ্‌তার বেশ।

অঙ্গ থেকে বেরুচ্ছে দিব্যজ্যোতি এবং নন্দনকাননমন্দারসৌরভ; তার প্রতি পদক্ষেপে ঝংকৃত হচ্ছে অপ্সরাবিনিন্দিত সঙ্গীত নিক্কণ—সঙ্গে এসেছে বসন্ত-পবনের মৃদু হিল্লোল মলয়ানিল বিলোলানন্দোল্লাস।

বাচ্চা শয়তান সম্মুখীন হল সাধুর। বললে, 'তোমার তপশ্চর্যায় পরিতুষ্ট হয়ে আল্লা-তালা আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ করো।'

বলা মাত্রই সে বুরাকের বেশ ধারণ করলো।

* অনেকে মনে করেন এ-অধম নাৎসি দলের নির্ভেজাল দুশমন। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, যুদ্ধের গোড়ার দিকে হিটলার যে ইংরেজকে বেধড়ক চড় কষায় সেটা এ অধমের চিত্তে সাতিশয় বিমলানন্দ দিয়েছিল। আমার মতে হিটলারের সব চেয়ে মারাত্মক ভুল হয়, তিনি ফ্রান্সের পতনের পর যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করলেন না। না হয় তিনি নিষ্ফলকাম হতেন। তাতেই বা কি! মহৎ কর্ম করতে গিয়ে নিষ্ফল হওয়া অপকর্মে (রুশ আক্রমণ) সফল হওয়ার চেয়ে শ্রেয়ঃ!

বুরাক্ অনেকটা পক্ষীরাজের মত। সর্বাঙ্গ অত্যুত্তম অশ্বন্যায় এবং উভয় স্কন্ধে দুটি পক্ষ।*

কিন্তু বাচ্চা শয়তান ক্লাসের থিয়োরেটিকাল সর্ব আদেশ মেনে চলতে চলতে ভয়ে বেপথু-কম্প্রমান, এই সামান্য ফাঁদটা সাধু না ধরে ফেলেন।

কিন্তু ধেড়ে শয়তান দূর থেকে নিশ্চিন্ত মনে সব-কিছু দেখছে। সে বিলক্ষণ জানে, এসব আচরনিষ্ঠ জন বড় দম্ভী হয়। এরা ভাবে, সংসারের সর্বভোগ যখন ত্যাগ করেছি, তখন আর স্বর্গের সর্বসুখ আমি পাবো না কেন?

এই দম্ভই তাদের সর্বনাশ আনে, সে তত্ত্ব শয়তান দেখেছে, যুগ যুগ ধরে।+

তপস্বী সাধু ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে চেপে বসলেন সেই ভেজাল বুরাকের স্কন্ধে।

তারপর কি হল, সেটা বর্ণনা করতে আমার বাধে। কারণ সেটাতে আছে বীভৎস রস। সংক্ষেপে বলি, সাধুর যখন জ্ঞান হল তখন তিনি বিষ্ঠাকুণ্ডে। বাচ্চা শয়তান একবার তাকে কাঁধে পেয়ে পেয়েছে বাগে। ক্লাসের নোট-মাফিক তাকে সর্বযন্ত্রণা দিয়ে অজ্ঞানাবস্থায় ফেলে দিয়ে গেল পুরীষ-গহ্বরে।

সুশীল পাঠক! তুমি বলবে, আচারনিষ্ঠ সজ্জনের এই অসদ্‌গতি হল কেন? আমিও গল্পের এই পর্যায়ে কাহিনী-কীর্তনিয়া মৌলানাকে ঐ একই প্রশ্ন শুধোই।

তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'পুচ্ছাংশ দেখিয়াই সর্বাঙ্গ বিচার করা যায় না। অবহিত চিত্তে সর্বাঙ্গসুন্দর কাহিনীটি প্রণিধান করহ।'

এবারে ধেড়ে শয়তান বাচ্চাকে বললে, 'ঐ যে দেখা যাচ্ছে দূরে এক আলিম। এবারে বাবাজী, সাবধান!'

বাচ্চা কিন্তু ভয় পাওয়ার মত কিছুই দেখলো না। পণ্ডিত বটে লোকটা, কিন্তু নামাজ রোজায় যে তার মাঝে মাঝে ত্রুটি হয়ে যায়, সে তো জানা কথা। বইয়ের

* মুসলমানী ও পার্সী রেস্তোরাঁতে নাস্ত্যিকাসিক হিন্দু পাঠকও এর ছবি দেখে থাকবেন। পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ সাহেব এই বুরাকে চড়েই সৃষ্টিকর্তা সন্নিধানে যান। বিরুদ্ধ পক্ষ বলেন, তিনি সশরীরে যান নি; তাঁর রূহ, অর্থাৎ আত্মা গিয়েছিল। অর্থাৎ বুরাক ইত্যাদি রূপকার্থে নিতে হবে।

+ কবি রবীন্দ্রনাথ কৃচ্ছ্রসাধনে দম্ভ দেখে সর্বত্যাগী ভৈরব-শঙ্করকে উদ্দেশ করে বলছেন—

'আমাকে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।'

সর্বত্যাগী শঙ্কর হিন্দুর উপাস্য। কিন্তু তার সর্বত্যাগের অন্ধানুকরণ ও তৎসহ তাই নিয়ে দম্ভ, সেই ত্যাগের luxury, যেমন মূর্খ চেলারা করেন, কবি সেইটে এই কবিতায় বুঝিয়েছেন।

নেশায় তার কাটে অষ্টপ্রহর। এটাকে বাগে আনতে আর কতক্ষণ?।

পূর্ববৎ দেবদূত-বেশ ধারণ করে বাচ্চা শয়তান পণ্ডিতের সামনে এসে দাঁড়ালো। পূর্ববৎ তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব জানালো।

পণ্ডিত তখন রকে বসে বদনা থেকে জল ঢেলে মুখ ধুচ্ছিলেন।

ভুললে চলবে না, ইনি পণ্ডিত। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তাব শুনেই তাঁর চড়াকসে মনে পড়ে গেল ইতিপূর্বে কে কে আল্লার সমীপবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মুসা (Moses), ঈসা (যীশু), হজরৎ পয়গম্বর—ব্যস্।

তাই পণ্ডিত উত্তমরূপেই জানতেন, তিনি এমন কিছু পুণ্যশীল মহাপুরুষ "প্যাকম্বর' নন যে আল্লা তাঁকে স্বর্গে যাবার জন্য ডেকে পাঠাবেন।

'বটে রে, ব্যাটা!' মনে মনে বললেন পণ্ডিত। 'মস্করা করার জায়গা পাও না। আজ তোমারই একদিন, আর আমারই একদিন।'

সুহাস্য-আস্যে মৌলবী বললেন, 'কী আনন্দ, কী আনন্দ। স্বর্গে যাবার জন্য তো আমি হামেহাল তৈরি। কিন্তু, ভদ্র, এযুগে বড় ভেজাল চলছে। কি করে জানবো, তুমি সত্যই দেবদূত। শুনেছি দেবদূতরা মুআজিজা কেরামৎ (miracle) দেখাতে পারেন। তুমি কিছু একটা দেখাতে পারলেই আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।'

বাচ্চা শয়তান বলল, 'আপনি কি মিরাক্ল্ দেখতে চান, বলুন।' তার মনে বড় আনন্দ, অর্ধেক কেল্লা ফতেহ্ করে ফেলেছে।

পণ্ডিত বললেন, 'শুনেছি, দেবদূত অনায়াসে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সর্ব আকার গ্রহণ করতে পারেন। তুমি পারো?'

'নিশ্চয়!'

'তাহলে তুমি ক্ষীণ কলেবর গ্রহণ করে আমার এই বদনার নালি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারো?'

বাচ্চা শয়তান উল্লাসে মনে মনে নৃত্য করছে, পণ্ডিত এর চেয়ে অন্য কঠিন কর্ম করতে ইচ্ছা জানান নি বলে। তাকে তো অনায়াসে তিনি আরবীস্তানের বিরাট মরুভূমি, কিংবা ইউফ্রাতেস নদী, কিংবা আকাশের সূর্য, বা দিবাভাগে পূর্ণচন্দ্র হতে বলতে পারতেন।

পাছে তিনি মত পরিবর্তন করে ফেলেন, তাই সে তন্মুহূর্তেই পণ্ডিতের বদনার নালির ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়লো।

যেই না ঢোকা, পণ্ডিতের আর কোনো সন্দেহ রইল না ব্যাটা বদমাশ। তিনি

ভালো করেই জানেন, আল্লার আপন দূত একটা বদনাতে ঢুকতে যান না। তিনি বহুবিধ শাস্ত্র পড়েছেন, তাতে এমন মিরাকল্, কেরামতের উল্লেখ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশের পিঁড়িটা বদনার উপর চেপে তার উপর আরো ভালো করে চেপে নিজে বসে পড়লেন এবং বদনার নালিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন একটা খেজুর। বেশ মোলায়েম ফল; টায়ে টায়ে বদনায় সেঁটে যায়।

এবং চিৎকার :—

'গিন্নী, গিন্নী! নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি উনুনটা। ব্যাটাকে আজ সেদ্ধ করে হালুয়া বানাবো। ব্যাটা আমার সঙ্গে মস্করা করতে এসেছে! শা—, হা—জা—, বা—।*

হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড! বুড়ো শয়তান দূর থেকেই বুঝেছে বেপারটা সঙ্গীন।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত-মৌলবীর পায়ে এসে পড়লো।

বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য সন্ধি-আপোস করতে চায়।

সন্ধির শর্ত হল শয়তান এবং তস্য গোষ্ঠী ঐ মৌলবী-পণ্ডিত গোষ্ঠীর কাউকে প্রলোভিত করতে পারবে না।

* *

প্রথম গল্পের সঙ্গে এ গল্পের কি সম্পর্ক?

যতক্ষণ অবধি পণ্ডিত-মৌলবী-মৌলানা-রাব্বী-কাদার-দস্তুর সূক্ষ্মমাত্র প্র্যাকটিকাল বিষয়ে মত্ত হবেন না, ততদিন মহাপ্রলয় আসবে না।

* *

কিন্তু পাঠক, তোমার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে যে প্রশ্ন আমারো তাই। কী দরকার সেই-মহাপ্রলয় ঠেকিয়ে? যেখানে পৌঁচেছি, চাল নেই, তেল নেই, মাছ নেই—

২।১০।৬৫

* পণ্ডিত মাত্রই কি ভারত, কি আরব সর্বত্র আমাদের আজকের দিনের বিচারে বড় অশ্লীল গালাগাল দেন। 'তোমার সঙ্গে আলোচনা বন্ধ্যাগমন' আমাকে একাধিক পণ্ডিত বলেছেন। আমি তখন শান্তিপুরে নব্যন্যায় শিক্ষায় 'বন্ধ্যাগমন' করছি। দোষ আমারই, তাঁদের নয়। কাইরোতেও একই অবস্থা!

আলবের্ট শোয়াইৎসার্

"আজিকে একেলা বসে শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তবে সাজি
নবছন্দে, নূতন আনন্দগানে ?"

এই কবিতাটি রচিত হ'বার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর কেটে গিয়েছে। আমার চেনা-অচেনা অনেক প্রখ্যাত পুণ্যশ্লোক জন ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ-প্রশ্নটি তাঁদের উদ্দেশে শুধাই নি। হয়তো ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আজ আর এ-প্রশ্ন না শুধিয়ে থাকা গেল না।

কারণ এই মহাপুরুষ জীবনে সত্যসুন্দর শিবের যে সাধনা করেছিলেন সেটা সর্বযুগেই বিরল। এবং তার চেয়েও আশ্চর্য, তিনি একই পথে আজীবন সাধনা করেন নি।

আল্‌সেসের কাইজারবের্ক অঞ্চলে ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম।* সে অঞ্চল তখন জর্মন ছিল বলে তিনি জর্মন। ধর্মতত্ত্ব (প্রটেস্টান্ট বা এভানজেলিক) পড়ে তিনি চব্বিশ বছর সহপাদ্রিরূপে ঈশ্বর-মানুষ-গির্জার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু বছর তিন যেতে না যেতেই খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়ে তাঁর মনে যে-সব প্রশ্নের উদয় হয় সেগুলো নিয়ে চিন্তা, গবেষণা ও সাধনা গির্জার সেবায় নিযুক্ত থেকে হয় না। তাই তিনি বিখ্যাত স্ট্রসবুর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হয়ে কাজে যোগ দেন। এই অল্প বয়সেই তিনি যে গবেষণা করেন সেটা খৃষ্টধর্মের ইতিহাস-বিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং সে গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য সঞ্চয় বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ আদৌ নয়। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কি প্রকারে খৃষ্টের বাণী ও তৎপরবর্তী খৃষ্টধর্মের প্রথম উৎপত্তিযুগের এমন একটি অর্থপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি পাওয়া

---

* মৃত্যু : ৪।৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ কঙ্গোতে।

যায় যেটা আজও এবং আবার নূতন করে খৃষ্টসমাজে নূতন প্রাণ, নূতন ভক্তি, চরিত্রসংগঠন ও সমাজবাস করার জন্য নূতন নীতি নির্মাণ করে দেবে।

এদেশে রামমোহন তাই করেছিলেন। অর্থাৎ উপনিষদের স্বর্ণযুগ পুনরায় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন।

সউদী আরবের রাজা ইবন্ সউদ যে-সম্প্রদায়ভুক্ত তার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াহ্-হাবও তাই করেছিলেন।

শোয়াইৎসার্ এই সব তত্ত্বচিন্তায় ধ্যানধারণায় নিযুক্তকালীন প্রচুর সময় ব্যয় করেন সঙ্গীতস্রষ্টা য়োহান্ সেবাস্টিয়ান্ বাখ্-এর উপর। এখানেও সেই নবাবিষ্কারের কথা। এটা সত্য যে, বহু বৎসর দু-চারিটি কেন্দ্র ভিন্ন অন্য সর্বত্র বাখ্ অনাদারে থাকার পর সঙ্গীতস্রষ্টা মেণ্ডেলজোন্ পুনরায় রসিকজনের দৃষ্টি বাখ্-এর দিকে আকৃষ্ট করেন। এর পরেই বাখ্-এর অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার শোয়াইৎসার্। গির্জার অর্গেনসঙ্গীত তাঁরই প্রচেষ্টা ও প্রচারের ফলে পুনরায় নবজীবন লাভ করে। (অর্গেন ও অর্গেল এদেশের সঙ্গীতকে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর প্রভাবান্বিত করে। এই নিয়েই কিঞ্চিৎ গবেষণা কিছুদিন পূর্বে এদেশে হয়। তার অন্যতম প্রশ্ন তখন ছিল, অর্গেনকে কেটে হারমোনিয়ামরূপে প্রবর্তিত করে কে জনপ্রিয় হন কি করে, এর প্রতি আকাশবাণীর এত রাগ কেন, যদিও খান আবদুল করীম খানের মত মহাপুরুষ যখন এরই সঙ্গতে গেয়েছেন? এ নিয়ে আরো আলোচনা হলে ভাল হয়। আবার কৃতজ্ঞচিত্তে শার্ঙ্গদেবের শরণ নিচ্ছি। এবং সঙ্গে আরেকটি নিবেদন, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয়কামী নবীন ভারতীয় শাগরেদকে একাধিক ইয়োরোপীয় বাখ্ নিয়ে আরম্ভ করতে বলেন। বাখ্-এর রস পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজতর। এ বিষয় নিয়েও তুলনাত্মক সঙ্গীত-মহলে আলোচনা হওয়া উচিত।) এমন কি বলা হয় শোয়াইৎসার্ স্বহস্তে উত্তম অর্গেনও নির্মাণ করতে শেখেন।

উপরের দুটি সাধনা—খৃষ্টের জীবনানুসন্ধান ও বাখ্—ভিন্ন তাঁর প্রধান অনুসন্ধান ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, রাষ্ট্রচালনায় ধর্মনীতিকে পুনরায় দৃঢ় ভূমিতে স্থাপনা করা।

* *

সাধনা, অধ্যয়ন, ধ্যানধারণা, বাখ্-এর ভগবদ্‌সঙ্গীত এ সমস্ত নিয়ে যখন শোয়াইৎসার্ তন্ময়, যখন তাঁর খ্যাতি জর্মনির বাইরে বহুদূরে চলে গিয়েছে, তখন এই মহাত্মা হঠাৎ একদিন ত্রিশ বৎসর বয়সে, অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। কারণটি সরল অথচ সুদূরে নিহিত।

ফরাসী-কঙ্গ অঞ্চলে যে-সব অনাচার হয়ে গিয়েছে তার খেসারতি মেরামতি করতে হবে। কঙ্গর গভীরতম জঙ্গলে যে শত শত আফ্রিকাবাসী কুষ্ঠরোগে দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে তাদের সেবা করতে হবে।

তার পূর্বে কিন্তু তা হলে তো চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। ঠিক সেই জিনিসটিই সমাধান করে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিশনারি ডাক্তাররূপে তিনি ফরাসী-কঙ্গর দুর্গম অরণ্যের লাঁবারেনে-অঞ্চলে গিয়ে কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল খুললেন। তাঁর স্ত্রী দেশে নার্সের ট্রেনিং নিয়ে সেখানে সেবিকার কাজ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু এই কঙ্গবাসী কুষ্ঠরোগীদের অর্থসামর্থ্য কোথায়? শোয়াইৎসার্ আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ওষধি, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, সর্বোত্তম সহকর্মী নিয়ে চিকিৎসা করতে যান। তার জন্য অর্থ কোথায়?

এর পরের ইতিহাস দীর্ঘ। তাতে আছে আদর্শবাদ, নৈরাশ্য, অকস্মাৎ অযাচিত দান এবং সর্বোপরি শোয়াইৎসারের অকুণ্ঠ বিশ্বাস: "মানুষের জীবন বিধিদত্ত রহস্যাবৃত—এর প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের ভক্তি বিস্ময় ভয় থাকা উচিত।" এই অটল বিশ্বাস নিয়ে তিনি কিছু দিন পর পর সেই দুর্গম জঙ্গল অতিক্রম করে, ইয়োরোপে এসে অত্যুৎকৃষ্ট স্বরচিত আপন অভিজ্ঞতাপূর্ণ (বিশেষ করে অন্ধকার-কঙ্গর) পুস্তক প্রকাশ করে, প্রাচীন দিনের বাখ্-এর সঙ্গীত বাজিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। প্রথম-যুদ্ধের সময় তাঁর কাজে বাধা পড়ে; কারণ তিনি জাতে জর্মন হয়েও বাস করছেন ফরাসী কলনিতে—কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দ্বিতীয়—বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি এতই ভুবনবিখ্যাত যে দুই যুযুধান সৈন্যদলই তাঁর হাস-পাতালকে এড়িয়ে বাঁচিয়ে যুদ্ধ করে।

কিন্তু ১৯১৩ থেকে ১৯৬৫—এই দীর্ঘ বাহান্ন বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনা তো ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে শেষ করা যায় না। যদি কখনো সে সাধনার সিকি পরিমাণ খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারি তবে পুনরায় চেষ্টা নেব।*

৯।১।৬৫

* শোয়াইৎসার ভারতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে ১৯৩৫ সালে Die Weltanschauung der Indischen Denker নামক একখানা বই লেখেন। এ বই সম্বন্ধেও অনেক-কিছু বলার আছে; আমি বহু বৎসর পূর্বে পড়েছি। সেখানি ফের পেলে কিছু লেখার দুরাশা আছে।

মরহুম ওস্তাদ ফৈয়াজ খান

বিসমিল্লাতেই অতিশয় সবিনয় নিবেদন—আরম্ভ করে রাখি, এ অধম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মারপ্যাঁচ বিলকুল বোঝে না, ভরত থেকে আরম্ভ করে ধূর্জটিপ্রসাদ তক্‌ যে সব গুণীজ্ঞানী সঙ্গীতশাস্ত্র নির্মাণ করে গেছেন তাঁদের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি, কিন্তু তাঁদের বর্ণিত রাগরাগিণীর পুত্রকন্যা গোষ্ঠীকুটুম কে যে কোন্‌ মেলে পড়েন, কিছুতেই মনে রাখতে পারি নে। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে মারাত্মক তত্ত্ব, আমি পূর্ণ একটি বছর রেওয়াজ করেও তবলার গভীরে কেন—কানি পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে নিরাশ হয়ে সাধনাটি ছেড়ে দি, অতি দুঃখে অতি অনিচ্ছায়। অবশ্য নিতান্ত সত্যের অপলাপ হবে—তাই এটাও ক্ষীণ কণ্ঠে বলে রাখি, দ্রুতের রেওয়াজ করতে গিয়ে আমার হাতের কড়াতে আর্থ্রাইটিস হয়।

দ্বিতীয়ত, এ ক্ষুদ্র রচনাটি মজলিস্‌-রৌশন্‌ সমঝদারদের জন্য নয়, নয়, নয়। আমি খান সাহেবকে পেয়েছিলুম মানুষ হিসাবে, বন্ধু হিসাবে। তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন, সম্মোহিত করেছিলেন তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে—যদিও তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, আমি তাঁর জয়-জয়ন্তীতে যত না রস পাই, তার চেয়ে বেশী পাই তাঁর কাফি হোলিতে।

তাই দয়া করে মেনে নিন, এ লেখাটি সাধারণ পাঁচজনের জন্য, যারা যুগস্রষ্টাদের দৈনন্দিন জীবন, তাঁদের সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান সম্বন্ধে জানতে চায় মাত্র—কারণ তারা আমারই মত সুরকানা, তালকানা হওয়া সত্ত্বেও গান শুনতে ভালোবাসে এবং যেহেতু সঙ্গীতের গভীরে পৌঁছতে পারে না, তাই স্রষ্টাদের জীবনটা, তাঁদের চালচলন, ওঠনবৈঠন নিয়েই সন্তুষ্ট। অথথামার সঙ্গে আমাদের তুলনা করুন, কোনো আপত্তি নেই।

১৯৩৫ সালে, এই সময়ে, আজ হতে ঠিক ত্রিশ বৎসর আগে এ-অধম বরদা শহরে চাকরি নিয়ে পৌঁছয় এবং স্টেট গেস্ট্‌ হাউসে অতিথিরূপে স্থান পায়। মহারাজা স্বর্গত সয়াজীরাওয়ের সঙ্গে দেখা শেষ হওয়া মাত্রই আমার মনে যে অদম্য বাসনা জাগলো সেটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

ওস্তাদের ওস্তাদ রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রীযুত ফৈয়াজ খান বাস করেন এই বরদা শহরেই। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত শুনতে না পেলে এই দুনিয়াতে জন্মালুমই বা কেন, আর

এই বরদা শহরে এলুমই বা কেন? তার চেয়ে বাঁ-হাতের তেলোতে জল নিয়ে সেটাতে ডুবে আত্মহত্যা করলেই হয়।

খবর নিয়ে শুনতে পেলুম, তাঁর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় মহ্‌ফিলজলসা বসে, আর প্রায় প্রতি সকালে শাগরেদান সহ রেওয়াজ।

ইতিমধ্যে একটি অতিশয় অজানা-অচেনা বঙ্গসন্তানের সঙ্গে আলাপ হল। তার নাম বলবো না, কারণ ছেলেটি এখনো বড় লাজুক। তবে সে যদি চিঠি লিখে আপত্তি না জানায় তবে অন্য সুবাদে তার নাম প্রকাশ করে দেব। উপস্থিত ধরে নিন, তার নাম পরিতোষ চৌধুরী। ওস্তাদের শিষ্য—অবশ্য ন'সিকে পাকা-কথা বলতে হলে, ওস্তাদের বড় ভাইয়ের কাছেই সে রেওয়াজ করে বেশী। কারণ একাধিক সমঝদার আমাকে বলেছেন—আমার টুঁটি চেপে ধরবেন না!—যে যদিও দাদাটি নিজে সভাস্থলে গাইতেন না, তবু সঙ্গীতশাস্ত্র তিনি জানতেন ওস্তাদ ফৈয়াজের চেয়ে বেশী। তাঁরাই বলেছেন, ওস্তাদ তাই শাগরেদদের কণ্ঠস্বর সুললিত গম্ভীর মধুর করার ভার নিতেন নিজে—অন্য 'কাজের' জন্য ভিড়িয়ে দিতেন দাদার কাছে, বিশেষ করে অচলিত, প্রায়-লুপ্ত রাগরাগিণীতে যাদের দিল্‌চসপী-শখ্‌ অত্যধিক।

চৌধুরী তার গুরু খান সাহেবকে কি বলেছিল জানি নে, এক রবির সকালে তিনি সশরীরে আমার ডেরায় এসে উপস্থিত। আমি হতভম্ব। কোথায় তাকে বসাবো, কী আপ্যায়ন করবো, আমার মাথায় কিছুই খেলছে না। মহারাজ সয়াজীরাও এলেও আমি এতখানি গর্ব এবং নিজেকে এত অসহায় অনুভব করতুম না।

আর ওস্তাদ—বিশ্বাস করবেন না—বার বার শুধু আমার হাত দু'খানা ধরে নিজের বুকে চেপে ধরেন। তিনি আমার চেয়েও বেএক্তেয়ার। আর বার বার দরবারী (কানাড়া নয়!) কায়দায় আমাকে কুর্নিশ করেন।

বহুদিন ধরে সে বেইমান পাষণ্ডকে খুঁজেছি যে আমার দুশ্‌মনী করে তাঁকে বলেছিল, আমি গুরুঘরের ছেলে এবং মুসলিম-বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্রভূমি কাইরোতে এ্যাসন্ মুসলিমশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি যে স্বয়ং মহারাজা আমাকে সেথান থেকে বরদা রাজ্যে নিয়ে এসেছেন।

আমি আদৌ অস্বীকার করছিনে আমি গুরুবংশের ছেলে; এ ভারতে সে রকম শতলক্ষ আছে। কিন্তু তার চেয়ে আমার গুরুতর আপত্তি, আমার ক' পুরুষ পূর্বে কে যে শেষ-গুরু হয়ে গেছেন, সেটাও প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। এবং আমার

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আপত্তি : কাইরোতে আমি যেটুকু আরবী শিখেছি সেটি আমি আপনাকে ছ' মাসে শিখিয়ে দিতে পারি।

এ বিষয়টা আমি উল্লেখ করলুম কেন? এই যে গানের রাজার রাজা, এই কৈয়াজ খান কী অদ্ভুত সরল ছিলেন সেটা বোঝাবার জন্য। পরে আমি চিন্তা করে বুঝেছি, তিনি সঙ্গীতের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গিয়েছিলেন বলে সরল বিশ্বাসে ভাবতেন, সম্রাজীরাও যখন আমাকে খাতির করেন তখন আমিও নিশ্চয়ই আমার শাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিখরে। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞানের জন্য তিনি যখন রাজবল্লভ হয়েছেন, তখন আমিও তাই। একই লজিক!

এর পর কতবার আমাদের দেখাশোনা হয়েছে—গানের মজলিসমহফিলের তো কথাই নেই। আমি প্রতিবার তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, 'দেখুন ওস্তাদ! কত রাজা আসবে যাবে, কত শমস্ উল্‌উলিমা (মহামহোপাধ্যায়) কত পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যাবেন—এমন কি এই যে আমাদের বরদার দেওয়ান সাহেব, যাঁর হাম্বাই-তাম্বাইয়ের অন্ত নেই—তিনিও চলে যাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরেক দেওয়ান এসে উপস্থিত হবেন, কিন্তু আপনার মত লোক আবার কবে আসবে কে জানে? আমি বেঁচে থাকলে আরো রাজা দেখব, আরো দেওয়ান দেখব, কিন্তু আপনার মত কাকে পাবো?'

আর কী সুদর্শন পুরুষ ছিলেন তিনি! চেহারা রং গোঁপ সব মিলিয়ে তিনি যেন তাঁরই গানের '(বন্দে) নন্দকুমারম্'—শুধু নন্দকুমার ছিলেন শ্যাম, আর ইনি গোরাচাঁদ।

আমাকে শুধোলেন, 'কবে এসে একটু গান—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'তওবা, তওবা! আপনি আসবেন এখানে! আমি যাবো যে কোনো সন্ধ্যায়, আপনার ইজাজৎ পেলেই।'

তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

কতবার তিনি সন্ধ্যে সাতটায় এসে ভোর পাঁচটায় উঠেছেন। আমাকে কতবার তিনি বেহেশৎ দেখিয়েছেন। তাঁর ওফাতের (মৃত্যুর) পর আর কেউ দেখায় নি।

বিশ্বাস করবেন না, আমি নন্দকুমার গানটি ভালোবাসি জেনে একদিন তিনি আমাকে—আবার বলছি আমার মত অতি-সাধারণ শ্রোতাকে—পুরো দেড় ঘণ্টা ধরে ঐ গানটি শুনিয়েছিলেন।

কিন্তু কত লিখব! আমার স্মৃতির কত বড় অংশ জুড়ে এখনো তিনি বিরাজ করছেন!

তাই একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করে শেষ করি।

একটি বরদাগত বাঙালী মহিলার অনুরোধে আমার বাড়িতে মহফিল বসেছে। ওস্তাদ সেদিন বড় মৌজে।

দুপুরে বরদায় ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল। রাত দুপুরেও অসহ্য গরম, বর্ষা নামতে তখনো দু'মাস বাকি। ওস্তাদ অনেক-কিছু গাওয়ার পর শুধোলেন, 'আদেশ করুন, কি গাইব।' সেই মহিলাটি অনেক চাপাচাপির পর ক্ষীণ কণ্ঠে অনুরোধ জানালেন, 'মেঘমল্লার।'

ওস্তাদ সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলেন।

যেন তিনি তাঁর সমস্ত সাধনা, সমস্ত ঘরানা (হয়তো ভুল হল, কারণ 'রঙ্গিলা' ঘরানা মেঘমল্লারের প্রতি কোনো বিশেষ দিলচস্পী ধরেন কি না আমার জানা নেই), সমস্ত সৃজনীশক্তি, বিধিদত্ত গুরুদত্ত সর্বকলাকৌশল সেই সঙ্গীত সম্মোহন ইন্দ্রজালে ঢেলে দিলেন। আমরা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে যেন সর্ব লোমকূপ দিয়ে সে মাধুরী শোষণ করছি।

এমন সময় বাইরে নামল কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি।

মহফিলে হুলস্থুল পড়ে গেল! কে কি ভাবে ওস্তাদকে অভিনন্দন জানিয়েছিল, কে সূক্ষ্মমাত্র কুমড়ো-গড়াগড়ি দিয়েছিল, কে ওস্তাদের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মাত্র—এ সবের বর্ণনা দেওয়ার শক্তি আমার নেই। অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা তো শুধু তিনিই দিতে পারেন যাঁর লেখনীতে অলৌকিক শক্তি আছে।

অন্য দিন ওস্তাদ আমাদের অভিনন্দন, প্রশংসাবাদ, মরহাবা যতখানি ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানিয়ে গ্রহণ করতেন, আজ তিনি সে রকম করলেন না। দু—একবার সেলাম জানিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। আমার একটু আশ্চর্য লাগলো।

অবশ্য তার পরও তিনি গেয়েছিলেন ভোর অবধি।

শেষ ভৈরবী গেয়ে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। আমি বললুম, 'ওস্তাদ, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন; একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বসুন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর যে কী বিষণ্ণতা মুখে মেখে আমার দিকে তাকালেন তার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, সৈয়দ সাহেব, লোকে আমাকে এরকম লজ্জা দেয় কেন বলুন তো? আমি কি গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারি?'

আমি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললুম, 'সে জানেন আল্লা। আমি শুধু জানি,

অন্তত আজ রাত্রে তিনি আপনার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন।'

৯।১০।৬৫

'পঞ্চাশ বছর ধরে করেছি সাধনা।'

'কটা ভাষা?' 'হা কপাল! বাঙলাই হল না।'

প্রথমেই নিবেদন জানাই, আকাশবাণীর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো ফরিয়াদ নেই। কেন নেই, যখন চৌদ্দআনা পরিমাণ লোকের আছে এ-সব তর্কের ভিতর আমি ঢুকতে নারাজ। বিশেষত যখন খুব ভালো করেই জানি, এই বিশ্বসংসারটা রিফর্ম করার গুরুভার আল্লা-তালা আমার স্কন্ধে চাপান নি। আমি শুধু আজ আকাশবাণী বাবদে একটি কাহিনী নিবেদন করবো। শোনা গল্প। সত্য না-ও হতে পারে। তবে ক্যারেকটিরিস্টিক—অর্থাৎ গল্পটি শুনেই চট করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশবাণীর একটি বিশেষ স্থূলাঙ্গের ছবি।

'সুনন্দ' রাগে বিতৃষ্ণার বিকৃত কণ্ঠে তাঁর জুর্নালে ইণ্টারভ্যু নামক প্রতিষ্ঠানটির ব্যঙ্গ করেছেন। হায় রে কপাল! তিনি কখনো ইণ্টারভ্যুর রাজার রাজা 'অডিশনিং' নামক খাটাশটির দাঁত-ভ্যাংচানি দেখেছেন—ঈভন ক্রম এ ভেরি লঙ সেফ ডিসটেন্স? তা হলে বুঝতেন ঠ্যালা কারে কয়। আমি স্বয়ং একাধিক 'অডিশনিং' বোর্ডের বড়কর্তা ছিলুম বেশ কিছুকাল ধরে। আমার জানার কথা! কিন্তু আমি এ সুবাদে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি কাহিনী কীর্তন করবো।

একদা 'গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটি গেল' যবে যে, কী বড় কী ছোট তাবৎ সঙ্গীতকাররা পরীক্ষা (এরই 'ভদ্র' নাম অডিশনিং) দিয়ে তবে গান গাইবার প্রোগ্রাম পাবেন, তখন পরীক্ষকদেরই একজন আপত্তি তুলে বললেন, 'বাজারে যাঁদের গ্রামোফোন-রেকর্ড রয়েছে, এবং/কিংবা স্টুডিয়ো-রেকর্ড রয়েছে তাঁদের আবার অডিশনিং-এর কি প্রয়োজন? যাঁদের নেই তাঁদের কথা আলাদা।' কিন্তু তখনকার দিনের আকাশবাণী রাজাধিরাজ স্বাধিকারমত্ত। মোকা যখন পেয়েছেন তখন ছাড়বেন কেন?

তখন ধরুন, এই লখ্‌নৌ শহরে ছোট-বড় তাবৎ গাওয়াইয়া বাজানেওলারা একজোটে স্থির করলেন, তাঁরা পরীক্ষা দেবেন না। তাঁদের আপত্তি, যারা পরীক্ষা নেবে তারাই বা সঙ্গীত-জগতের কী এমন বাঘ-সিঙ্গি?

আবার বলছি, এটা গল্প।

অবস্থা যখন চরমে, তখন দুনিয়ার হালচাল বাবদে সম্পূর্ণ বেখেয়াল, লখ্‌নৌয়ের সবচেয়ে বড় ওস্তাদ একদিন ভোরবেলা শিষ্য-সমাবৃত হয়ে রেওয়াজ করতে করতে হঠাৎ শুধোলেন, 'হাঁ মিয়া, "আডিশনিং আডিশনিং" চারো তরফ লোগ শোরগোল মচা রহে হৈঁ, সো ক্যা বলা ?' (পাঠক, আমার উর্দুজ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে কলকাতার পানওয়ালাদের দোকান থেকে—অপরাধ নিয়ো না, বরায়ে মেহেরবানী।) মোদ্দা কথা তিনি জানতে চাইলেন, চতুর্দিকে যে এই অডিশনিং অডিশনিং রব উঠেছে, সেটা আবার কি বালাই (আপদ, গেরো)।

শিষ্যেরা প্রাঞ্জল ভাষায় সে 'বালাইয়ের' জন্ম, বয়োবৃদ্ধি ও বর্তমান পরিস্থিতি গুরুকে বুঝিয়ে দিলেন, এবং তাঁদের কেউই যে এই অপমানকর প্রতিষ্ঠানের সম্মুখীন হবেন না সেটাও জানিয়ে দিলেন।

গুরু তাজ্জব মেনে বললেন, 'সে কি ? ইম্‌তিহান্‌-পরীক্ষা দিতে তোমাদের কি আপত্তি ? ভেবে দেখো আমি যখন বিরাট জলসায় গান ধরি তখন কি শেষ কাতারের পানওয়ালাটা পর্যন্ত আমার পরীক্ষা আরম্ভ করে দিয়ে ভাবে না, আমি রসসৃষ্টি করতে পারবো কি না, তার দিল ভিজিয়ে নরম করতে পারবো কি না ? সোজা কথায় বলতে গেলে, মহফিলের সবাই প্রতিবারেই আমার পরীক্ষা নেয়। হাঁ, আল্‌বত্তা, তারা না বলে পরীক্ষা নেয়, এরা বলে কয়ে নিচ্ছে। তাতেই কী বা এমন ফারাক ?'

শিষ্যেরা অচল অটল।

ওস্তাদ হেসে বললেন, 'মৈঁ তো জাউংগা জরুর।'

শিষ্যরা বজ্রাহত। আর্তরব ছেড়ে পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান তাবৎ শাগরেদ আবুজ্‌ করলে, 'আমরা যাচ্ছি নে ঐ সব পাঁ—দের সামনে পরীক্ষা দিতে, আর আপনি যাবেন হুজুর ?' হুজুর বললেন, 'য়েকীনান্‌—নিশ্চয়ই।'

শিষ্যেরা তখন 'ফারাম' (form)-এর ভয় দেখালে। তাতে মেলা অভদ্র প্রশ্ন আছে। ওস্তাদ বললেন, 'সে তো আদমশুমারীর সময়ও আমার বুড়টা বীবীকে শুধিয়েছিল, তিনি অন্য কোনো পন্থায় কিছু আমদানি করেন কি না ? ওসব বাদ দাও। ফারাম ভর দো।'

* * *

অডিশনিং-এর দিন টাঙা চড়ে গুরু চললেন, স্টুডিয়োর দিকে। সঙ্গে মাত্র একটি চেলা। বাকি চেলারা চালাকি করে আকাশবাণীকে জানায় নি যে তাঁদের

ওস্তাদ অডিশনিঙে আসছেন—ওদের শেষ ভরসা এপয়েন্টমেন্ট নেই বলে শেষ-মেষ যদি সবকুছ বরবাদ-ভণ্ডুল হয়ে যায়। অবশ্য এ-কথাও ঠিক, ওস্তাদ ওদের পরীক্ষা দেবার জন্য হুকুম দেন নি। নইলে ওরা নিশ্চয়ই অমান্য করতো না।

লখ্নৌয়ের—কথার কথা বলছি—আকাশবাণী সেদিন কারবালার ময়দানের মত খাঁ-খাঁ করছে। এমন সময় নামলেন গুরু টাঙা থেকে।

আকাশবাণীর 'চ্যাংড়াদের' যত দোষ দিন, দিন—প্রাণভরে দিন, কিন্তু একথা কখনো বলবেন না, এরা ওস্তাদদের সম্মান করে না। আমার চোখের সামনে কত বার দেখেছি, প্রোগ্রাম-এসিসটেন্ট কুলীনস্য কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান কী রকম মুসলমান গুরুর পায়ের কাছে কুমড়ো-গড়াগড়ি দিচ্ছে, মুসলমান পীরের ছেলে হিন্দু গুরুর পায়ে ধরে বসে আছে। এদের অসম্মান করে—অবশ্য সেটা ওদেরই রুচির অভাব—ওপরওয়ালারা যারা সঙ্গীত বাবতে দীর্ঘকর্ণ।*

ছোকরা কর্মচারীরা তো তন্মুহূর্তেই ওস্তাদকে তাদের চোখের পাতার উপর তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলো অডিশনিং রুমে—যেখানে 'পরীক্ষকরা' বেকার উকীলদের মত অনুপস্থিত মাছি মারছিলেন আর নিষ্ফল আক্রোশে আর্টিকিশেল দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় খাচ্ছিলেন।

ওস্তাদকে দেখে তাঁরা স্তম্ভিত। এ কী কাণ্ড! যেসব আনাড়ী ছোকরা গাওয়াইয়ারা দিনকে দিন বেতারকেন্দ্রের ছারপোকা-ভর্তি বেঞ্চিতে বসে দশ রুপেয়ার প্রোগ্রামের জন্য ধন্না দেয় তারা পর্যন্ত আসে নি অডিশনিঙে—আর এই

* প্যারিসে একবার একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতানুষ্ঠান-কর্তাদের নেকনজর পায় নি শুনে ভলতেয়ার সেই সঙ্গীতস্রষ্টাকে একটি চৌপদী লিখে সান্ত্বনা জানান, 'হায়, বড়লোকদের যে কানও বড় হয়' (অর্থাৎ গাধা)। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি উদাহরণ জানি। গুণী, ওস্তাদ রবিশঙ্কর তখন দিল্লি-আকাশবাণীর সঙ্গীতাধিনায়ক। গান্ধীর জন্মদিনে সেক্রেটারি ওঁকে ডেকে হুকুম দেন, ঐ উপলক্ষে তিনি গান্ধীর তাবৎ জীবনী—দক্ষিণ-আফ্রিকা, বড়লাট, উপবাস, সল্ট্-মার্চ—প্রতিফলিত করে যেন নূতন কিছু 'কম্পোজ' করেন। বিহ্বল, প্রায় উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি, রবিশঙ্কর চলেছেন করিডর দিয়ে—আমার সঙ্গে আচমকা কলিশন। সম্বিতে এসে আমাকে দেখে করুণ হাসি হেসে তাবৎ বাৎ বয়ান করে শুধোলেন, 'এ কখনো হয়?' আমি বললুম, আপনি যখন বাজান তখন আমার মত দৃষ্টিতে আনাড়ীরও মনে হয়, আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তবে কি না—হেঁ, হেঁ—সেক্রেটারি বোধ হয় বিলিতী সিমফনি, পাস্তোরাল-টাস্তোরাল বই পড়ে (শুনে নয়) আদেশ করছেন, এ দেশেই বা হবে না কেন?' রবি শুধোলেন, 'করি কি?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'একটা বাবদে আমার মত আকাটও একটা সজেশন দিতে পারে।' 'কি কি?' 'ঐ সল্ট্-মার্চের জায়গায় এসে আপনি যন্ত্রের তারগুলোতে করকচ-নুন মাখিয়ে দেবেন।'

ওস্তাদের ওস্তাদ লখ্‌নৌয়ের কুৎব্‌মিনার, তানসেনের দশমাবতার তিনি এসে গেছেন—এ যে অবিশ্বাস্য, বিলকুল গল্পের মুম্‌কিন্‌ তিলিস্‌মাৎ।

একথা অনস্বীকার্য তাঁরা ওস্তাদকে প্রচুরাধিক ইজ্জৎ দেখিয়ে ইস্‌তিক্‌বাল (অভ্যর্থনা) জানালেন, সর্বোত্তম তাকিয়াটি তাঁর পিছনে চালান দিলেন। ওস্তাদের মুখ যথারীতি পানে ভর্তি ছিল। একটি ছোকরা ছুটে গিয়ে ওগল্‌দান্‌ (পিকদান) নিয়ে এসে সামনে ধরলো।

কেউ কিছু বলার পূর্বেই ওস্তাদ বললেন, 'সব জব্‌ জম্‌ গয়ে তব কুছ হো জায়—' অর্থাৎ সঙ্গীতামোদীরা যখন একজোট হয়ে গিয়েছি তখন হোক কিঞ্চিৎ গাওনা-বাজনা। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নইলে কে তাঁকে সাহস করে পরীক্ষা দিতে বলতো? ওস্তাদ সবিনয় শুধোলেন, 'কি গাইবো?' তারস্বরে চীৎকার উঠলো, 'সে কি, সে কি? গজব কী বাৎ। আপনার যা খুশী!' (সাধারণ পরীক্ষার্থী জানে, এদের মামুলী পেশা বিৎকুটে, অচেনা রাগ বৎখৎ তালে গাইবার আদেশ দেওয়া।)

ইতিমধ্যে বেতারকেন্দ্রের যে পয়লা-নম্বরী সারেঙ্গীওয়ালা ও ওস্তাদ তবলচী অডিশনিং বয়কট করে কেন্টিনে চা খাচ্ছিল তারা টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটে এসেছে সঙ্গত দিতে—কর্তারা এদের অভাবে যে দুটি আকাট যোগাড় করেছিলেন, তারা বহু পূর্বেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

ওস্তাদ ধরলেন তোড়ি। আলাপের সময় প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বকুলগাছ থেকে এক একটি ফুল হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে লাগলো। যখন তালে এলেন তখন যেন ফুল নিয়ে সাতলহরা মালা গাঁথতে লাগলেন, প্রিয়ার কুন্তলদামে পরাবেন বলে।

আর সমস্তক্ষণ মুখে কী খুশীর ছটা। জানটা যেন ফুর্তিতে ভরপুর। ক্ষণে সারেঙ্গীওলার দিকে মুখ বাড়িয়ে তার বাজনার তারিফ করে বলেন, 'ক্যা বাৎ, ক্যা বাৎ!' ক্ষণে তবলচীর দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করে হুঙ্কার দেন, 'শাবাশ, শাবাশ, আফরীন, আফরীন!' যেন ওরাই সব জমিয়ে চলছে। ওঁর কোন কৃতিত্ব নেই।

গান থামলো। আনন্দে বিস্ময়ে সবাই এমনই স্তম্ভিত যে পুরো এক মিনিট পরে হর্ষধ্বনি ও সাধুবাদ রব উঠলো।

ইতিমধ্যে 'পরীক্ষকদের' একজন ওস্তাদের সঙ্গী ছোকরা শাকরেদের কাছ থেকে অন্য সকলের অজানতে সেই 'ফারাম্'খানা চেয়ে নিয়েছে। ঐটেতে পাস না ফেল, কোন্‌ হারে দক্ষিণা বেঁধে দিতে হবে সে-সব লিখে দিতে হয়।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো, যেখানে প্রশ্ন, 'আপনি কোন্ কোন্ রাগ-রাগিণী জানেন ?' তার উত্তরে লেখা মাত্র একটি শব্দ : 'তোড়ি।'

বিস্ময় ! বিস্ময় !! এ কখনো হয় !!! পরন্ত দিনের কাঁচা গাওয়াইয়াও তো লিখতো ডজন দুই। ওস্তাদ জানেন কত শত, এ তো রসজ্ঞদেরও কল্পনার বাইরে।

অতিশয় বতরিবৎ এবং প্রচুর মাফ চেয়ে সেই 'পরীক্ষকটি' বৃদ্ধ ওস্তাদকে শুধোলেন—অল্প অবিশ্বাসের স্মিতহাসি হেসে, 'ওস্তাদ, এ কখনো হয় যে, আপনি একমাত্র তোড়ি ছাড়া আর কিছুই জানেন না ?'

সকলের মুখেই প্রসন্ন মৃদু হাস্য। সারেঙ্গী-তবলা মাথা নিচু করে জাজিমের দিকে তাকিয়ে।

যে কোনো বিদ্যাতেই তোমার যদি অভিমান থাকে তবে, পণ্ডিত পাঠক, এই বেলা তুমি কান পেতে শোনো,—আমার জীবনে তাঁর উত্তরটি নিবিড়ঘন আঁধারে ধ্রুবতারার মত জ্বলে—তিনি কি উত্তর দিলেন।

ঠণ্ডী সাঁস লে কর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওস্তাদ বললেন,

'পচাস সালসে তোড়ি গা রহাহুঁ—অভী ঠিক তর্ হ্ সে নহী নিকলতী।'

অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর ধরে তোড়ি গাইছি। এখনও ঠিকমত বেরয় না। অন্য রাগ-রাগিণীর কথা কেন বৃথা শুধোও॥

১৬।১০।৬৫

ইন্টারভ্যু

'ইন্টারভ্যু' নামক চরম বেইজ্জতীর মস্করা যে কত নব নব রূপে প্রকাশিত হয় তার বর্ণনা আরেক দিন দেব। 'দেশে' এই মর্মে একাধিক চিঠি বেরিয়েছে, এবং আগে-ভাগে কাকে চাকরি দেওয়া হবে সেটা ঠিক করে নিয়ে যে চোট্টামীর ইন্টারভ্যু-প্রহসন করা হয় তারও বর্ণনা এ-চিঠিগুলোতে ও আমার সতীর্থের মূল প্রবন্ধে আছে। তবে এ বাবদে শেষ কথা বলেছে আমার এক তুখোড় তালেবর ভাগিনা। ডাঙর নোকরি করে, ঢাউস যা গাড়ি ব্যাঙ্ক দিয়েছে তার ভিতর একপক্ষে মা সহ তার তিন মাসী অন্য পক্ষে তার তিন মামী রীতিমত ব্যূহ নির্মাণ করে কাশ্মীর-

শিয়ালকোট কচ্ছের রণের* রণমোহড়া দিতে পারেন (বলা বাহুল্য মামীরাই হারেন, কারণ তাঁরা এসেছেন তিন ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে)। ভাগিনাটিকে প্রায়ই ইণ্টারভ্যু নিতে হয়—অর্থাৎ সিট্‌স্ অন দি রাইট্ সাইড্ অব্ দি টেব্‌ল। একদিন বেজায় উত্তেজিত হয়ে সে আমাকে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়ে শোনালে। তাতে ওমেদারের বয়স কত হবে, কি কি পাস থাকা চাই, এপেন্‌ডিকৃসের দৈর্ঘ্য তার কতখানি হবে, তার পরিবারে নিদেন কটা খুন হয়ে থাকা চাই ইত্যাদি বেবাক বাৎ ছিল। ভাগিনা তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ খুত খুঁত করে বললে, 'থাইছে! ফোডোগেরাপ্‌টা হ্যাওনের বাৎ বেবাক ভুল্যা গ্যাছে। হইডার তলায় লেখা থাগ্‌বো, "None need apply whose appearance does not resemble the above photograph." কি কন্ মামু?' আমি আর কি বলবো? এটা করলে তো অত্যন্ত সাধুজনোচিত আচরণ হত। এর চেয়ে ঢের ঢের নাস্তী (ইচ্ছে করে স্থাষ্টি উচ্চারণ করতে, সে উচ্চারণে যেন ঘেন্নাটার খোলতাই হয় বেশী, যেমন 'পিশাচ' বা 'পিচাশ' না বলে সর্বোৎকৃষ্ট হয় 'পিচেশ' বললে!) উদাহরণ আমি একটা জানি।

ফার্সীর লেকচারার নেওয়া হবে। আমাকে স্পেশালিস্ট হয়ে যেতে হবে। আমি বে-কসুর না-মঞ্জুর করে দিলুম। যদিও চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে মনে হল না, এর ভিতরে কোনো নষ্টামী আছে। তবু, আমি এই 'জামাই ঠকানোর'—সুনন্দের ভাষায়—কিস্কিরি-মস্করার হিস্সেদার হতে চাই নে। দু'দিন পর মৌলানা আজাদ ফোন করে জানতে চাইলেন, আমি যেতে আপত্তি করছি কেন? তখন বুঝলুম, উনিই আমার নাম স্পেশালিস্ট-রূপে প্রস্তাব করেছিলেন এবং এখন আমি সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হচ্ছি বলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেটা জানিয়ে ফরিয়াদ করেছেন—। মৌলানার পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তাই কাঁচুমাচু হয়ে এই ইণ্টারভ্যু বাবদে পরীক্ষক হিসেবেই, আমার পূর্ব পূর্ব নোংরা (স্থাষ্টি!) তজরুবা-অভিজ্ঞতা জানালুম। দেখি, মৌলানা সমুচাহ্ ওয়াকিফ্-হাল। কোনো প্রকারের তর্কাতর্কি না করে বললেন, 'আপনি গেলে ওরা সোজা পথে চলবে। যদি অন্যায় আচরণ দেখেন, আমাকে জানাবেন।' ইণ্টারভ্যুতে যে-সব অনাচার হয় তার কোনো বিচার নেই বলে, আমি টেবিলের কি এদিকে কি

---

* আমার বন্দুর জানা. কচ্ছবাসীরা জায়গাটার নাম কচ্ছী বা গুজরাতী বা কাঠিয়াওয়াড়ীতে বানান করে কচ্ছের 'রণ'—'রান' বা 'রাণ' নয়।

ওদিকে কোনো দিকে বসতে চাই নে (পেত্যয় না পেলে শ্রীযুত কালিদাস ভশ্চাযকে শুধোন।); কিন্তু এ ক্ষেত্রে মৌলানা আমার কাছ থেকে অনাচার-সংবাদ পেলে যে ওদের কান মলে দেবেন সেই ভরসায় গেলুম।

আমার সঙ্গে আরেকটি স্পেশালিস্ট ছিলেন। বাকীরা পাকা মেম্বার। তাঁদের একমাত্র কামনা, কাম খতম করে বাড়ি ফেরার। বিশেষত 'লেড়ের' ব্যাপার—চাকরিটা মিষ্বরুল্লা পেল না মৃদম খান পেল সে নিয়ে তাদের 'মাতাব্যাতা' হবে কেন, ছাই!

তবু ভদ্রতার খাতিরে তাঁরা দু-একটি প্রশ্ন শুধোলেন। সে ভারী মজা। যেমন, 'আপনার মাদ্রাসায় ইংরিজীও পড়ানো হত?'—কথাবার্তা অবশ্য আংরেজীতেই হচ্ছে। কারণ প্রশ্নকর্তারা ফার্সী ও ফরাসীর তফাত জানেন না।

'জী, হ্যাঁ।'

'কি পড়েছেন?'

'জী, রাস্কিনের "সিসেম অ্যাণ্ড লিলিজ", মিলটনের 'এরিয়োপেজি—",

'শেক্সপীয়র?'

'জী।'

'কি?'

'হ্যামলেট।'

এবারে প্রশ্নকর্তা দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেম, 'বাব্বা, বাব্বা! বেশ, বেশ। সুপ্রস্তাব!'

তার পর তিনি সোৎসাহে আরম্ভ করলেন, হ্যামলেটের আত্মআর্তনাদ—সলিলকি—"To be or not to be—"। তাকিয়ে আছেন কিন্তু আমার দিকে, ওমেদারের দিকে না—আমার অপরাধ? ইংরিজী খবরের কাগজেও একটা অত্যন্ত বেকার খবর বেরিয়েছে, আমার কি একটা বই কি যেন একটা প্রাইজ পেয়েছে, এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতি নাকি আমাকে প্রাইজটি দেবেন স্বহস্তে! আমাকেই ইমপ্রেস করা এখন তাঁর জীবন্মৃত্যুর চরম কাম্য—বলা তো যায় না, এখন থেকেই যদি রীতিমত আমাদের তোয়াজ করে ইম্প্রেস্ করা যায় তবে তো আমি হয় তো প্রাইজ নেবার সময় কানে কানে রাষ্ট্রপতিকে বলে দেবো, 'হুজুরের আণ্ডার সেক্রেটারি অনন্তভূত-পরাশরলিঙ্গম্‌কে এখন একটি প্রমোশন দেওয়া উচিতস্য উচিত!' অবশ্য সেটা সেরকম মোকা নয়। কিন্তু বলা তো যায় না—যদি হয়েই যায়। নেপোলিয়ন (আজকালকার 'জ্ঞানীরা' যাঁকে নাপোলেওঁ বলেন, যেন আমাদের মত সে-যুগের

গ্রাম-পণ্টকরা খাঁটি উচ্চারণ জানতো না বলে বাংলাতে তদনুযায়ী সঠিক বানান লিখতে পারে. নি!) বলেছেন, অসম্ভব বলে কিছুই নেই। নিশ্চয়ই তিনি জানতেন, কখন কি ভাবে কাকে লুব্রিকেট-তেলাতে হয়।

তা সে যাই হোক, আমাকে ন'সিকে ইম্‌প্রেস্ করে হকচকিয়ে দেবার পর ওমেদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাকিটা কও কি? "Or to take arms against a sea of—" বাকিটা বলে যাও তো?

কালো চামড়ায় তৈরী সর্বোৎকৃষ্ট স্প্রিং-সম্বলিত, পঞ্চাধিক কুশনবিজড়িত গম্ভীর আরাম-কেদারার তলা থেকে তিনি হাস্যরসের তুফানে ওঠা-নাবা করতে করতে বার বার বলেন, 'তার পর কি, go on! ইউ সেড্ ইউভ্ রেড হ্যামলেট, against a sea of troubles—আরো সাহায্য করলুম তোমাকে। বাকিটা বলে যাও!' আবার তিনি সোফাতে বৃন্দাবনের রসরাজসুলভ হিন্দোলদোলে দুলতে লাগলেন।

আমি তাজ্জব! বেচারী ওমেদার এসেছে ফার্সী ভাষার মেস্টারির চেষ্টায়। আঁ পাসঁা, বেচারী একটুখানি ইংরিজী শিখেছিল বটে, কিন্তু সেইটেই তার ফর্, fort, সেইটেই তার piece de résistance, সেইটেই তার বলতে গেলে, কিছুই নয়—ইংরিজীর মাধ্যমে ফার্সী পড়াতে গেলে যতখানি ইংরিজী জানবার প্রয়োজন তার চেয়েও সে বেশী জানে, সেটা তো ইতিমধ্যে তার স্মার্টনেসেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তা সে যাকগে। ওমেদার বেচারী তো ঘেমে-নেয়ে ঢোল। আমি তখন তার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললুম, 'ওরকম নার্ভাস হবেন না। আপনি কতখানি ইংরিজী জানেন না জানেন তার গুরুত্ব সামান্যই। ওটা আপনি ভুলে যান। এবারে চলুন ফার্সীতে। সেইটে কিন্তু আসল। ঐ যে আপনার সামনে ফার্সী বই কয়েকখানা রয়েছে তারই যে কোনো একখানা থেকে কয়েক লাইন পড়ুন—প্রথম আপন মনে চুপে চুপে, পরে আমাদের শুনিয়ে। অনুবাদ? না, না, অনুবাদ করতে হবে না। আপনার পড়ার থেকেই তো বুঝে যাবো, আপনি ফার্সী বোঝেন কি না। আর যেটা পড়বেন তার দু-একটা শব্দ আপনার জানা না থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। সবাই কি আর সব ফার্সী শব্দ জানে? তা হলে দুনিয়াতে অভিধান লিখত কে, পড়ত কে? তা সে যাক। আমার আর কোনো প্রশ্ন-ট্রশ্ন নেই।'

এবারে ছেলেটার—হ্যাঁ, আমার ছেলের বয়েসি—মুখে শুকনো হাসি ফুটলো; একটুখানি ভর্সা পেয়েছে। সেই হ্যামলেটওলা লোকটিও আসলে কিন্তু মানুষ

ভালো। পাঁচটা ক্বশ্চন্ ঝুলিয়ে ঠাঠা করে হেসে উঠলেন। বললেন—'হ্যামলেটের স্মরণে—'জাষ্টিস্ ডিলেড হয় নি। হা হা, হা.হা।'

ছেলেটি সুন্দর উচ্চারণে গড় গড় করে ফার্সী পড়ে গেল। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ-সন্তান; এবং পরে দেখা গেল, আরো হিন্দু ওমেদার ছিল। ফার্সীর আবহাওয়াতে আপন ঠাকুদ্দার কাছে লেখাপড়া শিখেছে। চেয়ারমেন বললেন, 'আপনি এখন যেতে পারেন।' ছেলেটি সবাইকে মুসলমানী কায়দায় সেলাম জানালে, আমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার একটু শুকনো হাসি হাসতে গিয়ে থেমে গেল—কি জানি ওটা ঠিক হবে কি না, যদি ওতে করে নম্বর কাটা যায়! আমি মনে মনে বললুম 'মারো ঝাড়ু, য়্যা নোকরি ওর উসকী ইন্টারভ্যু পর্।'

উহুঁ। এটা শেষ নয়, এটা আরম্ভ মাত্র। ছেলেটির সেলামপর্ব শেষ হওয়ার পূর্বে আমার সঙ্গের দ্বিতীয় স্পেশালিস্টটি বললেন, 'একটু বসুন'—এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন।'

হায় বেচারা ক্যাণ্ডিডেট্! ভেবেছিল, তার গন্ধবন্ধনা শেষ হল। এখন এ আবার কি ফাঁসি! বেচারী পর্চাখানির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। স্পেশালিস্ট দশ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর গুঁতোচ্ছেন, 'পড়ুন। পড়ছেন না কেন?' ছেলেটি হোঁচট ঠোক্কর খেতে খেতে খানিকটে পড়লো। স্পেশালিস্ট বললেন, 'অনুবাদ করুন।' রাম পাঁঠা! পড়ার কায়দা থেকেই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পাঠ্যবস্তু তার এলেমের বাইরে, তবে স্যাডিস্টের মত মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?

ছেলেটা নড়বড় পায়ে বেরিয়ে গেল।

আমি পর্চাটির জন্য স্পেশালিস্টের দিকে হাত বাড়ালুম। তিনি 'কুছ নহী, কুছ নহী' বলে সেটি পকেটে পুরে নিলেন। দুসরা ক্যাণ্ডিডেট এল। এবারে হ্যামলেটের বদলে গ্রে'র কবিতা। সর্বশেষে আবার ঐ অভিনয় সেই পর্চা নিয়ে। আমি স্পেশালিস্টের উদ্দেশে মনে মনে বললুম, 'তুমি ব্যাটা খোট্টা মুসলমান, আম্মো হালা বাঙাল পাঁতি ল্যাড়ে। দেখাচ্ছি তোমাকে।' এবারে ক্যাণ্ডিডেট পর্চাটি যেই ফেরত দিতে যাচ্ছে অমনি, তৈরী ছিলুম বলে, আমি সেটা নিয়ে নিলুম। ওমা! যত পড়ি, আগা-পাস্তালা ঘুরিয়ে দেখি, ততই কোনো মানে ওৎরায় না। ইতিমধ্যে আরেক ওমেদার এসে গেছে এবং চসার না পোঁও কি যেন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমার দৃষ্টি ঐ পর্চাটির দিকে নিবদ্ধ।

ইয়াল্লা! অব্ সমঝ্লন বা। যে দু' লাইন কবিতা ছিল সেটা অনেকট আমাদের

হরির উপরে হরি

হরি বসে তায়

হরিকে দেখিয়া হরি

হরিতে লুকায়।

'হরি' শব্দের কটা মানে হয়, আমি সত্যিই জানি নে—কান ছুঁয়ে বলছি। কিন্তু ছিঃ। কারো বাংলা জ্ঞানের পরীক্ষা যদি নিতান্তই নিতে হয় তবে এই ধরনের 'জামাই-ঠকানো' কবিতাই কি ন্যায্যতম, প্রশস্ততম ?।

কিন্তু এহ বাহ্য।

পরে, অন্তত আমি বুঝতে পারলুম দই খাচ্ছেন কোন্ রমাকান্ত আর বিকার হচ্ছে কোন্ গোবদ্দনের ?

দু-একটি পাকা মেম্বরও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা কি। লেখাপড়ায় এক একটি আস্ত বিদ্যেসাগর বলেই ওঁদের নাসিকায় থাকে সারমেয়বিনিন্দিত চাক্ষ-সন্ধানী অন্ধিসন্ধি।

ক্যাণ্ডিডেটের পরে ক্যাণ্ডিডেট—কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ মাঝারি, সংসারে যা হয়—ইণ্টারভ্যু স্বয়ংবরে আমাদের মত ইন্দুমতীর সামনে স্বপ্রকাশ হলেন। কিন্তু সবাই মার খেলেন, ঐ পর্চাটুকুর সামনে, ঐ চিরকুটটি সব্বাইকার ওয়াটারলু।

ইতিমধ্যে কী আশ্চর্য, কী তিলিস্মাৎ—একটি ওমেদার পর্চাটি পাওয়া মাত্রই সেটি গড়গড়িয়ে পড়ে গেল, আদ্যন্ত। যেন তার প্রিয়ার আড়াইশ' নম্বরী প্রেমপত্র।

ইণ্টারভ্যু শেষে লাঞ্চ। সরকারী লাঞ্চকে আমি বলি লাঞ্ছনা। অবশ্য সর্বোচ্চ মহলে নয়। সেখানে লাঞ্চের অজুহাতে আপনার জন্য পেলেটে করে রোলস্-রয়েস গাড়ি আসতে পারে তম্বঙ্গী পরী-পয়্করী চালিতা। ড্রাইভারিণীটি কাউ, থ্রোন্ ইন্ ফর গুড্ মেঝার।

পালাবার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়লুম সেই পঞ্চ-কুশন-মর্দন মহাজনের হাতে। বললেন, 'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, আপনাদের ঐ স্পেশালিস্টটি আপন ওমেদারকে একটু ভালো করে রিহার্সেল করালেন না কেন ? ও যদি সাত বার ঢোঁক গিলতো, এগারো বার হোঁচট খেয়ে খেয়ে চিরকুটটির কবিতা পড়তো, তবে হয় তো, আমাদেরও বিশ্বাস জন্মাতো, সে ঐ কবিতাটি ইতিপূর্বে কখনো দেখে নি।'

৩০।১০।৬৫

অর্থাৎ অর্থাৎ

একটা 'ফরেন'-ওলার কথাই বলি।

ইন্টারভ্যুতে আমিও ছিলুম। সেই ছাব্বিশ বছরের 'ফরেন'—যাটু ড্যাম কালা আদমী ছোকরাটা তার বাপের বয়সী ওমেদার অধ্যাপককে যা বেহায়া প্রশ্ন শুধোতে লাগলো তাতে আমি স্তম্ভিত। কারণ সেই অধ্যাপকের কিছু কিছু লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এ যুগে আর কটা হিন্দু ফার্সী শিখে [illegible] সাতশ' বছরের ইতিহাস অধ্যয়ন করে? ইনি তাঁদেরই একজন। অথচ ওই 'ফরেন'-পণ্টক ফার্সীর একবর্ণও জানে না। শুধু ইতিহাসের অধ্যাপক—ঠিক ইতিহাসও নয়, ইওলজির—বলেই গুণধর বোর্ডে এসেছেন, এবং যে-মোগল ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি নিরেট আকাট, সেই সম্বন্ধে চোথাচোথা প্রশ্নবাণ ঝাড়ছেন। সেগুলো তৈরি করে নিয়ে এসেছেন গতকাল লাইব্রেরি থেকে, দু'তিনখানা মোগল ইতিহাসের ইংরিজী অনুবাদ পড়ে—প্রধান উদ্দেশ্য, বাদ বাকী মেম্বরদের তাক লাগিয়ে দেওয়া। সে সব মেম্বররা এসেছেন অপরাপর য়ুনি থেকে। ফলে সে সব য়ুনিতে তিনি একস্‌টেশন লেকচারে নিমন্ত্রিত হবেন, এগ্‌জামিনার হবেন, বহুবিধ কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হবেন, তাঁর প্রিয় ছাত্রের অখাদ্য থীসিসে তাঁরা এক্‌সটারনেল পরীক্ষক হিসেবে ভিটো মারবেন, তিন্নো এ-বাগে তাই করবেন, গয়রহ, ইত্যাদি, এট্‌সেটরা। কি কি প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই, তবে রেডুক্‌সিয়ো আড্‌ আব্‌সুর্ডুমে পরিণত করতে যদি অনুমতি দেন তবে কাল্পনিক দু-একটি পেশ করতে পারি: 'আকবর যখন আহমদাবাদ আক্রমণ করছিলেন তখন সাবরমতী বেয়ে হাওয়া পুব না দক্ষিণ থেকে বইছিল?' 'সিলেটের শাহজলাল মসজিদে পূর্বে যে জালালী কবুতর ছিল তারা এখন চলে যাচ্ছে কোথায়?'

এবং এমনই খাজা ইংরিজী উচ্চারণে যে আমি একবার দু' প্রশ্নের ফাঁকে তাঁকে কানে কানে বললুম, "I am glad, Oxbridge has not been able to damage your original pronunciation."

আমি সবিনয় নিবেদন করছি, আমি সে অধ্যাপককে বাঁচাতে পারি নি। সেই প্রাচীন গল্প তা হলে আবার বলি। বার্নার্ড শ'র একটি নাট্য করে থিয়েটার থেকে [illegible] তুলে ধরেছে, দ্রষ্টাদের সপ্রশংস প্রশংস চিৎকার, 'নাট্যলেখককে স্টেজে

বেরুতে বলো, আমরা তাঁকে দেখব।' শ' এলেন। মিনিট পাঁচ ধরে চললো তুমুল হর্ষরব, করতালি, বাবতীয়। সবাই যখন শান্ত হলেন, এবং শ' তাঁর ধন্যবাদ জানাবার জন্য মুখ খুলতে যাবেন এমন সময় সর্বশেষ সস্তা গ্যালারি থেকে একটা আওয়াজ এল, 'ব্‌ব্‌ব্‌ব্‌ব্‌!' শ' ওই দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্রাদার, ঠিক বলেছ; এ নাট্যটা রদ্দী। কিন্তু তোমাতে-আমাতে, মাত্র দুজনাতে, এই শত শত লোকের পাগলামি ঠেকাই কি করে।'

* *

তার পরই আমি বিদেশ চলে যাই। না, স্তর! Sorry, কোনো সোভিয়েট, মার্কিন, বার্লিন ডেলিগেশনে নয়। তা সে যাক্। ফিরে এসে বোম্বায়ে আমার বন্ধু প্রসাদদাস মাণিকলাল শুক্লের বাড়িতে উঠলুম। ওই অক্সব্রিজওলার কথা কি করে উঠলো জানি নে, কারণ লেখাপড়ির ব্যাপারে আমরা charleton-ধাপ্পা-বাজদের নিয়ে কখনো আলোচনা করতুম না।

শুক্ল বললে, 'সে বড় মজার ব্যাপার। তোমার ওই ব্রাদার চৌধুরী শনৈঃ শনৈঃ উঠতে লাগলেন খ্যাতির শিখর পানে। আজ এই কলেজে, কাল অন্য য়ুনিভার্সিটিতে —আস্ত একটা হনুমানের মত চড় চড় করে পদোন্নতির অশ্বত্থগাছের মগ-ডালে, বয়েস পঁইত্রিশ পেরুতে না পেরুতে! ইতিমধ্যে তাঁর নিজস্ব উমদা গ্যোবেলসী শানাই তাঁর গুণের রাগ-রাগিণী বাজাতে বাজাতে এটাও জাহির করেছে যে, ওই চৌধুরী স্বচেষ্টায় ফরাসী, জর্মন, রুশ গয়রহ ভাষাও আয়ত্ত করে ফেলেছেন।'

শুক্ল ফিক করে একটুখানি হেসে বললে, 'সে বড় মজার। তোমার ঐ চৌধুরীর তখন এমনই আস্পর্দা বেড়ে গেছে যে, সে ছাপিয়ে দিলে বুর্নফের একটি অচলিত ছোট লেখার অনুবাদ ইংরিজীতে—চটি বই, ব্রশ্যুর বলতে পারো। আসলে সে সেটা করেছিলো এক আনাড়ি ছোকরার সাহায্যে, যার ফরাসী জ্ঞান ছিল অত্যন্ত কাঁচা—কিন্তু ছোকরা ধাপ্পা মারতে জানতো চৌধুরীর চেয়েও দুই বাঁও বেশী।

শুক্ল বললে, 'ওঃ! সে বই নিয়ে এ দেশে কী তুলকালাম, কাঁ। ফাঁর! অবশ্য তার চোদ্দ আনার উৎপত্তি চৌধুরীর গ্যোবেলসী কলসী থেকে। এবং এখনো এ দেশের লোকের বিশ্বাস এ রকম অনুবাদ হয় না। মাত্র দু'একটি প্রাণী জানে যে, কি করে যেন ওই অনুবাদ প্যারিসে পৌঁছে গেলে তাদের এক পত্রিকায় বেরোয়— "The originality of the translator has come out with extraordinary success in those passages where he has faild to understand the original!" অবশ্য তাতে করে চৌধুরীর রত্তিভর লোকসান হয়

নি, কারণ এই ফরাসীতে লেখা সমালোচনা—তাও প্রকাশিত হয়েছে পণ্ডিচেরীর কাগজে—এ দেশের পড়ে কটা লোক। তা সে যাক।

ইতিমধ্যে এ-দেশে একটি পোলিটিশিয়ানের প্রাণ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো জননী ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য। আসলে তুমি তো জানো, এ সব নির্জলা ব্লাফ্। ভদ্রলোক চান, তিনি যেন 'কল্‌চর'-জগতেও সম্মানিত হোন। অবশ্য পরের হাত দিয়ে তামাক খেয়ে। সেই 'পরের'ও অভাব হল না। এ অঞ্চলের শেঠিয়াদের টাকের ঠিক জায়গায় হাত বুলোতে পারলে গৌরীশঙ্করের শিখরে মরূদ্যান নির্মাণের জন্যও পিলপিল করে টাকা বেরিয়ে আসে।

তারপর স্থানায় স্থানায়* কুলোকুলি। তোমার এই প্যারা চৌধুরী—'

আমি বললুম, 'শট্ অপ্।'

'আহা, চটো কেন? তারপর সাড়ম্বর স্থাপিত হল, "জম্বুদ্বীপ-সমন্বিতাসমুদ্র—" যাকৃগে যাক্, আমার নামটা ঠিক মনে নেই, ওই 'কল্‌চর' 'মলচর' নিয়ে কি যেন একটা প্রতিষ্ঠান, আর চৌধুরী হলেন তার 'সর্বাধিকারী' 'মহাস্থবির' না কি যেন একটা।...কিছুদিন পর—ইতিমধ্যে অবশ্য প্ল্যান মাফিক দু-দশখানা ভালো-মন্দ-মাঝারী 'কলচরল' বই "জম্বুদ্বীপসমন্বিত—" দুচ্ছাই আবার ভুলে গেলুম প্রতিষ্ঠানের নামটা—বই বেরিয়েছে। সর্বাধিকারী চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের কর্তাকে বোঝালেন—

(ক) ঋগ্বেদের যে সব অনুবাদ গত এবং এই শতকে ইংরিজী-বাংলা-ফরাসী-জর্মনে বেরিয়েছে, সেগুলো ইতিমধ্যে বিলকুল বেকার আউট অব্ ডেট হয়ে গিয়েছে, (খ) একটি নূতন অনুবাদ দরকার, (গ) সেটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে বড় বড় পণ্ডিতদের সাহায্য নিতে হবে, (ঘ) এবং তাঁদের দক্ষিণা এবং ছাপা বাবদ লাগবে আশী হাজার টাকা।'

আমি তাজ্জব মেনে বললুম, 'কি বললে, আশী হাজার টাকা? বলো কি!'

'বিলক্ষণ। আশী হাজার টাকা। ব্যাপারটা হল গিয়ে ওই যে প্রতিষ্ঠাতা পলিটিশিয়ান কল্‌চরড্ হতে চান, তিনি শেয়ারবাজার, টেভয় টিন্ থেকে ওমরা তুলো, শিবরাজপুর মেঙ্গানীজ সব বোঝেন, কিন্তু—কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতদের তেজী-মন্দী বাবদে বিলকুল না-ওয়াকিফহাল। ঢেলে দিলেন টাকাটা। তার পর বেরুতে লাগলো কিস্তিতে কিস্তিতে বেদের নবীন ইংরিজী অনুবাদ। যে রকম আমাদের হরিবাবুর বাংলা কোষ বেরিয়েছিল। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু, ব্রাদার, নিরবচ্ছিন্ন

---

* 'চলন্তিকা' বলেন 'সজ্ঞান' থেকে সেয়ানা; বড়বাবু বলেন, জেনদৃষ্টি রাখে যে জন তার থেকে শেয়ানা, স্যানা।

শান্তি এই দগ্ধ সংসারে কোথায়? হঠাৎ পুণার এক পণ্ডিত আমাদের কল্চর-প্রতিষ্ঠাতার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে অনুবাদের খুনিয়া খুনিয়া সব ভুল দেখাতে লাগলেন। যেমন মনে করো—কথার কথা কইচি, আমি তো ওখানে ছিলুম না—'রবিকর' অনুবাদে হয়েছেন, 'সূর্য যে খাজনা দেন' কিংবা 'রাজকর' অনুবাদে হয়েছেন, 'রাজা যে রশ্মি দেন'।...এ রকম বিদকুটে বরবাদ অনুবাদ কেন হল কিছুই বোঝা গেল না। সামান্যতম বৈদিক ভাষা যে জানে সেও তো এরকম ভুল করবে না। হ্যাঁ, আলবাৎ, 'ক্রন্দসী' 'রোদসী' ধরনের অচলিত শব্দ নিয়ে সাতিশয় সাধু মতান্তর হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের আকাট, বর্বর—? রহস্যটা তবে কি?'

আমিও সায় দিয়ে বললুম, 'রহস্যটা তবে কি?'

'ওই কল্চরকামী প্রতিষ্ঠাতা বেদবেদান্ত বাবদে বেকুব হতে পারেন, কিন্তু তিনি 'ইঁদুরের গন্ধ পান'—শয়তানীর শ্বাস পান। নইলে সাদা-কালো-গেরুয়া বাজার কণ্ট্রোল করছেন বৃথাই। তিনদিন যেতে না যেতে স্বয়ং চৌধুরীই এসে যা বললেন তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি কি ভারতীয়, কি ফরাসী, কি ইংরেজ, কি জর্মন কোনো পণ্ডিতকেই অনুবাদ-কর্মে নিযুক্ত করেন নি। তাবৎ কর্ম করিয়াছেন একটি দুঃস্থা জর্মন রমণীকে দিয়ে। সে বেচারী সংস্কৃতেরও এক বর্ণ জানে না—বেদের ভাষা মনোজের ভাষায় কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে! সে স্রেফ জর্মন পণ্ডিত গেল্টনার-কৃত কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত বেদের অনবদ্য জর্মন অনুবাদ ইংরিজীতে অনুবাদ করে গেছে। মেয়েটি ভালো জর্মন জানে বটে, কিন্তু তার ইংরিজী কাঁচা। কিন্তু সেইটেই মূলতত্ত্ব নয়। আসল বিপদ হয়েছে, বেদের অনেক বস্তু অস্পষ্ট, রহস্যময়, দ্ব্যর্থ কেন—বহু অর্থসূচক। সেগুলো জর্মন পণ্ডিত গেল্টনারও করেছেন সন্তর্পণে, আবছা-আবছা রেখে—যেন সান্ধ্যভাষায়। এ নারী তাই তার অনুবাদে—আদৌ সংস্কৃত জানে না বলে—রবিকর, রাজকর, নরকর, হাতীর কর (কথার কথা কইচি!) গুবলেট করে বসেছে। তখন পরিষ্কার হল রহস্যটা।

তস্য বিগলিতার্থ, চৌধুরী দশ-বিশজন পণ্ডিত লাগিয়ে, তাদের ন্যায্য দক্ষিণা দিয়ে অনুবাদ করান নি। মেমসাহেবকে দিয়ে কম্মটি করিয়ে নিয়েছেন।

আরো অর্থাৎ এবং সেখানেই অর্থ, মেমসাহেবকে তিনি দিয়েছেন এক হাজার টাকা, ছাপার খরচা বাদ দিয়ে তিনি পকেটস্থ করেছেন সত্তর হাজার টাকা। হল?'

চৌধুরী এখন ফট্‌কা-বাজারে ভালো পয়সা কামায়॥

৮।১১।৬৫

অত্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

এই 'দেশ' পত্রিকাতেই আমার এক সতীর্থ কিছুদিন পূর্বে 'করেন ডিগ্রী'-ধারীর দন্তের প্রতি ক্ষণতরে ঈষৎ ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মর্মাঘাতী আপন মূল বক্তব্যে চলে যান। হয়তো সে স্থলে এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করার অবকাশ ছিল না, অর্থাৎ তিনি শেখ চিল্লীর মত মূল বক্তব্যের লাভ এবং ঈষৎ অবান্তর বক্তব্যের ফাউ দুটোই হারাতে চান নি।

গল্পটি বোধ হয় আপনি জানেন না, কারণ শেখ চিল্লী জাতে খোট্টা এবং বাঙলাদেশে কখনো পদার্পণ করেন নি। যদ্যপি শ্রীযুক্তা সীতা এবং শান্তা এবং খুব সম্ভব তাঁদের অগ্রজও মিয়া শেখ চিল্লীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন উপকথার মারফতে—স্বর্গত রামানন্দের পরিবার যে খোট্টাই দেশে বাল্যকাল কাটিয়েছেন সে কথা আগে জানা না থাকলেও তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লিখিত প্রবন্ধাদি পড়ে বহু বাঙালীই জেনে গিয়েছেন। কিন্তু এ স্থলে আমার যে গল্পটি স্মরণে এল সেটি বোধ হয় তাঁরা ইতিপূর্বে সবিস্তর বয়ান করে আমাকে পরবর্তী যুগের 'চোর' প্রতিপন্ন করার সুব্যবস্থা করে যান নি—এই ভরসাতেই সেটি উল্লেখ করছি। করে গেলেও বুটমুট 'ধরপবার' ভয় নেই—কারণ গল্পটি ক্লাসিক পর্যায়ের, অর্থাৎ এর বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের কার্যকলাপে নিত্য নিত্য সপ্রকাশ হয় বলে এটি নিত্যদিনের ব্যবহার্য গল্প।

মা-সরস্বতীর বর পাওয়ার পূর্বে কালিদাস যে আক্কেল-বুদ্ধি ধারণ করতেন, হিন্দী-উর্দুভাষীদের শেখ চিল্লীও সেই রকম আস্ত একটি 'গণ্টক' ('কণ্টক' থেকে 'কাঁটা'—সেই সূত্রানুযায়ী 'গণ্টক' থেকে কি উৎপন্ন হয় সে তত্ত্ব সুচতুর পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না; আসলে এই গূঢ় তত্ত্বটি আবিষ্কার করার ফলেই শ্রীযুত সুনীতি চট্টো অস্মদ্দেশীয় শব্দতাত্ত্বিকদের পঙ্‌ক্তিতে আপন তখ্‌ৎ-ই-তাউসে গ্যাঁট হয়ে বসবার হক্ক কব্জা করেন)।

সেই শেখ চিল্লীকে তাঁর মা হাতে একটি বোতল আর পয়সা দিয়ে বাজার থেকে তেল কিনে আনবার আদেশ দিলেন এবং পুত্রের পেটে কি পরিমাণ এলেম গজগজ করছে সেটা জানতেন বলে পইপই করে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আসল

তেলটা পাওয়ার পর সে যেন কাউ আনতে না ভোলে। শেখ চিল্লী এক গাল হেসে বললেন, 'তা-ও কখনো হয়।'

আমি জানি, আজকের দিনের পাঠক কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যে, কোনো জিনিসের দাম বাজারে কস্মিন্ কালে কখনো কমে। কিন্তু করতেই হবে, এই হালের সুকুমার রায়ের যুগেও 'বাড়তি' 'কমতি' ছিল—এমন কি বয়সের বেলাও। আমি যে যুগের বয়ান দিচ্ছি সেটা তারও বহু পূর্বেকায়। তাই মিয়া চিল্লীর আম্মাজানের অজানতেই বাজারে তেলের দর হঠাৎ কমে গিয়েছিল। হয়তো কোনো 'রাধাকে' নাচাবার জন্য নবাব সাহেবের 'ন মন তেলের' প্রয়োজন হওয়াতে তিনিও শায়েস্তা খানের মত তেলের দর সস্তায় বেঁধে দিয়ে বাজার শায়েস্তা করেছিলেন। সেটা এ যুগের 'সন্দেশ' শায়েস্তা করতে গিয়ে স্বহস্তে স্বপৃষ্ঠে ভূতের কিল খাওয়া নয়।

তা সে যা-ই হোক, তেল সস্তা হয়ে যাওয়ার দরুন মূল তেলেই বোতল কানায় কানায় ভরে গেল। শেখ চিল্লীর ঘটে বুদ্ধি কম ছিল সত্য কিন্তু তার স্মৃতিশক্তিটি আমাদের 'দাদখানী তেল, মসুরির বেল'-এর মত ছিল না। তিনি দোকানীকে বললেন, 'কাউ?'

দোকানী বললে, 'কী আপদ, বোতলে জায়গা কোথায়?'

শেখ বললেন, 'বটে্য! চালাকি পেয়েছ? এই তো জায়গা।' বলে তিনি বোতলটি উপুড় করে, বোতলের তলার গর্তটি দেখিয়ে দিলেন। মেরি মাগডেলেন যে খৃষ্টের পদদ্বয় তৈলাক্ত করেছিলেন সেটাকেও হার মানালেন শেখ—অবশ্য স্বহস্তে! দোকানী মুচকী হেসে সেই গর্তটি এক কাঁচ্চা তেল নিয়ে ভরে দিয়ে শেখের কাউয়ের খাঁইও ভরে দিল।

বোতলটি অতি সন্তর্পণে 'স্টাটুস কুয়ো' বজায় রেখে ধরে ধরে শেখ বাড়ি পৌঁছে মাকে বললেন, 'এই নাও আম্মা, তোমার কাউ।' তারপর বোতলটি উল্টে খাড়া করে ধরে বললেন, 'আর ভিতরে তোমার আসল।'

আম্মা-জানের পদদ্বয় অবশ্য খৃষ্টের তুলনায় অল্পই অভিষিক্ত হল।

* *

দেশ থেকে যে বোতলটি নিয়ে এ-দেশের ছাত্র বিদেশে বিদ্যার তেল—না ভুল বললুম, ডিগ্রীর তেল—কিনতে যায়, সেটি নিয়ে সে কোন শেখ চিল্লীর মত কি বেসাতি করে সে তত্ত্বটি অনেকেরই জানা নেই। না জানারই কথা, কারণ ইংরেজ আমলের পূর্বে এ-দেশে কখনো এই 'ফরেন' ভূতের উপদ্রব হয় নি। মুসলমান

আমলে কি হয়েছিল সেটা পরের কথা। তার পূর্বে কোনো ভারতসন্তান 'ফরেন' ডিগ্রীর জন্য কামচাটকা থেকে কাসাব্লাঙ্কা কোথাও গিয়েছে বলে শুনি নি। তবে জাতক পড়লে পাই, ঐ যুগে তক্ষশিলা ছিল বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র এবং বারাণসী ছিল সনাতন ধর্ম-জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার জন্য সর্বপ্রসিদ্ধ তীর্থ। তাই জাতকের একাধিক গল্পে পাই, বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধভাবাপন্ন বারাণসী গৃহী পুত্রকে তক্ষশিলায় বিদ্যার্জনের জন্য পাঠাতেন। তদ্রূপ কাশী সর্বকালেই সনাতন ধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি থাকা সত্ত্বেও হয়তো বিক্রমাদিত্যের যুগে সারা ভারতের কোনো কোনো অঞ্চল থেকে কিছু ছাত্র উজ্জয়িনীতে বিদ্যাভ্যাস করতে গিয়েছে।

মুসলমান আমলে রাজকার্য তথা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ফার্সীতে হত। (বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার ফলে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লোপ পায়; কিন্তু কাশী ও পরবর্তী যুগে বৃন্দাবনে হিন্দুশাস্ত্র চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল এবং এখনো আছে।) কিন্তু ফার্সী যদিও পারস্যের ভাষা, তবু এ-দেশের কোনো ফার্সী শিক্ষার্থী তেহ্‌রান বা মেশেদ্ শহরে ফার্সী শিখতে যেত না। ধর্ম চর্চার জন্য ছাত্রেরা পড়তো আরবী, কিন্তু তারাও মক্কা, মদীনা বা কাইরোতে গিয়ে 'ফরেন' ডিগ্রী নিয়ে আসতো না। অবশ্য কোনো কোনো ছাত্র এ-দেশে পাঠ সমাপন করে মক্কায় গিয়ে হজ্ করার সময় কাবার চতুর্দিকে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া হয়, সেগুলো শুনে নিত। অধীনের মাতামহ তাই করেছিলেন।

বিদেশে না যাওয়ার কারণ এ-দেশেই আরবী-ফার্সীর মাধ্যমে উত্তম জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা ছিল। এবং পাঠান-মোগল যুগেও কাবুল, কান্দাহার বা মজার-ই-শরীফে কোনো বড় কেন্দ্র গড়ে ওঠে নি—উঠেছিল দেওবন্দ, রামপুর, সুরট অঞ্চলের রাঁদেরে, হায়দ্রাবাদে, ঢাকায়, সিলেটে। বস্তুত কাবুল অঞ্চলের মেধাবী ছাত্র মাত্রই আমানুল্লার আমল পর্যন্ত দিল্লী অঞ্চলেই পড়াশুনো করতে আসত। আমি কাবুলে যাই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখন যে কয়টি আরবী-ফার্সীজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানে আমার আলাপ-পরিচয় হয় তাঁরা সকলেই উর্দুও জানতেন, কারণ সকলেই বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন ভারতে। ঠিক যে রকম বৌদ্ধ যুগে চীনা তথা অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শ্রমণরা এদেশে শিক্ষালাভের জন্য আসতেন, এখনো অল্পবিস্তর আসেন।

এমন কি, যে কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক হাজার পনরো বছর ধরে ধীরে ধীরে মুসলিম শাস্ত্রচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববৃহৎ সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও ভারত থেকে কখনো খুব বেশী ছাত্র যায় নি। আমি

যখন (১৯৩৪'৩৫) কাইরোতে ছিলুম তখন পাক (বর্তমান) ভারত উভয়ে মিলিয়েও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনারও বেশী ছাত্র ছিল না। পক্ষান্তরে, সেখানে আরবী দর্শনের যে পাঠ্যপুস্তক সম্মানিত ছিল, সেটি জনৈক ভারতীয় মৌলানা দ্বারা লিখিত।

(এ স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, সাত শ বছর আরবী-ফার্সীর কঠিন একনিষ্ঠ সাধনা করে ভারতীয় মৌলবীরা জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্ম চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সত্য, কিন্তু আরবী দূরে থাক, ফার্সী সাহিত্যেও কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তার এক মাত্র কারণ মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় সাহিত্যের কুৎব্ মিনার গড়া অসম্ভব। তাই যখন দেখি, মাত্র এক শ বছর ইংরেজী চর্চার পর এদেশে কেউ কেউ সে সাহিত্যে ঢিপি তৈরি করে ভাবছেন সেটি মিনার, তখন বড়ই বিস্ময় বোধ হয়। তাঁরা কি সত্যই ভাবেন, সেই সাত শ বছরের তাবৎ গুণীজ্ঞানীরা—এবং তাঁরা রাজার্থানুকূল্য পেয়েছিলেন চেরাপুঞ্জির বর্ষণের চেয়েও বেশী—এঁদের তুলনায় অতিশয় কুক্কুটমস্তিষ্কধারী ছিলেন? তাই যখন দেখি র‍্যাবোর বদলে হ্র্যাবো—তা হলে 'rare' অর্থাৎ 'বিরল' হবে 'হ্রাহ্র', France হবে 'ফ্হ্রাঁস এবং যেখানে 'r' অক্ষরের সঙ্গে উ-কার যুক্ত, যেমন 'প্রুস্ত', সেখানে গতি কি? কারণ 'প'র নিচে 'হ' এবং তারও নিচে উ-কার দিয়ে তৈরি কোন 'হাঁসজারুই' (হাঁস+সজারু+রুই) জাতীয় অক্ষর তো বাঙলা ছাপাখানায় নেই—তখন শুধু সবিনয় সকাতর সভয়ে প্রশ্ন শুধোতে ইচ্ছা করে, 'আপনারা তরুণরা, যে নানাবিধ ভাষা শিখছেন সেটা বড়ই আনন্দের কথা, কিন্তু একবার একটু ভেবে নিলেই তো হয় যে মাইকেল, জ্যোতি ঠাকুর, বীরবল, ধ্বনিবিদ সুনীতি চট্টো, শহীদুল্লা এঁরা কেউই এই বিদকুটে ফরাসী 'র' ধ্বনি যে আলাদা সেটা লক্ষ্য করলেন না, এটা কি প্রকারে সম্ভবে?' এবং শেষ নিবেদন—জানি আপনারা পেত্যয় যাবেন না, ফরাসী জর্মন এমন কি ইংরাজি 'r'ও বাঙলা 'র'-এর মত নয় সেটা সত্য, কিন্তু তাদের r'র সঙ্গে যে আমাদের 'র' মিলছে না সেটা আমরা 'র'-এর উচ্চারণ করার সময় মুখগহ্বরের অন্য জায়গা থেকে করি বলে নয়—তাদের আপত্তি আমরা 'r' উচ্চারণের সময় সেটিকে 'ট্রিল' করি বলে, অর্থাৎ আমরা যখন বলি 'পারি' (প্যারিস) তখন ফরাসী শুনতে পায় যেন আমরা 'r'টা তিনবার উচ্চারণ করে বসে আছি। বিচক্ষণ ফরাসী গুরু তদ্দণ্ডেই বলেন, 'কিন্তু মসিয়ো Paris শব্দে মাত্র একটিম "r"—আপনি তিনটে "r" উচ্চারণ করলেন যে?' আমি আরো জানি—আপনারা আরো পেত্যয় যাবেন না যদি বলি, ফরাসী জর্মন উভয় অভিনেতাই [এবং উচ্চারণের ক্ষেত্রে

ধ্বনিবিদ্ পণ্ডিতের চেয়ে এঁরাই সর্বসাধারণের কাছে অধিকতর সম্মান লাভ করেন —ইংলণ্ডেও বার্নার্ড শ-কে যে বি বি সি উচ্চারণ-বোর্ডে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করা হত তার কারণ তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি নয়, নাট্যে উচ্চারণ বাবদে তাঁর ওয়াকিফহালত্ব] চেষ্টা করেন বাঙালীর 'র'র মত আপন 'r' উচ্চারণ করতে !!!—কিন্তু ট্রিল না করে! অর্থাৎ জর্মনে যাকে বলে হ্যাল *—উজ্জ্বল—ফরাসীতে যাকে বলে ক্ল্যার—ক্লিয়ার, পরিষ্কার, স্বচ্ছ 'r' উচ্চারণ করাটাকে আদর্শ 'r' উচ্চারণ মনে করেন। তাই মোটামুটিভাবে বলা যায় ফরাসী বা জর্মন এমন কি ইংরিজী 'r' উচ্চারণ করার সময় যদি জিভটাকে মুখের ভিতর ঝুলিয়ে রেখে—অর্থাৎ সেটাকে তালু, মূর্ধা বা দাঁতের পিছনে ছুঁতে না দিয়ে, এবং কাজে কাজেই কোনো প্রকারের ট্রিল বা ফ্ল্যাপ্ করবার সুযোগ না দিয়ে—বাঙলা 'র' ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তবে ঐ তিন ভাষার ধ্বনিবিদ্ পণ্ডিতরাই আদর্শ "r" উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেন। তারপর অবশ্য যদি কেউ সেটাকে খাঁটি প্যারিসিয়ান করতে চান তবে সেটা গলা থেকে আরবী 'গাইন' ঘেঁষা করবেন, দক্ষিণ-ফ্রানসের মত করতে হলে ফার্সী 'খে' ঘেঁষা করবেন, এবং জর্মন বলার সময় কলোন-বন্ অঞ্চলের 'r' উচ্চারণ করতে হলে সেটাকেও ঐ ফার্সী 'খে' ঘেঁষা করবেন। কিন্তু সর্বক্ষণ সাবধান থাকতে হবে যে, ট্রিলিং দুষ্কর্মটি যেন করা না হয়। বীরভূম অঞ্চলে যখন 'রাম'-এর পরিবর্তে 'আম' উচ্চারণ শোনা যায় তখন ঐ ট্রিলটি করা হয় না বলে—এবং রেভুকৎসিয়ো আড্ আব্সুর্ডুম্ হয়ে যাওয়ার ফলে 'র'-এর সর্বনাশ হয়ে 'অ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। ইংরিজীতেও তাই, কিংবা প্রায় তাই হয়—যখন 'r' কোনো স্বরবর্ণের পরে আসে। যথা 'hard'; এ স্থলে 'r' শুধু আগের a-টিকে দীর্ঘ করে। 'r'-এর পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনধর্ম লোপ পায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে কোনো কোনো ধ্বনিবিদ্ উচ্চারণ দেখাবার সময় তাই 'r' হরফটি উল্টো করে দিয়ে লেখেন এবং ছাপাখানায়ও হরফটি উল্টো করে ছাপা হয়—লাইনো বা টাইপ-রাইটারে অবশ্য সেটা সম্ভব নয়। আর 'r' বলার সময় যদি বাঙলার মত সেটাকে ট্রিল করতে চান, তবে প্রাণ ভরে করা যায় ইতালির 'r' উচ্চারণ করার সময় ইংরিজিতে যে স্থলে 'Irregular' বলার সময় প্রথম যে দুটো 'r' একসঙ্গে এল, সে-দুটোকে দু'বার

* কথাটা জর্মনে hell, কিন্তু বাঙলায় আমি 'হেল' না লিখে হ্যাল কেন লিখলুম সে বিষয় নিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে আলোচনা করবার আশা রাখি। কারণ জনৈক পত্রলেখক ইতিকে আমায় 'হিমাচল ব্রাণ্ডার' পর্যায়ে ফেলেছেন।

উচ্চারণ করতে তো দেয়ই না, একবারই—বাঙলার! হিসেবে—প্রাণ' ভরে করতে দেয় কই? সেখানে ইটালিয়ান 'birra' (বিয়ার) বলার সময় যদি 'r'-টা প্রেমসে ট্রিল না করেন—কম-সে-কম দু'বার—তবে বিয়ারের বদলে সেই যে ফুটোয় ভর্তি এক রকম পনির হয় বেয়ারা তারই ফুটোগুলো শুধু প্লেটে করে হয়তো নিয়ে আসবে! এবং শেষ কথা: ফরাসী জর্মন ধ্বনিবিদ্-যে তাঁদের 'r' পরিষ্কার ক্ল্যার ত্বাল উজ্জ্বল রাখতে চান, তার অন্যতম কারণ, গ্রীক এবং লাতিন যে 'r' আছে সেটা সংস্কৃত 'র'-এরই মত পরিষ্কার উজ্জ্বল—এবং জানা-অজানাতে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমাত্রই গ্রীক-লাতিন থেকে খুব দূরে চলে যেতে চান না। এরই উদাহরণ 'গুড্‌বাই, মিঃ চিপ্‌স্' ফিল্মে আছে।)

সত্য জ্ঞান লাভের জন্য তৃষ্ণার্ত জন যুগে যুগে বিদেশ গিয়েছে, বিধর্মীর কাছে গিয়েছে। পয়গম্বর বলেছেন, 'জ্ঞান লাভের জন্য যদি চীন যেতে হয় তবে সেখানে যেয়ো'—বলা বাহুল্য, তাঁর আমলে চীন দেশে কোনো মুসলমান ছিলেন না, এবং তাই ধরে নিতে পারি বিধর্মী 'কাফেরের' কাছ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতেও তিনি আপত্তিজনক কিছু পান নি।

কিন্তু এই যে 'ফরেন' যাওয়ার হিড়িক আরম্ভ হল প্রায় শ' খানেক বছর আগে এবং স্বরাজ পাওয়ার পর—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—এখনো বাড়তির দিকে, তার বেশীর ভাগই ছিল 'ইষ্টাম্বো' নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে—পেটটাকে এলেমে ভর্তি করার জন্য নয়। পাঠান এবং মোগল রাজারা এ-দেশেই বাস করতেন, এইটেই তাঁদের মাতৃভূমি, কাজেই বিদেশের ইষ্টাম্বোর প্রতি তাঁদের কোনো অহেতুক মোহ ছিল না—যদিও বিদেশাগত হুন্নুরী গুণীকে তাঁরা আদর করে দরবারে স্থান দিতেন। কিন্তু ইংরেজ কলকাতায় বসেও চোখ বন্ধ করে তাকিয়ে থাকতো লণ্ডনের দিকে, Kedgeree ('কেজরী'—খিচুড়ি—কৃশর, কৃশরান্ন?—) খাওয়ার সময় চিন্তা করতো আল্লায় মালুম কিসের!

অতএব সেখানে থেকে যদি কপালে একটি 'ইষ্টাম্বো' মারিয়ে নিয়ে আসা যায় তবে পেটে আপনার এলেম গজ্‌গজ্ করুক আর নাই করুক, আপনি 'ফ্রেশ্ ক্রম ক্রিশ্চিয়ান হোম', আপনিও এখন গোরা রায়। তাই স্বরাজ লাভের পরও

অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
দিবাভাগে মন্দ ভাগ্যে তার মার খায়॥

১৬।১০।৬৫

সাবিত্রী

দক্ষিণ ভারতের একটি সানাটরিয়ামে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ব্যামো গোড়াতেই ধরা পড়েছিল বলে কেস্ খারাপ হতে পায় নি। আমাকেও তাই কোন প্রকারের সেবা-শুশ্রূষা করতে হত না। হাতে মেলা সময়। তাই কটেজে কটেজে—এ-সব কটেজে থাকে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালীরা আর বিরাট বিরাট লাটের একাধিক জেনরেল ওয়ার্ড তো আছেই—ডাক্তাররা সকালবেলাকার রোগী-পরীক্ষার রোঁদ সেরে বেরিয়ে যাবার পরই আমি বেরুতাম আমার রোঁদে। বেচারাদের অধিকাংশকেই দিনের পর দিন একা-একা শুয়ে শুয়ে কাটাতে হয় বলে কেউ তাদের দেখতে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ যে কী রকম খুশীতে উজ্জ্বল—এবং যে-ক'টি ফোঁটা রক্ত গায়ে আছে, সব ক'টি মুখে এসে যেত বলে রাঙা—হয়ে যেত, সেটা সত্যই অবর্ণনীয়।

করে করে প্রায় সব্বাইকেই আমি চিনে গিয়েছিলুম—তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীই বেশী।

একটি কটেজে আমি কখখনো যাই নি, ডাক্তার ভিন্ন আর কাউকে কখনো যেতেও দেখি নি। রোগীর পাশে সর্বক্ষণ দেখা যেত একটি যুবতী—বরঞ্চ তরুণী-ঘেঁষা যুবতী বললেই ঠিক হয়—মোড়ার উপর বসে উলের কাজ করে যাচ্ছেন; তাই বোধ হয় কেউ তাঁদের বিরক্ত করতে চাইতো না।

একদা রোঁদ শেষে, পথিমধ্যে হঠাৎ আচমকা বৃষ্টি। উঠলুম সেই কটেজটাতেই।

যুবতীটি ধীরে ধীরে মোড়া ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে অতি ক্ষীণ ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'আসুন, বসুন। কী ভাগ্য বৃষ্টিটা নেমেছিল। নইলে আপনি হয়তো কোনদিনই এ-কটেজে পায়ের ধূলি দিতেন না।'

কী মিষ্টি গলা! আর সৌন্দর্যে ইনি রাজরানী হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু সে কী শান্ত সৌন্দর্য। গভীর রাত্রে, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে, আমি নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে দেখেছি এই শান্ত ভাব—দিক্-দিগন্ত জুড়ে। আমরা প্রাচীন যুগের বাঙালী। চট করে অপরিচিতার মুখের দিকে তাকাতে বাধো বাধো ঠেকে। এঁর দিকে তাকানো যায় অসঙ্কোচে।

রোগীও সুপুরুষ, এবং এই পরিবেশে খাটে শুয়ে না থাকলে বলতুম, রীতিমত

স্বাস্থ্যবান। শুধু মুখটি অস্বাভাবিক লালচে—যেন গোরা অফিসারের মুখের লাল .

স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে হেসে বললেন—গলাটা কিন্তু রোগীর—'রোজ চারবেলা দেখি আপনাকে এ-পথ দিয়ে আসতে যেতে। পাশের কটেজে শুনি আপনার উচ্চহাস্য। শুধু আমরাই ছিলুম অস্পৃশ্য। অথচ দেখুন, আমি মুখুজ্যে বামুন—'

আমি গল্প জমাবার জন্য বললুম, 'কোন্ মে-? আমার হাতে বাঁড়ুজ্যে কুলের মেল একটি মেয়ে আছে।'

এবারে দুজনার আনন্দ অবিমিশ্র। এ লোকটা তাহলে পরকে 'আপনাতে' জানে। তিন্মুহূর্তে জমে গেল।

খানিকক্ষণ পরে আমি বললুম, 'আপনারা দুজনাই বড় খাঁটি বাঙলা বলেন, কিন্তু একটু যেন পুরনো পুরনো।'

মুখুজ্যে বললেন, 'আমি ডাক্তার—অবশ্য এখন অবস্থা "কবরাজ। ঠেকাও আপন যমরাজ।" তা সে যাকগে! আসলে কি জানেন, আমরা দুজনাই প্রবাসী বাঙালী। তিনপুরুষ ধরে লক্ষ্ণৌয়ে। আমার মা কাশীর, ঠাকুরমা ভট্টপল্লীর। সেই ঠাকুরমার কাছে শিখেছি বাঙলা—শাস্ত্রীঘরের সংস্কৃতঘেঁষা বাঙলা। সেইটে বুনিয়াদ। সবিতা আমাদের প্রতিবেশী। আমার ঠাকুরমার ছাত্রী। আমরা দুজনা হুবহু একই বাঙলা পড়েছি, শিখেছি, বলেছি। তবে ম্যাট্রিক পর্যন্ত উর্দু শিখেছি বলে মাঝে মাঝে দু-একটি উর্দু শব্দ এসে যায়—আমার ভাষাতে, সবিতার না। আপনার খারাপ লাগে?'

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, 'তওবা, তওবা! আমি বাঙালী মুসলমান আমরা ইওহী দু-চারটে ফাল্‌তো আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করি।'

পাশ ফিরে, আপন দুই বাহু আমার দিকে প্রসারিত করে দিলেন। আমি আমার হাত দিলুম। দুহাত চেপে ধরে, চোখ বন্ধ করে, গভীর আত্মপ্রসাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন 'বাঁচালেন! আপনি মুসলমান।'

আমি একটু দিশেহারা হয়ে চুপ করে রইলুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যত্রতত্র খান এখানে? ডাক্তার হিসেবে বলছি, সেটা কিন্তু উচিত নয়।'

আমি বললুম, 'আমি যত্রতত্র যা-তা খাই, এবং ভবিষ্যতেও খাবো। অপরাধ নেবেন না।'

'বাঁচালেন!' এবারে আমি আরো দিশেহারা! আমি তাঁর পরামর্শ অমান্য করছি দেখে তিনি খুশী!

'বাঁচালেন! জানেন, প্রথম দিনই আপনার চেহারা দেখে, অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করলুম আমার এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে।'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমায় বলি নি, সবিতা ?'

সবিতা এতক্ষণ ধরে শুধু উল বুনে যাচ্ছিলেন। মাথা তুলে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এমনকি, চলার ধরনটি, গলার স্বরও!'

মুখুজ্যে বললেন, 'সেই বন্ধুটি যদি আজ এ-লোকে থাকতো, তবে আজ আমার এ-দুর্দশা হত না! সে কথা থাক। মূল বক্তব্য এই : ঠাকুরমা প্লাস তামাম পরিবার, প্লাস সেই সখার পরিবার—সবাইকে লুকিয়ে, বিস্তর ছলনা-জাল বিস্তার করে আমি ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি ওর মায়ের তৈরী মুর্গী-মটন। সে খেত আমাদের বাড়িতে নিশ্চিন্ত মনে। আপনি বোধ হয় জানেন না—'

'বিলক্ষণ জানি, স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—আপনার ঠাকুরমার পাড়ার লোক—বাড়িতে দিশী-বিদেশী সবাইকে খাওয়াতেন। তাঁর ছেলে, স্বর্গত বিনয়তোষ। তিনিও নিষ্ঠাচারী ছিলেন। ঝাড়া আটটি বছর প্রতি রোববারে, তাঁর সামনে বসে, তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন করেছি আমি, মুসলমান।

ডাক্তার বললেন, 'তারপর ঠাকুরমা মা আর সবাই গত হলেন। রইল ঐ দোস্ত-ইয়ার-সখা বেদার্-বখ্শ্। একই বছরে দুজনায় ডাক্তারি পাশ করলুম। ইতিমধ্যে আমার বিয়ে হয়েছে। সবিতা রাঁধে ভালো, কিন্তু তার মা তাকে বলে দিয়েছিলেন, 'অন্তত রান্নার ব্যাপারে বাপের বাড়ির ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে, স্বামী যে-ভাবে খেতে চায় ঠিক সেইভাবে খাওয়াবি।' তাই সবিতা বেদারের মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরয়ানী থেকে কালুদা, বুরহানী থেকে আজওয়ান রুটি।

অতএব স্যার, কাল দ্বিপ্রহরে এখানে একটু হবিষ্যান্ন করবেন—' হেসে বললেন, 'অবশ্যই, মোগলাই! আসলে কি জানেন, এই যে চোখের সামনে সবিতা উদভ্রান্ত উল বোনে, এটা, it gets on my nerves! আর সবিতা একটি পারফেক্ট আর্টিস্ট। রন্ধনে। তার অনুশীলন নেই, রেওয়াজ নেই। আপনার শোক হয় না? আমার তো ওসব খাওয়া বারণ। নিজের জন্য—'

আমি সবিতার দিকে তাকিয়ে আমার মাকে দেখতে পেলুম; বাড়িতে কেউ না থাকলে মা হাঁড়ি পর্যন্ত চড়াতো না। তেল-মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তো। আর এই সবিতা নাকি বিস্বাদ বিবর্ণ মাছসেদ্ধ, কপিসেদ্ধ, পাতলাসে পাতলা যেন কড়াই-ধোয়া-জল স্যুপ নামে পরিচিত গব্যযন্ত্রণা স্বামীকে খেতে দিয়ে নিজে গণ্ডারগ্রাসে খাবে বিরয়ানী, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম!

আমি বললুম, 'কিন্‌সে তওবা। তা-ও কখনো হয়। কিন্তু আমি একা-একা খাব?—কেমন যেন?'

আর্তনাদ করে বললেন, 'আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না, রান্নাঘর থেকে সবিতার রেওয়াজের গন্ধ আমার নাকে আসবে—আচ্ছা, আপনি না-হয় আড়ালেই খাবেন, শুধু আমি পদগুলো কম্পোজ করে দেব। আপনাকে এ-নিমন্ত্রণ সাহস করে জানালুম, আপনি যত্রতত্র খান শুনে। নইলে—'

আমি বললুম 'ডাক্তার, আমি জানি, আপনাদের অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা বারণ। কাল সকালের রোঁদ সেরেই আসবো। দুপুরে খাব।'

সবিতা রাস্তা অবধি নেমে এসে বললেন—মাথা নিচু করে, প্রায় হাতজোড় করে, 'এই দু' বছর ধরে আমরা এখানে আছি। এই প্রথমবার তিনি পুরো আধ ঘণ্টা ধরে খুশিতে আনন্দে সময় কাটালেন। আপনি দয়া করে আসতে ভুলবেন না। বড় ডাক্তার বলেছে, উনি ফুর্তিতে থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। আমি ওঁকে বাঁচাতে চাই। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন—'

হঠাৎ ধপ্‌ করে রাস্তার পাশে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর তার মাথা ঠুকে দিল। এত দুঃখের ভিতরও আমি দেখলুম, বন্যার জলের মত এক মাথা গোছা গোছা গাদা গাদা কালো চুল ঘোমটার বাঁধ সরিয়ে আমার দুই গোঁড়ালির হাড় পেরিয়ে, মাঝ-হাঁটু অবধি ছাপিয়ে দিল। এ-চুল আমি দেখছি, অতিশয় শৈশবে, আজ মনে হয়, যেন আধাস্বপ্নে, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে, আমার মায়ের মাথায়।

সতীসাধ্বী যুবতীকে স্পর্শ করা গুনাহ্‌। জাহান্নামে যাক গুনাহ্‌।

দুহাত দিয়ে তাকে তুলে ধরলুম। বললুম, 'মা! ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো।'

সীমন্তিনী বললে, 'আমি আল্লাকে ইয়াদ করি।'॥

আমি বললুম, 'সেও বুঝলুম, কিন্তু মেয়েটা বিপদে পড়েছে, আর কেউই সাহায্য করছে না! এটা একটা কথার কথা হল?'

অসহায় ভাব দেখিয়ে বললে, হিন্দুদের ব্যাপার, কি করে বুঝি বলুন। দু' একটি মুসলমান আছে। তারাও হিন্দুদের ঐ সব দেখে বোধ হয় সাহস পাচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'জাহাজে ডাক্তার নেই? প্যাসেঞ্জারের ভিতরেও?'

'তারই সন্ধান চলছে, হুজুর।'

তারপর খানসামা বিজ্ঞভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে যেন আপন মনে বললে, 'যতসব নাদান বেকুবের কারবার। আরে বাপু, মেয়েটার মাথায় এক থাবড়া সিঁদুর আগে লেপটে দিলেই তো পারতো!'

(জানি নে, তাতে করে কি হত। হালে এ্যারোপ্লেনে নাকি এমতাবস্থায় এ্যারহোস্টেস্ সাহায্য করতে রাজী হয় নি)।

আপন ক্যাবিনে ফিরে যাচ্ছি এমন সময় এক সহৃদয় প্যাসেঞ্জার আমাকে পাকড়ে বললে, 'আপনি চলুন না, স্যার।'

তাজ্জব মেনে বললুম, 'আমি!'

'কেন? আপনি তো ডাক্তার!'

বুঝলুম, আমার ট্রাঙ্কে বা রিজার্ভেশন কার্ডে দেখেছে, লেখা, Dr.। কাতর কণ্ঠে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, সেটা ভিন্ন বস্তু, বেকার, 'ফরেন'। এটা দিয়ে মাছিটার ছেঁড়া পাখনাও জোড়া দেওয়া যায় না। লোকটি বড়ই সরল। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি নে, চিকিৎসার ডাক্তার এক প্রাণী, আমার ডক্টরেট ত্রিসংসারে কারো কোনো কাজে লাগে না। এধরনের গেরো আমার জীবনে আরো দু' দুবার হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে জাহাজে নূতন চাঞ্চল্য। কোত্থেকে পাওয়া গেছে এক না-পাস্ কম্পাউণ্ডার। সে বোধ হয় 'শ্মশান-চিকিৎসাটা' করতে রাজী হয়েছে। তবে বলছে, একটি মেয়েছেলের সাহায্য পেলে ভালো হত।

তারপর যা দেখলুম, সে দৃশ্যটি আমার জীবনে ভুলবো না।

ঐ যে পূর্বে বলছিলুম,জাহাজে তখনকার দিনের কলেজের দু' পাচটা 'আধুনিকা' নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াতো, তাদেরই একটি—লম্বা, ছিপছিপে শ্যামবর্ণ, পরনে সাদামাটা শাড়ি ব্লাউজ—গমগম করে কম্পাউণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেল, দু হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে। তখন চতুর্দিক থেকে উঠেছে তার দিকে 'ছ্যা ছ্যা ছি ছি' রব। সক্কলের টার্গেট তখন ঐ আসন্নপ্রসবা নয়—তখন এই ভদ্রকন্যা।

আমি জীবনে দু'জন পরমহংস দেখেছি।

আর এই দেখলুম, পরমহংসী। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নয়, সর্ব ধিক্কার, সব ব্যঙ্গ, সব বিদ্রূপ উপেক্ষা করে প্রসন্ন বদনে সে এগিয়ে যাচ্ছে॥

১৩।১১।৬৫

ফরাইজ্

'বাপের বাড়ি', 'শ্বশুরবাড়ি', 'পিতৃগৃহ', 'পতিগৃহ', 'মুখ্যগৃহ', 'গৌণগৃহ', ইত্যাকার বহু প্রকার 'গৃহের' নবীন নামকরণের প্রস্তাব পত্রান্তরে হয়ে যাচ্ছে। এই সুবাদে মুসলমানদের ভিতর কি রীতি প্রচলিত আছে সেটার উল্লেখ বোধ হয় সম্পূর্ণ অবান্তর হবে না। কারণ হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের লোকাচারে, বিষয়সম্পত্তি বণ্টন বাবদে যতই পার্থক্য থাক না কেন, উভয় ধর্মাবলম্বীরই ভাষা বাঙলা, এবং মুসলমান মেয়েও বলে 'বাপেরবাড়ি' 'শ্বশুরবাড়ি'। তবু একটা ব্যাপারে সামান্য তফাত আছে।

অল্প হোক, বিস্তর হোক, পিতার মৃত্যুর পর মুসলমান মেয়ে বাপের সম্পত্তির কিছুটা হিস্সে পায়। অর্থাৎ পৈতৃক ভদ্রাসনেও তার আইনত অংশ বিদ্যমান থাকে। একেই বলে 'ফরাইজ্'।

কার্যত কিন্তু সে এ-ফরাইজ্ দাবি করে না। এমন কি পতিগৃহে তার লোভী স্বামী যদি তাকে ন্যায্য হক্ক পওয়ার জন্য ক্রমাগত টুইয়ে দিতে থাকে তবু সে সেটার দাবি করে না, মোকদ্দমা করতেও রাজী হয় না—আর স্বামী নিজের থেকে কোনো দাবি দাওয়া করতে পারে না, কারণ হক্ক তার স্ত্রীর, তার নয়।

বোন কেন মোকদ্দমা করে না, তার একাধিক কারণ আছে। লোকাচারে বাধে (এতে হয় তো কিছুটা প্রতিবেশী হিন্দুর প্রভাব আছে); এবং দ্বিতীয়ত তার অন্য স্বার্থ আছে। সে যদি তার ন্যায্য পাওনা নিয়ে নেয়, তবে সে অর্থ হয়তো খর্চা হয়ে যাবে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সে যদি কোনো কারণে অসহায় হয়ে যায়—দেবর ভাশুর তাকে অবহেলা করে—তবে তার অন্য আশ্রয় থাকে না। পক্ষান্তরে সে যদি ফরাইজ্ না নেয়, তবে সে তারই হকের জোরে বাপের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে। এমন কি শ্বশুর ভাশুর স্বামীর জীবিতাবস্থায়ও যদি তার

উপর অত্যধিক চোটপাট হয় তবে সে ফরাইজের হকে বাপের (বা বাপ মরে গিয়ে থাকলে) ভাইয়ের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে।

আরো একটা কারণ আছে। মুসলমান মেয়ে মাত্রই আশা করে, সে যেন বছরে অন্তত একবার তার বাপ মা ভাইবোন, ছেলেবেলার পাড়াপ্রতিবেশীকে দেখতে যেতে পায়। এ স্থলে স্মরণ করিয়ে দি, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান মেয়ের নাম পদবী বদলায় না। মুসলমান বিবাহ অনেকটা সিভিল ম্যারিজের মত কনট্রাক্ট ম্যারিজ—সেক্রেমেন্টাল নয়। অপরাধ যদি না নেন, তবে উল্লেখ করি, আমার পিতার নাম ছিল সৈয়দ সিকন্দর আলী। অথচ আমার মা চিরকালই নাম সই করেছেন, আমতুল মন্নান খাতুন চৌধুরী। মিসেস আলী, মিসেস সৈয়দ—বা বেগম আলী এ সব হালে ইংরেজের অনুকরণে হয়েছে।

* * *

এবারে গরীব দুঃখী চাষীবাসীদের একটি উদাহরণ নি। পূব বাঙলার।

মনে করুন চাষা কেরামতুল্লা মারা গেছে। তার মেয়ে জয়নবের বিয়ে হয়েছে বেশ দূরে ভিন্ গাঁয়ে। জয়নবের বাল্যাবস্থায় তার মা মারা যায় বলে কেরামতুল্লা দুসরা শাদী করেছিল। সে পক্ষের ছেলে আকরম বিধবা মাকে নিয়ে, বিয়ে করে মোটামুটি সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে। সৎ বোনকে আর স্মরণেই আনে না। তার মাও সতীনের মেয়ে জয়নবকে দু' চোখে দেখতে পায় না। অতএব জয়নব বেচারী বাপের বাড়ির মুখ দেখতে পায় না। জয়নবের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের লোকে তাই নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করে। ওদিকে লোভী স্বামীও বলে, 'ফরাইজ্ চেয়ে নে।'

জয়নব বেচারী তখন যদি দৈবযোগে বাপের গাঁয়ের কাউকে পেয়ে যায় তখন তাকে দিয়ে ভাইকে খবর পাঠায় তাকে যেন এসে বাপের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যায়—একেই বলে 'নাইওর' যাওয়া। ভাই খবর পেয়েও গা করে না—আর সৎমার তো কথাই নেই। বেচারী জয়নব একাধিকবার খবর পাঠিয়ে হয়রান হয়ে গেল। ওদিকে বাপের গাঁয়ের লোক তো আর তার শ্বশুরের গাঁয়ে নিত্যি নিত্যি আসে না যে নিত্যি নিত্যি খবর পাঠাবে।

তখন সে ধরে অন্য পন্থা। নদীতে জল আনতে গিয়ে সুযোগ পেলেই সময় কাটায় বিস্তর। এবং স্বভাবতই তার গাঁয়ের সব মাঝিদের সে চেনে। তাদের কাউকে দেখতে পেলে পাড়ে বসেই চিৎকার করে তার ফরিয়াদটি জানিয়ে দেয়; সবিস্তারে বলতে হয় না—সবাই সব খবর জানে।

তাতেও যদি ওষুধ না ধরে, তখন সে ধরে রুদ্রমূর্তি।

শাসিয়ে দেয়, তাকে নাইওর না নিয়ে গেলে সে কবাইজের মোকদ্দমা করবে।

এইবার ভাইয়ের কানে কিঞ্চিৎ জল যায়। তাও পুরোমাত্রায় না। ইতিমধ্যে গাঁয়ের মুরুব্বিদের কানেও তাবৎ ফরিয়াদ পৌঁচেছে—বিশেষত সেইসব বৃদ্ধদের কানে যাঁরা বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন। তাঁরা তখন ছোকরাকে বুঝিয়ে বলেন, 'তোর আছে কুল্লে আড়াই বিঘত জমি—আচ্ছা, তার না হয় কিছুটা গেল; কিন্তু তোর বসত-বাড়িতেও যে ছুঁড়ির হিস্সে রয়েছে। সেইটেও তুই লাটে তুলবি নাকি? যা, যা, বোনকে নিয়ে আয়।'

আমি এতক্ষণ যা বললুম, এসব পূব-বাঙলার লোকসঙ্গীতেও আছে। তারই একটির শেষ দুই লাইনে আছে,

"থাকো গো বোন, থাকো গো বোন,
কিলগুঁতা খাইয়া,
*আষাঢ় মাসে লইয়া যাইমু
পঙ্খীরাজ ওড়াইয়া॥"

ভাই নৌকা নিয়ে আসার খবর পাওয়া মাত্রই বোন লেগে যায় নানারকম মিষ্টি পিঠে বানাতে। শাশুড়ী গজর গজর করে, কিন্তু জা-রা তো একই গোয়ালের গাই, তারা সাহায্য করে।

নৌকা এল। বোন সগর্বে হাঁড়ি ভর্তি মিঠে-পিঠে নিয়ে নৌকায় চাপলো। গাঁয়ের মেয়েরা এখন আর তাকে খোঁটা দিতে পারবে না। এতো সতীর নিঃসঙ্গ হিমালয়-যাত্রা নয়।

*　　　　*

বুদ্ধিমতী মেয়ে বলে বাপের বাড়ি গিয়ে জয়নব পাড়াময় চর্কিবাজি মেরে দিন কাটায় না। অবশ্য সর্বপ্রথম মিঠে-পিঠে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, সইটইদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, কিন্তু তারপরই লেগে যায় নূতন ধানচাল যা উঠেছে তার তুরুস্ত-ব্যবস্থা করতে। অবশ্য একথাও ঠিক, কেউ তা সে যে কোনো স্ত্রীপুরুষই হোক যদি সুবো-শাম বেঘোরে ঘুমোয় তবে লোকে প্রবাদটা বলে, 'দেখো খোদার খাসিটা ঘুমুচ্ছে যেন "নাইওরী-মাগীটার" মত।

এই করে করে 'নাইওর' বাস যখন শেষ হয়, তখন বাপের বাড়িতে আবার

* লেখকের মনে ঈষৎ সন্দেহ আছে, এ স্থলে ভাই বোধ হয় বোনকে কিঞ্চিৎ ধাপ্পা দিচ্ছে। বোনকে সচরাচর নাইওর নেওয়া হয় অঘ্রান মাসে ধান কাটার পর। কিন্তু আমি সঠিক বলতে পারবো না। কারণ দেশ ছেড়েছি দুই যুগ পূর্বে।

মিঠে-পিঠে তৈরী আরম্ভ হয়—এগুলো সে নিয়ে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। ভাই অন্তত একখানা শাড়ি, একটি কুর্তা কিনে দেবে বোনকে—জামা-ফ্রক ভাগ্নেভাগ্নিকে।

জয়নব কিন্তু ধান ভানা ধান কোটাতে এমনই সাহায্য করে যেন ভাই, সৎমা স্ত্রী চীপ-লেবারের প্রলোভনে তাকে আসছে বছর নিজের থেকেই 'নাইওর' নিয়ে আসে—ফরাইজের মোকদ্দমার শাসানি যেন মাঝি-মাল্লা মারফত না পাঠাতে হয়। শ্বশুরবাড়ি ফিরে জয়নব আবার দেমাক করে, 'আমি মাগনা খাই নে পরি নে। যদ্দিন ওখানে ছিলুম সৎমাকে কুটোটি পর্যন্ত কুড়োতে দি নি!'

* *

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম এটা হিন্দুদের বেলাও প্রযোজ্য। প্যাটার্ন মোটা-মুটি একই তবে তফাতটা কোথায়?

তফাত ঐ ফরাইজের হক, ড্যুরেস, ব্ল্যাকমেল (অবশ্য বেআইনী নয়) দিয়ে সে বাপের বাড়ি যাবার হক আজীবন জিইয়ে রাখে। স্বামীর সঙ্গে না বনলে সেই হক্কের জোরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাপের বাড়ি চলে আসে। অবস্থা চরমে পৌঁছলে সেখানে বসে স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ন্যায্য স্ত্রীধনের মোকদ্দমা লাগায়। কিংবা যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ভাশুর-দেওর তাকে অসম্মান করে তবে সে চলে আসে বাপের বাড়িতে, ঠুকে দেয় ওদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। এগুলোই আসল তত্ত্ব বলে পুনরাবৃত্তি করলুম।

* *

এ সব সম্ভব বাপের বাড়ির ফরাইজের জোরে।

তাই সেটি সে কখনো হাত-ছাড়া করে না। লোভী স্বামী যতই চোটপাট করুক না কেন।

হিন্দু মেয়েরা একটু চিন্তা করে দেখবেন॥

২৭।১১।৬৫

চোখের জলের লেখক

ইংরিজির শব্দভাণ্ডার অতুলনীয়। তন্মধ্যে একটি শব্দ 'গ্যাগা'-এর সঠিক উচ্চারণ না জানা থাকলেও ক্ষতি নেই। 'গ্যাগা' শব্দের অর্থ, লোকটার ব্রেন্‌-বক্‌সে যা আছে—যদি কিছু আদৌ থাকে—সেটা এমনই হযবরল গোবলেট পাকানোর জগা-খিচুড়ি যে কেউ কিছু বললে তার গলা দিয়ে যে ধ্বনি বেরয় সেটা 'গাগা', 'গ্যাগো,' 'গ্যাগা, গোঙরানো ঢপের—কাজেই শব্দটির যে কোনো উচ্চারণই মঞ্জুর। অর্থাৎ গাগার সঙ্গে ইম্‌বেসাইল, ইডিয়ট ('পণ্টক' বললুম না, কারণ সুনীতিবাবুর শব্দটির কপি-রাইট মেরে দিয়ে সেটার পাইরেটিং সংস্করণ বের করার দরুন পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে 'কণ্টক' থেকে 'কাঁটা,' 'পণ্টক' থেকে 'পাঁঠা' বের না করে আড়াল থেকে আমাকে 'পন্‌ঠক্‌' বলতে আরম্ভ করেছে) গোবর-গণেশ যে কারো সঙ্গে তুলনা করলে শেষোক্তদের অপমান করা হয়।

সেই গ্যাগাদের গ্যাগা—গ্যাগায়েস্টের মত আমি শুধু অর্থহীন কতকগুলো ধ্বনি বের করলুম যখন আমার এক নিত্যালাপী গুণী বললেন, জনৈক অধ্যাপক* নাকি প্রকাশ্য সভাস্থলে রায় প্রকাশ করেন, স্বর্গত, প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পীরাজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাকি থাড্ডোকেলাশ্‌ 'চোখের জলের লেখক'। আচ্ছা, পাঠক, তুমিই কও, সেস্থলে তুমি কি করতে। শরৎচন্দ্র কাঁদিয়েছেন। শরৎচন্দ্র হাসান নি। সামাজিক নিষ্ঠুরতার কাঁটাবনের উপর দিয়ে আমাদের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যান নি।—কাঁদাবার জন্য নয়, যন্ত্রণায় চিৎকার করার জন্য। ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপ-বাণে আমাদের জর্জরিত করেন নি?

এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে শতাধিক বর্ষ ধরে দুটি দল আছে। রামমোহন বনাম সতীদাহের দল, বিদ্যাসাগর বনাম নিরম্বু উপবাসের দল, রবীন্দ্রনাথ বনাম—তা সে যাই হোক্‌। সেই দল চেষ্টা করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে নেতা বানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিষ্ঠ করে তুলতে। তাঁরা মাষা পরিমাণ কৃতকার্য হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, শরৎচন্দ্র দলের বাইরে। শরৎচন্দ্র যেমন 'দত্তার' 'রাসবিহারী' চরিত্র আঁকে, ঠিক তেমনি 'নারীর মূল্য'ও লিখতে জানে। (আশা করি বলার

*যে-কোনো কারণেই হোক, বন্ধুবর নাম উল্লেখ করলেন না, আমিও শুধোই নি।

প্রয়োজন নেই, যে শরৎচন্দ্র এই অমূল্য গ্রন্থ কাঁদাবার জন্য লেখেন নি ; পাঠক, আপনি সে বই পড়ে কি ভেবেছেন সঠিক বলতে পারবো না ; আমার মনে হয়েছে, আমি যেন দু গালে চড় খাচ্ছি এবং জানি যখন এ-ই আমার প্রাপ্য তাই আমি তখন কাঁদি নি—কারণ কাঁদবার হক্কও সঞ্চয় করতে হয়।)

এদিকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'অন্ধভক্তের' দল—ডেকে আন্ বললে যারা বেঁধে আনে—(যদিও আমি রবীন্দ্র-শিষ্য হিসেবে শপথ করে বলতে পারি, তিনি ডেকে আনতেও বলেন নি) লাগলেন শরৎচন্দ্রের পিছনে। তার জের আজও চলছে। অবশ্য এস্থলে আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিবেদন করি, পূর্বোল্লিখিত অধ্যাপক এ-'দলের' নাও হতে পারেন। তিনি হয় তো তাঁর স্বাধীন ধর্মবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁর বক্তব্য বলেছেন।

কিন্তু এসব 'বৃথা বাক্য'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি 'তুলনাহীনা' কবিতা লিখতে লিখতে হঠাৎ লিখেছেন, 'বৃথা বাক্য থাক্'। গুরুবাক্য স্মরণে এবং সেই নীতি অনুযায়ী আমারও মন তাই এতক্ষণ ধরে বৃথা বাক্য ভুলে গিয়ে শুধু আঁকুবাঁকু করছে, মেজদার স্মরণে—যিনি দুর্দান্ত শীতের রাতে লেপের ভিতর কচ্ছপটির মত শুয়ে আছেন আর শ্রীকান্ত তাঁর জন্য পাতা উল্টে দিচ্ছেন, হঠাৎ ব্যাঘ্ররূপী 'বউরূপীর' আবির্ভাব, ভিরমি কাটলে পর মেজদা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'—ইতিমধ্যে খড়ম পেটাতে পেটাতে (আহা, কী সুন্দর ছবিটি!) কটুবাক্য, 'খোট্টার ব্যাটারা কাঁঠাল পাকা দিয়া'—এবং সবশেষে পিসীমার সাত পাকের সোয়ামীর প্রতি অত্যন্ত প্র্যাকটিকাল সময়োপযোগী সদুপদেশ,—কাটা ল্যাজটি ভবিষ্যতের সুব্যবহারার্থে তরিবৎ করে তুলে রাখার জন্য—সে কালে বোধ হয় ভাগলপুরে ব্যাঙ্কে ভল্টের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সাবধান! আমাকে সর্বক্ষণ সচেতন হয়ে থাকতে হবে যেন ফাঁদে পা না দি ;—শরৎচন্দ্র যে বাঙালীদের হাসিয়েছেন তার উদ্ধৃতি দেবার প্রলোভন সম্বরণ না করলে বর্তমানে যাদের হাতে শরৎ গ্রন্থাবলীর কপিরাইট তাঁরা আমাকে জেলে পুরবেন—পাতার পর পাতা নিছক পুনর্মুদ্রণ তাঁরা বরদাস্ত করবেন কেন? অথচ আমার বক্তব্য তো স্পষ্টতম হবে, যদি আমি একটি মাত্র বাক্য ব্যয় না করে নিছক উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যাই।

তর্ক স্থলে স্বীকার করছি কাঁদানো সহজ। হাসানো কঠিন। টেকো ভদ্রলোক তাঁর বাদ বাকি কুল্লে আড়াইগাছা চুল দিয়ে মাথার সামনের দিকের চালটা যেন খড় দিয়ে ছাওয়ার নিষ্ফল প্রচেষ্টা করেছেন—তাই দেখে রকে বসে আমার তিন ভাগনে যে 'সেব্রামীর' টিপ্পনী কাটলে সেটি অনায়াসে অলিম্পিকে পাঠানো যায়

এবং সেটি আমি ঘরের ভিতর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম। কিন্তু, হায়, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না, কারণ, সরলতম কারণ, আমার আপন টাকটি—থাক, 'বৃথা বাক্য থাক্'। কিন্তু ঠিক ঐ সময় অন্য একটি ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাবার সময় রক্ থেকে যদি শব্দ আসতো, 'আহা বেচারা, কাল রাত্রে তার ছেলেটি—জানিস, কি হয়েছে ?'—বাকিটা শুনতে পেলুম না বলে হেঁকে শুধালুম, 'কেন রে, কি হয়েছে ?' 'টাইফয়েডে একটা চোখ গেছে।' আমি তখন রকেরই একজন হয়ে গেলুম।

কিংবা সরলতর উদাহরণ দি।

ঐ বৈঠকখানায়ই বসে আছি। বাড়ির বউঝিয়া রান্নাঘরে ফিসফিস করে গালগল্প করতে করতে—রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না—হঠাৎ সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলো। আমি যত গ্যাগা-ই হই না কেন, উঠে গিয়ে শুধবো না, 'হ্যা, বউমা, তোমরা হাসছিলে কেন ?'

কিন্তু তারা যদি হঠাৎ এক সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠে তবে আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে জানতে চাইবো তারা এ রকম ধারা হঠাৎ কেঁদে উঠলো কেন ? অর্থাৎ হাসি একে অন্যের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়, কান্না কাছে টেনে আনে।

*   *

শরৎচন্দ্র 'চোখের জলের লেখক' ? আর বিদ্যেসাগর ? বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় তিনি যে সব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন, তখন আমরা ঠাঠা করে হেসেছি ?—না ? তাঁর 'শকুন্তলা' পড়তে পড়তে আমি তো হেসেই গড়াগড়ি! রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস নিশ্চয়ই অত্যন্ত অপ্রচুর ছিল। নইলে তিনি লিখবেন কেন, 'কেহ দুঃখ পায় ইহা তিনি (শ্রীকণ্ঠবাবু) সহিতে পারিতেন না—ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এই বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন 'বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস' বা 'শকুন্তলা' হইতে কোনো একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত তুলিয়া নিষেধ করিয়া, অনুনয় করিয়া কোনো মতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।'

আশ্চর্য! আমি তো গ্রন্থ দু'খানা পড়ে হেসেই কুটিকুটি। তবে হ্যা, আমি পূর্বেই স্বীকার করেছি আমি গ্যা গা।

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর মশাইকে লোকে চেনে তাঁর 'চোখের জলের' বইয়ের জন্য। অবতার বিদ্যাসাগরকে বাঙালী চেনে তিনি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দিতেন বলে। বিদ্যাসাগর মশাই দুটোই পারতেন। কিন্তু সবাই তো তা পারে না। সমাজের অত্যাচার অনাচার দেখে সত্য সাহিত্যিক মানুষকে কাঁদায়। তাঁদের

ভিতরে যাঁরা সত্যকার মানুষ তখন তাঁদের অনেকেই সে-সব অনাচারের বিরুদ্ধে নাঙ্গা তলওয়ার নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করে। কারণ আমাদের অধিকাংশই জড়। সাহিত্যিক স্পর্শকাতর। সে যখন করুণ বর্ণনা দিয়ে আমাদের কাঁদায়, তখন আমাদেরই মত জড়ভরতদের কেউ কেউ ঐ সম্বন্ধে সচেতন হয়।*

ড্রাইফুসের প্রতি নষ্টাধম ফরাসী মিলিটারী মদমত্ত হয়ে যে অবিচার করে তার প্রতিকারের জন্য তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রী প্যারিসের বড় বড় রাজনৈতিক শক্তিধর শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্তনাদ করেছে। কিন্তু সে বেচারী তো আমাদের 'তুলনাহীনা' লেখিকা আশাপূর্ণা নয়। শেষটায় চরম দীনজন যে রকম ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা চায়, ঠিক সেই রকম সে গেল সাহিত্যিক এমিল জোলার কাছে। তাঁর তখন বয়স হয়ে গিয়েছে। তিনি মাফ চাইলেন। শেষটায় বেচারী তার কাগজপত্র জোলার টেবিলে ফেলে রেখে চলে গেল।

এই পৃথিবীর পরম সৌভাগ্য সে রাত্রে জোলার কোনোকিছু করার ছিল না। এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ সেই রমণীর কাগজপত্র চোখে পড়লো। অলস-ভরে পড়া আরম্ভ করে, বুড়া হঠাৎ সোজা হয়ে বসল—তারপর গেল ক্ষেপে! তখন লিখল জাক্যুজ্ (J'accuse) 'আই একুজ'। 'ফরাসী সরকারকে আমি একুজ করি।'

তারপর কি হল সেটা বলতে গেলে ঐ বইখানা ছাড়িয়ে আরো দুখানা বই লিখতে হয়।

মনে নেই, ক'বছর নির্বাসনের কারাযন্ত্রণা ভোগ করে 'কাঁদানোর' লেখক জোলার কৃপায় ড্রাইফুসের প্রতি সুবিচার হল।

শেষ কথা: বহু বহু প্রকৃত লেখক, চোখের জলের লেখক' নন কিংবা শুধু 'হাসাবার' লেখক নন। দুইই।

তবে কে কোথায় হাসবে, কে কোথায় কাঁদবে, বলা কঠিন। সেই "অরক্ষণীয়া" মেয়েটি যখন পড়ি মরি হয়ে 'সেজেগুজে' কনে দেখবার পক্ষের সামনে বেরুতে যাচ্ছিল তখন একটি ছোট মেয়ে হাসি থামাতে না পেরে বলেছিল, পিসিমা সং সেজেছে।

আমি গ্যা গা। আমি ষোল বছর বয়সে কেঁদেছিলুম॥

৪।১২।৬৫

* বিদ্যাসাগর ছদ্মনামে হাস্য—বরঞ্চ বলা উচিত—ব্যঙ্গ রসও করে গেছেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি সে জন্য নয়। বস্তুত তাঁর সে সব ছদ্মনামে লেখা পুনরায় 'আবিষ্কৃত' হয় বছর বিশ-ত্রিশ পূর্বে।

ছাত্র বনাম পুলিস

(১)

'দেখি! বের করো অভিজ্ঞান-পত্র—আইডেনটিফিকেশন কার্ড!'

কী আর করে বেচারী—দেখাতে হল কার্ডখানা। নামধাম ঠিকানা তো রয়েইছে, তদুপরি রয়েছে বেচারীর ফোটোগ্রাফ, তার নিচে ছোকরার দস্তখত, এবং দুটোর দু'কোণ জুড়ে য়ুনিভার্সিটির স্ট্যাম্প। হোমিওপ্যাথিক পাসপোর্ট আর কি!

হায় বেচারা! যখন য়ুনিভার্সিটিতে প্রবেশ করার ওক্তে সগর্বে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ফোটোগ্রাফের নিচে দস্তখত করেছিলে তখন কি জানতে এটা 'দস্তখত' নয়, এই 'কুকর্ম' করে তার 'দস্ত্' (হাত) 'ক্ষত' হয়েছিল—এ 'পান্'টি আমার নয়, বিদ্যেসাগর মশাইয়ের। তাঁর প্রোতেজে মাইকেল পান করতেন প্রচুর, স্বয়ং বিদ্যাসাগর 'পান্' করতেন অত্যল্পই!

প্রাগুক্ত সরস প্রেমালাপ হচ্ছিল জর্মনির কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পুলিসম্যানে (চলতি জর্মনে 'শুপো')। ছোকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাত দুটোর সময় কাঁকর ছুড়ছিল একটি বিশেষ জানলার শার্সিকে নিশান করে, এবং যেহেতু তৎপূর্বে—অর্থাৎ শনির সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দুটো অবধি চেন-স্মোকারদের মত এ্যাট্টুখানি, মানে ইয়ে, ঐ যাকে বলে বিয়ার—পান করেছিল বলে তাগটা স্বভাবতই টালমাটাল হয়ে পাশের যার-তার জানলার শার্সির উপর পড়ছিল। অবশ্য একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, সে কাপুরুষের মত শুপোর হাতে আত্মসমর্পণ করে নি—আপ্রাণ পলায়ন-প্রচেষ্টায় নিষ্ফল হয়ে তবে ধরা পড়ে।

ব্যাপারটা সবিস্তার কি?

অতি সরল। জর্মন ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী লাভের পূর্বের তিন বৎসর ভূতের মত খাটে। কিন্তু শনির সন্ধ্যা থেকে রবির সকাল পর্যন্ত দল বেঁধে 'পাবে' ব'সে প্রেমসে বিয়ার পান করে। এবং যেহেতু বাড়াবাড়ি না করলে খৃষ্টধর্ম মদ্যপান সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না, তাই কোনো কোনো ধর্মানুরাগী ছেলে ভোর সাতটার 'মেস' (উপাসনায়) যোগ দিতে যায় 'পাব' থেকেই, সোজা গির্জার দিকে—শনির সন্ধ্যা থেকে রবির ভোর ছ'টা, সাড়ে ছ'টা অবধি বিয়ার পান করার পর। অবশ্যই মত্তাবস্থায় নয়—তবে ইংরিজীতে যাকে বলে ঈষৎ মডলিন।

তা সে যাক। এ লেখনের বিষয়বস্তু পুলিস—বনাম স্টুডেন্ট ('স্টুডেন্ট' বলতে জর্মনে একমাত্র য়ুনিভার্সিটি স্টুডেন্টই বোঝায়—স্কুলবয়কে বলে 'শ্যুলার')। এই দুইদলের মধ্যে হামেহাল—অবশ্য সাধারণত সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত এবং বিশেষ করে শনির দিনগত রাতে—একটা অঘোষিত বৈরিতা বিরাজ করছে, য়ুনিভার্সিটি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে। আমি যা নিবেদন করতে যাচ্ছি তার ঐতিহাসিক পটভূমিটি কিন্তু কিংবদন্তীমূলক, অর্থাৎ পুরাণ জাতীয়। সেইটুকু সয়ে নিন। তার পরই মাল।

আমরা সকলেই জানি কতকগুলো উপাধি মানুষের নামের অচ্ছেদ্য অংশ: যেমন (১) রেভারেণ্ড, (২) কর্নেল, বা (৩) ডক্টর (শুধু চিকিৎসক অর্থে নয়; যে কোনো বিষয়ে পি এচ ডি; ডি এস সি জাতীয় ডক্টরেট পাস করা থাকলে)। প্রথম শ্রেণীর উপাধিগুলো বিধিদত্ত, দ্বিতীয়গুলো রাজদত্ত এবং তৃতীয়গুলো য়ুনিভার্সিটি-দত্ত।

রাজাতে চার্চে লড়াই বহু যুগ ধরে চলেছে। এ-লড়াইয়ে শেষের দিকে এলেন য়ুনিভার্সিটি। তার পূর্বে শিক্ষা-দীক্ষার ভার ছিল প্রধানত পাদ্রীদের হাতে। কিন্তু মহামতি লুথারের আন্দোলনের ফলে বহু পিতা পুত্রকে আর 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' যাজক সম্প্রদায়ের কাছে মানসিক, হার্দিক এমন কি আধিভৌতিক উন্নতির জন্য পাঠাতে চাইলেন না। এ ছাড়া আরো বিস্তর কারণ ছিল, কিন্তু সেগুলো এ স্থলে অবান্তর না হলেও নীরস। মোদ্দা কথা, চার্চ ও রাজার লড়াইয়ের মধ্যিখানে য়ুনিভার্সিটিগুলো তক্কে তক্কে রইল আপন আপন স্বয়ংসম্পূর্ণ-স্বাধীনতা-স্বরাজ লাভের জন্য। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল লুথারপন্থী এবং তাদের মূল নীতি ছিল অনেকটা—'যখন পোপের "গুরু-বাদ" ত্যাগ করে স্বয়ং স্বাধীনভাবে বাইবেল পড়তে চাও, এবং তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একমাত্র স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে চাও, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দিতে হবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, (অটোনমাস ইণ্ডিপেনডেন্স)—নইলে তারা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণ করবে কি প্রকারে?'

যে করেই হোক সে স্বাধীনতা য়ুনিভার্সিটি-টাউনগুলোর (অর্থাৎ যে শহরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রধান সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান) রাস্তাঘাটেও সক্রিয় হয়ে উঠলো। অর্থাৎ নিতান্ত খুন, ধর্ষণ জাতীয় পাপাচার না করলে স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ই ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আপন জেলে (?) পুরে দিতো—বিচারের ভার নিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' বা আইন, জুরিসপ্রুডেন্সের প্রফেসরগণ—'ছাত্র আসামী' এঁদের

একজন বা একাধিকজনকে আপন উকীল নিয়োগ করতো—এবং সব-কুছ ফ্রী-গ্র্যাটিস-এ্যাণ্ড-ফর্-নাথিং।

সে সব দিন গেছে। তবু শুনেছি, হাইডলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা অন্য কোনো একটা হতে পারে—আমার ঠিক মনে নেই—জেলখানাটি নাকি এখনো মিউজিয়ামের মত বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এবং সেটি নাকি সত্যই দ্রষ্টব্য বস্তু।

যে-পাঠক বাঙলা ভাষার অতুলনীয় (আমার মতে বাঙলা ভাষায় অদ্বিতীয়) পুস্তক, উপেন বাঁড়ুয্যের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পড়েছেন, তিনি হয়তো স্মরণে আনতে পারবেন (আমিও স্মৃতির উপর নির্ভর করে বলছি; তাই ভুলচুক হবে নিশ্চয়ই, এবং তার জন্য মাফ চাইছি) যে, যখন অরবিন্দ-বারীন-উল্লাস-উপেন-কানাই-সত্যেন এট আল্-এর বিরুদ্ধে আলীপুরে বোমার মামলা হয় তখন হাজতে থাকাকালীন ছোকরাদের মধ্যে যাদের অদম্য কবিত্বপ্রকাশব্যাধি ছিল তারা লেখনীমস্যাধারাভাবাৎ কাঠকয়লা দিয়ে দেয়ালে পদ্য লিখত। তারই একটি,

'ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোনার বরণ হৈল কালি
প্রহরী যতেক ব্যাটা বুদ্ধিতে তো বোকা-পাঁঠা
দিনরাত দেয় গালাগালি।'

যতদূর মনে পড়ছে, 'উপীন'বাবু যেন মুচকি হেসে মন্তব্য করছেন, আহা কী 'সোনার বরণ'ই না বঙ্গসন্তানের হয়!

তারপর যা লিখছেন তার সারমর্ম; মাঝে মাঝে দু'একটি ভালো কবিতাও চোখে পড়ত। উদাহরণ-স্বরূপ দিয়েছেন,

'রাধার দুটি রাঙা পায়ে
অনন্ত পড়েছে ধরা,
ওঠে ভাসে কত বিশ্ব
চিদানন্দে মাতোয়ারা।'

এবারে তিনি যেন তাঁর চোখে একফোঁটা জল আসতে না আসতে দুঃখ করছেন, হায় রে মানুষের মন! কারাগারের পাষাণ প্রাচীরের ভিতরেও রাধার দু'টি রাঙা পায়ের জন্য সে আছাড় খায়।*

* অধীন পারতপক্ষে আপন বইয়ের বরাত দেয় না, কিন্তু এ-স্থলে নিতান্তই বাধ্য হয়ে নিবেদন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র (বেঙ্গল পাবলিশার্স) উপর মল্লিখিত প্রশস্তি ময়ূরকণ্ঠীতে (বেঙ্গল—প্রকাশভবন) পশ্য। তবে অনুরোধ এই, মূল বইখানা প্রথম পড়বেন। তারপর আমার বই পড়ার প্রয়োজন আশা করি আর হবে না।

*　　　　*　　　　*

জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন যুগের আপন জেলখানার কথা হচ্ছিল। তার অন্যতম প্রাচীনতমের নিঃসন্দেহ সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন মার্ক টুয়েন্। সে বর্ণনাটি এমনই সব-জাতের-বাড়া চৌম্বকীয় আকর্ষণীয় বর্ণনা যে তারই টানে আমারই চেনা এক সহযাত্রী জর্মন-সীমান্তে পৌঁছেই নাক-বরাবর চলে যান ঐ জেল দেখতে—সাঁ সুসি প্রাসাদ, ড্রেসডেনে সঞ্চিত রাফায়েলের মাদোন্না নস্যাৎ করে।

আলীপুরের যেসব 'কবিরা' প্রহরীকে পাঠা নাম দিচ্ছেন, কিংবা চোখ বন্ধ করে রাধার দুটি রাঙা পায়ের ধ্যানে মজে গেছেন, তাঁরা কিন্তু বিলক্ষণ জানতেন, তাঁদের জন্য মৃত্যু জেলের চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে—শহীদ হওয়ার সম্ভাবনা কবি, অকবি সকলেরই প্রায় সমান। কিন্তু জর্মন-বিশ্ববিদ্যালয়-জেলে ছাত্রেরা যেত অল্প কয়েক দিনের জন্য, ফাঁসীর তো কথাই ওঠে না। তাই মার্ক টুয়েনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে অপূর্ব হাস্যরসে রঞ্জিত করে সেই জেলটির বর্ণনা দেবার। কাজেই উপস্থিত আলীপুরের কথা ভুলে যান।

*　　　　*　　　　*

বিশ্ববিদ্যালয়ের জেলে ফাঁসি-কাঠ না থাকতে পারে, ক্যাবারে-কাঁ কাঁ'র ব্যবস্থা না থাকতে পারে, কিন্তু লেখনী-মস্যাধারের অভাব।—এটা কল্পনাতীত। যদিস্যাৎ ঐ জর্মনীরই সর্বোৎকৃষ্ট দশ লিটার বিয়ার প্রসাদাৎ কল্পনাটা করেই ফেলি, তখন চোখের সামনে, বিকল্পে ভেসে উঠবে পেন্‌সিল্—এ-কথা তো ভুললে চলবে না, এদেশের কেতাবপত্রে মহামান্য কাইজারের (ভারতীয় কাইসর-ই-হিন্দ পদক, লাতিন সীজার ইত্যাদি) নাম পড়ার বহু পূর্বেই ভারতীয় ছেলেবুড়ো ব্যবহার করেছে,

Koh-i-noor made by L. & C. Hardmuth in Austria, graphite* drawing pencil, compressed lead.

তাই সেই পেনসিল অকৃপণ হস্তে ব্যবহৃত হয়েছে ছাত্র-'কয়েদী'র দল দ্বারা বংশপরম্পরায়—সাদা দেওয়ালের উপর। শুধু কবিতা না বহুবিধ অন্যান্য চীজ্।

কিন্তু তৎপূর্বে তো জানতে হয়, এরা জেলে আসতো কোন্ কোন্ 'অপরাধ' করে। এর অনেকগুলোই আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এবং সাতিশয় সন্তোষ সহকারে

* এসব বাবদে জর্মনী অস্ট্রিয়া একই ধরা হয়। হিটলার নিজে অস্ট্রিয়ান হয়েও জর্মনীর ফুয়েরার হয়েছিলেন, এ সব তো জানা কথা ; উভয় দেশের ভাষাও এক।

স্বীকার করছি, সবল সক্রিয় হিস্সেদারও হয়েছি বহু ক্ষেত্রে—অর্থাৎ স্টুপো-স্টুডেণ্টেন, পুলিস ভর্সস্ ছাত্র 'যুদ্ধে'—কিংবা যুদ্ধ আসন্ন দেখে দ্রুততম গতিতে পলায়নে। কিন্তু সেটা অন্য অধ্যায়।

(২)

'পাজীটা এখনো এল না যে, ব্যাপারটা কি? বলেছিল না, তার কাকা আসছে ডানৎসিগ থেকে, ওর [redacted] নিয়ে আসবে কয়েক বোতল অত্যুৎকৃষ্ট ডানৎসিগারগোল্ট্-ভাসার্ (ডানৎসিগের স্বর্ণবারি—সোনালী সোমরস), আমরা সবাই হিস্সে পাবো।'

'একটা ফোন করলে হয় না?'

'হুঁ। সেই আনন্দেই থাকো! টেলিফোন! বুড়ির বাড়িতে এখনো দড়ি টেনে ভিতরের ঘণ্টা বাজাতে হয়। ইলেকট্রিক বেল্ পর্যন্ত নেই। তবে, হ্যাঁ, গার্ল ফ্রেণ্ডদের যখন তখন আপন কামরায় নিয়ে যেতে দেয়। তদুপরি বুড়ি বদ্ধ কালা। শুনেছি, পায়ের উপর গরম ইস্ত্রিটা হঠাৎ হাত থেকে ফসকে পড়ে গিয়েছিল—শুনতে পায় নি।'

রসালাপ হচ্ছিল শনির সন্ধ্যায় 'পাব' এ। জনসাতেক মেম্বর জমায়েৎ হয়ে একটা গোল টেবিল ঘিরে বিয়ার পান করছেন। সেটার উপর কোনো টেবিল ক্লথ নেই: আছে গত একশ বছরের স্টুডেণ্ট খদ্দেরদের নাম, যারা প্রতি শনিবারে এই টেবিলটা ঘিরে গুলতানি করেছে—ছুরি দিয়ে খোদাই করা। আমাদের দলের বাপ ভিল্ হেল্মের নামও এই টেবিলে আছে। সমস্ত টেবিলটা নামে নামে সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গিয়েছে—আর নূতন নাম খোদাই করার উপায় নেই।

এদের গুলতানির বর্ণনা বা ইতিহাস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ সবাই জানেন, সেই সোক্রাতেসের যুগ থেকে ইয়োরোপের গুণীজ্ঞানী থেকে চোর-চোট্টা সবাই মদ্যালয়ে বসে বিশ্রম্ভালাপ করেছেন, এবং সহজেই অনুমেয়, চোর-চোট্টারা প্লাতোর 'আইডিয়া'র সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে ছোরাছুরি করে নি, আর সোক্রাতেস প্রতিবেশীর তালাটি কি প্রকারে নিঃশব্দে বে-কার করা যায় তাই নিয়ে মদ্যপান করতে করতে শিষ্যদের সঙ্গে কূট ষড়যন্ত্রে ত্রিযামা যামিনী যাপন করেন নি। অর্থাৎ যে যার বৈদগ্ধ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, যাতে তার চিত্তাকর্ষণ তাই নিয়ে কথাবার্তা কইতে ভালোবাসে। তবে হ্যাঁ, মদ্যপানের মেকদার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু যে ঈষৎ নিম্নস্তরে নেমে যায় সেটা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। জর্মনির স্টুডেণ্টদের বেলায়ও তাই।

আমার ছিল মেজাজমর্জি অত্যন্ত খারাপ। ঠিক সেদিনই খবর পেয়েছি ইংরেজ গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডকে তালাক দিয়েছে। তারই ফলে আমার ফুল্লে বচ্ছরের খরচার জন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার এক-তৃতীয়াংশ (বেশী হতে পারে, কমও হতে পারে, এতকাল পর সঠিক বলা কঠিন) কর্পূর হয়ে গেল। অর্থাৎ এখন যে য়ুনিভার্সিটি রেস্তোরাঁর সবচেয়ে সস্তা ডিনারটি (সে যুগে দাম ছিল এদেশী পয়সায় ফুল্লে বারো আনা) খাবো, তারো উপায় রইল না। কাল সন্ধ্যা থেকে রাত্তিরের খাওয়াটা নিজেকেই রাঁধতে হবে। ওদিকে দেশের ইয়াররা ভাবছেন, 'লেখাপড়ায় আস্ত একটা গর্দভ ঐ ছেলে জর্মনি গিয়ে তোপা মজাটা লুটে নিলে, মাইরি!'

ইতিমধ্যে এসব 'পাবে' শনির সন্ধ্যায় যা-সব হয় সে-সবই হয়ে গেছে। ঠেলায় করে গরম গরম সসেজ এসেছে দু'চারটে আনাড়ি বাজিয়ে ব্যাঞ্জোর উপর উৎপাত করে যৎসামান্য কামিয়ে গিয়েছে, পিকচার পোস্টকার্ড জুতোর ফিতে বিক্রির ছলে ভিখিরি তার রোঁদ মেরে গেল।

করে করে রাত একটা বাজলো। বিস্ময়বোধক চিহ্ন দেবার জন্য ঐ চিহ্নেরই বিন্দুটির বিন্দুবৎ প্রয়োজন নেই। শনির রাত্রি জর্মনিতে আরম্ভ হয় বারোটায়—যদ্যপি গ্রিনিজ কয়তা ঝাড়ে ঐ সময়টায় নাকি তার পরের দিন আরম্ভ। কিন্তু রাত একটার পর সাধারণ মদ্যালয় বন্ধ। এর পর করা যায় কি? আমি বিশেষ করে তাদেরই কথা ভাবছি যাদের তখনো তেষ্টা মেটে নি—জর্মনদের বিশ্বাস তারা বিয়ার পান করে তৃষ্ণা নিবারণার্থে। সাধারণ মদ্যালয় যখন বন্ধ তখন খোলা রইল অসাধারণ মদ্যালয়। সেগুলো একটু ইয়ে অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর মহিলায় ভর্তি আর কি। তবে স্টুডেন্টরা দল বেঁধে যখন সেখানে ঢুকে আপন গাল্‌গল্পে মত্ত হয় তখন ঐ পূর্বোক্ত 'ইয়েরা' ওদের জ্বালাতন দূরে যাক্—ডিস্টার্বও করে না। ওদের পকেটে আছেই বা কি?

ইতিমধ্যে সেই যে আমাদের টেওডর যাকে নিয়ে কাহিনী পত্তন করেছি, তার হঠাৎ পুনরায় শোক উথলে উঠলো ঐ ডানৎসিগ নগরীর প্রখ্যাত স্বর্ণবারির জন্য। বার বার বলে, 'দেখলে ব্যাটার কাণ্ডখানা! রাত একটা তক্ আমাদের বসিয়ে রাখলে একটা সুরালয়ে—যখন কিনা প্রত্যেক বাপের প্রত্যেক সুপুত্তুরের কর্তব্য আপন আপন সুনির্মিত স্নেহময় নীড়ে নিদ্রাদেবীর শান্ত্যঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া।'

কে একজন বললে, 'এই খানিকক্ষণ আগেই না তুইই বললি, পেটারের বাড়িটা আসলে অ্যাডাম এবং ঈভ তৈরী করেছিলেন। ঝুরঝুরে থুরথুরে?'

টেওডরের কিন্তু তখন কারো টিপ্পনীতে কান দেবার মত মরজি নয়—সে তখন

মৌজে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, যেন এক নবীন রিলেটিভিটি আবিষ্কার করার উৎসাহ দেখিয়ে বললে, 'আর পেটার ব্যাটা নিশ্চয়ই আরামসে ঘুমুচ্ছে। চলো, ব্যাটাকে গিয়ে জাগানো যাক্।'

এস্থলে কারো পক্ষে রণে ভঙ্গ দেওয়া জর্মন-স্টুডেন্ট-মনু-শাস্ত্রে গোমাংস ভক্ষণের চেয়েও গুরুতর পাপ। তুমি তা হলে আস্ত একটা কাপুরুষ! পুলিসকে—অর্থাৎ দুশমনকে—ডরাও। তোমার কলিজা বক্‌রির, তোমার সীনা চিড়িয়ার। অতিষ্ঠ হয়ে আপনি শুধোবেন, 'রাত্রি একটাই হোক্, আর তিনটেই হোক্, কেউ কাকে জাগালে পুলিসের পূর্বতর অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের কিবা ক্ষতিক্ষয়, জখম-লোকসান? ওদেশে কি রেতে-বেরেতে টেলিগ্রাফ পিয়ন আসে না?'

দাঁড়াও পাঠকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এসব ক্রমশ প্রকাশ্য।

বলা বাহুল্য রাত তেরোটার সময়—গ্রিনিজ যদিও সেটাকে দিবাভাগ বলেন—আপনি যদি বাড়ির, অবশ্য অন্য বাড়ির, দোস্ত দুশমন—যে-ই হোক্ কাউকে জাগাবার চেষ্টা করেন, তা সে সীমেন-হালেস্কে-শুকের্টের নব্যতম বিজলি-বেল্ বাজিয়েই হোক, আর পৌরাণিক যুগীয় ঘণ্টাকর্ণ কানে যে-ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতো যাতে করে সে তার জন্মবৈরী শ্রীহরির নাম-কীর্তন শুনতে না পায়—সেই ঘণ্টাটিই বাজান, বাড়িউলী যখন দরজা খুলে শনির রাতে ঐ জবাকুসুমসঙ্কাশ টেওডরের নয়নযুগল দেখতে পাবে—আমরা আর-সবাই না হয় পাশের গলিতে গা-ঢাকা দিয়েই রইলুম—তখন তার কণ্ঠ থেকে—ভুল বললুম, নাভিকুণ্ডলী থেকে যেসব মুরজ-মুরলীধ্বনি বেরুবে তার ঈষদ্ভগ্নাংশ শুনতে পেলে, ঐ যে খানিকক্ষণ আগে কি-সব 'ইয়েদের' কথা বলছিলুম তারা পর্যন্ত লোকের সামনে লজ্জা পাবে। অতএব ঐ কবোষ্ণ অন্ধকারেও আমাদের কাছে জাজ্বল্যমান হল যে ফ্রন্টাল এটাকের স্ট্রাটেজি বিলকুল আউট্ অব্ ডেট্।

আমাদের হস্তে তৎসত্ত্বেও আশার একটি ক্ষীণ প্রদীপ মিদির্ মিদির্ করছে। পেটারের কামরাটা দোতলায়, এবং একদম রাস্তার উপরে। অতএব আমরা সেদিক বাগে যেতে যেতে হেথাহোথা ক্ষুদ্রাকারের নুড়ি, কাঁকর, সোডার ছিপি ইত্যাকার মারণাস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে পৌঁছলুম পেটারালয়ে—বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথ দুর্গম নির্জন পেরিয়ে।

পেটার থাকে মাউস কাভে (সার্থক নাম, বাবা—'ইঁদুরের পথ!')।

টেওডরই আমাদের হিণ্ডেনবুর্গ বলুন, লুডেনডর্ফ বলুন, আমাদের রাইষ মার্শাল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যদিও সে পেটারের ঘরে আসে সপ্তাহে

নিচ্ছেন দশদিন, তবু তার জানলা যে ঠিক কোন্‌টা সেটা ঠাহর করতে পারছে না—আশা করি তার কারণ আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। অবশেষে হান্‌স্‌-ই লোকেট্‌ করলে জানলাটা। হান্‌স্‌ বটনির ছাত্র—পেটারের জন্মদিনে তাকে একটা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ সাতিশয় বিরল ফণীমনসা উপহার দেয়। একটা জানলার বাইরের চৌকাঠ-পানা ফালি কাঠের উপর হান্‌স্‌ সেটি আবিষ্কার করলে—রাত্রের হিম খাওয়াবার জন্য পেটার সেটি ঐ সিল্‌ না লেজ্‌ কি যেন বলে ইংরিজীতে—তারই উপর রেখে দিয়েছিল। কালিদাসের যুগে দ্বারে আঁকা থাকতো ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন যেমন শঙ্খচক্র—হেথায় কেক্‌টাস্‌।

পয়লা রৌণ্ডে টেওডর ছুঁড়ে মারল সোডার ছিপি। লাগলো গিয়ে ডানপাশের জানলাটায়। আমরা ফিসফিস করে পেটারকে সাবধান করতে কসুর করি নি, কিন্তু কেবা শোনে কার কথা, সে তখন জাঁদরেল জনরৈল সিং, আমরা নিতান্ত ডালভাত দাবাখেলার বড়েপেয়াদা। দুসরা রৌণ্ডে টেওডর বোধহয় 'ফইর' করেছিল একটা স্নো কৌটোর ঢাকনা। এটা ধন্‌-ন্‌-ন্‌ করে গিয়ে লাগলো বাঁ-পাশের জানলাটায়। আমরা তাকে কিছু বলতে যেতেই সে ধমক দিয়ে বললে, 'চোপ! এই হল আর্টিলারির আইন। প্রথম মারবে তাগের চেয়ে দূরে, তারপর তাগের চেয়ে কাছে, শেষটায় ম্যাথম্যাটিকলি মেজার করে ঠিক মধ্যিখানে।' হবেও বা। ও তো প্রাশান য়ুংকার ঘরের ছেলে—জানার কথা। এবং আমাদের তুলনায় তার পকেট-শস্ত্রাগার পরিপূর্ণ। কারণ আমরা জর্মনীর ধোপ-দুরস্ত রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি কীই বা এমন কামান ট্যাঙ্ক। পক্ষান্তরে যুযুধান টেওডর ঘিনপিৎ উপেক্ষা করে 'পাবের' সামনের 'বিন্‌' থেকে মেলা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছে। তাই এবারে ছুঁড়লে ছোট্ট একটি মার্কিং ইঙ্কের খালি শিশি। লাগলো গিয়ে তেতলার একটা জানলায়। তখন বুঝতে পারলুম জর্মনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কেন জিততে পারে নি। দ্বিতীয়টা তখনো হয় নি। সে সময় হিট্‌লার যদি আমাকে কন্‌সল্‌ট করতো তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে বারণ করে দিতুম—বিশেষত এই অভিজ্ঞতার পর।

তার চেয়েও পষ্ট বুঝতে পারছি, টেওডর এখন যে অবস্থায় পৌঁচেছে সেখানে আপন নাক চুলকোতে চাইলে গুত্তা মারবে পিঠে। কিন্তু সে-তত্ত্বটি তখন তাকে বলতে গেলে সেই সুপ্রাচীন জর্মন কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র; এক মাতাল রাত চৌদ্দটায় বাড়ি ভুল করে বার বার চেষ্টা করছে চাবি দিয়ে সদর দরজা খোলবার এবং সঙ্গে সঙ্গে কটুকাটব্য। সেই শব্দে শেষটায় দোতলায় একজনের ঘুম ভেঙে গেল। নিচের দিকে মাতালকে দেখে বললে, 'হেই, তুমি ভুল বাড়ির

তালা খোলবার চেষ্টা করছো।' মাতাল উপরের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললে, 'হে হে হে হে! তুমিই ভুল বাড়িতে ঘুমুচ্ছো।'

এই একতরফা লড়াই—আইনে যাকে বলে ইন্ আবসেন্‌শিয়া—কিংবা বলতে পারেন ডন্ কুইকসটের জল-যন্ত্র-আক্রমণ আধঘণ্টাটাক চলার পর টেওডর ছাড়লে —বলতে গেলে তার প্রায় শেষ সিক্‌স্ পৌণ্ডার—সার্ডিনমাছের খালি একটা টিন। ঝন্‌ঝন্ করে শব্দ হল। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল সে যেন ওস্তাদ এনায়েৎ খানের সেতার—কারণ সঙ্গে সঙ্গে সব-কিছু ছাপিয়ে কানে গেল পুলিসের ভারি ভারি বুটের শব্দ। এটা হল কি প্রকারে? সচরাচর শানবাঁধানো রাস্তার উপর রোঁদের পুলিসের বুটের শব্দ সেই নিঝুম নিশীথে অনেক দূরের থেকে শোনা যায়, এবং টেওডর ছাড়া আমাদের আর সকলের আধখানা কান খাড়া ছিল তারই আশঙ্কায়। অতএব দে ছুট, দে ছুট! কোন্ মূর্খ বলে যুদ্ধে পলায়ন কাপুরুষের কর্ম! ইংরেজ আফ্রিদীদের সঙ্গে যুদ্ধে পালালে পর এ-দেশের জোয়ানদের বুঝিয়ে বলতো, 'এর নাম বাহাদুরীকে সাথ্ পিছে হঠনা!'

কিন্তু ছুটতে ছুটতে আমি শুধু ভাবছি, এতগুলো বুটের শব্দ একসঙ্গে হল কি করে? রোঁদে তো বেরোয় প্রতি মহল্লায় হার্টের, sorry, হার্টলেস্, সিংগ্‌লটন! তা সে যা-ই হোক, এখন তো প্রাণটা বাঁচাই।

পূর্বেই বলেছি, পেটারের গলিটার নাম মূষিকমার্গ। আসলে কিন্তু বন্ শহরের আঁকাবাঁকা হাঁসুলি বাঁকের মোড়, পায়ের 'বেঁকি'-গয়নার প্যাঁচ-খাওয়া আড়াই বিঘৎ চওড়া নিরনব্বুইটি 'রাস্তাকেই' মূষিকমার্গ বলা যেতে পারে—তার জন্য কল্পনাশক্তিটিকে বহু সুদূরে সম্প্রসারিত করতে হয় না।

কিন্তু একটি তত্ত্ব সর্বজনবিদিত। এই গলিঘুঁচি কোথায় যে হঠাৎ বেঁকে গেছে, কোথায় যে রাস্তার, এক পাশে বহু প্রাচীনকালেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত একটি কারখানার অন্ধকার অঙ্গনে অশরীরী হওয়া যায়, অর্থাৎ লুকানো যায় (হংসমিথ্‌নের কথা অবশ্য আলাদা), কোথায় যে একটা গারাজের আংটাতে পা দিয়ে সামান্য তকলিফেই ছাতে ওঠা যায়, এ সব তথ্য পুলিস যতখানি জানে আমরাও ঠিক ততখানিই জানি। এমন কি লেটেস্ট খবরও আমরা রাখি: অমুক দেউড়ির ঠিক সামনের রাস্তার বাতিটি বরবাদ হয়ে গিয়েছে, এখনো মেরামত হয় নি, কিংবা অমুক জায়গায় পরশুদিন থেকে এক ডাঁই পিপে জুটেছে—পিছনে দিব্য অন্ধকার। অর্থাৎ পুলিস তার আপন হাতের তেলো যতখানি চেনে, আমরাও আমাদের তেলো ততখানিই চিনি।

মূষিকমার্গ ধরে খানিকটে এগোলেই সেখানে তেরাস্তা। আমাদের স্ট্র্যাটেজি অতি সনাতন, সুপ্রাচীন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'দিকে ছুট লাগালাম। আবার তেরাস্তা পেলে আবার দু' ভাগ হয়। ধরা যদি পড়িই তবে দলসুদ্ধ ধরা পড়বো কেন? এবং যুদ্ধের নীতিও বটে, 'আক্রমণের সময় দল বেঁধে; পলায়ন একলা-একলি।' খুদে বন্ শহরে পুলিস গিস্ গিস্ করে না—আর এই রাত্ত চোদ্দটায় ফাঁড়ি-থানা ক'টাই বা স্পেয়ার করতে পারে? কাজেই প্রতি তেরাস্তায় তারা যদি আমাদেরই স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে তবে তাদের 'মেন পাওয়ার' কম বলে, কয়েকটা রাস্তা কোলো অপ্ করতে পারবে না বলে শেষ পর্যন্ত হয়তো কেউই ধরা পড়বে না। কিন্তু এই 'শুপো' নন্দনগণ ঘড়েল। এবম্প্রকার বহু যুদ্ধে তারা জয়ী এবং পরাজয়ী হয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সেটা তাদের শেখায় অন্য স্ট্রাটেজি।

পাঠক, তুমি কখনো পোষা চিতে বাঘ দিয়ে হরিণ-শিকার দেখেছ? না-দেখারই সম্ভাবনা বেশী, কারণ সেই রাজারাজড়াদের আমলেও এ খেলাটি অস্মদ্দেশে ছিল বিরল। আমাকে দেখিয়েছিলেন বরোদার বুড়ো মহারাজ।

মহারাজার খাস রিজার্ভ ফরেস্টে ছিল বিস্তর হরিণ। তাদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হত একটা পোষা, ট্রেন্‌ড্ চিতে বাঘ। বাঘ দেখা মাত্রই হরিণের পাল দে ছুট দে ছুট। এবং মাচাণ্ডের উপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, একটু সুবিধা পাওয়া মাত্রই তারা দু'ভাগ হয়ে গেল, তার পর আবার দু'ভাগ, ফের দু'ভাগ—ক'রে ক'রে হরিণের পাল আর পাল রইল না, হয়ে গেলো চিত্তিরমিত্তির।

কিন্তু আমাদের নেকড়ে মহাশয়টিও অতিশয় সুবুদ্ধিমান। এ ভাগ, ও ভাগকে খামোখা তাড়া করে সে বর্বরস্য শক্তিক্ষয় করলো না। সে প্রথম থেকেই ভাগ করে নিয়েছে একটা বিশেষ হরিণ। প্রতিবারে পাল যখন দু'ভাগ হয়, তখন সে ঐ বিশেষ হরিণটার ভাগেরই পিছন নেয়। পরে চিতার ট্রেনার আমাকে বলেছিল, 'সব চেয়ে যে হরিণটা ধুমসো, চিতে সব সময়ই একমাত্র ঐটের পিছু নেয়—এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে শক্তিক্ষয় করে না, কারণ চিতে জানে ঐটেই হাঁপিয়ে পড়বে সকলের পয়লা। ধরতে পারলে পারবে ঐটেকেই—সব সময় যে পারে তাও নয়।'

বন্ শহরের শুপো সম্প্রদায় ঠিক তাই করলে। আমাদের মধ্যে যে দুটি ছিল সবচেয়ে হোঁৎকা ওরা প্রতি দু'ভাগ হওয়ার সময় ওদেরই পিছু নিল। শেষটায় ধরতে পেরেছিল অবশ্য একজনকে। সে কিন্তু টেওডর নয়, এবং জস্ট্ টু কীপ

কম্পানি, ছুঁড়ে ছিল মাত্র নিতান্ত খুদে দু' চারটি কাঁকর। তার কথাই আপনাদের খেদমতে ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

আগের জমানায় পুলিস তাকে দিয়ে দিত য়ুনিভার্সিটির হাতে—সে যেত য়ুনিভার্সিটির জেলে। শুনেছি, এস্তেক স্বয়ং প্রিনস আউটো এডওয়ার্ড লেওপোল্ড ফন্ বিস্‌মার্ক অবধি গেছেন। এবং সে তখন জেলেদের দেয়ালের উপর পেন্সিলযোগে আপন জিঘাংসা, কিংবা অনুশোচনা, কিংবা মধ্যিখানে, কিংবা কটুবাক্য—যথা যার অভিরুচি—কভু গদ্যে কভু ছন্দে, সেও কী বিচিত্র, কখনো আলেকজেনড্রিয়ান কখনো—সে কথা আরেক দিন না হয় হবে—লিখতো ; আমার আমলে আমাদের যেতে হত শহরের জেলে—একদিনের তরে (সেও এক মাসের ভিতর দিনটা বাছাই করে নেওয়া 'আসামীর' এক্তেয়ারেই ছেড়ে দেওয়া হত, বাইরে থেকে আপন খানা আনানো যেত, এবং যেহেতু যেসব সহযুযুধানবর্গ সে যাত্রায় পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা নেমকহারাম নন, তাঁরাই চাঁদা তুলে উত্তম লঞ্চ ডিনার বাইরে থেকে পাঠাতেন) ; কিংবা (ভারতীয় মুদ্রায়) সোয়া তিন টাকা জরিমানা দান—যথা অভিরুচি।

কিন্তু প্রশ্ন, এতগুলো পুলিস সে রাত্রে হঠাৎ এক জোট হল কি করে ?

খাঁটি বন্‌-বাসিন্দারা আমাদের যুদ্ধে নিরপেক্ষ। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট কাঁকর বা সোডার ছিপি যদি তার জানলায় লেগে গিয়ে তার নিদ্রাভঙ্গ করে তবে সে জানলা খুলে কটুবাক্য আরম্ভ করার পূর্বেই আমরা অকুস্থল ত্যাগ করি। কেউ কেউ আবার হঠাৎ এক ঝটকায় জানলা খুলে আমাদের মাথার উপর ঢেলে দেয় এক জাগ্‌ হিমশীতল জল। আমরা অবশ্য এ জাতীয় অহেতুক উপদ্রবের জন্য সদাই সতর্ক থাকি।

কিন্তু আজ ছিল আমাদের পড়তা খারাপ। টেওডরের সকলের পয়লা বুলেট, বা সোডার ছিপি, যাই বলুন, পড়ে একদম পাশের ফ্ল্যাটে এক নবাগত বিদেশীর জানালায়—কেন যে বিদেশীগুলো বন্‌-শহরটাকে বিষাক্ত করার জন্য আসে, আল্লায় মালুম—সে কিন্তু জানতো, বন্‌ শহরের খাস বাসিন্দারা এই (যোর্‌ দেন্‌) হান্‌ড্রেড্‌ ওয়্যারে ভদ্র সুইটজারল্যাণ্ডের মত সেই যুদ্ধারম্ভের রাত্রি থেকেই নিরপেক্ষ, জোর কটুকাটব্য (অর্থাৎ ডিপ্লোমাটিক প্রটেস্ট)। কিংবা এক জগ্‌ জল। তা সে এমন কীই বা অপকর্ম ? ইয়োরোপীয়রা তো চান করে একমাত্র যখন জাহাজ-ডুবি হয়। জল ঢেলে সে তো পুণ্য সঞ্চয় করলো, ডাক্তারদের শ্রদ্ধাভাজন হল। কিন্তু আজকের এই বিদেশী পাপিষ্ঠটা কটুবাক্য করে নি, জল ঢালে নি, করেছে কি, সে-

ফ্ল্যাটে কোন ছিল বলে চুপিসারে ফাঁড়ি-থানাকে জানিয়ে দিয়েছে। ওদিকে আবার ইয়ার টেওডরের অশুনস্তি সখা এই শহরে। এবং বছর দুই ধরে সে প্রাগুক্ত পদ্ধতিতে শহরের এ-মহল্লায়, ও-মহল্লায় শনির রাত্তে—এবং সেটা যত গভীর হয় ততই উম্‌দা—আজ একে, পরের শনিতে অন্যকাউকে জাগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পুলিস বিস্তর গবেষণার পর লক্ষ্য করলো যে সর্বত্রই ওয়ার্কিং মেথড বা মডুস অপেরান্ডি হুবহু এক—বড় বড় ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা যে রকম পুলিসের এই জাতীয় গভীর গবেষণার ফলেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। তাই তারা সেই ডেঞ্জরস্‌ ক্রিমিনাল টেওডরের প্রতীক্ষাতেই ছিল।

আর আপনাদের সেবক এই অধম? সে কি কখনো ধরা পড়েছিল?

(৩)

অধীর পাঠক! শান্ত হও, তোমার মনে কি কুচিন্তা সে আমি জানি; ইতিমধ্যে ঐ বাবদে দু'খানা চিঠিও পেয়েছি, আমার কিন্তু-কিন্তু ভাবটা যাচ্ছে না। আমি জানি, তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, তাই জানতে চাও আমি কখনো ধরা পড়ে শ্রীঘরবাস করেছিলুম কি না। আমার সে 'দুরাবস্থা'র* বর্ণনা শুনে তোমার হৃদয়মনে কোন্‌ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হবে সেই নিয়ে আমার দুর্ভাবনা। তাহলে একটি ছোট্ট কাহিনী দিয়ে আমার সঙ্কোচটা বোঝাই।

মাত্র কয়েকদিন আগে, এই ১৬ই অগ্রহায়ণ, আমরা স্বর্গত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন পালন করলুম। এঁর বহু বহু সদ্‌গুণ ছিল, তার অন্যতম, তিনি নিজে সাহিত্য নাট্য সৃষ্টি করুন আর নাই করুন সে যুগের সবাই মেনে নিয়েছিলেন যে তাঁর মত শাস্ত্রজ্ঞ রসজ্ঞ জন বাঙলাদেশে বিরল—এবং শুদ্ধমাত্র রসজ্ঞ হিসাবে অদ্বিতীয়। তাই কাঁচা পাকা সর্ব লেখকই তাঁকে তাঁদের বই পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। ওদিকে গুরুদাস ছিলেন কর্মব্যস্ত পুরুষ। সেই ডাঁই ডাঁই বই পড়ে স্বহস্তে উত্তর লেখার তাঁর সময় কই? তাই একখানা পোস্টকার্ডে যা ছাপিয়ে নিয়েছিলেন তার মোটামুটি মর্ম এই:—'মহাশয়, আপনার পাঠানো পুস্তকের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি উহা মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি। সত্য বলিতে

* এ-যুগের ছেলে-ছোকরারা বিদ্যেসাগর পড়ে না ব'লে বলতে দোষ নেই যে একদা এক পিতা-পুত্র বিদ্যেসাগর মশায়ের কাছে তাদের দুঃখের কাহিনী শেষ করলে এই বলে, 'আমাদের দুরাবস্থাটা দেখুন।' বিদ্যেসাগর নাকি মুচকি হেসে বললেন, 'তা সেটা আকার (আ-কার) থেকেই বুঝতে পারছি।'

কি পড়িতে পড়িতে—' এখানে এসে থাকতো একটা লম্বা লাইন, এবং তার উপরে ছাপা থাকতো, 'হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই' এবং লাইনের নিচে ছাপা থাকতো 'অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।' তিনি নাকি পাঠানো বইখানা পড়ে যথোপযুক্ত-ভাবে হয় লাইনের উপরের 'হাস্য সম্বরণ' বা নিচের 'অশ্রু সম্বরণ' কেটে দিতেন। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু, তাই নিশ্চয়ই কোনো বদরসিক কাহিনীটির সঙ্গে আরো জুড়ে দিত যে, অধিকাংশ স্থলেই তিনি নিজে বইখানি পড়তেন না, তাঁর সেক্রেটারি সেটি পড়ে বা না পড়ে উপরের 'হাস্য' কিংবা নিচের 'অশ্রু' কেটে দিত।*

তাই আমার কিন্তু-কিন্তু, তুমি লাইনের উপরের না নিচের, কোন বাক্যটি কাটবে—আমার কাহিনী শুনে। তা সে যাক্‌গে, বলেই ফেলি। কোন্ দিন আবার ভুম করে মরে যাবো।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, চিতে বাঘ হরিণের পালের গোদাটাকেই সব সময় ধরবার চেষ্টা করে তারই পিছনে ধাওয়া করে যখন সব কটা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে—শহরের পুলিসও ঠিক সেই রকম আমাদের মত 'পিশাচ-সম্প্রদায়ের' সব চেয়ে হোঁৎকাটাকেই ধরবার চেষ্টা করতো, আমরা যখন তাড়া খেয়ে হরিণের টেকনীকই অনুসরণ করে ইদিকের ওদিকের গলিতে ছড়িয়ে পড়তুম। কিন্তু কিছুদিন পরে আমরা লক্ষ্য করলুম, একই গোদাকে বারবার শিকার করে পুলিস যেন আর খাঁটি স্পোর্টসম্যানের নির্দোষানন্দ লাভ করছে না। তখন তারা দুসরা কিংবা তেসরা মোট্‌কাটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদেরও ট্রেনিং হচ্ছে, আম্মোগোরও। কখনো তারা জেতে, কখনো আমরা জিতি। সেই যে গুলিখোর শিকারী বয়ান দিচ্ছিল, 'তারপর আমি তো ফাইর করলুম বন্দুক, আর কুত্তাকেও দিলুম শিকারের দিকে লেলিয়ে। তারপর বন্দুকের গুলি আর কুত্তাতে কী রেস্! কভী কুত্তা কভী গোলী, কভী গোলী কভী কুত্তা!' আমাদের বেলাও তাই, 'কভী ইস্টুডেন্ট কভী পুলিস, কভী পুলিস কভী ইস্টুডেন্ট!' আমার অবশ্য কোনই ডর ভয় ছিল না।

* ভিক্‌টর য়্যুগো (Hugo) সম্বন্ধে বলা হয়, একবার এক অখ্যাতনামা কবি য়্যুগোকে তাঁর কবিতার বই পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে য়্যুগোর সানন্দ অভিনন্দন এসে পৌঁছল সেই কবির হাতে, তাঁর কাব্যসৃষ্টির অজস্র প্রশংসাবাদ করে য়্যুগো শেষ করেছেন এই বলে, 'হে নবীন কবি, আমি তোমাকে সাদর আলিঙ্গন করে, ফ্রান্সের কবিচক্রের আমন্ত্রণ জানাই।' তিন দিন পরে বুক-পোস্টে পাঠানো কবির সেই কবিতার বই ফেরত এল তাঁর কাছে। উপরের পিঠে পোস্ট অফিসের রবর-স্ট্যাম্পে ছাপ, 'যথেষ্ট টিকিট লাগানো হয় নি বলে গ্রহণকারী বেয়ারিং হারে কালতো পয়সা দিতে নারাজ; অতএব প্রেরকের কাছে ফেরত পাঠানো হল।'

কারণ আমি তখন এমনিতেই ছিলুম বেহদ্ রোগা টিঙটিঙে—পাঁচফুট সাড়ে ছ'ইঞ্চি নিয়ে একশ' পাঁচ পৌণ্ড ওজন—অর্থাৎ হোঁৎকা মোট্‌কা জর্মন সহপাঠীদের তুলনায় তো আধটিপ নস্যি। তদুপরি আমি সবদাই সুনির্মল বসুর সেই তিরস্কারটি মনে রাখি, 'বাঙালী হয়েছো, পালাতে শেখ নি!'

কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এক রাত্রে দেখি, পুলিস অন্য ব্যবস্থা করেছে। এতদিন যেই আমি একা হয়ে যেতুম, পিছনে আর বুটের শব্দ শুনতে পেতুম না। সেরাত্রে দেখি, পুলিস নিতান্ত আমাকেই ধরবার জন্য যে মনস্থির করেছে তাই নয়, আগের থেকে, বেশ সুচিন্তিত ফাইভ ইয়ারস প্ল্যানিং করে যেন জাল পেতেছে। আমি তাড়া খেয়ে যেদিকেই যাই, পিছনে তো বুটের শব্দ শুনতে পাই-ই, তদুপরি দেখি, ঐ দূরে গলির মুখে আরেকটা পুলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন বিরহজর্জরিত ফিলমের নায়ক প্রেমাতুরা নায়িকাকে আলিঙ্গনার্থে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমি মহাভারত পড়েছি, জানি, এ-আলিঙ্গন হবে ধার্তরাষ্ট্র। অতএব মারি গুত্তা অন্য বাগে।

অনেকক্ষণ ধরে এই খেলা চললো। ইতিমধ্যে আমি কয়েক সেকেণ্ডের তরে সব পুলিসের দৃষ্টির বাইরে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলুম একটা 'পাবে'। ঝটকা মেরে 'বার' থেকে অন্য কারো অর্ডারী এক কাপ কফি যেন ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বসলুম, 'পাব'-এর সুদূরতম প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো একটা পুলিস।

খাইছে। এবারে এসে পাকড়াবে। বৈদ্যরাজ চরক বলেন, 'এ অবস্থায় হরিনামের বটিকা খেয়ে শুয়ে পড়বে!'

সে কিন্তু হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথমটায় 'বার' কীপারের মুখোমুখি হয়ে, আমার দিকে পিছন ফিরে এক গেলাস বিয়ার কিনে একটা অতি দীর্ঘ চুমুক দিলে। আমি বুঝলুম, মাইকেল সত্যই বলেছেন, সীতাদেবীকে রাবণের রাক্ষসী প্রহরিণীরা কোনো গাছতলায় বসিয়ে বেপরোয়া ঘোরাঘুরি করতো,

'হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে'

গদ্যময় ইংরিজীতে যাকে বলে নিতান্তই 'ক্যাট অ্যাণ্ড মাউস প্লে।' বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথেরটাই ভালো, 'এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা।'

এবারে সে গেলাস হাতে করে 'বার'-এর দিকে পেছন ফিরে আমার দিকে মুখ করে তাকাল।

আমিও অলস কৌতূহলে একবার তার দিকে তাকালুম। 'পাব'-এ নূতন

নিরীহ খদ্দের ঢুকলে যেরকম অন্য নিরীহ খদ্দের তার উপর একবার একটি নজর বুলিয়ে অন্য দিকে চোখ ফেরায়।

আমি যদিও তখন মাথা নিচু করে কাপের দিকে তাকিয়ে আছি—যেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বৈজ্ঞানিক অণুপরমাণু পর্যবেক্ষণ করছেন—তবু স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, লোকটা কি ভাবছে। তারপর শুনলুম, 'গুটে নাখট্!' আমি মাথা তুলে দেখি পুলিস তার বিয়ার শেষ করে 'পাব'ওলাকে 'গুড নাইট' জানিয়ে চলে যাচ্ছে। (জর্মনীর অলিখিত আইন, 'বিয়ার খাবে ঢক ঢক করে, ওয়াইন খাবে আ-স্তে, আ-স্তে।')

ঠিক বুঝতে পারলুম না কেন? তবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম বলি নি। এদের তো রাবণের গুষ্টি। এবার যিনি আসবেন, তিনি এঁয়ার মত বাপের সুপুত্তুর নাও হতে পারেন। আবার বাইরে যাবারও উপায় নেই। জাল গুটিয়ে সবাই চলে গেছেন, না ঘাপটি মেরে বসে আছেন, কে জানে?

ঘণ্টাখানেক পর যখন 'পাব' নিতান্তই বন্ধ হয়ে গেল, তখন দেখি সব ফাঁকা। তবু সাবধানের মার নেই। অকুস্থলের উল্টো মুখে রওয়ানা দিয়ে অনেকখানি চক্কর খেয়ে বাড়ি ফিরলুম 'তড়পত হুঁ জৈসে জলবিন মীন' হয়ে।

* * *

তার দু-তিনদিন পর সকালবেলা যখন পাত্তাড়ি নিয়ে য়ুনি (ভার্সিটি) যাচ্ছি, তখন একজন পুলিস হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে বুটের গোড়ালি গোড়ালিতে ক্লিক্ করে আমাকে সেলুট দিলে। আমি হামেশাই পুলিসের সামনে ভারী সুবিনয়ী—বার তিনেক 'গুটেন মর্গেন গুটেন মর্গেন গুটেন মর্গেন' বললুম, যদ্যপি একবারই যথেষ্ট।

কোনো প্রকারের লৌকিকতা না করে সোজা শুধোলে, 'তুমি ইণ্ডিয়ান?'

তালেবর পুলিস মানতে হবে। বলেছে 'ইণ্ডার'। 'ইণ্ডিয়ানার' বা রেড ইণ্ডিয়ান বলে নি। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকও যে পার্থক্যটি জানে না। বললুম, 'হ্যাঁ।'—

শুধোলে, 'এখান থেকে ইণ্ডিয়া কতদূর?

আমি বললুম, 'এই হাজার পাঁচেক মাইল হবে। সঠিক জানি নে, তবে জাহাজে যেতে ১২।১৩ দিন লাগে।'

বললে, 'বাপ-মা এই পাঁচ হাজার মাইল দূরে পাঠিয়েছে বাঁদরামি শেখবার জন্যে?'

এতক্ষণে আমার কানে জল গেল। বুঝলুম, উইথ রেফারেন্স্ টু দি কনটেকসট

যে, লোকটা সেই রাত্রের আমাদের দলের দুষ্কর্ম এবং পরবর্তী লুকোচুরির কথা পাড়ছে। আমি তবু নাক-টিপলে-দুধ-বেরোয়-না গোছ হয়ে বললুম, 'কিসের বাঁদরামি ?'

জর্মনে 'ন্যাকা' শব্দের ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ নেই। কিন্তু যে কটি শব্দ পুলিসম্যান প্রয়োগ করলে তার অর্থ ঐ দাঁড়ায়। তারপর নামলো সম্মুখসমরে। বললে, 'সেরাত্রে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখের আড়াল হয়ে যেতে পেরেছিলে বলে তোমাকে ধরি নি। এবারে কিন্তু ছাড়বো না।'

'অনেক ধন্যবাদ!' তারপর আমিও রণাঙ্গনে নেমে বেহায়ার মত বললুম, 'সে দেখা যাবে।'

যেন একটু দরদী গলায় বললে, 'কিন্তু কেন, কেন এসব করো ?'

আমিও তখন একটু নরম গলায় বললুম, 'এদেশে কি শুধু য়ুনিতে পড়তেই এসেছি ? ওদেশে বসেও তো এ-দেশের বই কিনে পড়া যায়। আমি এসেছি সব শিখতে, আর-সব স্টুডেন্টরা যা করে, তাই করি!'

'সব ছেলে এরকম বাঁদরামি করে ?'

আমাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হল সবাই করে না।

'তবে ?'

তখন বললুম, 'ব্রাদার, শোনো। এই স্টুডেন্ট বনাম পুলিস লড়াই সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে হাইডেলবের্গে। এখানে আরম্ভ হয় ১৭৮৬তে। তারপর কয়েক বছর য়ুনি বন্ধ ছিল—কেন, সঠিক জানি নে, বোধ হয় নেপোলিয়ন তার জন্য দায়ী—ফের য়ুনি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৮ থেকে। এবারে তুমিই কও, বুকে হাত দিয়ে, এই আমরা আজ যারা স্টুডেন্ট, আমরা যদি আজ লড়াই ক্ষান্ত দি তবে ভবিষ্যৎ বংশীয় স্টুডেন্টরা ইতিহাসে লিখে রাখবে না "অতঃপর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এক দল কাপুরুষ ছাত্র আগমনের ফলে—তাহাদের মধ্যে একটা অপদার্থ ইণ্ডিয়ানও ছিল—সেই সংগ্রাম বন্ধ হইয়া যায়—স্টুডেন্টরা পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল।" তারপর ভারতীয় নাটকীয় পদ্ধতিতে 'হা হতোস্মি হা হতোস্মি' করার পর বললুম, 'এই যে মহাকবি হাইনে, তিনি পর্যন্ত এখানে—'

এই করলুম ব্যাকরণে ভুল। বাধা দিয়ে শুধোলে, 'তুমি তার মত কবিতা লিখতে পারো ?'

নিশারণে সে জিতেছিল না আমি জিতেছিলুম, সেটা সমস্যাময়, সেটাকে 'ড্র' বললেও বলা যেতে পারে, কিন্তু দিবাভাগে এই তর্ক-যুদ্ধে আমি হার মেনে বললুম,

'বাকিটা আরেকদিন হবে, ব্রাদার। এখন তোমার নামটা বলো। সেই শনির রাত্রে যেখানে আমাদের প্রথম চারি চক্ষুর মিলন হয়েছিল সেখানেই দেখা হবে। আমি ফোন করে ঠিক করে নেব। এখন চলি, আমার ক্লাস আছে।'

সে হেসে যা বললে সেটাকে বাঙলায় বলা চলে, 'ডুডু খাবে টামাকও ছাড়বে না।'

*　　　*　　　*

এবারে ধরতে পারলে ছাড়বে না—সে তো বুঝলুম। ওদিকে এক মাস পরে আমার পরীক্ষা। তিনটে ভাইভা। শনির রাত জেগে তামাম রববার শুধু মুখস্থ আর মুখস্থ। হাসি পায় যখন এদেশে শুনি, এখানে বড্ড বেশী মুখস্থ করানো হয়; মুখস্থ না করে কে কবে কোন্ দেশে কোন্ পরীক্ষা পাস করেছে! তা সে পেসতাল-দ্‌জির দেশেই হোক আর ফ্রোবেলের দেশ, এই জর্মনিতেই হোক। তাই আমাকে আর যুদ্ধে না ডেকে আমাদের ফীলড মার্শেল আমাকে রিজার্ভে রাখলেন। মাত্র এক রাত্রে ডাক পড়েছিল, তবে সেটা শহরের অন্য প্রান্তে। আর এক দিন, সেই দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ-পোটির সঙ্গেই একটা 'পাব'-এ বসে দু-দণ্ড রসালাপ করেছিলুম। লোকটি সত্যই অমায়িক।

*　　　*　　　*

এদেশে পরীক্ষার পূর্বে এত সাতায় রকমের কাগজপত্র মায় থীসিস্ ডীনের দফ্‌তরে জমা দিতে হয় যে, সবাই শরণ নেয় আন্‌কোর হালের যে দু'দিন আগে পাস বা ফেল করেছে। তারাই শুধু এসব হাবিজাবির লেটেস্ট খবর রাখে। সে রকম দুজনা অনেকক্ষণ ধরে বসে, দফে দফে, একাধিক বার মিলিয়ে নিয়ে এক বাণ্ডিল কাগজ, ফর্ম, সার্টিফিকেট আমাকে দিয়ে বললে, 'এইবারে যাও বৎস, ডীনের দফ্‌তরে। সব মিলিয়ে দিয়েছি। আর, শোনো, সব কাগজের নিচে রাখবে একখানা পাঁচ মার্কের (তখনকার কালে পাঁচ টাকার একটু কম) নোট। এটা কেরানীর অন্যায্য প্রাপ্য—কিন্তু পূর্ণ শত বৎসরের ঐতিহ্য।'

দুরু দুরু বুকে—প্রায় নার্ভাস্ ব্রেক ডাউনের সীমান্তে পৌঁছে—দাঁড়ালুম গিয়ে ডীনের দফ্‌তরে, কাউন্টারের সামনে। পাঁচ টাকার চেয়ে বেশীই রেখেছিলুম।

যে কেরানী এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন তাঁর এ্যাব্বড়া হিণ্ডেনবুর্গী গোঁফ, আর বয়েসে বোধ হয় তিনি য়ুনির সমান। সাতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে আমার গুড্ মর্নিঙের কি একটা বিড়বিড় করে উত্তর দিয়ে দফে দফে কাগজ গুনলেন, টাকাটা কি কায়দায়

যে সরালেন ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। কিন্তু মুখে হাসি ফুটলো না। বরঞ্চ গম্ভীর কণ্ঠে গম্ভীরতর করে শুধোলেন, 'অমুক সার্টিফিকেটটা কই ?'

আমি তো সেই দুই জোগানদারদের উপর রেগে টঙ্। পইপই করে আমি শুধিয়েছি, ওরা আরো পইপই করে বলেছে, সব কাগজ ঠিকঠাক আছে, এখন এ কী গেরো রে বাবা! বুঝলুম, কি একটা সার্টিফিকেট আনা হয় নি। কিন্তু সে সার্টিফিকেট কিসের, কোনোই অনুমান করতে পারলুম না। জোগানদারদের মুখেও শুনি নি।

ভয়ে ভয়ে শুধালুম, 'কি বললেন, স্যার!'

এবার যেন নাভিকুণ্ডলি থেকে কৈফিয়ৎখানি কণ্ঠে কি একটা বেরুলো।

গুরু-মুর্শীদ, ওস্তাদ-মুরুব্বীদের আশীর্বাদ-দোওয়া আমার উপর নিশ্চয়ই ছিল; হঠাৎ অর্থটা মাথার ভিতরে যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আপন অজান্তে এক গাল হেসে বলে ফেলেছি, 'চেষ্টা তো দিয়েছি, স্যর, দু বচ্ছর ধরে প্রায় প্রতি শনির রাত্রে—মাফ করবেন স্যর—বলা উচিত রবির ভোরে। তা ওরা ধরতে না পারলে আমি কি করবো? বললে পেত্যয় যাবেন না, স্যর—'

ইতিমধ্যে বুড়ো হঠাৎ ঠাঠা করে হেসে উঠেছেন। যেমন তাঁর গাম্ভীর্য তেমন তাঁর হাসি। বিশেষ করে তাঁর বিরাট গোঁপ জোড়ার একটা দিক নেমে যায় নিচে, তো অন্যটা উঠে যায় উপরের দিকে। সে হাসি আর থামে না। ইতিমধ্যে ছোকরা কেরানীরাও হাসির রগড় দেখে তাঁর চতুর্দিকে এসে দাঁড়িয়েছে। এবারে থেমো বললেন, 'ধরা দেবার চেষ্টা করলে, আর ওরা ধরতে পারলো না, এটা কি রকম কথা?'

আমি বললুম, 'যে-পুলিস আরেকটু হ'লে ধরতে পারতো, তাকে সাক্ষী স্বরূপ হাজির করতে পারি, যে, আমি চেষ্টায় ত্রুটি করি নি, এই জেলে যাবার সার্টিফিকেট জোগাড় করার।'

সংক্ষেপে বললেন, 'খুলে কও।'

আমি সেই প্রকৃতির লোক যারা নার্ভাস ব্রেক ডাউনের ভাঙন থেকে পড়ি পড়ি করতে করতে বেঁচে গিয়ে হঠাৎ নিষ্কৃতি পেয়ে হয়ে যায় অহেতুক বাচাল—সেও আরেক রকমের নার্ভাস্‌নেস্! গড় গড় করে বলে গেলুম, পুলিসের সেই জাল পাতার কাহিনী—বিশেষ করে আমার উপকারার্থে—'পাব'-এর ভিতরকার বয়ান ও সর্বশেষে সেই পুলিসম্যানের সঙ্গে পথিমধ্যে আমার যম-নচিকেতা কথোপকথন। বক্তৃতা শেষ করলুম, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'এর পর এই পরীক্ষার পড়া নিয়ে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম

বলে সলিড্ কিছু করে উঠতে পারি নি, স্যর। শুধু ঐ যে, দিন পনেরো আগে হঠাৎ এক সকালে দেখা গেল লর্ড মেয়ারের বিরাট দফতরের উচ্চতম টাওয়ারে একটা ছেঁড়া ছাতা বাঁধা, বাতাসে পৎপৎ করছে, কায়ার ব্রিগেড পর্যন্ত নামাতে পারে নি, ঐ উপলক্ষ্যে অধীন কিঞ্চিৎ, অতি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে—'

একজন ছোকরা কেরানী আঁতকে উঠে বললে, 'সর্বনাশ। ওটার তালাশী যে এখনো শেষ হয় নি।'

বুড়ো বললেন, 'আমরা তো কিছু শুনছি না।'

বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরুতে গেলে তিনি কাউন্টারের ফ্ল্যাপ্‌টা তুলে আমার সঙ্গে দোর পর্যন্ত এলেন—পরে শুনলুম, এ-রকম বিরল সম্মান ইতিপূর্বে নাকি মাত্র দু' একজন বিদেশীই পেয়েছেন। আমি কিছু শুধোবার পূর্বেই তিনি যেন বুঝতে পেরে তাঁর মাথাটি আমার কানের কাছে নিচু করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুলের ডগা বুকে ঠুকে ঠুকে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তিনবার, আমি তিনবার।' তারপর অত্যন্ত সিরিয়াসলি শুধোলেন, 'বছর তিনেক পূর্বে এক ডাচ্ স্টুডেন্ট বললে—বুঝতেই পারছো, এ রসিকতাটা আমি শুধু বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গেই করে থাকি, স্রেফ্ মাত্র জানবার জন্য, তারা কতখানি সত্যকার জর্মন ঐতিহ্যের য়ুনি ছাত্র হতে পেরেছে—স্টুডেন্টরা নাকি ক্রমেই হারছে।' কণ্ঠে রীতিমত আশঙ্কার উৎপীড়ন।

আমি তাঁর প্রসারিত হাত ধরে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে বললুম, 'তিন বছর পূর্বে, ইয়া। কিন্তু তারপর জানেন তো, আমি আর আপনার মত মুরুব্বীকে কি বলবো, কৃষ্ণতম মেঘেরও রূপালী সীমান্তরেখা থাকে—এল জর্মনিতে অভূতপূর্ব বিরাট বেকার সমস্যা, যেটা এখনো চলছে। ফলে ছেলেরা ম্যাট্রিক পাস করে এদিক ওদিক কাজে ঢুকতে না পেরে বাধ্য হয়ে ঢুকছে য়ুনিতে, আগে যেখানে ঢুকতো একজন, এখন ঢোকে দশজন। ওদিকে সরকারের পয়সার অভাবে পুলিসের গুষ্টি না বেড়ে বরঞ্চ কমতির দিকে। আমরা এখন দলে ভারি। বস্তুতঃ আমরা এখন নিশাচরবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক দিবা ভাগেই তাদের সম্মুখ-সমরে আহ্বান করতে পারি—করি না, শুধু শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্য ভঙ্গ হবে বলে।' তারপর একটু থেমে গম্ভীরতর কণ্ঠে বললুম, 'আর যদি কখনো সে দুর্দিনের চিহ্ন দেখি, তবে সেই সুদূর ভারত থেকে ফিরে আসবো—আ মি। সামনের পরীক্ষায় পাশ করি আর ফেলই মারি, সেই পরাজয় প্রতিরোধ করার জন্য য়ুনিতে ঢুকে ছাত্র হব আবার—আ মি।'

আম্মো।' ॥

১।-।৬৬

রাসপুতিন

এক একটা দুঃখ মানুষ আমৃত্যু বয়ে চলে। আমার নিজের কথা যদি বলার অনুমতি দেন, তবে নিবেদন করি, অধ্যাপক বগ্‌দানফের আমাকে বলা তাঁর নিজের জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমি যে কেন তখনই লিখে রাখিনি সেই নিয়ে আমার শোক, এবং এ-শোক আমার কখনো যাবে না। তারই একটি ১৯১৭-র কম্যুনিস্ট বিপ্লব। তিনি অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত ঘটনাটি বর্ণন করতে তাঁর লেগেছিল পুরো ন'টি ঘণ্টা। শান্তিনিকেতনে আশ্রমের ইস্কুলের শোবার ঘণ্টা পড়ে রাত ন'টার সময়; আমি কলেজে পড়তুম বলে অধ্যাপকের ঘরে ঐ সময়ে যেতে কোনো বাধা ছিল না। পর পর তিন রাত্রি ধরে রাত বারোটা-একটা অবধি তিনি আমাকে সে ইতিহাস বলে যান। অবশ্য অনেকেই বলতে পারেন, ঐ যুগপরিবর্তনকারী আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তর প্রামাণিক পুস্তক লেখা হয়ে গিয়েছে এবং অধ্যাপক বগ্‌দানফের পাঠটা খোয়া গিয়ে থাকলে এমন কীই বা ক্ষতি। হয়তো সেটা সত্য, কিন্তু ঐ বিষয়ে আমি যে কটি সামান্য বই পড়েছি তার সব কটাই বড়ই পাণ্ডিত্য-পূর্ণ, বৈজ্ঞানিক। বগ্‌দানফ তাঁর কাহিনী বলেছিলেন একটি ষোল বছরের ছোকরাকে—ঘটনার মাত্র চার-পাঁচ বৎসর পরে এবং সেটি তিনি তাই করেছিলেন সেই অনুযায়ী রসময়, অর্থাৎ সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ। এ স্থলে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি, অধ্যাপকের বর্ণনভঙ্গিটি ছিল অসাধারণ, তাই পরবর্তী যুগে তাঁর ইরান ও আফগানিস্থান (এ দুটি দেশে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন) সম্বন্ধে লিখিত গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরাজি পণ্ডিতমণ্ডলীতে সাহিত্যিক খ্যাতিও পায়। মাতৃভাষা রাশানে তিনি লিখেছেন কমই—তাঁর পাণ্ডিত্য-প্রকাশ যুগে রাশাতে এ ধরনের গবেষণার কোনোই মূল্য ছিল না বলে সেগুলো সেখানে ছাপানোই ছিল অসম্ভব। তিনি প্রধানত লেখেন ফরাসী ইংরাজী ও ফার্সীর মাধ্যমে। এবং সব চেয়ে বেশী সম্মান পান ফার্সী পণ্ডিতজন মধ্যে।*

তিনি যে দ্বিতীয় কাহিনী বলেন, সেটি রাসপুতিন সম্বন্ধে। প্রথমটির তুলনায় এটি অনেক হ্রস্ব। রাসপুতিনকে নিহত করা হয়, পুরনো ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী

* এঁর উল্লেখ শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র জীবনীতে' করেছেন; আমিও 'দেশে-বিদেশে' অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি।

১৬ই ডিসেম্বর, নতুন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ৩০ ডিসেম্বর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। এর প্রায় কুড়ি বৎসর পর রাসপুতিনকে নিয়ে আমেরিকায় একটি ফিলম্ তৈরী হয় (এবং আমার যতদূর মনে পড়ে লায়োনেল বেরিমোর রাসপুতিনের অংশ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন) এবং ঐ সময় রাসপুতিন-হন্তা রাশার শেষ জারের নিকটাত্মীয় গ্র্যাণ্ড ডিউক ইউসুপফ (আরবী হীব্রুতে ইউসুফ, ইংরিজীতে জোসেফ) ইয়োরোপে। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের মধ্যে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সেই সব ভাগ্যবানদের দুজনা, যাঁরা প্রাণ নিয়ে রাশা থেকে পালাতে সক্ষম হন। তিনি লণ্ডন আদালতে মোকদ্দমা করেন ফিলম্ নির্মাতাদের (বোধ হয় M G M) বিরুদ্ধে যে, তাঁরা যে ফিলমে ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাসপুতিন তাঁর অর্থাৎ ইউসুপফের স্ত্রীকে পর্যন্ত তাঁর কামানলের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি মোকদ্দমাটি হেরে যান বটে, কিন্তু ঐ মোকদ্দমাটি তখন এমনই cause celebre কজ্ সেলেব্র রূপে—যেমন আমাদের ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মোকদ্দমা—প্রখ্যাতি লাভ করে যে তার অল্প দু' এক বৎসর পর ঐ মোকদ্দমায় প্রধান অংশগ্রহণকারী একজন উকিল মোকদ্দমাটি সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক—এবং আমি বলবো—সাহিত্যিক উচ্চপর্যায়ের প্রবন্ধ লেখেন। তিনি যদিও ইউসুপফের বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল ছিলেন, তবু আদালতে ইউসুপফ দম্পতির খানদানী সোম্য আচরণের অকৃপণ প্রশংসা করেন। তারপর হয়তো আরো অনেক কিছু ঘটেছিল কিন্তু তার খবর আমার কানে পৌঁছয় নি। হঠাৎ গত মাসের 'আনন্দবাজারের' এক ইস্যুতে দেখি, ইউসুপফ ফের মোকদ্দমা করেছেন—এবার কিন্তু আমেরিকায়, কলাম্বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাসপুতিন ও তাঁর জীবন নিয়ে নাট্য প্রচার করার জন্য—এবং আবার মোকদ্দমা হেরেছেন। সেই সুবাদে আমার মনটা চলে গেল ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে, যখন অধ্যাপক বগ্দানফ রাসপুতিন-কাহিনী আমাকে ঘণ্টা তিনেক ধরে শোনান।

পরবর্তী যুগে ফিলম্ বেরুলো, তারপর লণ্ডনের উকিল তাঁর বক্তব্য বললেন, এবং 'আনন্দবাজার' বিদেশ থেকে যে সংবাদ পেয়েছেন, তা-ই প্রকাশ করেছেন। এদের ভিতর পরস্পর বিরোধ তো রয়েইছে, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ-স্থলে আসল বক্তব্য এই যে, বগ্দানফ বলেছিলেন, সম্পূর্ণ না হোক্ অনেকখানি ভিন্ন কাহিনী। আমি আদৌ বলতে চাই নে, তাঁর বিবরণী, জবানী বা ভার্শন—যাই বলুন—সেইটেই নির্ভুল আপ্তবাক্য; বস্তুত তিনি নিজেই আমাকে বারবার বলেছিলেন, "যাই বয়্। সেন্ট পেটের্সবুর্গে তখন এত হাজারো রকমের গুজোব নিত্য নিত্য

ডিউক সম্প্রদায় থেকে আস্তাবলের ছোকরাটা পর্যন্ত গরমাগরম এ-মুখ থেকে ও-মুখ হয়ে রাশার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে যে আমারটাই যে অভ্রান্ত সেই বা বলি কোন সাহসে ? তবে এটা সত্য আমার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ "টেক্‌স্ট্‌ ক্রিটিসিজ্‌ম্‌" —তখনো ছিল, এখনো আছে—অর্থাৎ কোনো পুস্তকের পেলুম তিনখানি পাণ্ডুলিপি, তাতে একাধিক জায়গায় লেখক বলেছেন পরস্পরবিরোধী তিনরকম কথা। আমার কাজ যাচাই করে সত্য নিরূপণ করা, কিংবা সত্যের যতদূর কাছে যাওয়া যায় তারই চেষ্টা দেওয়া। অতএব, বুঝতেই পারছো, রাসপুতিন সম্বন্ধে গুজোবগুলো আমি সরলচিত্তে গোগ্রাসে গিলি নি, আমার বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করে যেটা সর্বাপেক্ষা সত্যের নিকটতম সেইটেই বলছি।'

অধ্যাপক রাসপুতিনের প্রথম জীবনাংশ সংক্ষেপে সারেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই চাষী পরিবারের ছেলে রাসপুতিনের জন্ম সাইবেরিয়াতে। 'রাসপুতিন' তার আসল নাম নয়—সেটা পরে অন্যলোকে তার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, বিশেষ করে কামাদি ব্যাপারে, জানতে পেরে তার উপর চাপায়। লেখাপড়ার চেষ্টা তিনি ছেলেবেলায় কিছুটা দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেদিকে ছিলেন, ক্লাসের মামুলি চাষার ছেলেরও অনেক নিকৃষ্ট। এরপর তিনি তাঁর সমাজের ভদ্র ঘরেই বিয়ে করেন—আর পাঁচটা ছেলের মত। কিন্তু তার কিছুকাল পরেই হঠাৎ তাঁর ঝোঁক গেল 'ধর্মের' দিকে, কিন্তু প্রচলিতার্থে আমরা ধর্মাচরণ বলতে যা বুঝি সেদিকে নয়। হিন্দু ধর্মে যে-রকম একাধিক মতবাদ, শাখা-প্রশাখা—রুশের প্রচলিত (অর্থডক্স) সনাতন খৃষ্টধর্মেও তাই। তারই একটার দিকে আকৃষ্ট হলেন গ্রেগরি (রাসপুতিন)। এ স্থলে উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি, অধ্যাপক বগ্‌দানফ ছিলেন অতিশয় 'গোঁড়া'—আমি সজ্ঞানে শব্দটি ব্যবহার করছি—রাশার সরকারী ধর্ম 'গ্রীক অর্থডক্স' চার্চে বিশ্বাসী এবং আচারনিষ্ঠ খৃষ্টান। শান্তিনিকেতনে তাঁর কামরায় (তখনকার দিনের অতিথিশালা, এখন বোধ হয় 'দর্শন-ভবন') দেয়ালে ছিল ইকন এবং তার নিচে অষ্টপ্রহর জ্বলতো মঙ্গলপ্রদীপ এবং তারই নিচে তিনি অহরহ দাঁড়িয়ে স্বদেহে আঙুল দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করতে করতে—ঠিক আমাদের বুড়িদের মত—বিড়বিড় করে দ্রুতগতিতে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। বলা বাহুল্য রাসপুতিন যে খ্‌লিস্‌তি (khlisti) সম্প্রদায়ে প্রবেশ করলেন সেটাকে অধ্যাপক অপছন্দ করতেন। এ সম্প্রদায় উন্মত্ত নৃত্য, সংগীত (এবং লোকে বলে যৌনাভিচার) ইত্যাদির মাধ্যমে পরমাত্মাকে মানবাত্মায় অবতীর্ণ করিয়ে স্বয়ং পরমাত্মাতে পরিবর্তিত হওয়ার চেষ্টা করে। এ মার্গ বিশ্বসংসারে কিছু আজগুবী নূতন চীজ

নয়। তবে এঁরা বলতে কসুর করতেন না যে, স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে এঁরা উদাসীন, অর্থাৎ এ বাবদে কে কি করে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। রাসপুতিন এটাকে নিয়ে গেলেন তার চরমে। তিনি প্রচার করতে লাগলেন, 'পাপ না করলে ভগবানের ক্ষমা পাবে কি করে? অতএব পাপ করো!' এ ছাড়া তার আরেকটি বক্তব্য ছিল, তিনি পরমাত্মার অংশাবতার, এবং তাঁর সঙ্গে দেহে মনে আত্মায় আত্মায় যে কেউ সম্মিলিত হবে তারই চরম মোক্ষ তদ্দণ্ডেই। তাঁর শিষ্যাগণের সঙ্গে তাঁর সেই সম্মিলিত হওয়াটা কোন্ পদ্ধতিতে হতো সেটা বলতে শ্লীলতায় বাধে, এবং একথা প্রায় সর্ববাদী সম্মত যে তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাগণকে নিয়ে একই কামরায় যে সব 'সম্মেলন' ঘটাতেন সেটা শুধু তিনি নিজেতেই সীমাবদ্ধ রাখতেন না, শিষ্য-শিষ্যাগণ নিজেদের মধ্যেও সম্মিলিত হতেন। ইংরিজীতে একেই 'অর্জি' 'সেটারনেলিয়া' ইত্যাদি বলে থাকে।

এটা সত্য, রাসপুতিনের কথা আমিই উত্থাপন করেছিলুম এবং অধ্যাপকও রাসপুতিন সম্বন্ধে তাঁর যা জানা ছিল সেটি সবিস্তর বলেছিলেন, কিন্তু তিনি রাসপুতিনের ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর পূর্ণ বক্তব্যের প্রায় অর্ধাংশ ব্যয় করেন ঐ সম্প্রদায় নিয়ে, এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে কোথায় কোথায় এ-প্রকারের 'অর্জি' স্বীকৃত এবং কার্যে পরিণত হয়েছে তাই নিয়ে। এ বাবদে তাঁর শেষ বক্তব্য আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে: ধর্মের নামে এ ধরনের অনাচার কেন যুগে যুগে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কিংবা গোপনে গোপনে বিশেষ কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে প্রাচীন ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখে, এ তত্ত্বটি সাতিশয় গুরুত্ব ধারণ করে এবং এর অধ্যয়ন প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রীয় পুস্তক অধ্যয়ন করে হয় না, এর জন্য প্রথমত প্রয়োজন নৃতত্ত্ব এবং পরে সমাজতত্ত্বের গভীর অধ্যয়ন (এর পূর্বে Anthropology ও Sociology এ দুটো শব্দ আমি কখনো শুনিই নি)।

আমি তখন বুঝতে পারি নি পরে পারি, যে আর পাঁচজনের মত তিনিও রাসপুতিনের রগরগে কাহিনী কীর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ওরই মাধ্যমে—ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখানোর মত—আমাকে সাধারণ ভারতীয় ছাত্রের পাঠ্যবস্তুর গণ্ডি থেকে বের করে পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে প্রথম-পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য, এসব আমার সম্বন্ধে নিছক ব্যক্তিগত কথা হলে আমি এগুলো উল্লেখ করতুম না, আমার অন্যতম উদ্দেশ্য, এই সুবাদে তখনকার দিনের স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-চালিত বিশ্বভারতীর (স্কুল ও

কলেজ—যথাক্রমে 'পূর্ব' ও 'উত্তর বিভাগ') অধ্যাপকগণ কি প্রকৃতি ধারণ করতেন তারই যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন।

অধ্যাপক বলেছিলেন, এধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ অবাধে করা যাচ্ছে এবং তদুপরি সেটা ধর্ম নামে প্রচারিত হচ্ছে, এটা যে জনপ্রিয় হবে—অন্তত জনগণের অংশ বিশেষে—সেটা তো অতিশয় স্বাভাবিক। কিন্তু এই যে এক অজানা-অচেনা অর্ধলুপ্ত খ্‌লিস্‌তি সম্প্রদায় হঠাৎ নবজীবন লাভ করে খুদ জারের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল, এটা তো আর একটা আকস্মিক অকারণ কর্তাবিহীন কর্ম নয়। এরকম একটা নবআন্দোলন আনয়নকারী পুরুষের কোনো না কোনো অসাধারণ গুণ, আকর্ষণ বা সম্মোহনশক্তি থাকা নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

পূর্বেই বলেছি, অধ্যাপক ছিলেন কট্টর 'অর্থডক্‌স্ গ্রীক চার্চ'-এর অন্ধ ভক্ত। কিন্তু এস্থলে এসে তিনিও স্বীকার করলেন, রাসপুতিন একাধিক অলৌকিক শক্তি ধারণ করতেন। তিনি যে কঠিন কঠিন দুরারোগ্য রোগে, কোনো প্রকারের ঔষধ প্রয়োগ না করে প্রশম করতে পারতেন সেটারও উল্লেখ করলেন। কি প্রকারে? কেউ জানে না।

ইতিমধ্যে জার-প্রাসাদের উপর মৃত্যু যেন তার করাল ছায়া বিস্তার করেছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বালক যুবরাজ আহত হন। তাঁর রক্তক্ষরণ আর কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। ভিয়েনা বার্লিন থেকে বড় বড় চিকিৎসক এসেছেন। আমি অধ্যাপককে শুধিয়েছিলুম, 'চিকিৎসা শাস্ত্রে কি রাশা তখনো এতই পশ্চাৎপদ?' তিনি বলেছিলেন, 'বলা শক্ত। তবে সাহিত্যের বেলা চেখফ্ যা বলেছেন এ স্থলেও হয়তো সেটা প্রযোজ্য: তোমার প্রিয় লেখক চেখফ্ বলেছেন, "হ্যাঁ, আলবৎ আমরা রুশ সাহিত্য পড়ি। কিন্তু সেটা ঐ যেরকম আমরা 'কুটির শিল্পকে' মেহেরবানী করে সাহায্য করি। আসল মালের জন্য যাই ফরাসী সাহিত্যে।" হয়তো চিকিৎসার বেলাও তখন তাই ছিল।'

দাসী না ডাচেস্—সমাজের দুই প্রান্তের দুজনা—কে প্রথম রাসপুতিনকে নিয়ে গেল জারের রাজপ্রাসাদে?

সে কি? যুবরাজ মৃত্যুশয্যায়, আপন 'কটেজ ইনডাস্ট্রির' রাশান ডাক্তাররা তো হার মেনেছেনই, ভিয়েনা-বার্লিনের রাজবৈদ্যরাও, যাঁরা কি না কাইজারের, এমপেরার ফ্রানৎস যোজেফের প্রাসাদের গণ্যমান্যদের চিকিৎসা করে করে বিশ্ব-

বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা পর্যন্ত রাশা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। কারণ রুশ যুবরাজের যে রোগ হয়েছে সেটার নাম হ্যামোফিলিয়া—আমরা গরীবদের, না জানি কোন্ পুণ্যের ফলে, আমাদের হয় না—ব্যামোটা শব্দার্থেই রাজসিক, শুধু রাজা-রাজড়াদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ। পূর্বে ছিল এই বিশ্বাস; পরে দেখা গেল, গরীবদেরও হয়। আমরা বললুম, 'সেই কথাই কও। ভগবান যে হঠাৎ খামোখা এহেন দুরারোগ্য ব্যাধি শুধু বড়লোকদের জন্যই রিজার্ভ করে রেখে দেবেন, এটা তো অকল্পনীয়। ব্যামোগুলো তো আমাদের মত গরীবদের জন্যই তৈরি হয়েছে। ভগবান স্বয়ং তো রাজাদের দলে। কিংডম্ অব্ দি হেভ্ন্ বা স্বর্গরাজ্যে যাঁর বাস তিনি তো ফেভার করবেন তাঁর জাতভাই তাঁদেরই, যাঁদের কিংডম্ অব দি আর্থ বা পৃথ্বীরাজ্য আছে।* তাই যদি হয়, তবে স্বর্গরাজ্যই হোক, আর ভূস্বর্গই হোক, ভিয়েনা-বার্লিনের অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেখানে রুগীকে হরি নামের গুলি দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার তালে, সেখানে দাসী 'কার্সী পড়বে'? হয়তো ঠিক সেইখানেই, কিন্তু অন্য কারণও আছে।

আমরা এ-দেশে যত কুসংস্কারাচ্ছন্নই হই না কেন, একাধিক বাবদে অন্তত সে যুগে, অর্থাৎ এ-শতাব্দীর প্রারম্ভে জারের রাশা আমাদের অনায়াসে হার মানাতে পারতো। সে রাশার গ্রীক অর্থডক্স্ চার্চ ছিল শব্দার্থেই অর্থডকস্—গোঁড়া, কট্টর কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আর চাষাভূষোদের তো কথাই নেই। তন্ত্রমন্ত্র, জড়িবড়ি, মাদুলী-কবচ থেকে আরম্ভ করে নিরপরাধ 'প্রভু যীশুর হত্যাকারী' ইহুদিদের সুযোগ পেলেই বেধড়ক মার, এবং সেখানেই শেষ নয়—আপন রক্তের, আপন ধর্মের জাতভাই যারা এসব কুসংস্কার থেকে একটুখানি মুক্ত হয়ে, অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ স্বাধীনভাবে প্রভু যীশুর বাণী জীবন দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করতো যেমন 'দুখবর', 'স্তান্দিস্ত' সম্প্রদায় —তাদের উপর কী বীভৎস অত্যাচার।† এবং চাষাভূষোদের এই অত্যাচার-ইন্ধনে কাষ্ঠ সরবরাহ করতেন জার সম্প্রদায় এবং তাঁদের অনুগ্রহে লালিত পালিত বিলাস-ব্যসনে গোপন পাপাচারে আকণ্ঠ-নিমগ্ন অর্থডক্স্ চার্চ তার আপন 'পোপ'—হোলি

* স্বয়ং স্বামীজী নাকি বলেছেন, 'যে ভগবান আমাকে এ-দুনিয়ায় এক মুঠো ভাত দেয় না, সে নাকি মৃত্যুর পর আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবে—why, even an imbecile would not believe it; much less I!' তবে এটা প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। তবু এ-কথা অতিশয় সত্য, তিনি এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম নাকি বলতেন, মানুষকে ভগবান হতে হবে, আর তিনি নাকি বলতেন মানুষকে মানুষ হতে হবে।

† সে অত্যাচার-সংবাদে কাতর হয়ে তলস্তয় 'রেসারেক্শন' বই লিখে, টাকা তুলে এদের অনেককে কানাডা পাঠিয়ে দেন।

সিনড্‌কে নিয়ে যে ইউসুপক এর কয়েক বৎসর পর রাসপুতিনের ভবলীলা সাঙ্গ করেন, তিনি বা তাঁর ভাই, আরেক গ্র্যাণ্ড ডিউক প্রকাশ্য 'ডুমা' বা মন্ত্রণাসভায় প্রস্তাব করেন এবং বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করে স্বহস্তে নির্মিত পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে পেশ করেন, ইহুদিদের সবংশে বিনাশ করার জন্য কি প্রকারে, স্তরে, স্তরে শল্য প্রয়োগদ্বারা তাদের পুরুষদের সন্তান প্রজনন ক্ষমতা হরণ করা যায়? বগ্‌দানফ সাহেব বলেছিলেন, 'মাই বয়, হি সাব্‌মিটেড্‌ ইট ইন্‌ অল্‌ সিরিয়াসনেস্‌!' অবশ্য তৎসত্ত্বেও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভদ্রসন্তান অধ্যাপক বগ্‌দানফ ইহুদিদের ঘৃণা করতেন —হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে, ঐ জাতীয় আর পাঁচটা বর্বর রুশের মত। বিশ্বভারতীতে তখন একটি সুন্দরী, বিদেশিনী, ইহুদি অধ্যাপিকা ছিলেন; কি প্রসঙ্গে তাঁর কথা উঠতে বগ্‌দানফ তিক্ত অবজ্ঞায় মুখ বিকৃত করে বললেন, 'আই উড্‌ নট্‌ টাচ হার উইথ এ পেয়ার অব টংস্‌!—সাঁড়াশি দিয়েও তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে রাজী হবেন না।

এ কথা সবাই বলেছেন, রাজধানী সেণ্ট পেটের্‌স্‌বুর্গে (তখন অবশ্য রাশা জর্মনীর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত বলে তাদের সভ্যতায় জর্মনদের যে শতকরা আশী ভাগ আবদান, যায় তাদের ভাষায় প্রবেশপ্রাপ্ত জর্মন শব্দ, যেমন সেণ্ট পেটের্‌স্‌বর্গের জর্মন অংশ 'বুর্গ'—'প্রাসাদ', 'কাস্‌ল্‌—সমূলে উৎপাটিত করে নামকরণ করেছে 'পেত্রোগ্রাদ'। সর্বশেষে এর নামকরণ হয় 'লেনিনগ্রাদ', কিন্তু ততদিনে রাজধানী চলে গেছে মস্কোতে) জারের 'উইণ্টার পেলেসে' প্রাসাদে বিরাজ করতো কেমন যেন এক অদ্ভুত রহস্যময় (প্রধানত ধার্মিক—mysticism) বাতাবরণ। সম্রাজ্ঞী —জারিনা—ছিলেন অতিশয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আচার-অনুষ্ঠানে সদালিপ্ত, প্রতি মুহূর্তে পুত্রের পুনর্বার রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হবার ভয়ে উদয়াস্ত সশঙ্কিত; বিশেষ করে যখন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি এই কঠিন পীড়ার সম্মুখে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে, তখন যে তিনি পাগলিনীর মত রাজ্যের যত প্রকারের টোটকাযোটকা, তাবিজমাদুলীর সন্ধানে লেগে যাবেন সেটা অবাঞ্ছনীয় হলেও অবোধ্য নয়—এমন কি কট্টর বৈজ্ঞানিকও সেখানে সহানুভূতি দেখাবে। একেই তো শীতপ্রাসাদে বিরাজ করতো রহস্যময় বাতাবরণ, যেন সেখানে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো প্রকারের অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, তদুপরি নানাশ্রেণীর কুটিল ভাগ্যান্বেষী সেই প্রাসাদে কোনো প্রকারের চতুরতা দ্বারা অর্থ সঞ্চয়ের জন্য গমনাগমন করছে, সেখানে যদি নিত্যসঙ্গিনী দাসীটিও বলে যে, সে একজন 'হোলিম্যান', 'সাধুতপস্বীকে' চেনে যাঁর হৃদয়ে প্রভু যীশুর সামান্যাংশ প্রবেশ

করার ফলে ('সেই শাশ্বত সত্তার একটি কণা আমাতে অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছে'—রাসপুতিনের আপন ভাষায়) তিনি প্রভুরই মত বহু দুরারোগ্য ব্যাধি, কোনো ঔষধ প্রয়োগ না করে অবলীলাক্রমে আরোগ্য করতে পারেন, তবে মহারানী যে নিমজ্জমানার ন্যায় সেই তৃণখণ্ডকেও দৃঢ়হস্তে ধারণ করবেন সেটা তো তেমন-কিছু অসম্ভব আচরণ নয়।

অন্তপক্ষ বলেন, দাসী নয় ডিউক।

রাসপুতিন দিগ্বিজয় করতে করতে পেত্রোগ্রাদ—সম্ভব হলে রাজপ্রাসাদ—জয় করবেন বলে মনস্থির করেছেন। এদিকে সেখানকার যাজক সম্প্রদায়ের কেউ বা তাঁর জনপ্রিয়তার সংবাদ শুনে, কেউ বা তাঁর ধর্মের নবজাগরণ প্রচেষ্টার খ্যাতি শুনে, কেউ বা তাঁর অলৌকিক কর্মক্ষমতার জনরবে আকৃষ্ট হয়ে সেটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য, এক কথায় অনেকেই অনেক কারণে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করতে উদ্‌গ্রীব। রাসপুতিন সশিষ্য-শিষ্যা পেত্রোগ্রাদে প্রবেশ করে—সে প্রবেশ প্রায় খৃষ্টের পূত পবিত্র জেরুজালেমের পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করার সমতুল—সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হলেন এক প্রভাবশালী শিষ্যের গৃহে। শীঘ্রই যোগসূত্র স্থাপিত হল পেত্রোগ্রাদের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মশিক্ষাশালার সুপণ্ডিত অধ্যক্ষের সঙ্গে। ইনি আবার মহারানীর আপন ব্যক্তিগত পুরোহিত—অর্থাৎ এঁরই সামনে মহারানী প্রতি সপ্তাহে একবার 'কনফেস্' করেন, ঐ সপ্তাহে তিনি যে সব পাপচিন্তা করেছেন, কর্মে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন সেগুলি স্বীকার করে শাস্ত্রাদেশ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তাদেশ গ্রহণ করেন—প্রায়শ্চিত্ত সাধারণতঃ উপবাস ও মালাজপের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে।* এই কনফেশন গ্রহণ করে যে পুরোহিত প্রায়শ্চিত্তাদেশ প্রদান করেন তাঁর পদটি স্বভাবতই সাতিশয় গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব ধারণ করে। তিনি সম্রাজ্ঞী-হৃদয়-কন্দরের অন্তরতম রহস্য জানেন বলেন—এমনকি স্বীকারোক্তির সময় তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকারও ধরেন—তাঁকে থাকতে হয় অতি সাবধানে।

* এই কনফেশন বা পদস্খলন স্বীকারোক্তি একাধিক ধর্মে প্রচলিত আছে। এদেশে জৈনদের ভিতর সেটি নিষ্ঠা সহকারে মানা হয়, এবং এরই নাম 'পর্যুষণ'। তবে আমাদের যতদূর জানা, পর্যুষণ বৎসরে মাত্র একবার হয় এবং সম্প্রদায়ের সকলেই সেটা একই সময়ে করেন বলে বর্ষার শেষে সেটা পর্বদিবস রূপে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ শ্রমণরাও বর্ষাকালে পর্যটন নিষিদ্ধ বলে কোনো সংঘে আশ্রয় নিয়ে বর্ষাযাপন শেষে পাপ স্বীকারোক্তি করে পুনরায় পর্যটনে নেমে পড়েন। মুসলমানরা হজের সময় করে থাকেন, এবং মৃত্যু আসন্ন হলে 'তওবা' করেন। 'তওবা' শব্দার্থে 'প্রত্যাবর্তন'। অর্থাৎ তওবাকারী আপন পাপ সম্বন্ধে অনুশোচনা করে ধর্মমার্গে প্রত্যাবর্তন করলো।

তাঁর প্রধান কৌতূহল রাসপুতিন কোন্ কোন্ কারণে কি ভাবে হৃদয়ে ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে সমস্ত জীবনধারা পরিবর্তিত করে 'নবজন্ম' পেলেন। গ্রীক অর্থডক্স্ চার্চ, ক্যাথলিক তথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইতিহাসে এই 'নবজীবন' লাভ, গৃহী খৃষ্টানের সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য এই কনভার্শনের উপ-ইতিহাস এক বিরাট অংশ গ্রহণ করে আছে। খৃষ্ট সাধু মাত্রই এটি মনোযোগ সহকারে বারংবার পাঠ করে তার থেকে প্রতিদিন নবীন উৎসাহ, তেজস্বী অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন। মহারানীর আপন যাজক ধর্ম-একাডেমির অধ্যক্ষরূপে এই উপ-ইতিহাসে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, সেই পুস্তক তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে সটীক প্রতিদিন পড়িয়ে শোনাতেন এবং স্বভাবতই সেই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন সাধুসন্তদের নিয়ে গভীর এবং সূক্ষ্ম আলোচনা করতেন। কিন্তু কোনো পাপাত্মা কি ভাবে অকস্মাৎ দৈবাদেশ পেয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে ধর্মসংঘে প্রবেশ করে, কিংবা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে, অথবা পাণ্ডিত্য থাকলে সংঘে প্রবেশ ক'রে নির্জনে নিভৃতে বাইবেল বা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের এক নবীন টীকা নির্মাণে বাকী জীবন কাটিয়ে দেয় এ সম্বন্ধে তাঁর কোন ব্যক্তিগত অব্যবহিত অভিজ্ঞতা ছিল না, এবং অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ-রকম একটা আকস্মিক 'কনভার্শনের' নায়ক যদি তাঁর আপন কর্মস্থলে হঠাৎ এসে পৌঁছন তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করবেন। পূর্বেই বলেছি, রাসপুতিনের ভিতর কেমন যেন একটা বৈদ্যুতিক আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায়ও তিনি সাধারণ কেন, অসাধারণ জনকেও মন্ত্রমুগ্ধবৎ মোহাচ্ছন্ন করতে পারতেন। খৃষ্ট ধর্মশাস্ত্রে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ছিল অতিশয় সীমিত, কিন্তু প্রভু যীশুর যে কটি সরল উপদেশ তিনি বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করতে পেরেছিলেন সেগুলি তিনি অতিশয় দৃঢ়-বিশ্বাসের বীর্যশীল সরলতায় প্রকাশ করতে পারতেন। সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যটিও নিবেদন করা উচিত যে, রাশায় ধর্মশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে যে পণ্ডিতকুলমান্য সর্বোত্তম শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন তিনি এই অশিক্ষিত হলধরসন্তানের কাছে আসবেন না শাস্ত্রের টীকাটিপ্পনী শ্রবণার্থে। তিনি আসবেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। এ-স্থলেও প্রভু যীশুর সঙ্গে রাসপুতিনের সাদৃশ্য আছে। ইসরায়েলের স্মার্তপণ্ডিতরা যখন প্রভু যীশুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তখন তিনি যেন তাচ্ছিল্য ভরে বলেছিলেন, আমি শাস্ত্রকে কার্যে পরিপূর্ণ ভাবে দেখাবো।

এসব কারণ অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। যা বাস্তবে ঘটে সেটা সর্ব তর্কের অবসান এনে দেয়। পণ্ডিতের পণ্ডিত রাসপুতিনকে দেখে, তাঁর সরল আচার-

ব্যবহার, তাঁর প্রতি শিষ্য-শিষ্যাদের সহজ ভক্তি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হলেন, কিন্তু মুগ্ধ হলেন যখন রাসপুতিনের কাছ থেকে শুনলেন, তাঁর আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলে যেতে লাগলেন, কি ভাবে এক দৈবজ্যোতি তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হল আর তিনি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে স্বর্গীয় প্রভুর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করলেন।

এ প্রকারের আকস্মিক পরিবর্তন ইতিহাস শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাক্ষ পড়েছেন, পড়িয়েছেন প্রচুর কিন্তু এ-জাতীয় পরিবর্তনের একটি সরল সজীব দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শোনা সে যে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন, অভিনব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যে-কোনো অধ্যাপক, যে-কোনো শিক্ষক এ প্রকারের অভিজ্ঞতাকে অসীম মূল্য দেন, কারণ পরের দিন থেকেই ছাত্রমণ্ডলী বেষ্টিতাবস্থায় তিনি অর্ধবিশ্বাসী তর্কবাগীশদের উদ্দেশে সবল, আত্মপ্রত্যয়জাত সুদৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারেন, 'পবিত্র রুশ দেশের পবিত্রতর সন্তদের যে অলৌকিক পরিবর্তনের কথা তোমরা পড়ছো, সেগুলো কাহিনী নয়, ইতিহাস, এবং শুষ্ক পত্রে লিখিত জীর্ণ ইতিহাস নয়, নিত্যদিনের বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্য ; সে জিনিস ভাগ্যবান চক্ষুষ্মান দেখতে পায়।' অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত নীতিবাক্য আছে :

"অদ্যাপিও সেই লীলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এবং তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, এই সাধুপুরুষকে তিনি রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত সম্রাজ্ঞীর সম্মুখীন করবেন। সব ধর্মের সর্ব ইতিহাস বলে, সাধুজনের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই। সম্রাজ্ঞীকে এই সাধু তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে এনে দেবেন সান্ত্বনা, আত্মপ্রত্যয় এবং তাঁর ধর্ম বিশ্বাস স্থাপন করবেন দৃঢ়তর ভূমিতে।

অতি সহজেই তিনি রাসপুতিনের গুণমুগ্ধ রাজপরিবারের একাধিক নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ার সহানুভূতি ও সহযোগ পেলেন। রাসপুতিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

কেউ কেউ বলেন, সেটা ছিল আকস্মিক যোগাযোগ। অধিকতর বিশ্বাসীরা বলেন, 'না, যুবরাজের কঠিনতম সঙ্কটময় অবস্থায় যখন রাজবৈদ্যগণ তাঁর জীবন রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতশ্বাস, তখন রাসপুতিন তাঁকে অনুরোধ করার পূর্বেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিষ্যগণকে প্রত্যয় দেন, তিনি যুবরাজকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারবেন।'

এতো কোনো হাস্যকর আত্মপ্রত্যয় নয়। অভিজ্ঞতম প্রবীণ চিকিৎসকও বার বার মস্তকান্দোলন করে স্বীকার করেন, কত অগুণিত রোগী যমদূতের দক্ষিণহস্ত

ধরে যখন পরপারে যাত্রার জন্য প্রথম পদক্ষেপ করেছে, রূঢ় সরল ভাষায় ঐ সব রোগীদের সম্বন্ধে যখন বহু পূর্বেই সর্ব বিশেষজ্ঞ একই বাক্যে আপন দৃঢ় নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন, ঠিক সেই সময় হঠাৎ অকারণে, চিকিৎসকের কোনো প্রকারের সাহায্য না নিয়ে সেই জীবন্মৃত ব্যক্তি শ্মশান-সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে পুনরায় লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

* *

সম্রাট এবং মহিষী উভয়েই নাকি সাধুর প্রথম দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে যান। বিশেষ করে রাজমহিষী।

অধ্যাপক বগ্‌দানফের মতে, অর্থাৎ তিনি যে জনরব সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল বলে গ্রহণ করেছিলেন সেই অনুযায়ী রাসপুতিন নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহারানীকে আশ্বাস দেন, যুবরাজ রোগমুক্ত হবেন, এবং তিনিই তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। রাজমহিষী স্বয়ং তাঁকে নিয়ে রুগীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উচ্চ কণ্ঠে, তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। যে ব্যক্তিকে সম্রাজ্ঞী নিয়ে যাচ্ছেন সে-ব্যক্তি যে চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ, সে-কথা সে-ই একাধিকবার স্বীকার করেছে, এমতাবস্থায় যখন তাঁরা আশা করেছেন যে, যে-কোন মনুষ্য বা ইতর প্রাণীর ন্যায় যুবরাজও প্রকৃতিদত্ত শক্তি বলে—যে শক্তি সর্বজনের অলক্ষিতে জীবদেহে বেঁচে থাকার জন্য সর্বব্যাধির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম দ্বারা আপন কর্তব্য করে যায়—হয়তো নিরাময় হয়ে যেতে পারেন সেই সঙ্কটজনক অবস্থায় এই নবাগত হয়তো আপন অজ্ঞতাবশত সেই শক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে।

তৎসত্ত্বেও মহারানী রাসপুতিনকে রোগীর কক্ষে নিয়ে গেলেন।

চিকিৎসকরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন। রাসপুতিন বললেন, তিনি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে চিকিৎসা করবেন না। তৃতীয় বলতে সম্রাজ্ঞীকেও বোঝায়; তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে দেহলীপ্রান্ত উত্তীর্ণ হলেন।

অতি অল্পক্ষণ পরেই রাসপুতিন দোর খুলে রানীর দিকে সহাস্য ইঙ্গিত করলেন। রানীমা কক্ষে প্রবেশ করে স্তম্ভিত। যেন কত যুগ পরে তিনি দেখলেন রাসপুতিনের দেওয়া কি যেন একটা জিনিস হাতে নিয়ে যে কোনো সুস্থ বালকের মত যুবরাজ খেলা করছেন।

রাসপুতিন প্রকৃতই যুবরাজকে তাঁর রক্তমোক্ষণ রোগ থেকে নিরাময় করেছিলেন কি না সে-বিষয়ে মতানৈক্য আছে--তবে এটাও স্মরণে আনা কর্তব্য বিবেচনা করি

যে, এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে গবেষণা, পাণ্ডিত্য, সত্যানুসন্ধান বললেই বোঝাতো —অবিশ্বাস। এই মূলমন্ত্র ঐ সময়ে এমনই সুদূরপ্রসারী হয় যে, তৎকালীন লিখিত পুস্তক, এনসাইক্লোপীডিয়াতে একাধিক যশস্বী লেখক স্বয়ং বুদ্ধ, মহাবীর, এমন কি তাঁদের আপন খৃষ্টের অস্তিত্ব পর্যন্ত সন্দেহাতীতরূপে সপ্রমাণ না হওয়ায় (দু' হাজার, আড়াই হাজার বৎসরের পরের একতরফা বা 'এক্‌স্‌পার্টে' তদন্তে।) তাঁদের জীবনী এবং বাণীকে কাল্পনিক কিংবদন্তী আখ্যা দিয়েছেন, এবং কেউ কেউ তাঁদের অস্তিত্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেছেন। অতএব সে যুগের পুস্তক যে রাসপুতিনের মত চিকিৎসানভিজ্ঞজন যুবরাজকে রোগমুক্ত করেছেন সে কথা হয় অস্বীকার করে, কিংবা নীরব থাকে। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন, রাসপুতিনের প্রাসাদ গমনাগমনের পর থেকেই যুবরাজের স্বাস্থ্যোন্নতি দিনে দিনে সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়;

আর সে যুগের সম্রাজ্ঞীদের ভিতর ধনে-ঐশ্বর্যে খ্যাতিপ্রতিপত্তিতে নিঃসন্দেহ সর্বাগ্রগণ্যা না হলেও যাঁকে ইয়োরোপের রাজন্যবর্গ-রাজপরিবার সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতেন সেই জারিনা? তিনি তো কৃতজ্ঞতার প্রতিদানস্বরূপ রাসপুতিনের পদপ্রান্তে কী যে রাখবেন তার সন্ধানই পাচ্ছেন না, কারণ সাধারণজনের মত ভবন-যানবাহন রজতকাঞ্চনে তাঁর লোভ ছিল না—তাঁর আসক্তি কিসে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—ওদিকে জারিনা আবার জাতমিস্টিক, অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে তিনি বিশ্বাস করেন এবং যাঁদের এ সব মিরাকল দেখাবার শক্তি আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে তিনি তাঁর দেহমন-আত্মা সর্বস্ব নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত।

জিতেন্দ্রিয় পরোপকারী সাধুসজ্জনদেরই না কত প্রকারের কুৎসারটে—দু' হাজার বৎসর হয়ে গেল এখনো খৃষ্টবৈরীরা বলে, তিনি নাকি অসচ্চরিত্রা যুবতীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ও মদ্যপানে তাঁর আসক্তি ছিল ঈষৎ মাত্রাধিক—সে-স্থলে রাসপুতিন। যিনি কি না, তাঁর কামানল নির্বাপিত করার চেষ্টা তো করেনই না, তদুপরি ঐ বিশেষ রিপুর চরিতার্থতাকে তুলে ধরেছেন সর্বোচ্চ ধর্মের পর্যায়ে এবং ফলে শিষ্যশিষ্যাগণসহ বহুবিধ অনাচারে লিপ্ত হন—এ সব 'অর্জি' 'সেটারনেলিয়ার' উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি—তাঁর পূর্ববর্তী মফস্বল-জীবনের তুলনায় রাজধানীতে তাঁর বর্তমান কেলেঙ্কারির বিবরণ তথা পল্লবিত জনরব চতুর্দিকে যে অধিকতর ছড়িয়ে পড়বে তাতে আর কী সন্দেহ! কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোক্ষমতর মারাত্মক কলঙ্ককাহিনী রটতে আরম্ভ করলো চতুর্দিকে; এ-সব দলবদ্ধভাবে কৃত দুষ্কর্মের 'অর্জি' এখন নাকি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে—এবং সেখানে তো সব-কিছুই নির্বিঘ্নে

সম্পন্ন হয়—পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে! সম্রান্তভম ডিউক ডাচেস, অর্থাৎ সম্রাটের নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ারাও নাকি এই সব অনাচারে অংশ নিচ্ছেন। এবং সর্বশেষে যে কলঙ্ককাহিনী পেত্রোগ্রাদে জন্মলাভ করে সর্ব রুশের সর্ব সমাজের উচ্চতম থেকে অধস্তন শ্রেণী পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে আপামর জনসাধারণকে দিল রূঢ়তম পদাঘাত সেটি আর কিছু নয়, স্বয়ং জারিনা তাঁর দেহ সমর্পণ করেছেন রাসপুতিনকে। অন্যান্য সম্রান্ত মহিলাদের তো কথাই নেই।

গ্র্যাণ্ড ডিউকই য়ুসপফের দু'টি মোকদ্দমাই ছিল এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। এই সব কলঙ্ককাহিনীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে প্রথমে ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে, পরে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, অথচ তাঁর মতে, তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রী পূর্বোল্লিখিত পাপানুষ্ঠানের সঙ্গে মোটেই বিজড়িত ছিলেন না। সে কথা পরে হবে।

আমি এতক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা দিয়ে রুশ রাজনীতি এড়িয়ে গিয়েছি কিন্তু এখন থেকে আর সেটা সম্ভবপর হবে না, কারণ, এই সময়েই কূটরাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হলধর-সন্তান রাসপুতিন হিস্সে নিতে আরম্ভ করেছেন দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ কঠিন কঠিন সংকট-সমস্যায়। ইতিমধ্যে যে সব সরল ধর্মযাজকগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে বিশ্বস্ততম সূত্রে তাঁর 'কীর্তিকলাপের' সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হয়ে তাঁর সঙ্গে সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন। কিন্তু স্বয়ং জারিনা এবং রাশার 'পোপ' হোলি সিনড যতক্ষণ তাঁর সম্মোহন-ক্ষমতায় অচেতন ততক্ষণ তাঁকে তো মুহূর্তেক তরে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। পাঠক, স্মরণ করুন সেই সুপ্রাচীন আরবী প্রবাদ: 'কুকুরগুলো ঘেউঘেউ করে, কিন্তু কাফেলা (ক্যারাভান) চলে এগিয়ে!' রাসপুতিন এই কুকুরগুলোর ঘেউঘেউকে থোড়াই পরোয়া করেন।

কিন্তু রাসপুতিন কি করে এ রকম নির্বিকারচিত্তে উপেক্ষা করলেন রুশ দেশের জনগণের রাজনৈতিক নবজাগরণকে! জার দ্বিতীয় নিকলাস যত না রক্ষণশীল, সম্রাটের সার্বভৌমিকত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁর চেয়ে শতগুণ স্থবির জড়ভরত ছিলেন তাঁর আমির-ওমরাহ। ওদিকে রুশ-সিংহ যখন সদম্ভে মূষিক জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে তার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে নির্মমরূপে পরাজিত হল, তখন আর 'হোলি' রাশার অন্তঃসারশূন্যতা গোপন রাখা সম্ভব হল না। জনমত নির্ভয়কণ্ঠে জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসন দাবি করলো। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যে বৎসর রাসপুতিন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, ঠিক সেই বৎসরেই জার প্রথম 'বিধানসভা' (এরই নাম পূর্বোল্লিখিত 'ডুমা') নির্মাণের অনুমতি দিলেন। সে

এক সত্যকার সার্কাস—নইলে তার কোন সম্মানিত সদস্য সেখানে অস্ত্রোপচারদ্বারা ইহুদিকুলকে শিখণ্ডীরূপে পরিণত করবার প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ গাম্ভীর্যমণ্ডিত পদ্ধতিতে পেশ করতে পারেন?

কিন্তু 'ডুমা' প্রতিষ্ঠান বন্ধ্যা হয়ে রইল কি না রইল সে তত্ত্ব রাসপুতিন-জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি যতদিন না রাজপ্রাসাদচক্রের দু-একজন ধুরন্ধর অতিশয় রক্ষণশীল রাজনৈতিক মন স্থির করলেন যে, রাসপুতিনকে দিয়ে তাঁরা এমন সব রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়ে নেবেন, যারা ডুমার প্রতি পদক্ষেপের পথে লৌহপ্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান হয়ে থাকবে। কূটনীতিতে আনাড়ি রাসপুতিনের হাত দিয়ে তামাক খাওয়াটা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য হল না, কিন্তু এ সব অপদার্থ-নিয়োগের পশ্চাতে কে, সে তথ্যটিও গোপন রইল না। বস্তুত স্বয়ং রাসপুতিন প্রত্যেক পার্টিতে জালা জালা মদ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুমিষ্ট কেক্‌খণ্ড (তাঁর জন্য বিশেষ করে কেকে তিন ডবল চিনি দেওয়া হত—এ বাবদে হিটলারের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ মিল) চাষাড়ে পদ্ধতিতে প্রচুর শব্দ আর বিরাট আস্বাদনসহ চিবুতে চিবুতে দম্ভ করতেন, 'এই যে দেখছো স্কার্ফখানা, এ'টি আপন হাতে বুনেছেন স্বয়ং জারিনা' (কিংবা হয়তো তাঁর আদরের ডাকনাম সোহাগভরে উল্লেখ করতেন—আমার যেন মনে পড়ছে, তাই ; কিংবা 'জানো হে, ভরনাভাকে পাঠালুম তবল্‌স্কের বিশপ করে।' প্রভু রাসপুতিনে অন্ধভক্ত, অত্যধিক মদ্যপানবশত অর্ধমত্ত শিষ্যেরাও নাকি দ্বিতীয় সংবাদটি শুনে অচৈতন্য হবার উপক্রম! কারণ প্রভুর নিত্য সঙ্গী ঐ ভরনাভা যে একেবারে আকাট নিরক্ষর! সে হবে বিশপ!

মরিয়া হয়ে অন্যতম প্রধান পাত্রী নিযুক্ত করলেন গুপ্তঘাতক। রাসপুতিন শুধু যে অনায়াসে সংকট অতিক্রম করলেন তাই নয়, এ 'সুবাদে' রাজপ্রাসাদে তাঁর প্রভাব এমনই নিরঙ্কুশ হয়ে গেল যে, স্বয়ং জার পর্যন্ত আর এখন উচ্চবাচ্য করেন না। অবশ্য সমস্ত ইয়োরোপই বিলক্ষণ অবগত ছিল যে, জার অতিশয় দুর্বল চরিত্রের 'যাক্‌গে, যেতে দাও না'—ধরনের নির্বীর্য 'শাসক'। কার্যত তাঁকে শাসন করেন জারিনা। এবং তাঁর সম্মুখে রাসপুতিনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার মত সাহস তখন কারো ছিল না।

রাসপুতিনকে হত্যা করার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ার পরই তিনি জারিনাকে সর্বজনসমক্ষে গম্ভীর প্যাকম্বরীকণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন (বা শাসান), 'আমার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে গোষ্ঠীসুদ্ধ রমানফ পরিবার (অর্থাৎ সপরিবারে তখনকার জার) নিহত হবে।' নিহত তাঁরা হয়েছিলেন, এবং অতিশয় নিষ্ঠুর পদ্ধতিতেই, কিন্তু

সেটা ঠিক এক বৎসরের ভিতরই কিনা, বলতে পারবো না, দু' বৎসরও হতে পারে।

কিন্তু জারিনা? তাঁর শোচনীয় অবস্থা তখন দেখে কে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অতিপ্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাসী এই মূঢ় রমণীর যত দোষই থাক, একটা কথা অতিশয় সত্য, তিনি তাঁর পুত্রকন্যাকে বুকে চেপে ধরে রেখেছিলেন পাগলিনী-পারা। উদ্‌ভ্রান্ত তাঁর আর্ত সশঙ্ক দৃষ্টি, না জানি কোন্ অজানা অন্ধকার অন্তরাল থেকে কোন্ অজানা এক নূতন সংকট অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হবে, তাঁর কোনো একটি বৎসকে ছিনিয়ে নেবার জন্য।

অতএব প্রাণপণ প্রহরা দাও রাসপুতিনের চতুর্দিকে। তিনিই একমাত্র মুশ্‌কিল্‌-আসান্। এই 'হোলিম্যান' আততায়ীর হস্তে নিহত হলে সর্বলোকে সর্বনাশ

কিন্তু বিশ্বসংসারের সকলেই রাসপুতিনের সাবধানবাণী বা শাসানোতে বিশ্বাস করেন নি এবং ভয়ও পান নি। বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চস্তরের রাজবক্ত-ধারী একাধিক ব্যক্তি। এঁরা ক্রমাগত জার-জারিনাকে রাসপুতিন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন, এবং ফলে তাঁদের প্রতি বর্ষিত অপমানসূচক কটুবাক্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন। রাজপ্রাসাদে এঁরা হচ্ছেন অপমানিত—অথচ রাসপুতিনের 'শুভাগমনের' পূর্বে এঁরাই ছিলেন সেখানে প্রধান মন্ত্রণাদাতা। এখন তাঁদের এমনই অবস্থা যে, বাইরের সমাজে তাঁরা আর মুখ দেখাতে পারেন না। তাঁদের পদমর্যাদা, অভিজাতরক্ত প্রকাশ্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ থেকে তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে সত্য, কিন্তু ভিতরে বাইরে, স্ফুট অস্ফুট নিত্যদিনের এ অপমান আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! ওদিকে 'হোলি রাশা' যে কোন্ জাহান্নমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কে জানে।

অপমানিত সর্বোচ্চ অভিজাতবংশজাত তিনজন বসলেন মন্ত্রণাসভায়।

স্থির হল, ইউসুপফই হত্যা করবেন রাসপুতিনকে। তাই আজও লোকে বলে, 'তোমার স্ত্রীকে রাসপুতিন ধর্ষণ করেছিল বলেই তো তুমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে, নইলে রাশাতে কি আর অন্য লোক ছিল না?' ইউসুপফ এটা অস্বীকার করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রধানদের আদেশানুযায়ীই তিনি ঐ কর্মে লিপ্ত হন, আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় নিজকে ভলন্টিয়ার করেন যদিও তাঁর স্ত্রী ধর্ষিতা হন নি। এ সম্বন্ধে ইউসুপফের আপন জবানী পাঠক বিশ্বাস করতে পারেন, নাও করতে পারেন; আমি শুধু বগ্‌দানফ সাহেবের জবানীটি পেশ করছি। না হয় সেটা ভ্রান্তই হল, তাতেই বা কি? তদুপরি আমার স্মৃতিশক্তি আমার কলম নিয়ে কি যে খেলা খেলছে, জানবো কি করে?

এবং আশ্চর্য! হত্যা করবেন আপন বাড়িতেই তাঁকে সসম্মান নিমন্ত্রণ করে। পুলিসকে ভয় করতেন এঁরা থোড়াই। কিন্তু জানিনা? তিনি যে শেষ পর্যন্ত হত্যাকারী কে, সে খবরটা প্রায় নিশ্চয়ই জেনে যাবেন, এবং তার ফলাফল কি হতে পারে, না পারে, সে নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এ ছাড়া গত্যন্তর নেই—নান্য পন্থা বিদ্যতে।

ইউসুপফ পক্ষ যে রাসপুতিনের শত্রু তিনি এটা জেনেশুনেও ইউসুপফের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে এলেন কেন? কেউ বলে, ইউসুপফের সুন্দরী স্ত্রী ইরেনে তাঁকে 'বিশেষ' প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলেন, কেউ বলে, রাসপুতিন সত্যাই আশা করেছিলেন, মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার ফলে হয়তো প্রাসাদের এই শত্রুপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে, কেউ বলে, রাসপুতিন প্রাসাদ জয় করেছিলেন বটে কিন্তু ইউসুপফের মত অভিজাতবংশের কেউ কখনো তাঁকে নিমন্ত্রণ করা দূরে থাক, বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকতে দিতেন না। ইউসুপফ জয় অর্থই পেত্রোগ্রাদ-অভিজাতকুল জয়। তার অর্থ, নূতন শিষ্যা, নূতন···একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাণ্ডার!

প্রায় সবাই বলেছে, মদে দেওয়া হয়েছিল প্রচুর পটাসিয়াম সায়েনাইড, কিন্তু অধ্যাপক বলেছিলেন, মধুভরা বিরাট কেকের সঙ্গে মিশিয়ে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় পন্থাতেই আততায়ীর ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। মহামান্য অতিথি রাসপুতিনকে অবশ্যই দিতে হত বংশানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত অত্যুৎকৃষ্ট খানদানী মদ্য; এবং ভদ্রতা রক্ষার জন্য অতিথি-সেবককেও নিতে হত সেই বোতল থেকেই! এইটেই সাধারণ রীতি। কিন্তু পার্টিতে সবাই তো আর কেক খায় না—তাও আবার তিন ডবল মধুভর্তি স্পেশাল 'রাসপুতিন কেক্'—তদুপরি, বিরাট কেকের দু-আধা দুই পদ্ধতিতে নির্মাণ করে জোড়া দেওয়া অতি সহজ।

তা সে কেক্ই হোক্ আর খানদানী মদই হোক—রাসপুতিন তাঁর বীভৎস অভ্যাস মত সে-বস্তু খেয়ে গেলেন প্রচুরতম পরিমাণে, এবং তাজ্জব কী বাৎ। তাঁর কিছুই হল না। চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়লো না। আমার সুস্পষ্ট মনে আছে এস্থলে অধ্যাপকও আপন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'মাই বয়! দেয়ার উয়োজ ইনাফ পয়জন টু নক্ অফ্ সিক্স্ বুল্জ।' অর্থাৎ ঐ বিষে ছ'টা আস্ত বলদ ঘায়েল হয়। কিন্তু রাসপুতিন নির্বিকার! ইউসুপফরা জানতেন না, রাসপুতিনকে ইতিপূর্বে একাধিকবার বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা নিষ্ফল হয়। ম্যাজিশিয়ানরা যে রকম ব্লেড খায়, রাসপুতিন ঠিক সেই রকম হরেক জাতের বিষ খেতে তো পারতেনই, হজমও করতেন অক্লেশে।

ষড়যন্ত্রকারীরা পড়লেন মহা ধন্দে। তাঁদের সব প্ল্যান ভণ্ডুল।

তখন ইউসুপফ অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের ফিসফিস করে বললেন, 'এ রকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আমি ওকে গুলি করে মারবো।'

পিছন থেকে ঠিক ঘাড়ের উপর, অর্থাৎ সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায়, একেবারে কাছে এসে ইউসুপফ গুলি ছুঁড়লেন। রাসপুতিন রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

সে তো হল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা এখন সম্মুখীন হলেন এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নূতন সমস্যার। জখমহীন মৃতদেহ যত সহজে হস্তান্তর করা যায়, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে কর্মটা তো অত সহজ নয়। এখন কি করা কর্তব্য সেটা স্থির করার জন্য দলের আর যাঁরা সন্দেহ না জাগাবার জন্য পার্টিতে যোগ না দিয়ে উপরের তলায় অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের সঙ্গে ইউসুপফাদি যোগ দিলেন। তার পূর্বে তিনি লাশটা টেনে টেনে সেলারে (মাটির নিচে কয়লা এবং আর-পাঁচটা বাজে জিনিস রাখার গুদোম) রেখে এলেন। পাছে হঠাৎ কেউ ডাইনিংরুমে ঢুকে লাশটা আবিষ্কার করে ফেলে।

স্থির হল, রাসপুতিনের লাশ ইউসুপফের বাড়ির কাছে নেভা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। সেটা ডিসেম্বর মাস।* নেভার উপরকার জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। সেইটে ভেঙে লাশ ভিতরে ঢুকিয়ে গায়েব করে দেওয়া কঠিন কর্ম নয়।

এইবারে সবাই হলেন—যাকে বলে বজ্রাহত। এবং ভুলবেন না, এঁদের অধিকাংশই ফৌজের আপিসার। এঁদের কাউকে হকচকাতে হলে রীতিমত কষ্ট করতে হয়, আর মৃত্যুভয়? ছোঃ।†

তা নয়! সবাই সেলারে ঢুকে দেখেন, রাসপুতিনের লাশ উধাও! ঘাড়ের

* রাসপুতিনের মৃত্যুদিবস ১৫।১৬ ডিসেম্বর ১৯১৬ বলা হয়, আবার ৩০ ডিসেম্বরও বলা হয়। তার কারণ অর্থডক্স রুশ ক্যালেণ্ডার ও কন্টিনেন্টে প্রাচীন ক্যালেণ্ডারে ১৩।১৪ দিনের পার্থক্য।

† অধ্যাপক আমাকে গল্পচ্ছলে একদা বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশান অফিসারদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা (প্যাস্টাইম) ছিল প্রচুর মদ্যপানের পর লটারিযোগে দুজন অফিসারের নাম স্থির করা। তারপর একজন একটা ঘরে ঢুকে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় স্থান বেছে নিয়ে ঘরের সব আলো নিবিয়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকবে অন্য অফিসার, হাতে সবচেয়ে ছোট সাইজের পিস্তল নিয়ে। প্রথম অফিসার আশ্রয়স্থল থেকে কোকিলের এক ডাক ছাড়বে, "কু"; অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকারে শব্দমাত্রে ধ্বনির উপর নির্ভর করে পিস্তল মারবে। তখন সেই অন্ধকারে 'শিকার' জায়গা বদলাবে, কিন্তু "কু" ডাক না ছাড়া পর্যন্ত পিস্তল মারা বারণ। কতক্ষণ পরে দুজনের পার্ট বদলায়, আমার মনে নেই।

সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায় গুলি খেয়ে যে-লোকটা পড়ে গিয়ে 'মরলো', সে যে শুধু আবার বেঁচে উঠলো তাই নয়, আপন পায়ে হেঁটে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

অবশ্য এ-কথা ঠিক, ইউসুপফ সেলারের দরজা বাইরের থেকে তালাবদ্ধ করেন নি, এবং খামোখা বেশী লোক যাতে না জানতে পারে তাই সে রাত্রে অধিকাংশ চাকর-বাকরকে ছুটি দিয়ে রেখেছিলেন।

রাসপুতিন যদি এখন কোনো গতিকে জারিনার কাছে পৌঁছে সব বর্ণনা দেন—এবং নিশ্চয়ই তিনি করবেন তবে ইউসুপফের অবস্থাটা হবে কি?

কিন্তু তিনি অতশত ভাবেন নি—অন্যান্যদের জবানী তাই। তাঁরা বলেন, তিনি পাগলের মত পিস্তল হাতে নির্জন রাস্তায় ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দেখেন, চতুর্দিকের সেই শুভ্র শুভ্রতাময় বরফের ভিতর দিয়ে টলতে টলতে রাসপুতিন এগিয়ে যাচ্ছেন। রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবারে ইউসুপফ আর কোনো চান্‌স্ নিলেন না। পিস্তলে যে কটা গুলি ছিল সব কটা ছুঁড়লেন তাঁর ঘাড়ের উপর। তারপর সবাই মিলে তাঁকে টেনে নিয়ে, নেভা নদীর উপরকার জমে-যাওয়া বরফ ভেঙে লাশটা ঢুকিয়ে ঠেলে দিলেন ভাটির দিকে।

কিন্তু জারিনা সে-দেহ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চার্চেরই মত একটি বিশেষ উপাসনাগারসহ নির্মিত চেপলে তাঁর দেহ সযত্নে গোর দেওয়া হল একটি রমণীয় পার্কের ভিতর। মহারানী প্রতি রাত্রে যেতেন সেই গোরের পাশে, নীরবে অঝোরে অশ্রুবর্ষণ করার জন্য, রাসপুতিনের আত্মার সদ্গতি কামনা করে॥

২২।১।৬৬॥

মিশরের পসারী—গন্ধবণিক—যে রকম ভারতের শঙ্খচূর্ণ* এবং অগুরু আতর বিক্রি করে, ঠিক তেমনি কাইরোর পুস্তক-বিক্রেতা বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বুদ্ধজীবনী' বিক্রি করে। কিন্তু সে 'বুদ্ধজীবনী' কে লিখেছেন, কেউ জানে না।

অবশ্য পঞ্চতন্ত্র সেখানে অন্য নামে পরিচিত। আরবীতে বলে 'কলীলা ওয়া + দিমনা'। এ দুটি—কলীলা ও দিম্‌না—দুই শৃগালের নাম। সংস্কৃতে করটক ও দমনক। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, গোড়াতে পঞ্চতন্ত্রের ঐ নামই ছিল। পরবর্তী যুগে ওটিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পঞ্চতন্ত্র নাম দেওয়া হয়। পাঁচ সংখ্যায় কেমন যেন একটা ম্যাজিক আছে কিংবা চোখের সামনে আপন হাতের পাঁচটা আঙুল যেন কোনো ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত তথ্য, গল্প, প্রবাদ-সমষ্টিকে পাঁচের কোটায় ফেলতে চায়। বাইবেলের 'প্রাচীন নিয়মে' (ওল্‌ড টেস্টামেণ্ট) হয়তো এই কারণেই 'পেণ্টাটয়েশ'='পঞ্চগ্রন্থ' আছে। এদানির আমরা পাঁচ-শালার পরিকল্পনা করি।

তা সে যাই হোক, আমাদের এই তৃতীয়/দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পঞ্চতন্ত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ইরানে পেহ্‌লেভি (সংস্কৃতে পহ্‌লভী) ভাষাতে অনূদিত হয়। তার একটা বাইরের কারণও ছিল। প্রাচীন ইরানের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস রোমের সম্পর্ক বহুকালের। কখনো যুদ্ধের মারফতে, কখনো শান্তির। শান্তির সময় উভয়ে একে অন্যের উপর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতে ইরানীরা গ্রীসের উপর বিরক্ত হয়ে (ফেড্‌ অপ্‌) পূবের দিকে মুখ

* এই শঙ্খচূর্ণ নিয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে একটা 'কেলেঙ্কারি' হয়ে যায়। যেসব শাঁখারী পূর্ব বাঙলা থেকে এসে পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের দরকার শঙ্খের। শঙ্খ প্রধানত বিক্রি হয় মাদ্রাজ অঞ্চলে এবং তার অন্যান্য খরিদ্দার আরব দেশ, মিশর ইত্যাদি। তারা শাঁখ গুঁড়ো করে ওষুধ বানায়। আমাদের গরীব শাঁখারীরা যে দাম দিতে প্রস্তুত ছিল (সোজাসুজি, না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মারফৎ, আমার ঠিক মনে নেই) আরবরা তার কিঞ্চিৎ বেশী দাম দিতে রাজী ছিল বলে মাদ্রাজ তাবৎ শঙ্খ বিক্রি করে দেয় ওদের। ফলে বহু শাঁখারী বেকার হয়ে যায়।

+ কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা আরবীর এই 'ওয়া'='অ্যাণ্ড'=এবং থেকে থেকে বাঙলা 'ও' এসেছে।

ফেরালে। ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্র রাজা খুসরৌ অনুশিরওয়ানের* আমলে পহ্লভীতে এবং অল্পকালের ভিতরই পহ্লভী থেকে সিরিয়াকে অনূদিত হল।

এই প্রথম—সর্বপ্রথম কিনা বলা কঠিন—একখানা আর্য ভাষায় লিখিত পুস্তক আর্যেতর ভাষায় অনূদিত হল,† কারণ সিরিয়াক ভাষা হীব্রু, আরামেয়িক ও আরবীর মত সেমিতি ভাষা। ইরাক সিরিয়া অঞ্চলে প্রচলিত এই সিরিয়াক ভাষা ও সাহিত্য (৩য় থেকে ১৪ শতাব্দী পর্যন্ত এর আয়ু) বরাবরই ইরানের সঙ্গে লেনদেন রাখতো বলে পহ্লভীতে কোনো উত্তম গ্রন্থ অনূদিত হলে, সেটি সিরিয়াকেও অনূদিত হত। (পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরেকখানি ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ পহ্লভী হয়ে সিরিয়াকে অনূদিত হয়, এর পরবর্তী যুগে মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপে পঞ্চতন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশী সম্মান পায়—তার কথা পরে হবে।)

বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের কপাল ভালো। পহ্লভীতে যিনি এ পুস্তক অনুবাদ করেন তিনি ছিলেন রাজবৈদ্য; অতএব সুপণ্ডিত। সিরিয়াকে যিনি তদনুবাদ করেন তিনিও জ্ঞানীজন, কারণ এ গ্রন্থ অনুবাদ করার পূর্বেই তিনি কিয়ৎপরিমাণ গ্রীক দর্শনও কৃতিত্বসহ সিরিয়াকে অনুবাদ করেছিলেন।

পহ্লভী অনুবাদটি লোপ পেয়েছে, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনূদিত সিরিয়াক অনুবাদটি ("কলিলগ্" দমনগ্) এখনো পাওয়া যায়।

এর প্রায় দু'শ বৎসর পর—মোটামুটি হজরৎ মুহম্মদের জন্মের দেড় শ' বৎসর পর—জনৈক আরব আলঙ্কারিক পঞ্চতন্ত্র আরবীতে অনুবাদ করেন। আরবী সাহিত্যের তখন কৈশোরকাল। এই পুস্তক অনুবাদ করার সময় অনুবাদক আব্দুল্লা ইব্ন অল্-মুকাফ্ফার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তরুণ আরব সাহিত্যিকদের শৈলী বা স্টাইল

* এই খুসরৌর আমলেই চতুরঙ্গ খেলা ভারত থেকে ইরানে যায়।

† তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, এই সর্বপ্রথম সেমিতি জগতে ভারতী সাহিত্য পরিচিত হল। বস্তুত এর অনেক পূর্বেই জাতকের বহু গল্প কাফেলা [ক্যারাভান] ও চক্রির কথকদের [স্টোরি-টেলার] মারফতে গ্রীস রোম পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বৌদ্ধ শ্রমণরা খৃষ্টজন্মের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্য ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তারও পূর্বে লোহিত সমুদ্রের কূল ধরে ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; এমন কি প্রাচীনকালে মোহেনজোদড়োর সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উপস্থিত এগুলো আমাদের আলোচনার বাইরে। এবং বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করলে যে সব গ্রন্থ অনূদিত সেও এ আলোচনার বাইরে।

শেখানো—বিশেষ করে যারা 'ব্যাল-ল্যাৎর' বা রম্যরচনায় হাত পাকাতে চান।*
পহ্‌লভী সিরিয়াক হয়ে আরবীতে পৌঁছতে গিয়ে বিষ্ণুশর্মা নামটি কিন্তু এমনই রূপান্তরিত হয়ে যায় যে আরবরা ভাবে, ইনি বিদ্যাপতি, এবং সেই অনুসারে তাঁর নাম লেখা হয় বীদ্‌বা বীদ্‌পা বীদপাই (আরবীতে 'প' অক্ষর নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে কাছাকাছি অন্য দুই অক্ষর দিয়ে 'প' ও 'চ' বোঝাবার চেষ্টা করা হয়)। আরবী অনুবাদ হয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং তার হীব্রু অনুবাদ দ্বাদশ শতকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনৈক ক্যাথলিক কার্ডিনালের জন্য এটি লাতিনে 'ডিরেক্‌টরিয়ুম ভিটে্য হুমানো' (অর্থাৎ মোটামুটি 'মানব-জীবনের জন্য "হিতোপদেশ"—'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' যে সংশ্লিষ্ট সে কথা মধ্যপ্রাচ্যে জানা ছিল) নাম নিয়ে ইয়োরোপে প্রচারিত হয়, এবং এই অনুবাদের উপর নির্ভর করে পরবর্তী কালে ইয়োরোপের প্রায় তাবৎ অর্বাচীন ভাষাতে 'বিদপাই-এর নীতিগল্প' বা 'কলীলা ও দিম্‌না' রূপে অনূদিত হয়ে প্রখ্যাতি লাভ করে।

'জাতক,' 'পঞ্চতন্ত্র' 'হিতোপদেশে'র বিজয়-যাত্রা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেছেন স্বর্গত ঈশান ঘোষ। তাঁর অতুলনীয় জাতক অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথকভাবে কথিত নহে। এক একটি তন্ত্রে এক একটি কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশেপাশে অন্য বহু কথা সংযোজিত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্মদ্দেশে বেতাল পঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আরবে নৈশোপাখ্যানমালা এবং য়ুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেই এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উক্তরূপে এক সূত্রে নিবদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।' এ অনুচ্ছেদ ঈশান ঘোষ শেষ করেছেন, এই বলে—'হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি

* অধীন এই উদ্দেশ্য নিয়েই বছর ষোল পূর্বে 'পঞ্চতন্ত্র' সিরিজ 'দেশ' পত্রিকায় আরম্ভ করে। নইলে বিষ্ণুশর্মার অনুকরণ করার মত দম্ভ আমার কখনো ছিল না। এর অল্প পরেই Indian Council for Cnltural Relatious-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকাকালীন মরহুম মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে আমরা একখানা আরবী ত্রৈমাসিক ('সকাফৎ-উল-হিন্দ,' 'ভারতীয় সংস্কৃতি') প্রকাশ করি ও ঐ সময় মিশরাদি একাধিক দেশ থেকে অনুরোধ আসে যে, যেহেতু অতকায় 'কলীলা ওয়া দিমনা' ও 'পঞ্চতন্ত্রে' প্রচুর তফাত, অতএব আমরা যেন একখানি নূতন অনুবাদ প্রকাশ করি। আমরা সে কাজ সানন্দে প্রোক্ত পত্রিকায় আরম্ভ করি।

সভ্য অসভ্য সর্ব দেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোনো পুস্তকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই।'*

অজহর বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে যে পুস্তক-বিক্রেতা আমাকে 'কলীলা ওয়া দিমনা' বিক্রি করে, সে ইঙ্গিত দেয়, আরেকখানি ভারতীয় পুস্তক কপ্ট খৃষ্টানরা (এঁরা নিজেদের ফারাওয়ের বংশধর বলে দাবি করেন) কিছুদিন পূর্বে আরবীতে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

তখন কপ্ট বন্ধুদের কাছে অনুসন্ধান করে জানতে পারি, এর আরবী নাম 'সুৎরহ বার্লাম ওয়া য়ুআসফ'। এ পুস্তকের প্রধান নায়ক দু'জন খৃষ্টধর্মে সেন্টরূপে স্বীকৃত হয়েছেন—ক্যাথলিক উভয়কে স্মরণ করেন ২৭ নভেম্বর ও য়ুআসফকে গ্রীক চার্চ স্মরণ করেন ২৬ অগস্ট (সেন্টস্ ডে)।

তখন অনুসন্ধান করে দেখি, 'য়ুআসফ' নাম এসেছে 'বোধিসত্ত্ব' থেকে ও 'বার্লাম এসেছে 'বুদ্ধ ভগবান'-এর 'ভগবান' থেকে।

এ পুস্তকের কাহিনী পঞ্চতন্ত্রের চেয়েও বিস্ময়জনক॥

২।৪।৬৬

* ঈশান ঘোষের বাঙলা জাতক কী জর্মন, কী ইংরিজি, কী হিন্দী সব জাতকানুবাদের চেয়ে শত গুণে শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ পরিশ্রম ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ঈশান এই অনুবাদ সম্পন্ন করে বঙ্গবাসীকে চিরঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। এ অনুবাদ প্রকাশিত হলে পর পালিপণ্ডিতো আরেক ধনুর্ধর বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী এর সমালোচনা করেন। পরম লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় ঈশানের অনুবাদ বহু বৎসর পূর্বে নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও এর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। শুনতে পাই, সাহিত্য আকাদেমি স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙলা কোষ পুনর্মুদ্রণ করেছেন। তাঁরা যদি (বিধুশেখরের আলোচনা সহ) এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে সহায়তা করেন তবে গৌড়জন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

বার্লাম ও য়োসাফট্

ইয়োরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের চার-পাঁচটি ভাষা নিয়ে প্রায় ষাটটি ভাষায় অনূদিত 'বার্লাম ও য়োসাফট্' ইয়োরোপে ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়া থেকে খৃষ্টানমঠে তথা সাধুসন্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হয়ে ক্রমে ক্রমে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রধান কারণ, অতি সুমধুর সরল গল্পচ্ছলে এই পুস্তকে বর্ণিত খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য ইতিপূর্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোনো ভাষাতেই রচিত হয় নি—এমনকি, খৃষ্টধর্মের প্রাচীনতম প্রধান বাহক গ্রীক, লাতিন এবং হীব্রুতেও না। তাই দেখতে পাই, ইংলণ্ডে ছাপাখানা নির্মিত হওয়ার পর উইলিয়াম ক্যাকস্টন যে-সব পুস্তক ছাপান, তার মধ্যে এই পুস্তকটিও ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী অনুবাদে আছে। অবতরণিকারূপে এখানে এ-পুস্তক সম্বন্ধে আরো বহু বিস্তর চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান তত্ত্ব তথ্য নিবেদন করা যায়, কিন্তু আমাদের ধারণা, পুস্তকের উপাখ্যানটি এস্থলে অতিশয়তম সংক্ষেপে বর্ণনা করে নিলেই সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা হবে—পাঠক নিজের থেকেই অনেক-কিছু কল্পনা করে নিতে পারবেন।

ভারতবর্ষে এক পরাক্রমশালী নরপতি পুত্রহীন অবস্থায় অতিশয় মনকষ্টে দীর্ঘকাল জীবন যাপন করার পর এক অভূতপূর্ব সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান লাভ করেন। মহাসমারোহে তাঁর নামকরণ করা হল য়োসাফট্ (গ্রীক অনুবাদে Josaphat) এবং রাজা সে-যুগের শ্রেষ্ঠতম কালডীয় (Chaldaean) জ্যোতিষীদের নিমন্ত্রণ ক'রে রাজপুত্রের জন্মকুণ্ডলী নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। তাঁরা সবাই একবাক্যে রাজাকে জানালেন, নবজাত কুমারের ভবিষ্যৎ গর্ব গৌরব ধারণ করে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি হবেন বিরলতম মহাত্মাদের মধ্যে বিরল, কিন্তু তিনি পিতৃ-পিতামহের সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে সত্যধর্মের সন্ধানে গৃহত্যাগ করবেন। বলা বাহুল্য, নৃপতি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং এই মর্মন্তুদ ভবিষ্যদ্বাণী যাতে সফল না হয়, তার জন্য মন্ত্রণা গ্রহণ করে আদেশ দিলেন, রাজপুত্রকে যেন পরম রমণীয় এক রাজ-প্রাসাদের ভিতর চিত্তাকর্ষণীয় সদানন্দময় পরিবেশে রাখা হয়। প্রাসাদ থেকে বাইরে এসে তিনি যেন কোনো অবস্থাতেই জরামৃত্যুর (ইংরেজী অনুবাদ আছে misery and death, জর্মনে আছে ঐ একই—Elend und Tod, খুব সম্ভব জরার প্রকৃত প্রতিশব্দ ইয়োরোপীয় কোনো ভাষাতেই নেই বলে তৎপরিবর্তে

'মিজরি' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে) সংস্পর্শে না আসতে পারেন : রাজা অনুমান করে নিয়েছিলেন, সদাসুখীজন যে পরিবেশে আনন্দ লাভ করেছে, সেটা পরিবর্তন করে সে অন্য পরিবেশের সন্ধানে যাবে, 'কোন্ দুঃখে' ?

কাহিনীর এই অংশটুকু শোনামাত্রই যে-কোনো ভারতীয়, সিংহলী, তিব্বত-চীন-জাপান-শ্যামবাসীর মনে উদয় হবে, এ-যেন বড় চেনা-চেনা ঠেকছে, একি যুবরাজ সিদ্ধার্থের জীবন নয় ? তাই যদি হয়, তবে সে-কাহিনী সর্বধর্মের সর্ব-সজ্জনকে উৎসাহ এবং আনন্দ দান করলেও সেটি খৃষ্টধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে সম্মানিত হবে কি প্রকারে ? কাহিনীর পরের অংশটুকু শুনলেই সেটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হবে। কিছুটা আগেও বলা হয়েছে, সেটা আমি ইচ্ছে করেই আগে বলি নি, কারণ, তা হলে সিদ্ধার্থকে চিনতে পাঠকের অসুবিধা হত।

কাহিনীতে আছে, রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল (এটা অবশ্যই সত্য নয়, এবং এরকম আরো পরিবর্তন পরিবর্ধন পাঠক পাবেন ; কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলো করা হয়েছিল, পাঠক ক্রমশ বুঝতে পারবেন) * কিন্তু যুবরাজের পিতা সে ধর্মের ঘোরতর শত্রু ছিলেন এবং রাজ্যে তার প্রসার বেড়ে যাচ্ছে দেখে রাজাদেশ প্রচারিত করেন যে প্রজাসাধারণ, পাত্র-অমাত্য যে কেউ এই নবীন ধর্ম গ্রহণ প্রচার প্রসার করবে, সে দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজারই এক অন্তরঙ্গ সখা এবং মন্ত্রী খৃষ্টধর্মগ্রহণ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণা করার জন্য মরুভূমিতে চলে যান (মিশরের খৃষ্টান সাধুরা দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায়শ লীবিয়া-মরুভূমিতে অন্তর্ধান করতেন)। রাজাদেশে তাঁকে খুঁজে মরুভূমি থেকে ফিরিয়ে আনলে পর তিনি রাজসভায় তাঁর আচরণ বোঝাতে চেষ্টা করেন ও ক্ষমা ভিক্ষাও করেন। রাজা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নিজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন।

এদিকে রাজপুত্র যৌবনে পদার্পণ করে আর প্রাসাদে বন্দী হয়ে থাকতে চাইলেন না ; তাঁর ইচ্ছা, তিনি বাইরের বিশাল জগতে বেরিয়ে গিয়ে সেখানে নব নব

*ধর্মের ইতিহাসে এটা কিছু নূতন নয়। কাঠিয়াওয়াড়ে হিন্দু লোহানা রাজপুতদের ইসমাঈলীয়া (ইসলামেরই এক) সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কাহিনী নির্মিত হয় যে, হিন্দুদের যে কল্কি অবতারের আবির্ভূত হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে মক্কা নগরে হজরৎ আলীরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়ে গেছেন। সত্যপীরও তুলনীয়।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যে কন হকমান্‌সটালের কবিতার বাংলা অনুবাদ নিয়ে আলোচনা হয় তিনিও এই গ্রন্থের গল্প মূলসূত্ররূপে নিয়ে তাঁর সৃজনীশক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন। নাম 'ইয়েডেরমান' = 'এভরিবডি'।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং সেই মর্মে পিতার অনুমতি ভিক্ষা করলেন। অতিশয় অনিচ্ছায় তিনি সম্মত হলেন। ফলে রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে এক এক জন করে অন্ধ, কুষ্ঠরোগী, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ও সর্বশেষে একটা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ব্যথাতুর হয়ে এর কারণ সম্বন্ধে কাতর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং উত্তরে শুনতে পান, এসব দুঃখ দুর্দৈব মানুষমাত্রেরই ললাটে লেখা আছে। অত্যন্ত বিচলিত ও অভিভূত হয়ে তিনি অনুসন্ধানের ফলে আরো জানতে পান, এসব দুঃখ-দুর্দৈব থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাবার পন্থা জানেন শুধু এক শ্রেণীর সাধুসন্ত—তাঁরা সংসার ত্যাগ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকেন। রাজপুত্রের প্রবল ইচ্ছা হল, এঁদেরই মুখ থেকে তিনি তত্ত্বকথা শুনবেন, কিন্তু তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ করা অসম্ভব কারণ, তাবৎ সাধু-সন্তকে রাজাদেশে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে এক অতিশয় পূত পবিত্র তথা ধর্মজ্ঞ সাধু মণিকারের ছদ্মবেশ পরে রাজসভায় আবির্ভূত হলেন এবং রাজপুত্রের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথা তাঁকে বোঝাতে লাগলেন। সে সময় তিনি নানা গল্প, নানা কাহিনী কীর্তন করে সংসারের অসারতা ও প্রকৃতধর্ম কি, সে-সব সপ্রমাণ করেন।

(এই গল্পগুলো গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক অংশ গ্রহণ করে আছে। এগুলোর অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল যে ভারতবর্ষ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে নিয়ে ইউরোপে প্রচুর গবেষণা করা হয় তবু সবগুলোর মূল তখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি, হয়তো কখনো পাওয়া যাবে না। তবে কয়েকটি নিঃসন্দেহে জাতক থেকে নেওয়া হয়েছে (আশ্চর্য! স্বয়ং বোধিসত্ত্ব যে-সব গল্প জাতকে বলে গেলেন, য়োসাফট্‌রূপে তাঁকে আবার সেগুলোই উপদেশরূপে শুনতে হল!) এবং কিছু মহাভারত থেকেও। এদেশে কোথায় কি পরিমাণ গবেষণা হয়েছে সেকথা বলা কঠিন—এই গ্রন্থ নিয়ে কোনো গবেষণা আমার চোখে পড়ে নি। এ কর্ম করার সর্বাপেক্ষা শাস্ত্রাধিকার ছিল স্বর্গত ঈশান ঘোষের। তিনি তাঁর জাতক-অনুবাদের উপক্রমণিকায় এ পুস্তক নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেখানে স্থান সংকীর্ণ এবং এর গল্পগুলো ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন পাঠে বড়ই ভিন্ন ভিন্ন—এমন কি জাপানী 'শক জিৎসু রকু'ও যে এ আলোচনায় স্থান পায় সে তত্ত্ব কয়েক বৎসর পূর্বে জর্মন গবেষকগোষ্ঠী উল্লেখ করে গেছেন এবং এ দেশে বসে সেগুলো সংগ্রহ করা অসম্ভব না হলেও সুকঠিন।)

যে-মণিকার রাজপুত্রকে উপদেশ দিলেন তিনিই এ গ্রন্থের বার্লাম। রাজপুত্র মনস্থির করলেন, তিনি বার্লামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। এ সংবাদ শুনে রাজা

ক্ষোভে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়। সর্ব প্রথমেই তিনি বার্লামকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন, কিন্তু তিনি ততক্ষণে নগর ত্যাগ করেছেন। রাজা যখন দেখলেন পুত্র কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করবেন না তখন তিনি ধূর্ত পন্থা অবলম্বন করলেন। নাকোর নামক এক অচেনা জনকে তিনি নিযুক্ত করলেন, সে এসে সভাস্থলে খৃষ্টধর্মের সপক্ষে দুর্বল, ভ্রমাত্মকযুক্তি প্রয়োগ করে তর্কযুদ্ধে সভাপণ্ডিতদের কাছে হেরে যাবে; এই করে খৃষ্টধর্ম সর্বজন সমক্ষে লাঞ্ছিত হলে যুবরাজ নিশ্চয়ই বার্লামের অনুসরণ করার ব্যর্থতা বুঝতে পারবেন। কিন্তু রাজপুত্র সংবাদ পেয়ে গোপনে নাকোরকে এমনই তিরস্কার করলেন যে, সে শেষ পর্যন্ত রাজসভায় বাগ্মিতাসহ অব্যর্থ যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করল। এর পর নাকোরও খৃষ্ট সাধুরূপে নির্জন ভূমিতে অন্তর্ধান করে। রাজা তখন জাদুকরের শরণাপন্ন হলেন। সে তখন পার্থিব ভোগ-বিলাসের মায়াজাল বিস্তার করে যুবরাজকে প্রলোভিত করার চেষ্টা দিয়ে নিষ্ফল তো হলই পক্ষান্তরে যুবরাজ তাঁকে একটি কাহিনী বলে স্বধর্মে দীক্ষিত করলেন। এর সঙ্গে মার-এর মিল দেখা যাচ্ছে, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রে সে ধ্যানী বোধিসত্ত্বকে প্রচুর মারণাস্ত্র দিয়ে ভয়ও দেখায়।

সর্বশেষে রাজপুত্র বোধিসত্ত্ব বা য়োসাফট্‌রূপে রাজপুরী ত্যাগ করে বার্লামকে খুঁজে পেলেন। তাঁকে সখা ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে উভয়ে ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত হলেন।

* *

এ গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের কাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম জুড়ে দিয়ে সে ধর্মের যে জয়জয়কার করা হল তার প্রণেতা কে জানবার উপায় নেই। পঞ্চতন্ত্রের মত এ-গ্রন্থও রাজা খুসরৌর আমলে পহ্‌লভীতে অনূদিত হয় এবং ওরই মত, তারপর, সীরিয়াকে। তার থেকে হয় গ্রীক অনুবাদ এবং উপক্রমণিকায় বলা হয় 'একটি উপকারী কাহিনী…আবিসিনিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশ—যার নাম ভারতবর্ষ (!)—সেখান থেকে এটি আনয়ন করেন সাধু জন।' ওদিকে আরবী অনুবাদও হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে গ্রীক অনুবাদের চেয়েও স্পষ্টতররূপে ধরা পড়ে যে এর মূল ভারতে ও বৌদ্ধধর্মে। এর পর লাতিন অনুবাদ এবং তার থেকে ইয়োরোপীয় সর্বভাষায়।

'বিষ্ণুশর্মা' প্রসঙ্গে নিবেদন করেছি য়োসাফট্‌ এসেছে 'বোধিসত্ত্ব' থেকে (আরবীতে আছস্থলে 'ব' ও 'য়'-তে মাত্র একটি বিন্দুর পার্থক্য আছে বলে হয়ে যায় য়োদাসাফ) এবং বার্লাম (বুদ্ধ) 'ভগবান' থেকে।

অতএব এক বুদ্ধদেব যদি দুই মূর্তি ধারণ করে খৃষ্টধর্মে সেণ্ট বা সন্তরূপে পূজা পান তবে নিশ্চয়ই আমাদের আনন্দের কথা॥

৯।৪।৬৬

রবি-মোহন-এনড্রুজ

কয়েক দিন পূর্বে একখানা চটি বইয়ে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী ও এনড্রুজ সম্বন্ধে একটি বিবরণীতে দেখি, আর সবই আছে, নেই শুধু একটি কথা:—এনড্রুজের পরলোকগমনের পর তাঁর স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হলেন কে, এবং সেই মহৎ চিন্তা মূর্তস্বরূপ দেবার জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কে, এবং এনড্রুজ ফাণ্ডের আজো সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট আছে—যদি আদৌ থাকে—তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবো কাকে?

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ* হয় যে সময়, তখন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমে। শুনেছি, সে-সময় তিনি নাকি সে-আন্দোলনের প্রশংসাই করেছিলেন। ফেরার সময় বোম্বায়ে নেমে তাঁর মত পরিবর্তন হয়, এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় একাধিক প্রবন্ধে আপন মতামত ব্যক্ত করেন (দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু বরাবরই গাঁধীকে উৎসাহ-হিম্মৎ জুগিয়ে যান)। এনড্রুজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর উভয়েরই অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু—(এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা সহকর্মী বিধুশেখর বা ক্ষিতিমোহনের মতো তো ছিল বটেই, বেশী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না)—তাই অনেকেই তাঁকে 'শান্তিনিকেতন-সাবরমতী-সেতু' নাম ধরে উল্লেখ করতেন।

* 'গুরুচণ্ডালী' নিয়ে আলোচনা একাধিক স্থলে দেখেছি। চলতি ভাষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এটাকে অমার্জনীয় অপরাধের অনুশাসনরূপে সম্মান করা হত—যদিও যে-দ্বিজেন্দ্রনাথকে কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরূপে সশ্রদ্ধ সম্মান জানাতেন, তিনি স্বয়ং সে-অনুশাসন তাঁর কঠিনতম সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ বাংলা দর্শনগ্রন্থে পদে পদে লঙ্ঘন করতেন, এবং সকলকেই সে উপদেশ দিতেন। চলতি ভাষা চালু হওয়ার পর, পরলোকগমনের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লেখেন 'গুরুচণ্ডালী এখন আর অপরাধ নয়; 'বাংলা-অলংকারের পিনাল-কোড থেকে গুরুচণ্ডালী সরিয়ে দেওয়া হল'—ধরনের অভিব্যক্তি)। অধীন দ্বিজেন্দ্রনাথের আদেশ বাল্যাবস্থা থেকেই মেনে নিয়েছে, যদ্যপি সে সবাই 'লড়াই শুরু হল' এবং 'যুদ্ধ আরম্ভ হল' তথা 'মোকদ্দমা শুরু হল' এবং 'তর্কবিতর্ক আরম্ভ হল' এ'দুয়ে পার্থক্য মেনে চলেছে।

এনড্রুজের ধর্ম ছিল দীননারায়ণের সেবা। ধর্মসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন-বিবর্তন সর্বদাই দীনের উদ্দেশে নিয়োজিত হয়; তাই সাক্ষাৎ রাজনীতি এড়িয়ে চললেও এনড্রুজ গান্ধী-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই এই মহান আন্দোলনের ব্যাপারে ভারতবর্ষের দুই মনীষীর মধ্যে মতানৈক্য যে সর্ব-প্রকারের ক্ষতিসাধন করতে পারে, সে-বিষয়ে তিনি সচেতন হন; তিনি মন স্থির করলেন, পত্র-পত্রিকার মারফত উভয়ের মধ্যে যে বাদানুবাদ হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক ভালো হয়, উভয়ে একসঙ্গে মিলিত হয়ে যদি ভাবের আদান-প্রদান করেন। বলা বাহুল্য গাঁধী-রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য জন্মায়, যখন গাঁধী এর কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় আমন্ত্রণে আফ্রিকা ত্যাগ করে সদলবলে শান্তি-নিকেতন আশ্রমে যোগ দেন ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে সেখানে ছয় মাস থাকেন (তখন কলেজবিভাগ বা বিশ্বভারতীর জন্ম হয় নি)।

এ-আলোচনা হয় কলকাতায়, এবং এক এনড্রুজ ছাড়া সেখানে চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন না।

কিন্তু কবির মত চিত্রকরও শুধু যে নব নব সৃজন কর্মে লিপ্ত থাকেন তাই নয়, নব নব গোপন তত্ত্ব, সৌন্দর্য আবিষ্কার করে রসিকজনের সম্মুখে রাখতে চান। কবি রবির ভ্রাতুষ্পুত্র 'ছবি-রবি' অবন ঠাকুর তাই মনে মনে ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর মত মনীষী এ দেশে নিত্যি নিত্যি জন্মায় না; নিভৃতি এ দোঁহার মিলনের অন্তত সামান্য কিছুটাও যদি না দেখতে পেলুম, তবে এ-জীবনে দেখলুমটা কি? কথাটা ঠিক; হিমালয় আল্‌প্‌সে মিলন হয় না,—কিন্তু এ-মিলন তো তারো বড়ো।

উপযুক্ত তাবৎ কাহিনী আমি অন্যত্র সবিস্তর দিয়েছি বলে এ স্থলে সংক্ষেপে সারি, কারণ অন্যকার কীর্তন ভিন্ন। 'অবন-ঠাকুর' চুপসে দরজার চাবির ফুটো দিয়ে এক লহমার তরে স্থিরদৃষ্টিতে দেখে নিলেন ভিতরকার 'ছবিটি'। সেইটেই তিনি এঁকে পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে—যেখানে ঐ তিনজনের দুজনা, অর্থাৎ কবি ও এনড্রুজ স্থায়ীভাবে বাস করেন।

কিন্তু মূল কথায় ফিরে যাই—এটুকু শুধুমাত্র এ-তিন মহাপুরুষের অন্তরঙ্গতা বোঝাবার জন্য পটভূমি নির্মাণ।

*　　　*

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে (খুব সম্ভব) গ্রীষ্মকালে অকস্মাৎ মহাত্মাজী অবতীর্ণ হলেন বোম্বাইয়ের জুহুবীচে। যুদ্ধ এবং জনরবে ভারতবর্ষ তথা তাবৎ পৃথিবী তখন গমগম করছে। প্রায় সম্পূর্ণ পূর্ব ও উত্তর ইয়োরোপ জয় করার পর হিটলার

তখন সদর্পে ককেশাসের তেল পানে ধাওয়া করবেন বা করেছেন—এমন সময় টলটলায়মান ইংরেজের চরম দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ডমিনিয়ন বিয়ণ্ড দি সীজ-এর অন্যতম ভারতবর্ষ আরেকটা স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করবে কি? এই ছিল তখন দেশবিদেশে সর্বমুখে একমাত্র প্রশ্ন।

এমন সময় গাঁধী নামলেন জুহুবীচে। এবং তার চেয়েও বিস্ময়জনক ব্যাপার; —যে গাঁধীকে আপাতদৃষ্টিতে সরল, ভালোমানুষ বলে মনে হয়, তিনি যে সাংবাদিকদের এড়াবার জন্য কত হুনুর-হেকমৎ রপ্ত করে বসে আছেন, সে তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বিলক্ষণ জানে ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা—সেই গাঁধীই ডেকে পাঠিয়েছেন নিজে যেচে, প্রেসকনফারেন্স্। তিনি নাকি সর্বপ্রশ্নের উত্তর দেবেন।

এদিকে তিনি জুহুবীচে নেমেই খবর পাঠিয়েছেন বোম্বায়ের আশ্রমিক সঙ্ঘকে। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনবেন।

বোম্বায়ে বিস্তর শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী আছে—তাঁদের প্রায় সবাই গুরুদেবের দু' দশটা গান গাইতে পারে, আর মহারাষ্ট্রবাসী হলে তো কথাই নেই, তারা গুরুদেবের কালোয়াতী গান পর্যন্ত গাইতে পারে, দু' একজন নিধুবাবু ঢঙে গুরুদেবের টপ্পা তক দখল করে বসে আছে। কিন্তু সব সময় সবাই তো আর বোম্বায়ে থাকে না। তবু ছিলেন সর্বাধিকারী স্বর্গত বচুভাই শুক্ল; ইনি শান্তিনিকেতনে প্রচলিত—অর্থাৎ সেখানে দৈনন্দিন এবং পালপরবে গীত—সব কটার এবং আরো প্রচুর অচলিত সুর আপন বিরাট দিলরুবাতে বাজাতে পারতেন। তারপর ছিলেন পিনাকিন ত্রিবেদী, গোবর্ধন মাপারা, সুশীলা আসর ইত্যাদি। আমিও ছিলুম বচুভাইয়ের অতিথিরূপে। কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ আমার মত 'বেতালাকে' কাবু করতে পারেন এমন বেতাল-সিদ্ধ এখনো জন্মান নি!

আশ্রমিক সঙ্ঘ, এবং অধিনায়করূপে বচুভাই পড়লেন দুশ্চিন্তায়। গাঁধীজী কোন্ কোন্ গান শুনতে চাইবেন, বা কেউ গাইলে শুনতে ভালোবাসবেন সে সম্বন্ধে কারোরই কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা আপন ধারণা নেই—বস্তুত শান্তি-নিকেতনে বাসকালীন এবং বিশেষ করে সেস্থল ছাড়ার এত যুগ পরেও যে তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ রয়েছে সে-তত্ত্ব প্রাক্তন ছাত্রদের প্রায় কেউই জানতো না। অবশ্য অনেকেই জানতো 'জীবন যখন শুকায়ে যায়—' গানটি তাঁর বড়ই প্রিয় (এবং সেই কারণেই নিউমেনের 'লীড কাইনড্লি লাইট এমিড্স্ট্ দি এনসারক্লিং গ্লুম।')।

আমি বললুম, 'এটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, গাঁধীজী যে-সময়টা আশ্রমে কাটান, ঠিক সেই সময়ে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতই পাবে পয়লা নম্বর—বা ফার্স্ট প্রেফারেন্স, তারপর নিশ্চয়ই স্বদেশী গান (এখন যাকে গাল-ভরা নামে ডাকা হয় 'দেশাত্মমূলক সঙ্গীত'), তার পর মন্দিরে উপাসনার সময় যে কটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হয়। এর পরও আছে—কিন্তু অদ্দূর আমার এলেম যায় না, যেমন মনে করো গুরুদেব তাঁর আপন পছন্দের যে-সব গান বাছাই করে তাঁকে শুনিয়েছেন তার হদীস পাবো কোথায়!' সবাই এক বাক্যে আমার বক্তব্য স্বীকার করে বললে, 'এই তিন দফেতে যে-সব গান পড়ে তারই সব কটা এত অল্প সময়ে কোরাসে তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। অতএব এই নিয়েই উপস্থিত সন্তুষ্ট থাকা যাক।' আমি তখন স্কেল টি-স্কোয়ার সেট-স্কোয়ারসহ—কথার কথা কইছি—লেগে গেলুম জরিপ করতে, মহাত্মাজী যে-সময়টায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন ঠিক সেই সময়ে গুরুদেব কোন্ কোন্ গান রচেছিলেন (এস্থলে একটি ফরিয়াদ জানিয়ে রাখি: যাঁরাই গুরুদেবকে নিয়ে কোনো কাজ করতে চান, তাঁরাই চান, গুরুদেবের কবিতা যে রকম কালানুক্রমিক পাওয়া যায়, গানের বেলাও ঠিক সেই রকম হওয়া উচিত, বরঞ্চ বেশী উচিত। আমার এক মিত্র 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম' নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এরই অভাবে দিশেহারা হয়ে এগুতে পারছেন না। তাঁর মূল প্রশ্ন, একটা বিশেষ সময়ের পর—মোটামুটি ১৯১৮—রবীন্দ্রনাথ কি একেবারেই আর কোন ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন নি? করে থাকলে কটি?) অবশেষে কষ্টেশ্রেষ্টে মোটামুটি একটি ফিরিস্তি তৈরি হল। বেশীর ভাগ গায়কই গুজরাতী; তাদের পছন্দের ধর্মসঙ্গীত—যেগুলো কারো না কারো ভালো করে জানা ছিল—সেগুলোও কোরাসে শিখে নেওয়া হল। সকলেরই এক ভরসা—গাঁধীজীর সুরজ্ঞান খুব একটা টনটনে নয়, মহারাষ্ট্রের মত গাঁধীর জন্মভূমি কাঠিওয়াড়-গুজরাতে গান-বাজনার প্রাচীন সর্বব্যাপী কোনো ঐতিহ্য নেই।

"শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর" শেষটায় এল। ওরা ধরে নিয়েছিল আমি সঙ্গে যাব। আমার এক কথা 'ক্ষেপেছ! আমি না পারি গাইতে না জানি বাজাতে। আমাদ্বারা কোনোপ্রকারের শোভাবর্ধনই হবে না—"শোভা" জিনিসটাই গাঁধীজী আদৌ পছন্দ করেন না।'

* *

মহাত্মাজী বললেন, 'গাঁও!'

ওরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'কি গান...?'

'তোমাদের যা জানা আছে।'

এসব আমার শোনা কথা। তার উপর ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে। সঠিক মনে নেই, প্রাক্তনদল সকলের পয়লাই রঙের টেক্কা, অর্থাৎ 'জীবন যখন শুকায়ে যায়—' মেরেছিল, না সেটাকে তাঁর আদেশের জন্য জীইয়ে রেখেছিল। কিন্তু মোদ্দা, তারা এক একটা গান শেষ হলে যখন থামে, তখন মাথা নেড়ে সম্মতি জানান, এবং আরো গাইবার ইঙ্গিত করেন। তারা দু' একবার চেষ্টা দিয়েছিল গাঁধীজীর আপন পছন্দ জানাবার জন্য—ফলোদয় হয় নি।

সর্বশেষে মহাত্মাজী দু'একটি প্রশ্ন শুধোন। কেউ উত্তর দিতে পারে নি। মারাঠী মপারা বাড়ি ফিরে তো আমাকে এই মারে কি তেঁই মারে। আমি থাকলে নাকি চটপট উত্তর দিয়ে দিতুম। আমি বললুম, 'এগুলোর উত্তর তো বচুভাইও জানে, তদুপরি সে ওয়াডওয়ান অর্থাৎ গাঁধীজীর মতই কাঠিওয়াড়ের লোক—গুজরাতী—না, খাস কাঠিওয়াড়িতেই দিয়ে তার জান ঠাণ্ডা করে দিতে পারতো।' সে নাকি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। 'আমি হতুম না, কি করে জানলে। ঐ সিংগির সামনে।'

কিন্তু এই বাহ্য।

আসলে পূর্বোল্লিখিত প্রেস কন্‌ফারেন্‌স্, গাঁধীজী ডাকিয়েছিলেন ঐ দিনই, ঐ সময়েই, ঐ স্থলেই।

এখন আমি যা নিবেদন করবো, সেটা ঐ সময়কার খবরের কাগজ নিয়ে চেক্ অপ্ করে সন্দেহ-পিচেশ তথা গবেষক-পাঠক ধরে ফেলতে পারবেন, আমি কী "দারুণ" "গুলমগীর"। আলংকারিকার্থে কিন্তু আমি "যদু"পতি বা "রাখাল" রাজা হওয়ার মত তাদের লক্ষাংশের একাংশ শক্তি ধরি নে বলে আমি নাচার; বেচারার পক্ষে গুল মারাই একমাত্র চারাহ্।

যতদূর মনে পড়ে সেই এণ্ডেমণ্ডে বিজড়িত ভারতের সর্বজাতের সাংবাদিকগণই সেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

গান শেষ হলে মহাত্মাজী ওঁদের বললেন, 'তোমাদের কি কি প্রশ্ন আছে, শুধোও।' আর যায় কোথায়। দুনিয়ার যত রকম প্রশ্ন; আবার নূতন করে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবে কি, এই কি তার জন্য উৎকৃষ্টতম মোকা নয়—মিত্রপক্ষ চতুর্দিকে বেধড়ক মার খাচ্ছে, আরম্ভ হলে কি প্রকারে হবে, ট্যাক্স বন্ধ করে না নয়া কোনো টেকনীকে, ১৯২০-এর মত ছাত্রদের ডাকা হবে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি?

গাঁধীজী তাঁর চিরাচরিত ধৈর্যসহ উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন—যদ্যপি আমার মনের উপর তখনকার, অর্থাৎ পরের দিনের খবরের কাগজ পড়ার পর যে দাগ পড়েছিল সেটা বোধ হয় এই যে, মোক্ষম প্রশ্নগুলো মহাত্মাজী এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য ঐ সময়ে ভবিষ্যতের তাবৎ প্ল্যান ফাঁস করে দেওয়া যে সদ্বুদ্ধির কর্ম হত না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হঠাৎ মহাত্মাজী দু হাত তুলে প্রশ্নধারা নিরুদ্ধ করে বললেন, 'আমি বেনে। বেনে কাউকে কোনো জিনিস মুফতে দেয় না। আমিও খয়রাৎ করার জন্য তোমাদের ডাকি নি। রবীন্দ্রসঙ্গীত তো শুনলে। এবার আমার কথা শোনো।

পোয়েট গত হওয়ার পূর্বে (তখনো বোধ হয় এক বছর পূর্ণ হয় নি) আমাকে আদেশ করেন, আমাদের উভয়ের বন্ধু এন্‌ড্রুজের স্মৃতিরক্ষার্থে যা কর্তব্য তা যেন আমি আপন কাঁধে তুলে নি। এখন দেখতে পারছি, আসন্ন ভবিষ্যৎ বড়ই অনিশ্চিত। তাই আজই আমি "এন্‌ড্রুজ মেমোরিয়াল ফাণ্ড"-এর জন্য অর্থ সঞ্চয় আরম্ভ করলুম। দাও।'

মপারা রিপোর্ট দিতে গিয়ে আমায় বলেছিল, 'গাঁধীজী অনেকক্ষণ ধরে এন্‌ড্রুজ সম্বন্ধে বলেছিলেন, in a very touching manner। আর তার পর মহাত্মাজীর সামনে পড়তে লাগল, টাকা, পুরো মনিব্যাগ, গয়না, রিস্টওয়াচ, আংটি, কত কী! যেন বানের জলে ভেসে আসছে দুনিয়ার কুল্লে মূল্যবান জিনিস। অনেকে এমনই যথাসর্বস্ব দিয়ে ফেলেছিল যে, বোম্বায়ে ফেরার জন্য টিকিট কাটার পয়সা পর্যন্ত তাদের কাছে অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু জানেন তো, রেলও এখন আর পুরোপুরি ইংরেজের নয়। ভিলেপার্লে থেকে চর্চ গেট স্টেশন—সবাই জানে, কেন এদের টিকিট নেই।'

ফাণ্ডের টাকা যখন জমে উঠছে, তখন কে একজন বললে, 'মহাত্মাজী, এখন এসব কেন? স্বরাজ পাওয়ার পর এসব কাজ তো রাতারাতি হয়ে যাবে।'

আজ সত্যই আমার হাসিকান্নায় মেশানো চোখের জল নেমে আসে—এই ব্যক্তিটির ঐ মন্তব্যটির স্মরণে। তারই মত আমরা সবাই তখন ভাবতুম, ইংরেজই সর্ব নষ্টের মূল। বিহারে ভূমিকম্প হলে ইংরেজই দায়ী, মেদিনীপুরে সাগর জাগলে ওটা ঐ ইংরেজেরই দুষ্কর্ম। ইংরেজকে খেদিয়ে দিয়ে স্বাধীন হওয়া মাত্রই—

When we shall have attained liberty, all those will be mere trifles!

গাঁধীজী সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষম গরম, কড়া গলায় জবাব দেন,

'But Tagore did not wait to be born till India has attained her liberty !'

পরাধীন ভারতে যদি কবি জন্ম নেন, তবে তাঁর সখার স্মৃতিরক্ষার ভার পরাধীন ভারতের স্কন্ধেই।

তাই বলছিলুম, হাসি পায়, কান্নাও পায়—তখন আমরা কী naif (প্রায় 'ন্যাকার' মত)-ই না ছিলুম, যে বিশ্বাস করতুম—স্বরাজ পাওয়ার পরই 'পাঁচ আঙুল ঘিয়ে' আর 'ডেগ-এর ভিতর গর্দান ঢুকিয়ে ভোজন।'

তাই কি রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী বলেছিলেন, (উদ্ধৃতিতে ভুল থাকলে ক্ষমা চাইছি) 'একদিন (স্বরাজ লাভের পর) যেন না বলতে হয়, ইংরেজই ছিল ভালো।'

* *

কিন্তু কোথায় গেল সেই 'এন্‌ড্রুজ ফাণ্ড' যার মোটা টাকাটা তুলেছিলেন গাঁধীজী ?

তা সেটা যেখানে যাক, যাক। দুঃখ এই, সেই চটি বইয়ে এবং অন্যত্র 'এ্যান্‌ড্রুজ ফাণ্ডের' কথা উঠলে কেউ আর গাঁধীকে স্মরণ করে না, তিনি যে সেই সুদূর বোম্বায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়ে ফাণ্ডের গোড়াপত্তন করেছিলেন সেটা সবাই ভুলে গেছে !!

৫।২।৬৬

'ইজরায়েল বিশ্বের প্রবাদ-সত্য রূপে গণ্য হবে'—বাইবেল

ঘরে ঢুকতেই বললেন, এদিকে এসো। অসাধারণ পণ্ডিত লোক। আমি তাঁকে বড্ডই শ্রদ্ধা করি, বলতে কি, ভালোবাসি। তিনিও আমাকে স্নেহ করেন। সত্যকার পণ্ডিত কখনোই মূর্খকে অবহেলা করে না।

ঘরে আর কেউ নেই। তবু তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'তোমরা কাল বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে আলোচনা করছিলে না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা তোমার আটকাচ্ছিল কোথায় ?'

'আজ্ঞে, আমি শুধাচ্ছিলুম, আল্লা যদি না-ই থাকবেন তবে এই দুনিয়াটা পয়দা করলে কে ? আপনারাও তো—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'আমাদের কথা বাদ দাও—তোমার মুশ্‌কিলটা কোথায় সেইটে খুলে কও।'

"শরণঙ্করসাধু' হীনযানপন্থী বৌদ্ধ : সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলছিলেন, সৃষ্টির আদিও নেই অন্তও নেই। অতএব সৃষ্টিকর্তারও প্রয়োজন নেই। তারপর বললেন, যদি তর্কস্থলে ধরেও নেওয়া হয় সৃষ্টিকর্তা আছেন, তবুও তো শেষ-সমস্যার সমাধান হয় না। প্রশ্ন উঠবে, সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করলেন কে? শুনুন আজগুবী কথা। তারপর তিনি তাঁর গেরুয়া আলখাল্লার ভিতর থেকে নোট-বুক বের করে আঁকলেন একটা চক্কর—সার্কল। বললেন এই সার্কলের যেমন কোনো জায়গায় আরম্ভও নেই, শেষও নেই, সৃষ্টিও হুবহু তেমনি। তারপর আপনি ঘরে ঢুকলেন। পাছে আপনাকে ডিসটার্ব করা হয় তাই আমরা আরো খানিকক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলার পর উনি চলে গেলেন।'

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি অর্থাৎ প্রাচ্য-বিদ্যায়তন। তারই একটা কামরায় আমরা তিনজনা কাজ করি। একজনের বিষয়বস্তু ইরানী ফাইয়াঁস-পর্সেলিন—বিশ্ব কলাসৃষ্টিতে তার স্থান। অন্যজন বাইবেলের ওল্ড-টেস্টামেন্টের হীব্রু পাঠের নয়া সম্পাদনা করছেন। আর আমি—তা সে যাকগে। দু'জনাই বছর দশেক পূর্বে সর্বোত্তম শ্রেণীর ডক্টরেট নিয়েছেন; একজন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক।

শুধোলেন, 'চক্কর এঁকে সাধু বললেন সৃষ্টি এরই মত আদিঅন্তহীন। তা, এতে আবার দুর্বোধ্য কি আছে? তবে হ্যাঁ, আরো সোজা করে বলা যেতে পারতো। আচ্ছা, স্কচ্‌দের বিশেষত্ব কি—অন্তত তাদের কোন্‌ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্বের লোক হাসিঠাট্টা করে?'

এক গাল হেসে বললুম, 'সে আর বলতে। কিপ্টেমি।'

'বিলক্ষণ। সেই গল্পটা জানো তো—লণ্ডনের এক ইংরেজ কোম্পানী স্কটল্যাণ্ডের এবার্ডীন শহরে খুললে ট্রামওয়ে। হাড়কিপ্টে স্কচরা ট্রাম চড়বে না, কিছুতেই। কোম্পানি লাটে ওঠার উপক্রম। তখন লণ্ডন থেকে পাঠানো হল স্পেশালিস্ট—তাঁকে বের করতে হবে দাওয়াই, স্কচকে কি প্রকারে ট্রামে ঢোকানো যায়। তিনি এবার্ডীনে এসেই ট্রাম ভাড়া থ্রূপেন্স থেকে ঝটকায় এক পেনি কমিয়ে করে দিলেন টাপেন্স। পরের দিন তাঁর অপিসের সামনে মহাপ্রলয়ের ভিড়। তিনি তো ভ্যামগ্লাড্‌—নিশ্চয়ই তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে, ভাড়া কমিয়ে দেবার জন্য। ইয়াল্লা, তওবা, তওবা। এরা যে তাঁরই জানলা তাগ করে পচা ডিম হাজা টমাটো ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে 'কোত্থেকে এসেছে এই

নম্বার। আগে আমরা পায়ে হেঁটে, ট্রাম ভাড়ার তিন পেনি বাঁচাতে পারতুম, এখন কুল্লে দু'পেনি। নিকালো রাস্কেলকো এবার্ডীনসে!' আচ্ছা, হলো। এবারে বলো তো ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য কি? পারলে না? আমিই বলছি, হুবহু একই গাধার এ-কান ও-কান। কিপ্টেমিতে।'

ইহুদীদের কিপ্টেমি সম্বন্ধে আমি কোনো গল্পই জানি নে, অতখানি বে-খবর বেরসিক আমি নই, কিন্তু বিশেষ কারণে আমি চুপ করে রইলুম। সে-কারণ একটু পরে পাঠক নিজের থেকেই বুঝে যাবেন।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'একবার এক ইহুদি আর স্কচে ঝগড়া লেগেছে, কে কতক্ষণ ধরে ডুব সাঁতার দিতে পারে—দুজনা দুই সুইমিং পুলে কাজ করতো আর দুই পুলের মধ্যে ছিল উৎকট রেষারেষি। শেষ পর্যন্ত বাজি ধরা হল এক শিলিঙ। বাজে লোকের কৌতূহল এড়াবার জন্য তারা নদীর এক নিভৃত জায়গায় দিল ডুব।'

তিনি চুপ মারলেন। আমি ভাবলুম, ওস্তাদ কথকের মত তিনি পজ্ দিয়েছেন আমার মনের উপর গল্পটা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেইটে দেখবার জন্য। কিন্তু কই? তাতো নয়। তিনি দেখি, পকেট থেকে ছুরি বের করে আপন মনে দিব্য পেনসিল কাটতে আরম্ভ করেছেন। তখন থাকতে না পেরে আমি শুধালুম, 'তারপর?'

উদাস সুরে বললেন, 'কি করে বলবো ভাই কও। দু'জনার কেউই তো উঠলো না জলের তলা থেকে।' তারপর হন্তদন্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, ভাগ্যিস্, তারা বাজিটা পাকাপোক্ত করার জন্য তাদের এক উকীল বন্ধুর কাছে কাগজ-কলমে লিখিয়ে নিয়ে—অবশ্য সবকুছ মুফত'মে—তারই জিম্মায় রেখে এসেছিল; নইলে শহরের লোক [illegible] ও জানতে পেতো না, এ দুটো শান্ত, অজাতশত্রু লোক হঠাৎ ইহসংসার থেকে কি করে কপ্পূর হয়ে গেল। হুঁ! এক শিলিঙ—বাপ্‌রে! চাট্টিখানি কথা!'

'কিন্তু—'

'এর মধ্যে 'কিন্তু' 'but' 'mais' 'aber' কিছুই নেই ভাই। কিন্তু সেই যে, অন্তহীন চিরচক্রের দৃষ্টান্ত দিলেন সিংহলের মহাস্থবির, বলছিলুম কি না, সেটা আরো সোজা করে বলা যেতে পারতো। তাই তোমাকে গল্পটা বাজিয়ে নিলুম, তুমি ইহুদি স্কচ সম্বন্ধে চালু গল্পগুলোর খবর রাখো কি না। সবাই বলে, ওরিয়েন্টালরা—এবং বিশেষ করে ইণ্ডিয়ানরা—নাকি সর্বক্ষণ মুখ গুমড়ো করে,

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন, রসকষের বালাই নেই। যতো সব। হ্যাঁ, অন্তহীন চিরচক্র সহজ করে বোঝাতে হলে বলতে হয়—স্কচ বিল শোধ করবে না আর পাওনাদার ইহুদিও তাকে ছাড়বে না। সে ধাওয়া করেছে স্কচের পিছনে। শহরটাও ছোট। তখন কি হয়? অন্তহীন চিরচক্র। এখনো যদি না বুঝে থাকো তবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোনো ইহুদির দোকানে এপ্রেন্টিসি করগে।'

আমি বললুম, 'একটি কথা শুধোতে পারি—অপরাধ যদি না নেন, ব্যক্তিগত কথা।'

তিনি বললেন, 'মাই লাইফ ইজ এন ওপ্‌ন্ বুক। যা-খুশী শুধোতে পারো।'

'আচ্ছা, আপনি তো, বোধ হয় ইজরায়েলাইট—'

বাধা দিয়ে মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'অত ভদ্রতা করে, অন্য লোক হলে বলতুম ভণ্ডামি করে, ইজরায়েলাইট না বলে য়ুডে (Jude=ইহুদি) বলতে পারো, তার চেয়েও অবজ্ঞাসূচক Jut বলতে পার, এমন কি পাঁচজন জর্মন আড়ালে যে 'ফাজার য়োট' (মোটামুটি, 'ঘৃণ্য ইহুদির বাচ্চা') ব্যবহার করে সেও করতে পারো। আমি নির্বিকার।'

আমি জিভ কেটে বললুম, 'ছি ছি কি যে বলেন—'

ফের বাধা দিয়ে বললেন, 'শোনো, ভদ্র। তুমি কি বললে, কি না বললে কিচ্ছুটি এসে যায় না। এই দেখ আমার নাকটা—কি রকম বেঁকে গিয়ে হুকের মত ঝুলে আছে, তারপর আমার কান দু'খানা—মাথার সঙ্গে লেপটে না গিয়ে একটা ডান দিকে আরেকটা বাঁ-দিকে যেন উড়ে চলে যাবার পণ করেছে, দাঁড়াও, তোমাদের দেশের হাতীর বোধ হয় এ রকম কান হয়, তারপর আমার চুল—কানের কাছে কি রকম যেন কোঁকড়া কোঁকড়া, নিগ্রোদের মত, আমাদের মিশর-বাসের সামান্য অবশিষ্ট—'

'থাক না। প্লীজ।'

একটু হাসলেন, তাতে কোনো তিক্ততা ছিল না। বললেন, 'এক ফার্লং দূরের থেকে লোক চিনতে পারে, ঐ আরেক ব্যাটা ইহুদি আসছে। তুমি ইজরায়েলাইট বললে, না য়ুডে বললে তাতে কি যায় আসে? তা সে যাক্ গে। তুমি কি যেন শুধোচ্ছিলে?'

'আপনি তো ইহুদি—'

'বলে ইহুদি। রীতিমত খানদানী মনিষ্যি আমি। কেন, নাম থেকে বুঝতে

পারছো না? তোমাদের কুরান শরীফেও যে প্রফেট ইয়াকুবের (জেকব্) উল্লেখ আছে তাঁর তৃতীয় পুত্রের নাম লেভি। কিংবা বাইবেলের প্রথম অধ্যায়, জেনেসিসেও পাবে এ-গোষ্ঠীর খবর। কিন্তু থাক্, প্রপিতামহের শুকনো হাড় চিবিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তবে এ-কথা ঠিক, আমাদের পরিবারের বংশানুক্রমে ইহুদি ধর্ম ও হীব্রুসাহিত্যের চর্চা আছে।'

'তা হলে আপনি ইহুদিদের কঞ্জুসী নিয়ে, আপন চেহারার ইহুদীলক্ষণ নিয়ে অত ঠাট্টা মস্করা করেন কি করে?'

মিট মিট করে হেসে বললেন, 'কেন, শোন নি, স্কচদের সম্বন্ধে যে-সব নূতন নূতন গল্প বেরোয় তার অধিকাংশের জন্মস্থল এবারডীন, জনক স্কচরা স্বয়ং? তত্বটার সত্যি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু ইহুদির কঞ্জুসী, সে নোংরা—স্নান করে না, যে-দেশে বাস করে সেটাকে মাতৃভূমিরূপে স্বীকার করে না, আরো কত কী—এসব নিয়ে যে-সব গল্প আছে তার একটা বিরাট ভাণ্ডার আছে আমার কাছে। পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে ঠাকুর্দার কাছ থেকে এবং এর অধিকাংশই ইহুদিদের তৈরি—কোনো সন্দেহ নেই সে-বিষয়ে। বাবার এসবেতে শখ নেই। তিনি পড়ে আছেন হীব্রুশাস্ত্র নিয়ে, আর অবসর সময়ে ঐ একই অভিনিবেশ সহকারে, জর্মন সাহিত্যচর্চা। কারো সঙ্গে মেশেন না বড় একটা, কিন্তু তোমাকে যতটুকু চিনতে পেরেছি তার থেকে মনে হয়, তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলে তিনি খুশী হবেন। প্রাণ ভরে তাঁর কাছ থেকে জর্মন সাহিত্যের খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করতে পারবে। আসবে একদিন ডিনারে? বেশ। মাকে শুধিয়ে দিন ঠিক করে তোমাকে বলবো।'

'আচ্ছা, বলুন তো, এদেশে নাকি একটা পোলিটিকাল পার্টি দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে, আর তারা নাকি নির্বিচারে সব ইহুদিদের এ-দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়—যারা পাঁচ শ' সাত শ' বছর ধরে জর্মনিতে আছে তাদেরও, যারা এক বর্ণ হীব্রু জানে না, সিনাগগে যায় না, নাস্তিক্যবাদের পক্ষ সমর্থন করে প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছে তাদেরও। দোষটা কি ওদের?

এই তার মুখ একটুখানি গম্ভীর হল। সেটা যেন মুছে ফেলে মুচকি হেসে বললেন, 'এতো কিছু নূতন নয়। বাইবেলের 'এস্টার' পুস্তিকা পড়েছ?"

আমি অভিমানের সুরে বললুম, 'আমি অগা। কিন্তু এস্টার পড়ি নি, এ-সন্দেহ কেন করছেন? তবে হ্যাঁ, ওল্ড টেস্টামেণ্ট পড়া উচিত, তারই নির্মাতা কোনো ইহুদি রাব্বির কাছ থেকে! আমি পড়েছি খৃষ্টান—তাও লুথেরীয় অর্থাৎ কি না

প্রটেস্টান্ট্—পাদ্রির কাছে। ওনারা তো এস্টারের ঐতিহাসিকতায় আদৌ বিশ্বাস করেন না।'

'সে-কথা পরে হবে। উপস্থিত অন্তত এটুকু মেনে নিতে পারো, সেখানে যে চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে তার অনেকখানি খাঁটি সত্য—তা সে যার মুখ দিয়েই বলানো হয়ে থাক না কেন এবং ইরানের রাজা গ্রীস-মিশর-বিজয়ী Xerxes ইহুদি-বালা এস্টারকে বিয়ে করে থাকুন, আর না-ই করে থাকুন। সেখানে Xerxes- (বাইবেলের 'অহস্‌ভেরুস')-এর মন্ত্রী তাঁকে একদিন বললেন, "মহারাজের বিশাল সাম্রাজ্যে এক শ্রেণীর লোক সর্বদাই পাওয়া যায় (ইহুদি) যাদের আইনকানুন অন্যসব জাতদের থেকে ভিন্ন, এমন কি রাজাদেশও তারা মানে না ; অতএব এক বিশেষ দিনে এদের সবংশে নির্বংশ করা হোক।"…তখনও প্রভু যীশুর জন্ম হয় নি, খৃষ্টধর্মের সঙ্গে বৈরীভাবের প্রশ্নই ওঠে না, আর, ঐ যে নয়া পলিটিকাল পার্টির কথা বলছিলে, যারা জাতে অ্যারিয়ান—তাদের ভিতর আবার নীল চোখ, ব্লণ্ড চুল-ওলা সর্বশ্রেষ্ঠ নর্ডিক জাত সম্বন্ধে প্রচার করতে গিয়ে তারা পিঠপিঠ বলে ইহুদিরা মানুষ পর্যায়ের নিম্নে (untermensch = under-man) সে পার্টি তো পর্শু দিনের—নিতান্ত শিশু। তা সে যাক্‌গে—এই আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস জেনে তোমার যে কি লাভ হবে জানি নে—তোমাদের দেশে—'

'হালে আমাদের দেশে ইহুদিরা এসেছে ইয়োরোপ থেকে। তার বহু শতাব্দী পূর্বে ঝড়ের মারে একখানা নৌকায় করে সাতজন পুরুষ আর সাতজন স্ত্রীলোক এসে পৌঁছয় বোম্বাইয়ের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, অধুনালুপ্ত চেমুল বন্দরের কাছে।*

* মারাঠীতে 'চ' অক্ষরের উচ্চারণ 'ৎস'-এর মত। তাই টলেমি এ বন্দরকে তিমুলা, সিমুলা দুই উচ্চারণেই লিখেছেন। চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের (টিলক, গোখলে ও যদি বেয়াদপি মাফ করেন তবে উল্লেখ করি, অধীনের আধুনা প্রকাশিত 'ছু-হারা' পুস্তকের চরিত্র কাণে) অনেকেরই নীল চোখ, কটা চুল ; এদের ভিতরেও কিংবদন্তী, এঁরাও ঝড়ের মারে কোঁকণ অঞ্চলে পৌঁছন।

বরদার সয়াজীরাও যেরকম রমেশ, অরবিন্দ, আম্বেডকরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন, ঠিক তেমনি এই সাত স্ত্রীপুরুষের বংশধর পণ্ডিত কাহিম্‌করকে বোম্বাই থেকে ধরে এনে বরদা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করেন। ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম ইহুদি (এরা ইয়োরোপীয় বহু ইহুদির ন্যায় 'ইহুদি' শব্দটাকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন এবং নিজেদের 'বেনে-ইজরায়েল = বেনে-(আরবী বিন—ইবন = পুত্র ; ইবন্ বৎতুতা বতুতা তুলনীয়) ইজরায়েল, = 'ইজরায়েল-সন্তান' রূপে পরিচয় দেন। আমার পরম সৌভাগ্য বরদাবাসকালীন এই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হয়। এই মাটির মানুষটির বৎপরো-নাস্তি অনাড়ম্বরে প্রকাশিত বেনে ইজরায়েল পুস্তিকা ইয়োরোপীয় পণ্ডিত সমাজে, বিশেষ করে রাব্বিদের ভিতর যেন টর্পেডোর মত পড়ে। বস্তুত তারপর যে যা লিখেছেন বিশেষ করে ভিন্ন ভিন্ন

শাস্ত্রাদি সব লোপ পায় বলে লোকে এদের ইহুদি পরিচয় পায় নি; শুধু শনিবারে এরা বিশ্রাম নিত বলে (ইহুদির সাব্বাৎ) এবং তেলীর ব্যবসা করতো বলে (বোধ হয় মধ্য-প্রাচ্যের অলিভ তেল তৈরির কায়দা এরা তিল-সর্ষের উপর চালায়) এদের নাম হয়েছিল 'শনিবার-তেলী।' একশ' বছরও বোধ হয় হয় নি, তর্কাতীত সিদ্ধান্ত হয়েছে, এরা জাত-ইহুদি। কিন্তু এদের পিছনে তো কেউ কখনো লাগে নি—এস্টার কেতাবের পাইকিরি কচু কাটার নৃশংস প্রস্তাব কহাঁসে কঁহা।'

'জানি, তাই বলছিলুম, তোমার কি লাভ? আর এদেশের আর্যেরা বলেন, ইহুদি লাভ, টাকা, সোনারূপো ভিন্ন অন্য চিন্তা অন্য বস্তু বোঝে না। রূপোর কথাই যদি উঠলো তবে একটি ইহুদি কথিকা—কঞ্জুসীবাবদ—ঠিক পপুলার গল্প নয়, হাফশাস্ত্র বাক্যের মত বলি,—শ্রবণ করো, এবং তারপর—'

ইঙ্গিত বুঝে বললুম, 'যাচ্ছি আপন টেবিলে হীব্রু ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করতে।'

ব্যাগ খুলে একটা আপেল বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একদা জনৈক অর্থ-পিচেশ মজ্জা-কিপটে কোটিপতি—কখনো কাণা কড়িটি দান করেছে এ-কথা তার কোনো হাতই জানে না—এসেছে এক রাব্বির কাছে। জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে রাব্বি তাকে বললেন, 'বাইরের দিকে তাকিয়ে আমায় বলো, কি দেখতে পাচ্ছো।'

ধনী বললে, 'লোকজন—বিস্তর মানুষ।'

রাব্বি বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব।' তারপর একটা আয়নার সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে শুধোলেন, 'এবারে কি দেখছ?'

'আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি—'বললে কিপটে।

'ততোধিক উত্তম প্রস্তাব'—বললেন রাব্বি, 'এইবারে শোনো, বৎস, কান পেতে মন দিয়ে। জানলার শার্সি কাঁচের তৈরি, আয়নাও কাঁচের তৈরি তফাৎ কি? আয়নার পিছনে রয়েছে অতিশয়, হাল্কার চেয়েও হাল্কা সামান্য একটু রূপোর

এনসাইক্লোপিডিয়ায়—তার বেশীর ভাগ জজ কাহিম্‌করের কাছ থেকে নেওয়া। সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা সহ। বরদার দ্বিতীয় ইহুদি ছিলেন জর্মন। এ-লেখনের ডঃ লেভির মত, ড. কোন-ভীনার ('কোন্-ভীনারের মা' পশ্য—পঞ্চতন্ত্র ১ম) ।—ইয়োরোপীয় ইহুদি ও কাহিমকরের কোঁকণী ইহুদিদের পাল-পরবের ক্যালেণ্ডার ভিন্ন ভিন্ন—আল্লাকে বে-শুমার শোকরিয়া। আমি কখনো বা জজ সাহেবকে নিয়ে কোন্-ভীনারের গৃহে, কখনো বা কোন্-ভীনারকে নিয়ে জজের বাড়িতে বহু বিচিত্র বহুবার ভক্ষণ করে—একই পরব দু'-দুবার যথা গোস্বামী মতে ইত্যাদি পালন করে, ধর্ম রক্ষা করতুম। বেনে-ইজরায়েলদের সম্বন্ধে আমার যেটুকু সা মা ন্য জ্ঞানগম্যি সেটুকু সমূহে জজের খয়রাৎ।

প্রলেপ—ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু বৎস, যেই না এল সামান্যতম রূপো, অমি তুমি আর অন্য মানুষকে দেখতে পাও না, দেখতে পাও শুধু নি জে কে ॥*

২৩।৪।৬৬

এমেচার ভাগ্‌স স্পেশালিস্ট

সব ব্যাপারেই আজকাল স্পেশালিস্ট। সেদিন মার্কিন মুল্লুকে এক স্পেশালিস্টই আবিষ্কার করেন যে শোভাযাত্রা, বয়কট বা ধর্মঘটে যাঁরা কালো ঝাণ্ডা তুলে হই হই করে, তাদের অনেকেই ভাড়াটে। এ তত্ত্ব আমাদের কাছে নূতন নয়; দিল্লিতে থাকাকালীন স্বর্গত অশ্বিনী গুপ্ত আমাকে দিল্লীতে যে 'হাঙার স্ট্রাইকের' জন্য প্রতিষ্ঠান আছে, যিনি হাঙার স্ট্রাইক করবেন তাঁর জন্য শামিয়ানা, তাকিয়া-বালিশ, নির্জলা না হলে নিম্বুপানি—তদ্‌ভাবে জিন্ (যদি তিনি মদ্যপ হন), কারণ বলতে গেলে একমাত্র জিন্‌ই সহজলভ্য কড়া ড্রিঙ্কের ভিতর জলের রঙ ধরে, আহারাদি, হ্যাঁ, আহারাদিই বলছি কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে হাঙার স্ট্রাইকার যদি খেতে চান তবে গভীর রাত্রে তার সুব্যবস্থা—সেদিকে আমার ভোঁতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং যিনি আজো এ-প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি মার্কিনী স্পেশালিস্ট নন, নিতান্ত দিশী মাল—এবং সর্বোপরি তিনি 'এমেচার'।

এসব তো মস্করার কথা—যদিও দুটোই ডাহা 'ইমানসে' সত্য। তবে দিল্লির প্রতিষ্ঠানটি নাকি 'সদাচার কদাচারের' উৎপাতে এদানির বড়ই উৎপীড়িত ('তংগ্

* এ লেখনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আমার অন্তরঙ্গ পাঠকদের না জানিয়ে কিছুতেই থাকতে পারলুম না যে ২৬ মার্চ (১৯৬৬) সন্ধ্যাবেলা প্যারিস বেতার থেকে ইন্দিরাজীর ফরাসীতে প্রদত্ত মঁসিয়ে দ্য গলের অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরের রেকর্ডিং। অনবদ্য রিসেপশনে—কলকাতা 'খ'-এর চেয়ে কোটিগুণে শ্রেয়। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ অতি সুন্দর, পরিষ্কার। অনভ্যাসবশত মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চারণে বিদেশী আড় প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যুদ্ধের সময় আমি চার্চিলের ফরাসী ভাষণ বেতারে শুনেছি। ইংরিজীর জোরালো একসেন্ট দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ফরাসী উচ্চারণ। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, বেতার যন্ত্রে কান সেঁটে না শুনলে মনে হবে, গাঁক-গাঁক করে ইংরেজ সাবলটর্ন কুচকাওয়াজের 'হুকুমদার' ঝাড়ছে। ফরাসীতে অনুনাসিকের ছড়াছড়ি। ইংরেজের কাছে সে বস্তু গোমাংস। অতএব বাংলার 'চাঁদ' যেন ইংরেজের মুখে 'চ্যানড' হয়ে বেরুচ্ছিল। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ চার্চিলের চেয়ে ইনফিনিটি পার্সেন্ট শ্রেয়।

আ গয়ে'); তার অর্থ অবশ্য এ-নয় যে 'হাঙার স্ট্রাইক' করার কারণের কিংবা/এবং অকারণের অজুহাত অছিলার অভাব ঘটেছে, কিংবা 'হাঙার-এর' হাঙ্গরদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ঘটেছে—আসল কারণ ওটা নাকি রেশনড্ হয়ে গিয়েছে, 'অর্থাৎ হাঙার স্ট্রাইক', 'ফাস্ট্ আন টু ডেথ' এসব করতে হলে সেগুলো এখন করবেন সরকার স্বয়ং। আনাড়ি এমেচারদের হাতে আর এ-সব টপ প্রায়োরিটির বস্তু ছেড়ে দেওয়া যায় না। দেশ-বিদেশে বড্ড বেইজ্জতী হয়। আইরল্যাণ্ডের কে যেন ম্যকস্থইণি না কি যেন নাম সে নাকি বাহাত্তর বা বিরানব্বই দিন নাগাড়ে উপোস মেরেছিল—এমতাবস্থায় ভারত যদি বাহাত্তর দিনের রেকর্ড দেখায় তবে সেটা হবে সত্যই 'শরমকী—' থুড়ি 'লজ্জাকী, ঔর আফসোস —' থুড়ি 'পশ্চাত্তাপকী বাৎ!'

তৎসত্ত্বেও এমেচারকে ঠেকানো যায় না—বারট্রাণ্ড রাসলের মত নিরহঙ্কার লোক পর্যন্তও চেষ্টা দিয়ে হার মেনেছেন।* স্বয়ং রবি ঠাকুর এই এমেচারি কর্মে বড্ডই সুখ পেতেন। আমি তামা তুলসী স্পর্শ করে একশ' বার কিরে কাটতে রাজী আছি, তাঁকে মধ্যম শ্রেণীর হোমেওপ্যাথ ডাক্তার বললে তিনি সেটাকে কবিতায় নোবেল প্রাইজ পাওয়ার চেয়ে লক্ষ গুণে শ্লাঘনীয় বলে মনে করতেন। ঠিক তেমনি স্পেশালিস্ট সত্যেন বোস তাঁকে দিলেন টুইয়ে—বিজ্ঞান শিখতে নয়, সেও না হয় বুঝি—শেখাতে। অর্থাৎ 'মেস্টারি' করতে। তাহলে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন। বাজারে যেগুলো মেলে সেগুলো লিখেছেন বটে বিশেষজ্ঞরা—একশ' বার মানি—কিন্তু যে বাঙলা ভাষায় লিখেছেন সেটা, ঐ যে ফরাসীতে বলে, 'ইল্জ একি্রভ ফ্রাঁসে কম্ লে ভাশ্ এস্পানিয়োল'—তেনারা ফরাসী লেখেন স্প্যানিশ

* এ বাবদে তাঁর বিদকুটে রায়: সর্ব পণ্ডিত যখন কোনো তত্ত্ব এক বাক্যে স্বীকার করে নেন, তখন তুমি এমেচার সেখানে ফপরদালালী করতে যেয়ো না। আর যেখানে তাঁরাই একমত হতে পারছেন না সেখানে তুমি নাক গলাতে যাও কোন দুঃসাহসে? এর বিগলিতার্থ তুমি এমেচার ঠোঁট দুটি সেলাই করে বসে থাকো। এমন কি কেউ যদি বলে, Fine weather—eh? তুমি হাঁ, না বলতে পারবে না। তুমি ওয়েদারের জানো কি? প্রথম গ্রীনিচকে শুধোবে আবহাওয়ার দফতরে। তারা যদি বলে 'ফাইন' তবে ফাইন—তা তুমি যেখান থেকে কথা বলছো সেখানে থাক না মলয় পবন আর সূর্যাস্তের লালিমায় রঙিন গোলাপী আকাশ! এস্তেক তোমার নাম যদি 'অতুল' হয়, তবে তোমার বিপদ প্রত্যাসন্ন। শিশির ভাদুড়ী বলতেন অ (যয়-এ যে 'অ' উচ্চারণ), আর রবি ঠাকুর বলতেন 'ওতুল'—কিন্তু তিনিও আবার 'ওতুলনীয়' না বলে বলতেন 'অতুলনীয়'। অর্থাৎ ব্যারট্রাণ্ড রাসলের অনুশাসন মানলে তোমাকে নাম বদলে 'মাকাল টাকাল' কিছু একটা 'দশদিশি নিরন্ধ্রা' নাম রাখতে হবে!

গাইয়ের মত।* রবি ঠাকুর আর যা করুন, তাঁর বাঙলাটা অন্তত বোধগম্য হবে। থাক না দু পাঁচটা ভুল এদিক ওদিক। সেগুলো মেরামত করার জন্য তো ঐ হোথায় সত্যেন বোস বসে।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ একদিন শব্দতত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কির দা'য়ে মজে যান। বৃদ্ধ বয়সে—বোধ হয় সুনীতিবাবু এবং/কিংবা গোঁসাইজীর প্ররোচনায়—তাবৎ বাঙলা ভাষাটা নিয়ে খুব একচোট তলওয়ার খেলা দেখিয়ে দিলেন। আহা সে কী স্বচ্ছ সুন্দর তরল ভাষা—যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে। কে বলবে, বিষয়বস্তু নিরস শব্দতত্ত্ব—হুস্ হুস্ করে পাতার পর পাতা সিনেমার ডেলি ক্যালেণ্ডারের পাতার পর পাতা ওড়ার মত পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ভুম করে সম্বিতে ফিরে আসবেন। এমেচার আর্টিস্ট যেন লাজুক হাসি হেসে ঘন ঘন করতালির মধ্যিখানে শেষ বক্তব্য নিবেদন করছেন, কি বলছেন? বলছেন, তিনি শব্দতাত্ত্বিক নন্—নিতান্ত এমেচার—তাই খুব সম্ভব হেথা হোথা বিস্তর গলদ থেকে যাবে।

তারপর তিনি যে মুষ্টিযোগের শরণ নিয়েছেন সেইটে তিনি কালিদাসের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। সেটা তাঁর শক্তি (fort) ও বটে দুর্বলতাও —যদি অপরাধ না নেন—বটে কিন্তু এ স্থলে তিনি যে তুলনাটি ব্যবহার করেছেন সেটি উপমা কালিদাসকেও হার মানায়। তিনি বলছেন, 'কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শরীরতত্ত্বের যথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, (যেমন সেজানের ওয়েস্ট কোট-পরা ছোকরাটির হাত আজানুলম্বিত না বলে আঙুলক-লম্বিত বললেই ঠিক হয়—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছবিটি রসে ভর্তি—যাকে আজকের দিনে 'রসোত্তীর্ণ' বলা হয়।) ঠিক তেমনি কবির ভাষা সম্বন্ধে এ-বইয়ে দু-পাঁচটা ভুল বা অর্ধসত্য পরিবেশিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এসব ভুল মেনে নিয়েও দেখা যায় এরকম তুলনাহীন প্রবন্ধ হয় না। কারণ তথ্য-পরিবেশনে অসম্পূর্ণতা থাক আর নাই থাক, সবসুদ্ধ মিলিয়ে প্রবন্ধটি বাঙলা ব্যাকরণ (খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণ—বাঙলার ছদ্মবেশ পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়।) এবং খাঁটি বাঙলা

* আমার টায় টায় মনে নেই, তবে রাজশেখর লেখেন, নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতলীনের উপর কুলহরণীর প্রতিক্রিয়া' শুনে মনে হয় সকলের সজাগ দৃষ্টির সামনে (এখানে পাঠক আমার তরফ থেকে একটা ভদ্রজনোচিত গণ্ডা খাঁকরি অনুমান করে নেবেন! ধন্যবাদ!) কোনো একটা বেহেড্ বেলেল্লাপনা। উহুঁ, আপনার পাপ মন, পাঠক, আপনার পাপ মতি। ওর অর্থ হচ্ছে—আবার বলছি টায় টায় মনে নেই—The reaction of chlorine (কুলহরণীর) on acitylene (অসিতলীন) where nitrogen (নেত্রজন) is present.

অলঙ্কার নিয়ে এক অভূতপূর্ব রচনা। যেমন তিনি বলছেন, চলতি বাঙলাতে গুরুচণ্ডালী এখন আর দোষের মধ্যে গণ্য নয়।

ঠিক এই জিনিসটেই আমরা অন্যান্য সাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশা করি। কারণ সাহিত্যিকের সঙ্গে ভাষার যে পরিচয় হয় সেটা আদৌ শব্দতাত্ত্বিক বা ভাষা-তাত্ত্বিকের মত নয়। সে ভাষা ব্যবহার করে নূতন নূতন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই তার ভাষা সদা পরিবর্তনশীল। অত্যুত্তম গ্রন্থ লিখে ভাষাবাবদে আপামর জনসাধারণ তথা বৈকারণিকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেলেও লেখক তার পরবর্তী পুস্তকে সেই অনুমোদিত ভাষার পুনরাবৃত্তি করতে চায় না, রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, আপনার মালের রিসীভার অব স্টোলেন প্রপার্টি হতে চায় না। তাই তাকে প্রতিদিন নিত্য নবীন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেখানে সে কোনো বৈকারণিক, কোনো শব্দতাত্ত্বিকের সাহায্য পায় না। তাই প্রাচীন লেখক—যখন নূতন শব্দভাণ্ডার নূতন বচনভঙ্গী নিয়ে পুনরায় একখানা সার্থক গ্রন্থ লেখেন, তখন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ কর্ম শব্দতাত্ত্বিক করতে পারেন না—অবশ্য তিনি যদি সাহিত্যিকও হন ও তাঁর তত্ত্বগ্রন্থখানি সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে পারেন তবে অন্য কথা।

তাই ভাষার নব নব রূপ দেখাবার জন্য সাহিত্যিককেও এমেচারি শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

এবং শুধু সাহিত্যিকই না, যে-ব্যক্তিই জ্ঞান-বিজ্ঞান বা অন্য যে-কোনো চিন্ময় বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন, আলোচনা করেন, তাঁকেই কিছু-না-কিছু শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এই তত্ত্বটি আজ হঠাৎ আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠলো, মুসলমানদের সন্ত ইমাম আবু হানীফার বিরাট ন' ভলুমী গ্রন্থের একটি জায়গা পড়ে।

ইমাম আবু হানীফা শিষ্যসমাবৃত হয়ে প্রতি প্রাতে বসতেন মুসলিম ধর্ম আলোচনায়। তাঁর রায় লিখে রাখা হত তো বটেই, তাঁর প্রধান শিষ্যদের কেউ ভিন্ন রায় (মিনিট অব ডিসেন্ট) প্রকাশ করলে সেটিও সযত্নে পাশাপাশি লিখে রাখা হত।

একদা প্রশ্ন উঠলো, 'নগরে জুম্মার নমাজ অবশ্য পালনীয় : কিন্তু গ্রামে জুম্মার নমাজ হয় না'—এ-আদেশ শিরোধার্য করবো কি না? ইমাম সাহেব বললেন, 'শিরোধার্য করা, না-করার পূর্বে প্রথম দেখতে হবে, 'নগর' বলে কাকে, আর 'গ্রাম' বলে কাকে?' জনৈক শিষ্য বললেন, 'অভিধান দেখলেই হয়।' এবারে ইমাম যা

বললেন, সেটি মোক্ষম তত্ত্বকথা—সর্বভাষাতে সর্বকালে প্রযোজ্য। তিনি বললেন, 'কোষকার দেবে সাধারণ প্রচলিত অর্থ। পক্ষান্তরে আমরা ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন করে জনসাধারণের জন্য অনুশাসন প্রচার করি (অর্থাৎ আমরা theologians); থিওলজিয়ানের দৃষ্টিবিন্দু থেকে কোন্‌টা শহর—যেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ—এবং কোন্‌টা গ্রাম যেখানে জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ—তার শেষ বিচার তো আমাদের হাতে।'

অত্যন্ত খাঁটি কথা। যেমন ধরুন গরুর বাথান, যেখানে রাখালরা শীতকালে থাকে। সেটাকে হয় তো গ্রামের পর্যায়েও ফেলা যাবে না। কিংবা উত্তম মরূদ্যান পেয়ে হাজার লোকের কাফেলা (ক্যারাভান) কয়েক দিন বিশ্রাম করলো। সেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ না অসিদ্ধ?

ইমাম সাহেব বলছেন, থিয়োলজিকাল অর্থে কোন্‌টা গ্রাম, আর কোন্‌টা শহর, তার সংজ্ঞার (definition-এর) জন্য কোষকার তো আসবে আমাদেরই কাছে।

ঠিক তেমনি আইনজ্ঞ পণ্ডিতরা সংজ্ঞা দেন কোন্‌টা crime, আর কোন্‌টাই বা tort; তবে তো কোষকার সেটা তার অভিধানে লিপিবদ্ধ করে। সে তো আর বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটিতে বিশেষজ্ঞ নয় যে, নিছক আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক শব্দের সংজ্ঞা দেবে, বর্ণনা দেবে, প্রতিশব্দ দেবে।

ঠিক এই জিনিসটি বাঙলা দেশে এখনো আরম্ভ হয় নি।

সবাই তাকিয়ে আছেন কোষকারের দিকে। সে পরিভাষা বানিয়ে দেবে। আর সে বেচারী তাকিয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, আইন ইত্যাদির পণ্ডিতদের দিকে। তারা সংজ্ঞা দেবেন—এবং তাঁদের অধিকাংশই শব্দ বা ভাষাতাত্ত্বিক নন, সে বাবদে নিতান্তই এমেচার—তবে তো কোষকার সেগুলো লিপিবদ্ধ করবে॥

২৬।২।৬৬

মিজোর হেপাজতী

নেফা অঞ্চল বাদ দিলে আসামে যে কটি পার্বত্য অঞ্চল গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তার ভিতর পড়ে খাসিয়া, গারো, নাগা ও লুসাই। এর সঙ্গে ত্রিপুরার কুকি অঞ্চলেরও নাম করতে হয়, কিন্তু নানা কারণে সেখানকার কুকিরা এ যাবৎ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে নি—এবং যেহেতু ত্রিপুরা আসামের অংশরূপে গণ্য হয় নি, তাই সে-দেশ এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। কিন্তু মণিপুর সম্বন্ধে এস্থলে কিছু না বললে তাদের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা বাঙালী ধর্মপ্রচারকদের প্রতি অবিচার করা হয়।

আসামের অন্যান্য পার্বত্য জাতির মত মণিপুর অনুন্নত নয়। মহাভারতের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মণিপুর ও বর্তমান মণিপুর একই কিনা সে নিয়ে তর্কাতর্কি করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই—এবং যেহেতু মণিপুর অধীনের জন্মভূমির প্রত্যন্ত ভূমিতে অবস্থিত, সে তার প্রতিবেশীকে অহেতুক ক্ষুব্ধ করতে চায় না, কিন্তু এ কথা সত্য যে, যদ্যপি সাধারণ মণিপুরীদের চেহারার ছাপ মঙ্গোলীয়, ওদের ভিতর হঠাৎ বিশুদ্ধ আর্য টাইপও পাওয়া যায়—এবং যেহেতু পার্শ্ববর্তী আর্য বাংলা ভাষাভাষী সিলেট কাছাড়ে এ টাইপ দুর্লভ, তাহলেই প্রশ্ন উঠবে, কান্যকুব্জ অঞ্চলের এই আর্য টাইপ হঠাৎ মণিপুরে আবির্ভূত হল কি প্রকারে? পশ্চিম-বাংলার সঙ্গে মণিপুরের সরাসরি যোগসূত্র না থাকা সত্ত্বেও বাঙালী আজ মণিপুরী নৃত্যের কথা ও সে নৃত্য যে রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে, সে-কথা জানে—বস্তুত ভারতবর্ষে অধুনা যে চার রকমের শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি স্বীকৃত হয়, এ নৃত্য তারই অন্যতম—কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রচার ও প্রসার লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, অতএব এ নৃত্যকে আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্য দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করা কঠিন।*

* দক্ষিণ ভারতের ভরতনাট্যম নিয়ে যতখানি গবেষণা এই উত্তর ভারতেই হয়েছে, এই উত্তর ভারতের ঘনিষ্ঠতর মণিপুরী নৃত্য নিয়ে তার এক-দশমাংশও হয় নি। এ নৃত্য সত্যই রহস্যময়। মূল নৃত্য শান্ত ও লাস্যরসাশ্রিত কিন্তু প্রারম্ভিক অবতরণ নৃত্য (এর টেক্‌নিকাল নামটি আমি ভুলে গিয়েছি) অত্যন্ত প্রাণবন্ত, দুর্দান্ত—তাণ্ডব নৃত্যের কাছাকাছি এবং পার্শ্ববর্তী অনুন্নত অঞ্চলের সংগ্রাম-নৃত্যের সঙ্গে সাদৃশ্য ধরে। হয় তো বৈষ্ণব হয়ে যাওয়ার পরও মণিপুরীরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগত পার্বত্য নৃত্য ত্যাগ করতে চায় নি বলে 'অব তরণ' রূপে—প্রস্তাবনারূপে—সেটিকে রক্ষা করেছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। আসল প্রশ্ন এই: ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজাদেশে মণিপুর যে বৈষ্ণবধর্ম 'রাষ্ট্রধর্ম'-রূপে গ্রহণ করল সেটা সম্ভব হল কি প্রকারে? আসামের আর পাঁচটা পার্বত্য জাতি যে রকম আর্য জনপদ থেকে দূরে হাজার হাজার বৎসর ধরে আপন আপন প্যাটার্ন অব্ কালচার বুনে যাচ্ছিল মণিপুরও করছিল তাই। তাদের মাঝখানে একমাত্র মণিপুরই বা বৈষ্ণব হয়ে গেল কেন? এ কথা সত্য যে শিলচর থেকে মণিপুর পৌঁছোনো সহজতর। কিন্তু মৈমনসিং থেকে গারো পাহাড় যাওয়াও তো কঠিনতর নয়, গারোরা অতিশয় শান্তিপ্রিয় এবং দু-একটি গারো মুসলমানের সঙ্গেও আমার আলাপ পরিচয় হয়েছে। পক্ষান্তরে নেফার অধিবাসীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করা কঠিনতর; অথচ লোকমুখে শোনা, সেখানকার কোনো কোনো উপজাতি সর্ববাবদে অ-হিন্দু হয়েও মাথার এক দিকের খানিকটা চুল কামায় ও চিহ্নস্বরূপ দেখিয়ে বলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাকি তাদের অর্ধ-হিন্দুরূপে পরিণত করে বলেন যে, তিনি আবার এসে তাদের পূর্ণ-হিন্দু করে দেবেন—তারা এখনো সেই প্রতীক্ষায় আছে। তা সে যা-ই হোক্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বাঙালী শিষ্যেরাই যে মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মণিপুরী ভাষা বাংলা অক্ষরে লেখা হয়; পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগে খৃষ্টান মিশনারিরা পার্বত্য-বাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার পর তাদের ভাষা রোমান বা অভকার দিনের ইংরিজী অক্ষরে লেখেন।*

কিন্তু সবচেয়ে বড় তত্ত্বকথা, মণিপুরবাসী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করতে (এবং পরবর্তী যুগে কাছাড়ে আশ্রয়গ্রহণকারী কিছু মণিপুরী ইসলাম গ্রহণ করাতে) কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতিগত বা অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্ট হয় নি। রাজনৈতিক সমস্যার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বাঙালী মিশনারিরা মণিপুরের সিংহাসনে কোনো বাঙালীকে বসাতে চান নি। অর্থনীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে মণিপুরবাসী ও পার্শ্ববর্তী কাছাড়বাসীর মধ্যে দ্রব্যবিনিময়ের ফলে উভয়েই উপকৃত হন। এই

* এ যুগে মণিপুরে যে রকম হঠাৎ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়, সে রকম উদাহরণ কী অদূর অতীত কী বর্তমানে আমি অন্যত্র কোথাও পাই নি। মালকানা রাজপুতদের অল্পসংখ্যক লোকই বিংশ শতাব্দীতে 'আর্যসমাজে' দীক্ষা নেয়। শিলঙ শহর প্রায় শত বৎসর ধরে হিন্দুপ্রধান। সেখানে ব্রাহ্ম ও ইসলাম মিশন স্থাপিত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান মিশনারিরাই সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেন। এখনও আসামের সর্ব পার্বত্য অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারিই অগ্রগামী—এবং কোনো কোনো জায়গায় সমস্তল ভূমিতেও।

অর্থনৈতিক দিকটা পাঠক বিশেষভাবে মনে রাখবেন। আমার মনে হয়, নাগা এবং মিজোদের অর্থনৈতিক সমস্যাটা কেউ সবিশেষ চিন্তা করে দেখেন নি।

আমার বাল্যকালে সিলেট জেলার একাধিক জায়গায় নিয়ত বর্ধিষ্ণু খৃষ্টান মিশন ছিল এবং সে যুগে ভারতের তাবৎ প্রটেস্টান্ট্ মিশনারিদের ভিতর দক্ষিণ-শ্রীহট্টে কর্মরত ওয়েল্‌শ্ মিশনের (এখনো মিজোদের ভিতর এই মিশনই সর্বপ্রধান এবং যে ক'জন মিশনারির খবর অধুনা পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁরা খুব সম্ভব এই মিশনেরই। রেভারেণ্ড পিন্‌গোয়ার্ন জোন্‌স্ তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা—বাংলা', ইংরেজী, ওয়েল্‌শ্ তিন ভাষাতেই—চরিত্রবল ও ধর্মানুরাগের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আমি পাঠশালায় যাবার সময় থেকেই তাঁর গির্জা ও সান্‌ডে স্কুলের রীতিমত অনুরাগী অংশগ্রহণকারী ছিলুম বলে প্রায়ই টিলার উপরে অবস্থিত তাঁর ছিমছাম বাংলোতেও যেতুম। মিশনে বাস করতো আরো বিস্তর ছেলেমেয়ে—প্রধানত চা-বাগিচার সাহেব ও দিশী রমণীর মিলনজাত পুত্রকন্যা এবং কিছু কিছু খাসিয়া, গারো, নাগা ও লুসাই (মিজো) খৃষ্টান। খাস বাঙালী প্রায় চোখেই পড়ে নি। আমি বিশেষ করে এই পার্বত্য খৃষ্টানদের সম্বন্ধেই কৌতূহলী ছিলুম এবং হাইস্কুলে ঢোকার সময় একটি লুসাই ছেলের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। সে সময় লুসাই ভাষা শিখতে গিয়ে—যদিও শেখা হয় নি—আবিষ্কার করি যে, অন্তত লুসাই ভাষাতে বাংলার বহু বহু শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই (পরে জানতে পারি, অলিখিত ভাষা মাত্রেরই সাধারণত এই হাল)।

জোন্‌স্ সায়েব থাকতেন ছিমছাম বাংলোয়, জানলায় পর্দা টানানো! সায়েব-মেম খানা খেতেন ছুরি-কাঁটা দিয়ে, ধবধবে সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা খানা-টেবিলের পাশে। আমার বয়স তখন তেরো। কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল, ধর্মযাজকের এতখানি বিলাস ভালো না—বিশেষ করে তিনি যখন মিশনের আর সবাইকে তাঁর মত 'বিলাসে' রাখতে পারেন না। (পরবর্তী যুগে ইংলণ্ড এবং কন্টিনেণ্ট ঘুরে বুঝতে পারলুম, জোন্‌স্ সায়েব তাঁর দেশের পাদ্রী-ভাইদের তুলনায় কতখানি আত্মত্যাগ করে ওই বিদেশ-বিভুঁইয়ে কতখানি সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন; তাঁর আত্মাকে স্মরণ করে আজ ক্ষমা ভিক্ষা করি)।

আমার এবং আমার হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের মনে পাদ্রীসায়েবের ছিমছাম বাড়ি, আসবাবপত্র কোনো প্রলোভনের উদ্রেক করতো না। আমরা যেন কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝে মনে মনে যুক্তি করতুম, 'খৃষ্টান হলে এ সব পাওয়া যায়; কিন্তু আমরা তো ধর্ম বেচতে চাই নে।' তাই বোধ হয় জোন্‌স্ সায়েব তাঁর জোরদার

বাগ্মিতাশক্তি দ্বারাও কোনো বাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারেন নি—করে থাকলেও অত্যন্ত দুঃস্থ দূর গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে। আমরা কখনো তার খবর পাই নি।

আমার কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগতো, মিশনের এই খাসি লুসাইরা কি জোন্স্ সায়েবের মত ফিটফাট বাড়িতে থাকতে চায় না?

মণিপুরে যে সব বৈষ্ণব 'মিশনারিরা' গিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই সেখানে কোনো উচ্চতর মানের জীবনযাপন করেন নি। বস্তুত আজও মণিপুরের গ্রামবাসী সুর্মা উপত্যকার চাষার চেয়ে অনেক সচ্ছল। কাজেই এ নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব সেখানে উপস্থিত হয় নি।

কিন্তু নাগা-লুসাইদের মধ্যে কি হল?

যারা লেখাপড়ায় সামান্য ভালো—এ কথা মানতেই হবে, খৃষ্টান মিশনারিরা তাঁদের সামর্থ্যে যতখানি কুলোয় ততখানি অর্থ শিক্ষার জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঢেলে দিয়েছিলেন এবং একদা সেখানে সাক্ষরের সংখ্যা বাংলার তুলনায় ছিল বেশী—তারা কোহিমা আইজলে পড়তে এল, পরে শিলঙে এবং কেউ কেউ কলকাতা পর্যন্ত। এবং যারা আপন গ্রাম থেকে বেরুলো না, তারা অন্তত পাদ্রীসায়েবের বাড়ি, তাঁর তৈজসপত্র দেখেছে। শিলঙে যে দু চারজন চাকরি নিয়ে থেকে গেল তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা বাড়ির টানে গাঁয়ে ফিরে গেল, এবং যারা গাঁয়েই ছিল এদের অনেকেই কি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করে পাদ্রী-সায়েবের মানের কাছে আসতে চাইলো না?

এ তো আমাদের চোখের সামনে নিত্য নিত্য ঘটছে। আমাদেরই গ্রামের ছেলে শহরে এসে আর গ্রামে ফিরে গিয়ে নিম্নমানের জীবনযাপন করতে চায় না। বস্তুত ফ্রান্স, জর্মনি সর্বত্রই ক্রন্দনরব উঠেছে, গ্রামের বুদ্ধিমান কর্মঠ ছেলে মাত্রই আর গ্রামে ফিরে যেতে চায় না। পড়ে থাকে নিষ্কর্মাগুলো। দি ভিলেজেস আর বীইং ড্রেনড্ অব দেয়ার ব্রেনস—শহর ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের প্রতিভাকে। বিশ্বব্যাপী এই যে একতরফা ভাটা, এরই ফলে যে গ্রামোন্নয়ন করা যাচ্ছে না এসম্বন্ধে 'উনেস্কো' বহু কাল ধরে সচেতন, বিস্তর গবেষণা করেছেন, দাওয়াই খুঁজে পাচ্ছেন না।

কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনী হয় না, কারণ, যে গ্রামের ছেলে শহরে থাকতে চায় তার জন্য আশেপাশে বিস্তর ছোট-বড় শহর আছে—বোলপুর, শিউড়ি, বর্ধমান, শেষটায় যদি তাতেও প্রাণ না ভরে, তবে কলকাতা। রেলের চাকরি করে ভাগলপুর, পাটনা হয়ে কত কী।

কিন্তু মিজো-লুসাইবাসী যাবে কোথায় ? আইজল, লুঙলে তাদের কি দিতে পারে ? তারপর শতাধিক মাইলের ধাক্কা পেরিয়ে শিলচর—সে আমাদের শিউড়ি-বর্ধমানের তুলনায় কসমপলিটান শহর বটে—কিন্তু তারই বা মুরদ কতটুকু ? তার নিজেরই দুঃখের অবধি নেই। আসাম সরকার তাকে—যাক্, আবার না আরেকটা বাঙাল খ্যাদানো আরম্ভ হয়ে যায় (ভালো তো কারো করতেই পারি নে, মন্দটা না-ই বা করলুম !) আর কেন্দ্রীয় সরকার ? কতবার বুঝিয়েছি, এই শিলচরে বেতারের কেন্দ্র বানিয়ে নাগালুশাইদের কন্ট্রোল করো—কেবা শোনে কার কথা। (এ-স্থলে বলে রাখা ভালো আমার জন্মভূমি কাছাড় নয়)। থাক সে কথা। মিজো যদি বা শিলচর পেরুতে চায় তবে সামনে যে খাঁড়া পাঁচিল—হিল্ সেক্শন—তারপর সেই সুদূর গৌহাটি। এখানে খাসিয়াদের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যাবে, একে তাদের চাষের পদ্ধতি উন্নত, শিলঙ গৌহাটির ভাষা তারা মোটামুটি জানে, জিনিসপত্র সেখানে বেচতে পারে, চাকরি-নোকরি মিস্ত্রিগিরি করে পয়সা কামাতে পারে। আর শিক্ষিত সম্পদশালী বহু খাসিয়া শিলঙ শহরের পাদ্রীর বাঙলোর চেয়েও ফিটফাট বাঙলোয় বাস করেন। তাই স্বভাবতই খাসিয়ারা অনেকখানি সন্তুষ্ট এবং তাই শান্ত।

কিন্তু মিজো যায় কোথায় ?

১৯১০।১৯১১ থেকে তাদের ভিতর আরম্ভ হয় খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং ১৯৩১ নাগাদ অর্ধেক লুশাইবাসী হয়ে গেছে খৃষ্টান। তারপর কি হয়েছে জানি নে। নিশ্চয়ই বেড়েছে। কারণ মিশনারিদের কাজ বন্ধ হয় নি। আদমশুমারীর হিসাব দেখে লাভ নেই। ঐ সময় থেকেই আরম্ভ হয়, পরের সেনসাসে কার স্বার্থ অনুযায়ী কি দেখাতে হবে তাই নিয়ে ছিনিমিনি, ইংরিজীতে যাকে বলে 'কুকিং'।

পার্বত্যাঞ্চলবাসী অনেক সময় আমাদের হিসেবে নিষ্ঠুর কিন্তু তারা সরল। সরল বিশ্বাসে তারা মনে আশা পোষণ করেছিল, যারা তাদের খৃষ্টান করেছে তাদেরই জাতভাই ইংরেজ সরকার একদিন তাদের বাসনা-কামনা পূর্ণ করে দেবে। 'জুম' খেত করে যে তার পয়সায় পাদ্রীর বাঙলো বানানো যায় না সেটা তারা বোঝে না। আমার মনে হয়, ইংরেজ-রাজ থাকলেও আজ না হোক কাল বা পরশু মিজোদের রুদ্ধ আক্রোশ ইংরেজকেই আক্রমণ করতো। তবে ইংরেজ ধাপ্পা মারতে ওস্তাদ—বাঙালীর মত চালাক জাতকেও কতবারই না একটা কুমীরছানাকে বারোটা করে দেখিয়েছে। কবিগুরুর মত বিচক্ষণ জন এবং তাঁর চেয়েও ঢুঁদে বহু

পলিটিশিয়ান 'ব্রিটিশ জস্টিসে' বহুকাল ধরে বিশ্বাস রেখে আশা করতেন, সময় এলে আমরা ইংরেজের কাছ থেকে জস্টিস—সুবিচার পাবো।

অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করি—যাঁরা আমার সঙ্গে একমত নন তাঁদের কাছে মাফ চাইছি যে, দেশ-শাসন ব্যাপারে ইংরেজের অনেকগুলো সদ্গুণ আছে এবং সেই অনুপাতেই আসাম সরকার,—থাক, আবার কেন? তবে আসাম সরকার না হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মিজোদের ভার নিলেই যে মুশকিল আসান হয়ে যেত সেটা আমি বিশ্বাস করি নে। যাই বলুন, যাই কন, আসাম সরকার বাস করেন শিলঙে—খাসিয়াদের মধ্যিখানে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরে নেফা অঞ্চলেও রয়েছে আরো গণ্ডায় গণ্ডায় উপজাতি। তাদের অনেকেই প্রতি হাটবারে নেমে আসে সমতলে,ক্ষেতের জিনিস,এটা-সেটা (তখনকার দিনে চামর, মৃগনাভি, হাতীর এবং গণ্ডারের দাঁত—ভয়ঙ্কর মূল্যবান জিনিস, মধ্যপ্রাচ্যে 'হারেম' পোষণের জন্য মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় নিত্যকাম্য এফ্রডিসিয়াক ইত্যাদি) বিক্রি করে প্রধানত নুন, কেরোসিন* (সর্বনাশ! আমাদেরই যা হাল, ওদের হচ্ছে কি? তবে হ্যাঁ ডিগবয় ওদের অতি কাছে) কিনে নিয়ে যাবার জন্য। ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাবাসী আসামীদের অনেকেই তাদের চেনেন। কাছাড়বাসী ক'জন সদস্য আসাম মন্ত্রিমণ্ডলীতে আছেন সঠিক জানি নে; যে কজন আছেন একমাত্র তাঁরাই ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা-বাসীদের তুলনায় নাগা-মিজোদের বিলক্ষণ চেনেন, সদুপদেশ দিতে পারবেন, অবশ্য শর্ত, যদি কেউ চায়! এঁদের তুলনায় নাগা-মিজোদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের জ্ঞান সীমাবদ্ধ—এ বিষয়টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে বুঝিয়েছিলেন নাগাদের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, সে-সময় আপন মাতৃভূমি নাগা পাহাড়েই এস ডি ও শ্রীযুত কে ভি চুসা, ট্রেনে শেয়ালদা থেকে সিলেটের কুলাউড়া পর্যন্ত দিল্লি থেকে মুককচণ্ড ফেরার

* এক সিলেটী মুসলমান ডাক্তার বহু বৎসর আইজল-লুঙলেতে কাটিয়ে এসে আমায় বলেন, মিজোরা দু-দিন তিন-দিনের পাহাড়ের চড়াই-ওৎরাই পথ পেরিয়ে লুঙলে আসতো কেরোসিন কিনতে। সে কেরোসিন আসতো শিলচর থেকে, বেশীর ভাগ পথ মানুষের কাঁধে, বাঁকে করে। একবার একজন বাহকের কলেরা হয় নির্জন পথিমধ্যে। বাঁশের স্টেচার বানিয়ে অন্য চারজন বেহারা রোগীকে নিয়ে লুঙলে পানে রওয়ানা দেয়—দশ টিন কেরোসিন পাহাড় চলার 'পথের' উপর রেখে দিয়ে। গণ্ডায় গণ্ডায় কেরোসিনকামী খৃষ্টান অখৃষ্টান চলেছে লুঙলের দিকে, কিন্তু তাদের ধর্মবোধ এমনই প্রবল যে তারা কেরোসিনের দিকে ফিরেও তাকালো না। বেহারারা লুঙলে থেকে ফিরে এসে সমূচা সব কটা টিন যথাস্থানে পায়—তারাও জানতো, লোপাট হবে না, তাই লুকিয়ে রাখার প্রয়োজনও বোধ করে নি। সেই মিজোরাই এখন লুঙলেতে লুটতরাজ করলো!

পথে। সুযোগ পেলে সে কাহিনী আরেক দিন হবে। শ্রীচুসা অর্থনৈতিক দিকটারও উল্লেখ করেন।

মিজোরা সরল বিশ্বাসে ভাবছে, আমরা—তা সে কেন্দ্রীয় সরকারই হোক, আর আসাম সরকারই হোক—বিধর্মী (নাগারাও কড়া সুরে বলে, 'যারা আমাদের সঙ্গে আমাদের গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে না তারা আমাদের ঘৃণা করে ; সেটা না হয় করা গেল, কিন্তু খেতেও হবে তাদের সঙ্গে এবং স্বর্গস্থ প্রভু জানেন, একমাত্র চারপাঈ ছাড়া সর্বচতুষ্পদই তারা খায়! সঙ্গে সঙ্গে পান করতে হবে শুকনো লাউয়ের পাত্রে ভর্তি ভাত পচিয়ে তৈরী লিটার লিটার বিয়ার! কোহিমার ছোকরা ইংরেজ শাসনকর্তা এ-তিনটি প্রথমটি করে পুণ্যসঞ্চয় করতেন, বাকি দুই বাবদেও তেনারা সমগোত্রীয়, এমন কি প্রয়োজন হলে village belle-কেও তাঁরা নিরাশ করতেন না —কারণ ব্যাচেলার ভিন্ন অন্য কাউকে সেখানে সচরাচর পাঠানো হ'ত না) এবং যেহেতু আমরা বিধর্মী তাই আমরা তাদের ন্যায্য পাওনা দিচ্ছি না। আমরা সরে গেলেই তাদের সর্ব বাসনা কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। মোস্ট প্রিমিটিভ জুম চাষ করে যে এবসার্ড জীবনমান উচ্চ পর্যায়ে তোলা যায় না সেটা বোঝাবে কে?

অবশ্য মিজোদের অসন্তোষের অন্যান্য কারণও আছে। আমি শুধু একটা কারণ দেখালুম—অন্তত মার্কসিস্টরা খুশী হবেন—তাঁদের অনেকেরই মতে এইটেই একমাত্র কারণ। একমাত্র কারণই হোক আর প্রধানতম কারণই হোক, অর্থনৈতিক কারণটার সন্ধান নেওয়া সর্বক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়। লেনিনের সমসাময়িক ভিয়েনার অর্থডক্স্ অর্থনীতি পণ্ডিত শুমপেটার এবং তাঁরই মত কট্টর বার্লিনের জমবার্ট কেউই এই দৃষ্টিবিন্দুটি অবহেলা করেন নি।

স্বীকার করে নিচ্ছি, আমার এ বিশ্লেষণ ভুল হতে পারে, কিন্তু তথ্যগুলো সঙ্কিত হয়েছে বিশ্বস্তজনের কাছ থেকে।*

---

* (ক) মিজো প্রবন্ধটি লিখে 'দেশ' দপ্তরে পাঠিয়ে দেবার পর দুটি তাৎপর্য পূর্ণ খবর বেরিয়েছে প্রথমটিতে মাদ্রাজের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম মেধী বলেছেন—'যাতে করে মাল চলাচল জাম না হয়ে যায় ("trasnport bottleneck"), মিজো, নাগা এবং অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে রেল লাইন বসানো উচিত।' তিনি General council meeting of the All-India Railwaymen's Federation-এতে এ বিবৃতিটি দেন ও ২৭-৩-৬৬র কাগজে এটি বেরোয়। মিজো নাগারা যে রেলের অভাবে বাদবাকি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন, সে-কথা আমি প্রবন্ধে নিবেদন করেছি।

(খ) পার্বত্য-অঞ্চল সম্বন্ধে ব্যাপক রিপোর্ট দেবার জন্য যে পাটস্কর কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তার রিপোর্টের কয়েকটি প্রধান সুপারিশ ৩১ মার্চ বেরিয়েছে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট না পড়ে কিছু বলার উপায় নেই, কিন্তু যেটুকু বেরিয়েছে তার থেকে মনে হল 'আধুনিক ঘটনার আলোকে' রিপোর্টটি আউট অব ডেট—তামাদি না হলেও বর্তমানের প্রধান সইতে পারবে না।

১৬।৪।৬৬

আদরের ডাক-নাম গ্নপ্‌প্‌ বা ইয়্নপ্‌প্‌—সারা দেশটা জুড়ে। তোলা-নাম হার ডক্টর ইয়োজেপ (গ্নপ্‌প্‌) গ্যোবল্‌স্‌, রাষ্ট্রের প্রপাগাণ্ডা-মন্ত্রী, রাজধানী বার্লিনের গাও-লাইটার (অঞ্চলাধিকারী) এবং ফুরার অ্যাডলফ্‌ হিটলারের শেষ জুয়ো-খেলার পাশা যখন ব্লাঙ্কো মেরে মেরে যাচ্ছে, তখন সর্বাত্মক, টোটাল ওয়ারের জন্য বুলে তাগৎ 'ইকট্রে' করার জন্য সর্বাধিকারী। পার্টির ব্রেন-বাক্সো। শত্রু-মিত্র সবাই এক সুরে বলেছেন, 'হাঁ, প্রপাগাণ্ডা কারে কয়, সে-বস্তু দেখিয়ে গেছে ঐ ব্রেন-বাক্সোটা।' বাক্সোটির এক দিক দিয়ে ঢুকতো সাদামাটা তথ্য, হাফ-তথ্য, ডাহা মিথ্যে, ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন বেরিয়ে আসতো অন্য দিক দিয়ে। এক-একখানা চাছাছোলা, নিটোল, অব্রণ, অনিন্দনীয় কলাসৃষ্টি। দাঁড়ান, এই 'কলা-সৃষ্টি' রহস্যটা একটু গুছিয়ে বলতে হয়—কারণ, এ-বাবদ তাবৎ টেকনিক্যাল টার্ম একমাত্র ফরাসীর মারফতে প্রকাশ করা সম্ভবে। তদুপরি গ্যোবল্‌স্‌ সায়েবের দিলের দোস্ত থেকে জান্‌-এর দুশমন্‌ তক্‌ স্বীকার করেছেন, ভোঁতা হোঁৎকা টিউটন নাৎসী পাঁঠাদের ভিতর ঐ গ্যোবল্‌স্‌ই ছিলেন একমাত্র জিনিয়াস, যাঁর স্কন্ধে বিরাজ করতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মস্তিষ্ককুণ্ডলী পরিপূর্ণ লাতিন মাথা—তাই তাঁর লিখন-কথন উভয়েতেই ছিল, ফরাসীসুলভ স্ফটিক স্বচ্ছতা।* এ-কলাসৃষ্টিকে অ্যভ্র্‌ দা'র বলা যেতে পারে, মাস্টার পীস অব আর্ট বললে ঠিক ঠিক মানেটা ওৎরায় না। অব্‌জে দা'র শব্দসমষ্টি আমি শুনেছি; এটা বোধ হয় morale-এর মত ইংরিজিতে চালু ভেজাল ফরাসী মাল (আমরা যেরকম কলকাত্তাই উর্দুতে

* অক্সফোর্ডের ইতিহাস-অধ্যাপক ট্রেভর-রোপারের মত জর্মনির জাতশত্রু শতেকে গোটেক; তদুপরি তিনি একটি আস্ত রবস্ত রব। তিনি বলেন, 'and it was the Latin lucidity of his (Goebbels') mind, the un-German suppleness of his argument which made hime so much more successful as a preacher than the frothblowing nationalists of the South.'

অবশ্য অধ্যাপককে বোঝা ভার। তিনি শতাধিক বার বলেছেন, জর্মনরা অতিশয় অগা জাত। উত্তরে বলি, অগারা পরিষ্কার যুক্তি বোঝে না; রহস্যের সন্ধানে কোটে মাথা। তাই জর্মন দার্শনিকদের ভিতর লাতিন ধরনের স্বচ্ছ লেখক শোপেনহাওয়ার ভোঁতা লেখক হেগেল্‌-এর তুলনায় অবহেলিত।

'একঠো' 'দুঠো'র ভেজাল বরাব্বর ব্যবহার করে আসছি।)—অর্থ, যে-কলাসৃষ্টি কোনো কাজে লাগে না, যেমন 'পাপিয়ে মাশে'তে তৈরী কাশ্মীরী ফুলদানি-পারা সৃষ্টিছাড়া বস্তু, যেটাতে ফুল রাখা যায় না বটে, কিন্তু দেখতে খাসা। গ্যোবল্‌স্ সায়েবের বেতার বক্তৃতা বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বিলকুল বেকার নয়—টায়-টায় কাজে লাগতো। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি টলস্টয়কে নিশ্চয়ই পরম আপ্যায়িত করতে পারতেন; পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে, টলস্টয় তাঁর কলা দ্বারা নির্মাণ করতেন স্বর্গারোহণের সোপান, গ্যপ্‌প্ নির্মাণ করতেন রসাতলের খাড্ডায় সবেগে নিপতিত হওয়ার তরে অত্যুত্তম পিচ্ছল সানুপ্রদেশ। আর ইহুদিকুলের কল্যাণার্থে গ্যাস-চেম্বার।

হিটলারের বক্তৃতা-গর্জনও রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যতুল্য প্রলয়ঙ্কর, কিন্তু সেটাকে অত সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না। সেটাও কলাসৃষ্টি এবং সেটি গ্যপ্‌প্-মার্কার চেয়ে লক্ষগুণে কার্যকরী। কড়া পাক।

দুজনার মুখে একই জিগির: ইহুদিকুল সর্বনেশে। এদের সমূলে বিনাশ করতে হবে।*

কিন্তু দুজনের মনের ভিতর দু' প্রকারের যুক্তি। গ্যপ্‌পের বিশ্বাস, ইহুদিরা সর্ব ব্যাপারেই সাতিশয় ধুরন্ধর। এদের সঙ্গে 'নর্ডিক আর্যরা' অর্থাৎ জর্মনরা কিছুতেই পাল্লা দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে হিটলার এটা মানতে পারেন না—জান্ কবুল। তাঁর মতে, এই বসুন্ধরায় যে-কটা ডাঙর ডাঙর জাত, গোষ্ঠী, বংশ—যা খুশি বলুন, ইংরেজীতে Race, জর্মন Rasse—তার মধ্যে 'আর্য'-রেস সর্বোত্তম। এবং সেই আর্য রেসের ভিতর সর্বোত্তমেরও সর্বশ্রেষ্ঠ জর্মনির নর্ডিক, নীল চোখ, ব্লন্‌ড্ (সোনালী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপালীও—যেটাকে বলা হয় প্লাটিনাম ব্লন্‌ড্) চুলধারী 'আর্য' রেস। ইহবিশ্বের সর্ববাবদে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন শক্তিমান যুবার শরীরেও যেমন ক্যানসার দেখা দিতে পারে ঠিক তেমনি জর্মন সমাজে এসে ঢুকেছে ইহুদি গোষ্ঠী। এরা ছারপোকার মত ভার্মিন।

* ন্যুরনবের্গের মোকদ্দমায় যখন আসামী নাৎসিদের বিরুদ্ধে বলা হলো যে তাঁদের ফ্যুরার স্বয়ং ইহুদিদের ausrotten = 'সবংশে নির্বংশ' করবেন বলে একাধিকবার সর্বজনসমক্ষে পণ করেছিলেন, তখন আসামী পক্ষ বলে, 'ওসব কথার কথা। কেউ যখন বলে, "তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো' (বাঙলায় বলতে গেলে এই অনুবাদই জুৎসই) তখন অন্য পক্ষ সেটা সিরিয়াসলি শব্দার্থে নিয়ে বিশ্বের তাবৎ ডুগডুগি বানাবার যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করতে মাথায় গামছা বাঁধে না।'

ছারপোকা বেশী বুদ্ধিমান না মানুষ বেশী বুদ্ধি ধরে, এ প্রশ্ন বুদ্ধিমান মানুষ তুলবে না —বুদ্ধিমান বা মূর্খ ছারপোকা তুলবে কি না, সেটা হিটলার বলেন নি।

য়প্‌প্‌ বললেন, 'এটা হল তুলনা। তুলনা যুক্তি নয়।'

ফ্যুরার বললেন, 'তুলনা মাত্রই তিন ঠ্যাঙের উপর দাঁড়ায়। টায়-টায় যুক্তির স্থান নিতে পারে না সত্য, কিন্তু আপন বক্তব্য জোরদার ও প্রাঞ্জল করার জন্য তুলনার ব্যবহার করেছেন সর্বগুণীজ্ঞানীই।'

য়প্‌প্‌ বললেন, 'তর্কস্থলে মেনে নিলুম।' গ্যোবলস্ বড়ই প্রভুভক্ত ছিলেন। নইলে প্রভুর আত্মহত্যার চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর তাঁর ছ'টি শিশুপুত্রকন্যাদের ডাক্তার দিয়ে খুন করিয়ে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করবেন কেন?* বললেন, 'তাই সই। কিন্তু আমি আপনাকে হাতেনাতে দেখিয়ে দেব, ইহুদিরা অন্তত ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্যের চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরে।'

'কোনো ক্ষেত্রেই না।'

'বাজী ধরুন।'

'বিলক্ষণ। কত?'

'এক লাখ।'

'গেমাখ্‌ট্‌—পাক্কা বাৎ।'

দুজনাতে ছদ্মবেশে বেরুলেন। তার জন্য বেশী বেগ পেতে হল না। এমনিতেই ঠোঁটকাটা বার্লিন-ককনিরা বলতো ফ্যুরারের চুল নেবে পড়ে কপাল ঢাকে নি—এটা অকল্পনীয়; আর গ্যোবলস্ এক লহমার তরে বকর বকর বন্ধ করেছে—এটা ততোধিক অবিশ্বাস্য। হিটলার তাই চ্যাট্‌চেটে পমেটম দিয়ে যেন প্রায় ভৈরবচণ্ডীর মত চুড়ো-খোঁপা বাঁধলেন—এবারে আর চুল খসে পড়ে, কপাল ছাপিয়ে চোখ এস্তেক ঢেকে দেবে না। বাস্, এতেই হয়ে গেল ছদ্মবেশ। আর য়প্‌প্‌? তিনি বললেন, তিনি প্রতি দশ মিনিটে একটি মাত্র সেনটেন্‌স বললেন। এ-রকম বিকট চুপচাপ লোককে কে চিনবে য়প্‌প্‌ বলে!

য়প্‌পেরই প্রস্তাবমত দুজনাতে ঢুকলেন এক পাঁচমিশিলি খাঁটি আর্য দোকানে। চাইলেন একটা টী সেট। দোকানী একটি রমণীয় ট্রের উপর সব কিছু সাজিয়ে সামনে ধরলো। গ্যোবলস্ তো তাঁর মুণ্ডটি ডান থেকে বাঁয়ে, ফের বাঁ থেকে ডাইনে

* সবিস্তর কাহিনী পাঠক পাবেন, অধীনের 'দু-হারা' পুস্তকে, হিটলারের 'শেষ দশ দিন' প্রবন্ধে।

নাড়িয়ে নির্বাক প্রশস্তি শুনিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়লো ঐরকম ভাবখানা করে বললেন, 'কিন্তু আমার যে-দোস্তকে আমি এই জন্মদিনের সওগাৎটা দেব তিনি তো ন্যাটা; আপনাদের কাছে কি লেফট-হ্যাণ্ডারদের জন্যে কোনো টী সেট আছে?' হিটলার বললেন, 'হুঁ।' ভদ্র আর্যসন্তান আমাদের দোকানী তো বেবাক বে-বাক্—অবাক। 'লেফট-হ্যাণ্ডারস টী সেট?' সে আবার কি গব্বযন্ত্রণা রে বাপু। বাপের জন্মে নাম এস্তেক শোনে নি। অনেকক্ষণ ঘাড় চুলকে, বিস্তর আন্দেশা করে আপসা-আপসি করে সবিনয় জানালে, তার কাছে নেই।

হিটলার দিলদরাজ আদমী। এক গাল হেসে বললেন, 'মাখ্‌ট্‌ নিক্‌স্‌, মাখ্‌ট্‌ নিক্‌স্‌—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! তাতে এসে যায় না। আমরা অন্য দিন দুসরা জিনিসের জন্য আসবোখন—খাসা দোকানটি কিন্তু! কি বলো হ্যার ডক্—থুড়ি। ঔফ বীডার জেএন! গুটে নাখ্‌ট্‌। আসি তবে। হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ।'

এবারে যপ্‌প্‌ প্রভুকে নিয়ে ঢোকালেন এক ইহুদির দোকানে।

দোকানী ছিল না। তার চোদ্দ বছরের ছেলে ছুটে এসে অদৃশ্য শ্যাম্পুতে (কথাটা আজকাল বড্ডই 'ফেশিনিবিল' হয়েছে; আমো ব্যাভার করতে চাই) হাত কচলাতে কচলাতে একবারের জায়গায় তিন-তিনবার বলে বসলো, 'য়ুটন ময়েন, য়ুটন ময়েন, য়ুটন ময়েন (গুটন্ মর্গেনের অর্ধশিক্ষিত উচ্চারণ), মাইনে হেরেন্!'

উত্তরে হিটলার বিড়বিড় করে কি একটা বললেন, ঠিক ঠাহর করা গেল না। দক্ষিণের কোনো কোনো ব্রাহ্মণ নাকি একদা রাস্তায় ('সড়ক' 'সরকে' বা 'সরণিতে' —ওঃ! কী স্টর্ম ইন এ টী 'সেট'!) বেরলে চিৎকার করতেন, অস্পৃশ্য যেন সরে যায়, তার ছায়া যেন ওঁর গায়ে না পড়ে—তবে এদের পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষকে বামুন গ্যাস চেম্বারে* খুন করে পুড়িয়েছে একথা কখনো শুনি নি। অতএব হিটলার যে ইহুদি ছোকরাকে হেল-ফেলো-উয়েল-মেট (hail-fellow-well-met) করেন নি,

* এর অন্যতম বড়কর্তা হোস ন্যুরনবের্গে মোকদ্দমায় সাক্ষী দেন, এবং পরে এঁর ফাঁসি হয়। দু'জন হাড়ে-পাকা মনস্তত্ত্ববিদ মার্কিন চিকিৎসক এঁকে আগা-পাশতলা পুন পুন পরীক্ষা করেও এঁর ভিতর কোনো কিছু আব্‌নরমাল পান নি। ইনি বলেন, 'হাজার খানেক মানুষ গ্যাস দিয়ে মারতে আমার ১০ থেকে ১২ মিনিট সময় লাগতো, কিন্তু আসল মুশকিল ছিল এদের পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা —দিনের পর দিন নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা চুল্লিগুলো চালু রেখেও কাজ খতম হত না।' গ্যাস চেম্বারে ইহুদিদের চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো থেকে, চুল্লি চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখে তাতে লাশ পুড়িয়ে ছাই করে জলে ভাসানো পর্যন্ত সব কাজ করতো কোনো কোনো স্থলে ইহুদিরাই! তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এই প্রলোভন। পরে অবশ্য তাদেরও ঘাড়ে গুলি করে মারা হত, পিছন থেকে, অতর্কিতে।

সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। ইহুদি ছোকরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'আমার বলে দেওয়া উচিত সরকারের হুকুম, কোনো "আর্য" যদি ইহুদির দোকানে ঢোকেন তবে দোকানদার যেন তাঁকে সতর্ক করে দেয়, এটা ইহুদির দোকান, এখানে কেনাকাটা করলে আর্যই দায়ী। সাইনবোর্ডেও স্পষ্ট করে লেখা আছে; আপনারা হয় তো লক্ষ্য করেন নি।'

হিটলার বিড়বিড় করলেন, 'শোন্ গুট্ শোন্ গুট্—অনেকটা যেন ঠিক আছে, ঠিক আছে; মেলা বকো না।

টী সেট চাওয়া হল। এল। গ্যোবলস্ ন্যাটার সেট্ চাইলেন।

ছোকরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই সম্বিতে ফিরে এক গাল হেসে বললে,'এখখুনি নিয়ে আসছি, স্যার!' বলে যে সেট ট্রে'র উপর সাজিয়ে রেখে দেখিয়েছিল সেইটে তুলে নিয়ে গুদোমঘরে অদৃশ্য হলো। দু-মিনিট পরেই আরেকটা আরো বাঢ়িয়া ট্রে'র উপর সাজিয়ে নিয়ে এল ন্যাটাদের সেট্।

তালেবর ছোকরা করেছে কি, এবারে ঐ আগেকার সেটই উল্টো করে সাজিয়েছে, অর্থাৎ টী-কাপগুলোর আঙটাগুলো রয়েছে খদ্দেরের বাঁ দিকে; তার মানে, খদ্দের বাঁ-হাত বাড়ালে আঙুল ঠিক আঙটার যথাস্থানে পড়বে।

গ্যোবলস্ বাক্যব্যয় না করে যথামূল্যে সেট্ কিনে নিলেন।

বেরিয়ে এসে বললেন, 'দেখলেন ইহুদিটার চালাকিটা?'

হিটলার অতিশয় সরল দরদী কণ্ঠে বললেন, 'চালাকিটা আবার কোথায়? বেচারী আর্যের ন্যাটা সেট্ ছিল না স্টকে, তো সে আর করবে কি?'

* * *

এবারে সিরিয়স কথা :—ব্যাটারা বলে, তারা নাকি আর্যোত্তম। আরে মোলো, আর্যোত্তম যদি হবিই, তবে সর্ব-আর্যের—তা সে গ্রীকই হোক, লাতিনই হোক কিংবা তাদের বহু পূর্বের মিটানির হিটাইটই হোক—সর্বপ্রাচীন সংহিতা চতুর্বেদ আছে ভারতীয় আর্যের শ্রুতিতে ভিন্ন অন্য কোন্ 'আর্য' গোঁসাইয়ের খট্টাঙ্গ প্রত্যঙ্গে?

কিন্তু, আমরা তো দিয়েছি আশ্রয়—প্রথম ইহুদিরা যখন জীবনমৃতাবস্থায় নিমজ্জমান তরণীতে করে বোম্বাই উপকূলে পৌঁছয়। গ্যাস-চেম্বারের কথা এই দু বা আড়াই হাজার বছর ধরে আমাদের মাথায়ই খেলল না। তবে, হ্যাঁ, এদানির কেউ কেউ বলেন, আমরা যে অস্মদ্দেশে ইজরায়েল প্রেসিডেন্টের শুভাগমনোপলক্ষে

উলাহ বলে 'দস্ত' করি নি সেটা, গ্যাস-ক্ষেত্রে পোরার চেয়েও সখ্‌ৎ গুনাহ্‌! তোবা! তোবা!!

৩০।৪।৬৬

ভাষা

হাট-বাজার, শাক-সবজি,* দান-খয়রাৎ, দুখ-দরদ্‌, ফাঁড়া-গর্দিশ, মান-ইজ্জৎ, লজ্জা-শরম, ভাই-বেরাদর, দেশ-মুল্লুক, ধন-দৌলত, রাজা-বাদশা, ঝড়-তুফান, হাসি-খুশী, মায়া-মহব্বৎ, জন্তু-জানোয়ার, সীমা-সরহদ্‌—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এস্থলে লক্ষ্য করার প্রথম তত্ত্ব এই যে, প্রত্যেক সমাসের প্রথম শব্দটি খাঁটি দিশি ভারতীয় শব্দ; হাট, শাক, দান, দুখ, মান, লজ্জা, দেশ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় শব্দটি যাবনিক (আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হীব্রু গয়রহ্‌), যেমন বাজার, সবজী, খয়রাৎ, দর্দ্‌ ইত্যাদি। এবং দুটি শব্দই প্রায় সমার্থসূচক।

তাহলে প্রশ্ন, এ 'কুকর্মের' কি প্রয়োজন?

আমরা যখন সাধারণের কোনো অজানা ভাষা থেকে উদ্ধৃতি দিই, তখন বাঙলা অনুবাদটি দি তার পরে। তাই আমরা যদি ইংরিজী প্রবন্ধে সংস্কৃত বা বাঙলা উদ্ধৃতি দিই দি, তবে ইংরিজী অনুবাদটি দি পরে। অর্থাৎ যাকে বোঝাতে যাচ্ছি তার ভাষা আসে পরে।

তা হলে মনে করুন, মুসলমান আগমনের কিছুকাল পরে কোনো হিন্দু (বা নবদীক্ষিত মুসলমানও হতে পারে, কারণ হিন্দু ধর্মবর্জন করে মুসলমান হয়ে গেলে রাতারাতি তার আরবী ফার্সী রপ্ত হয়ে যায় না) গেল মুসলমান শাসন-কর্তার কাছে বিচারের আশায়। বললে, 'ধর্মাবতার, হুজুর!—দেশ—' বলেই থমকে দাঁড়ালো। ভাবলে 'হুজুর কি 'দেশ' শব্দটা জানেন? হুজুর তো হাট-বাজারে ঘোরাঘুরি করে দিশী শব্দ শেখবার ফুর্সৎ পান না'—(অথচ আমাদের হিন্দুটি পেটের দায়ে, কাজের তাড়ায় বিদেশাগত মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে কিছু কিছু যাবনিক শব্দ শিখে গিয়েছে) তাই 'দেশ' বলে থমকে গিয়ে বললে 'মুল্লুক'—ওটা হুজুরের যাবনিক শব্দ। অতএব শেষ পর্যন্ত তার নিবেদন দাঁড়ালো, 'দেশ-

* কিন্তু শাক-ভাত, শাক-পাত, শাক-পাতেড়ে, শাকান্ন, শাক-মাছ অন্য সমস্যার অঙ্গ। স্থানাভাব না হলে সেটিরও আলোচনা করা হবে।

মুল্লুক ছারখার হয়ে গেল। রাজা-বাদশা (আবার রাজা বলে থমকে গিয়ে যাবনিক 'বাদশা' বললে) আমাদের মত কাঙাল-গরীবের (গরীব আরবী) দুখ-দরদ্ (দরদ্, দর্দ ফার্সী) কে বুঝবে ? আমাদের মান-ইজ্জৎ (ইজ্জৎ আরবী) ধন-দৌলৎ (দৌলত যাবনিক) সব গেল। মেয়েছেলের লজ্জা-শরম (শর্ম যাবনিক) ও আর বাঁচে না। রাস্তায় বেরোলেই দেখতে পাবেন, কারো মুখে হাসি-খুশী (খুশী ফার্সী) নেই। হুজুর অনুমতি দেন—ভাই-বেরাদর (বেরাদর ফার্সী) নিয়ে মগের মুল্লুকে চলে যাই।'

মনে করুন, কথার কথা কইছি, হুজুর সত্যকার হুজুর ছিলেন। হুকার দিয়ে প্রতিবিধান করলেন।

আমাদের বঙ্গসন্তানটি বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে আনন্দে ডগমগ হয়ে বললে, 'বুঝলে গিন্নী, হুজুর যা আমায় খাতির—' (বলেই থমকে দাঁড়ালো ; হুজুরের দরবারে 'খাতির' কথাটি খুবই চালু, সেইটেই এতক্ষণ ধরে দরবারে সে শুনেছে, তাই দুম্ করে সেটা ব্যবহার করে দুশ্চিন্তায় পড়লো, গিন্নী তো যাবনিক শব্দটা বুঝবে না, গিন্নী তো হাট-বাজারে গিয়ে যবনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে এসব শব্দ শেখে নি —তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে) 'যত্ন—হুজুর যা খাতির-যত্ন করলেন কি বলবো। আবার দোকান (ফের মুশকিল—দোকান ফার্সী শব্দ, তাই বললে 'হাট' (হট্ট)-হাট খুলবে,—কোনো চিন্তা করো না গিন্নী। নারায়ণ, নারায়ণ।'

এ যুগে আবার ফিরে আসবো। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে দেখুন, ইংরেজ boss-কে বলছি, 'স্যর। আমি উকিল—(বলেই থমকে দাঁড়ালুম, উকিল যদ্যপি আসলে আরবী শব্দ, এদানির ইটি খাটি বাঙলা, স্যর কি বুঝবেন ?—তাই হন্তদন্ত হয়ে বললুম) ব্যারিস্টার (উকিল-ব্যারিস্টার) লাগিয়েছিলুম। ঘটি-(ঐ য্ যা ! স্যর বুঝবেন কি ?) গেলাশ (glass—এবারে স্যর বুঝবেন।)—ঘটি-গেলাশ বন্ধক দিয়েছি—তেনাদের জন্য এরেক (ফের ইংরিজী 'ব্রাণ্ডি')-ব্রাণ্ডি, বিড়ি-সিগরেট (দ্বিতীয়টা ইংরেজি) যা গেছে সে আর বলে কাজ নেই।'

এই সব বলে করে তো ছুটি নিয়ে দেশে গেলুম।' প্রথমেই ঠাকুরমাকে পেন্নাম।

বললুম, 'ঠাকুমা, পরে সব গুছিয়ে বলবো, এই বেলা শুনে নাও সংক্ষেপে। বড় মাসীর গুণধর ছোট ভাইটি নিয়েছেন ফ্ল্যাট (আবার সেই হাঙ্গামা—ঠাকুমা তো 'ফ্ল্যাট' বুঝবে না, অতএব বললুম), ফ্ল্যাটবাড়ি। আমাদের কাউকে না শুনিয়ে করেছেন বিয়ে। কিন্তু ঠাকুমা, মেয়েটি কী সুন্দর। একেবারে ডল (doll—সর্বনাশ,

ঠাকুমা তো বুঝবে না, তা হলে 'পুতুল' বলি)-পুতুলের মত। কিন্তু হলে কি হয়! গুরু আছেন, ধম্মো আছেন। ব্যস! এল তেড়ে টাইফয়েডজ্বর (টাইফয়েড তো জ্বরই বটে—তবু ঠাকুমা যদি না বোঝেন, অতএব 'জ্বর'টা বলতে হল); তুমি ভাবছো আমরা কিছুই করি নি। ডাক্তার (আবার সেই বিপদ, তাই বলতে হল) বদ্যি (ডাক্তারবদ্যি) নিয়ে এলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।'

তাই আবার নিবেদন করছি, যাকে বোঝাচ্ছি তার বোধ্য শব্দটি আসে পরে।

এটা কিছু নূতন তত্ত্ব, আমাদের দেশের আজগুবী ব্যাপার নয়। ইংলেণ্ডেও নরমান বিজয়ের পর ইংরেজ যখন বিদেশী হুজুরের কাছে গিয়ে ফরিয়াদ বা রিপোর্ট দিত, তখন বলতো, 'He is very meek and humble (meek খাঁটি ইংরিজি, কিন্তু humble বিজয়ী নরমানদের শব্দ), Sir, but it is odd and strange (odd ইংরিজী, strange নরমান), that although we thought it meet & proper (meet ইংরিজী, proper নরমান) that we should search every nook and corner (nook ইংরিজী, corner নরমান), our sorrow and grief (sorrow ইংরিজী, grief নরমান) know no bound that we did not find him.'

তফাৎ শুধু এইটুকু যে ইংরেজ তখন দিশী ও বিদিশী শব্দের মাঝখানে and বসিয়েছে—meek and humble, odd and strange; আমরা বাঙালীরা 'and' 'এবং' বসাই নি; আমরা বলেছি, হাসি-খুশী, মান-ইজ্জৎ, দেশ-মুল্লুক।

পাঠক কিন্তু ভাববেন না, আমাদের সব সমাসই এ রকম।

জল-পানি, বাজার-উটকো, মাল-মশলা, ঘটি-বাটি, টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসা, ইস্কুল-কলেজ অন্য ধরণের সমাস॥

১২।৩।৬৬

কবিগুরু ও নন্দলাল

রসাচার্য নন্দলাল বসুর জীবন এমনই বহু বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, তিনি এতই নব নব অভিযানে বেরিয়েছেন যে তার পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া যে অতি কঠিন, শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। তদুপরি যিনি সে পরিচয় দিতে যাবেন তাঁর সর্বরসসৃষ্টিতে অপর্যাপ্ত কৌতূহল ও সে রস ব দন করার মত অপ্রচুর স্পর্শ-কাতরতা থাকার একান্ত, অত্যন্ত প্রয়োজন। মানব সমাজে নন্দলাল ছিলেন স্বল্পভাষী তথা আত্মগোপনপ্রয়াসী—তাঁর নীরবতার বর্ম ভেদ করে তাঁকে সর্বজন সম্মুখে স্বপ্রকাশ করার মত ক্ষমতা, সে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শৈলী ও ভাষার উপর অধিকার এ-যুগে অত্যল্প আলঙ্কারিকেরই আছে। আমাদের নেই; আমরা সে দুঃসাহস করি নে।

..মরা তাঁকে চিনেছি, গুরু রূপে, রসসৃষ্টির জগতে বহু বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সতত রত স্রষ্টা রূপে এবং কবিগুরুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও সহকর্মী রূপে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে প্রধানত পণ্ডিতদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—আচার্য বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, অ্যানড্রুজ, কলিন্স, শ্যামের রাজগুরু, উইনটারনিৎস, লেভি, গোস্বামী নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ইত্যাদিকে। এঁদের কেউই রসস্রষ্টা ছিলেন না, এমন কি যে দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গীতে, কাব্যে অসাধারণ সৃজনশক্তি ধরতেন তিনি পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব সৃজনশক্তির দ্বার রুদ্ধ করে সর্বক্ষমতা নিয়োজিত করেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মে। একমাত্র নন্দলালই এই পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যময় বাতাবরণের মাঝখানে অপ্রমত্ত চিত্তে আপন সৃষ্টি কর্মে নিয়োজিত ছিলেন।

রবি নন্দ সম্মেলন যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। এ তত্ত্ব অনস্বীকার্য যে রস কি, চিত্রে,প্রাচীর গাত্রে তথা দৃশ্যমান কলার অন্যান্য মাধ্যমে তাকে কি প্রকারে মৃন্ময় করা যায় এ-সম্বন্ধে নন্দলাল তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে উৎকৃষ্টতম শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। তাই নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আগমন করার পূর্বেই বঙ্গদেশ তথা ভারতে সুপরিচিত ছিলেন ও পশ্চিমের বহু সদাজাগ্রত রসিকজনের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কবিগুরুর নিত্যালাপী সখা, সহকর্মী ও শিষ্য রূপে শান্তিনিকেতনে আসন গ্রহণ করার পর তাঁর চিন্ময়ভুবন ধীরে ধীরে সমৃদ্ধতর হতে লাগলো ও রবীন্দ্রাহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্পর্শে এসে তিনি এমন সব বিষয়বস্তুর সঙ্গে

পরিচিত হলেন যেগুলো সচরাচর সাধারণ আর্টিস্টকে আকৃষ্ট করে না। একটি মাত্র উদাহরণ নিবেদন করি: দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায় তথা অন্যান্য জ্ঞানচক্রে শতাধিকবার আলোচনা করেছেন, তর্কবিতর্ক উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯২১ থেকে পূর্ণ কুড়িটি বৎসর এসব সম্মেলনে নন্দলাল উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু আমি তাঁকে কখনো (১৯২১-২৬) এ সবেতে অংশ গ্রহণ করতে দেখি নি।

অথচ ১৯৩৬।৩৭-এ বরোদার মহারাজা যখন তাঁকে সেখানকার কীর্তিমন্দিরে দেয়ালছবি (ম্যুরাল) আঁকতে অনুরোধ করলেন তখন তিনি চার দেয়ালে এঁকে দিলেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'। ১। 'গঙ্গাবতরণ' (গঙ্গা বিনা যে ভারতে আর্যসভ্যতার পত্তন ও বিকাশ হত না সে কথা বলাই বাহুল্য), ২। 'কুরুক্ষেত্র', ৩। 'নটীর পূজা', ৪। 'মীরাবাই' ('সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোঁঈ'—চিত্রে)। আর্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, মধ্যযুগীয় ভক্তি এই চার দৃষ্টিবিন্দু থেকে নন্দলাল দেখেছেন ভারতের সমগ্র ইতিহাস।

কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে যদ্যপি চিত্রের মাধ্যমে রসসৃষ্টি সম্বন্ধে নন্দলাল পরিপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষা গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সে রস কাব্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে কি ভাবে প্রকাশ পায় সেটি তিনি দেখতে পেলেন দিনের পর দিন, বহু বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনে। রসের প্রকাশে কোন কলার অধিকার কতখানি নন্দলাল সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ মাত্রায় সচেতন হলেন শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে। কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত আলঙ্কারিকের (নন্দনতত্ত্বজ্ঞের) ন্যায় রস নিয়ে আলোচনা করার সময় নিজেকে সাহিত্য, সঙ্গীত বা নাট্যরসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন না। স্বনামধন্যা স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে তিনি দিনের পর দিন রস নিয়ে যে আলোচনা (হোয়াট ইজ আর্ট ?) করেন তাতে টলস্টয়ের অলঙ্কার শাস্ত্রও বাদ পড়তো না এবং তিনি বেটোফনের 'ক্রয়েৎসার সনাটা'-র বিরুদ্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন সেটিও উভয়ের মধ্যে আলোচিত হত। এসব আলোচনা সাধারণত হত বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায়—এবং নন্দলাল সে-স্থলে নিত্য-নীরব শ্রোতা। সে-সময় নন্দলালের চিন্তাকুটিল ললাটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বোঝা যেত, আর্ট সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা, অভিজ্ঞতা, তাঁর যা আদর্শ সেগুলোর সঙ্গে তিনি এ-সব আলোচনার মূল সিদ্ধান্ত, মীমাংসাহীন জল্পনা-কল্পনা সব কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, নৃত্য যতখানি গতিশীল (ডাইনামিক) চিত্র ততখানি

হতে পারে না। পক্ষান্তরে নটনটী রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভানুমতী থেকে যায় শুধু স্মৃতিতে—বাস্তবে সে অবলুপ্ত। কিন্তু চিত্র চোখের সামনে থাকে যুগ যুগ ধরে—এবং চিত্রের মত চিত্র হলে প্রতিবারেই যে তার থেকে আনন্দ পাই তাই নয়, প্রতিবারেই সেই প্রাচীন চিত্রে নব নব জিনিস আবিষ্কার করি, নিত্য নিত্য নবীন রসের সন্ধান পাই। তাই কোনো নৃত্য-দৃশ্য যদি চিত্রে সার্থকরূপে পরিস্ফুট করা যায়, তবে মঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে যে-চিত্রের চিরতরে অবলুপ্ত হওয়ার কথা ছিল, সে হয়ে যায় অজর অমর। কিন্তু 'চিত্রে সার্থকরূপে পরিস্ফুট' করার অর্থ, সে যেন ফটোগ্রাফ না হয়—তা হলে মনে হবে, নর্তক-নর্তকী নৃত্যকলা প্রকাশ করার সময় হঠাৎ যেন মুহূর্তেক তরে পাষাণ পুত্তলিকায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরাই নন্দলালের 'নটীর পূজা' চিত্রটি প্রাচীর গাত্রে দেখেছেন, তাঁরাই আমার সামান্য বক্তব্যটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। সে চিত্র তো স্টাটিক নয়, 'স্তম্ভিত' নয়—বস্তুত তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, এই বুঝি নটী আরেকখানি অলঙ্কার গাত্র থেকে উন্মোচন করে দর্শকের দিকে, আপনারই দিকে অবহেলে উৎক্ষেপ করবে, এই বুঝি মৃদঙ্গে ভিন্ন তাল ভিন্ন লয়ের ইঙ্গিত ভেসে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে নটী তার নৃত্য দ্রুততর করে দেবে, লাস্য-নৃত্য তাণ্ডবে পরিণত হবে, মন্দমন্থর 'নমো হে নমো' অকস্মাৎ অতিশয় দ্রুত 'পদযুগ ঘিরে, 'চন্দ্রভানু'র মদমত্ত নৃত্যে নবীন বেশ গ্রহণ করবে।

বস্তুত আপন মনে তখন প্রশ্ন জাগবে, নন্দলাল মঞ্চে বিভাসিত যে-নৃত্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন, সে নৃত্য কি সত্যই এতখানি প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বসিত—শান্ত থেকে মন্থর, মন্থর থেকে উন্মত্ত—প্লাবন বেগে ধাবিত ছিল, না তিনি অঙ্কন করেছেন তাঁর নিজস্ব কল্পলোকের মৃন্ময় নৃত্যের আদর্শ প্রকাশ।

* *

সুন্দরের পরিপূর্ণ আনন্দ-রূপের ধ্যানের বীজমন্ত্র নন্দলাল গ্রহণ করেন কবিগুরুর কাছ থেকে। এবং তার সর্বোচ্চ বিকাশে সে বীজের যেন কোনো চিহ্নই নেই। সে যেন পত্রপুষ্পে বিকশিত মহীরূহ।

এবং একমাত্র নন্দলালই তাঁর গুরুর উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সকলেই জানেন, পরিপূর্ণ বৃদ্ধ বয়সে কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রের মাধ্যমে আপন সৃজনী শক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু কবির প্রভাবে ছবির নন্দলাল তো কখনো কবিতা রচনা করেন নি। ॥

১৪।৫।৬৬

ইহুদি যাজক সম্প্রদায়ের সুপুত্র শ্রীযুত লেভির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে খানা খেতে যাচ্ছি। তাঁর আছে গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তারই একটা ছাড়লেন :

"জারের আমলে রববার দিন গির্জেয় গেছে গ্রামের সবাই। রুশ জাতটা একদা ছিল বড়ই ধর্মানুরাগী। কুলোকে বলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভূতপ্রেত-তাবিজ-কবজে-বিশ্বাসী উজবুকের ভায়রা ভাই। এবং সাতিশয় পাষণ্ডেরা বলে, সেই প্রাচীন কুসংস্কারই আজ তাদের টেনে নিয়ে যায় লেনিনের দর্গায় শির্ণী চড়াতে। তা সে যাকৃগে—মোদ্দা কথা : তারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে, তাদের গাঁয়ের পাদ্রী সায়েব যা বলেন তাই আপ্তবাক্য। যত্মাপি এসব পাদ্রিদের অনেকেই নিজের নামটি পর্যন্ত সই করতে পারে না—"

আমি শুধালুম, "নিরক্ষর জন গির্জায় ধর্মোপদেশ দেয় কি প্রকারে ?"

বললেন, "আশ্চর্য! রাসপুতিন যে কী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কুল্লে আড়াই আউন্স বাইবেল গলধঃকরণ করতে পেরেছিলেন সে না হয় পড়োনি, তাই জানো না। নিচ্চেভো—অর্থাৎ কুছ পরোয়া নেহী। সেই আড়াই আউন্স বাইবেল ডাইলুট করে তিনি মহারাণী জারীনা মায় জার প্রাসাদ জয় করলেন। তাঁকেও নাম সই করতে হলে ঘেমে নেয়ে কাঁই হতে হতো।

আর এরই উলটো দিক—অর্থাৎ ভালোর দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ খুঁজতে হলে অন্তত তোমাকে তো আর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু অবধি মাকু মারতে হবে না। তোমার নবী পয়গম্বর তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর! তা সে যাকৃগে।

সে রববারে পাদ্রি সায়েবের সারমন বা বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ইহুদির কী অন্যায়ভাবে প্রভু যীশুকে ক্রুশের উপর খুন করলো। এ বিষয়ে বক্তৃতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সব পাদ্রিই দেন। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, শিক্ষিত পাদ্রি জানেন, প্রভু যীশু ক্রুশের উপর থেকে তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমা করে গিয়েছিলেন। তাই তিনি বক্তৃতা দেবার সময় সতত সতর্ক থাকেন, অজ্ঞ খৃষ্টানগণ যেন উত্তেজিত হয়ে ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ না করে। কিন্তু ঐ যে রুশ পাদ্রীর কথা বলছিলুম তিনি সেদিন উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন, কি প্রকারে মূঢ় জনতাকে প্রতিহিংসা-

পরায়ণ করে তোলা যায়। অবশ্য তার জন্য অত্যধিক বাগ্মিতা শক্তির কোনো প্রয়োজন নেই—কারণ রুশ দেশে আবহমান কাল থেকে ইহুদিবৈরিতা বংশানুক্রমে চলে আসছে। কাজেই সারমন শেষেই বিক্ষুব্ধ চাষীরা একজোট হয়ে ধাওয়া করলো মাঠের অন্য প্রান্তের খাস ইহুদি গ্রামটার দিকে। দূর থেকে তাদের চিৎকার হুঙ্কার শুনে ইহুদিরা ব্যাপার কি জানবার জন্য গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল। তাদের চিৎকারে তখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে—'খুন করবো, ব্যাটাদের খুন করে রক্ত দিয়ে রক্তের দাদ নেব।'

সবাই একে অন্যকে চেনে। তাই ইহুদি গাঁওবুড়ারা করজোড়ে শুধালে, 'আমরা কি অপরাধ করেছি যে আমাদের খুন করবে, এতকাল ধরে পাশাপাশি গ্রামে বাস করছি—'

উত্তেজিত জনতা বললে, 'চালাকি রাখো। তোমরা আমাদের প্রভুকে খুন করেছ, তার দাদ আমরা নেবই নেব।'

যেন পর্শু দিনের ঘটনা!" লেভি গল্প বলা ক্ষান্ত দিলেন। কারণ হঠাৎ পিটির পিটির করে বৃষ্টি নামলো। এই পোড়ার দেশে মনসুন নেই বলে বারো মাসের যে কোনো দিন আচমকা বৃষ্টি নামে। আমি বললাম, "চলুন স্যার ডক্টর, ট্রাম শেড্-এ আশ্রয় নি।"

বললেন, "ছোঃ! কিস্সু জানো না। ইহুদিরা ছাতা কেনে না কেন, তার খবর রাখো? খৃষ্টানদের বিশ্বাস, ইহুদিরা এমনই দুর্দান্ত চালাক যে, বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে জামাকাপড় বাঁচিয়ে দিব্য চলাফেরা করতে পারে। তারপর কি বলছিলুম? —সেই রুশ ইহুদিদের কথা। তারা ছিল সত্যই চালাক। চট করে ভেবে নিয়ে দেখলে, ঐসব জড়ভরত বেরেস্তান রুশদের বোঝানো হবে অসম্ভব, ঘটনাটা ঘটেছে দু' হাজার বছর পূর্বে, রুশ দেশে নয়—বহু দূর-দূরান্তরের প্যালেস্টাইনে—যারা মেরেছিল, তারা সেই দেশ ছেড়ে কবে কোন্ আদ্যিযুগে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র, বিয়ে করেছে জাতেবেজাতে—এখন যাদের ঠ্যাঙাতে যাচ্ছো—" আমি বললুম, "বুঝেছি। খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবদ্দন!"

লেভি বললেন, "লাখ কথার এক কথা!"

অতএব ইহুদি ডাঙরিয়ারা হন্তদন্ত হয়ে বললে, 'ইহুদিরা প্রভু যীশুকে না হক খুন করেছিল, এতো অতিশয় সত্য কথা—বিশ্ব-সংসার জানে। কিন্তু ভাই, তোমরা করেছ ভুল। আমরা, এ গাঁয়ের লোক, ওঁকে মারি নি—তা কখনো পারি!

মেরেছে—' বলে আঙুল দিয়ে দেখালে পাশের গাঁ। বলল, 'মেরেছে ঐ ও—ই গাঁয়ের ইহুদি রাস্কেলরা।' বুঝলে তো তায়া?" বলে লেডি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমি একগাল হেসে বললাম, "যা শত্রু পরে পরে। কিন্তু গল্পটা তো সে রকম ঝাঁঝালো না—আপনার সেদিনকার রাব্বি, জানলার শার্সি আর আয়নাতে তফাৎ নিয়ে গল্পটার মত?"

লেডি বললেন, "ক্যারেকটারিস্টিক গল্পের ফান্‌কশন হচ্ছে কোনো বিশেষ জাত বা শ্রেণী বা যা-ই হোক না কেন, তার ক্যারেকটার, তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা। ভেড়ার বাচ্চা আর নেকড়ে বাঘের মধ্যে তকাতর্কি নিয়ে যে গল্প ঈসপ লিখেছেন, সেটাতে ঝাঁঝ কোথায়? কিন্তু গল্পটা সাতিশয় ক্যারেকটারিস্টিক—অর্থাৎ ভেড়া আর নেকড়ের ক্যারেকটার ওতে চমৎকার ফুটে উঠেছে—নইলে গল্পটা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো কি করে, আর এত যুগ ধরে বেঁচে আছেই বা কি করে? আমি রুশ ইহুদিদের সম্বন্ধে যে গল্পটা বললুম—গল্প না হয়ে সত্য ঘটনাও হতে পারে—সেটা কিন্তু সর্ব-ইহুদিদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বিপদকালে তারা এক হতে তো জানেই না, বরঞ্চ নিজকে বাঁচবার জন্য তার জাতভাই অন্য ইহুদিকে বিসর্জন দিতেও তার বাধে না।"

আমি বললুম, "উঁহু।"

"মানে?"

আমি বললুম, "আমার দেশ বাঙলার উত্তর প্রান্তে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়, স্বার্থ থাক আর নাই থাক, তাঁরা একে অন্যের সাহায্য কস্মিনকালেও করেন না। একটা নদ পেরুবার সময় নাকি পর পর পাঁচজন ব্রাহ্মণ একটা পাথরে ঠোক্কর খান, কিন্তু কেউই পরের জনকে হুঁশিয়ার করে দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। শেষটায় একজন যখন 'বাপরে' বলে অন্যদের সাবধান করে দিলে, তখন তাঁরা সবাই সমস্বরে চিৎকার করে বললেন, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই আমাদের শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নয়'। তখন ধরা পড়লো, সত্যি, সে অন্য শ্রেণী ব্রাহ্মণ—বর্ণচোরা আঁবের মত এঁদের সঙ্গে মিশে এঁদেরই একজন হতে চেয়েছিল। গল্পটা আপনারই সংজ্ঞা অনুযায়ী খুবই ক্যারেকটাষ্টিক বটে, কিন্তু আমার মনে এ বাবদে একটা ধোঁকা রয়ে গেছে।"

লেডি বললেন, "তুমি দেখি হেরোডকেও হেরোডত্ব শেখাতে চললে—অর্থাৎ যাকে বলে গুরুমারা বিদ্যেতে ওস্তাদ হয়ে উঠছো। বুঝিয়ে বলো।"

আমি বললাম, "যে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গল্পটি আপনাকে বললাম, তাঁরা যে অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং বুদ্ধিমান জীব মাত্রেই ঐক্যে বিশ্বাস করে। তাই আমি বহুকাল ধরে পর্যবেক্ষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম, এঁরা একে অন্যকে খুবই সাহায্য করে থাকেন—যেরকম ফ্রীমেসনরা একে অন্যের প্রতি বড়ই সদয়—কিন্তু সে সাহায্যটি করেন অতিশয় সঙ্গোপনে। এবং অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা যাতে করে এ-তত্ত্বটি আবিষ্কার না করতে পারেন, তাই তাঁরা নিজেরাই বাজারে একাধিক কামুফ্লাজ গল্প ছেড়েছেন এই মর্মে যে, তাঁদের ভিতর মারাত্মক ঐক্যাভাব। তাই আমার মনে হয়, আপনি যে গল্প দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, ইহুদিরা সঙ্ঘবদ্ধ হয় না, সেটা স্বয়ং ইহুদিরাই তৈরি করেছেন, খৃষ্টানদের সন্দেহ না জাগানোর জন্য।"

ইহুদি আর স্কচমেনের একটা মহৎ গুণ—তাদের নিয়ে কেউ রসিকতা করলে সেটা তারা উপভোগ করতে পারে। লেডি আমার সত্য-সিদ্ধান্ত শুনে হেসে বললেন, "এটা আজ খানা-টেবিলে আমি পেশ করবো। দেখি, ঠাকুদ্দা-বাবা কি বলেন। কিন্তু জানো, এর থেকে একটা গুরুতর সমস্যায় উপনীত হওয়া যায়। তুমিই সেদিন প্রশ্ন করেছিলে, ইহুদিরা যে প্যালেস্টাইনে 'হোম' বানাতে চায়, সেটা ভালো না মন্দ? আমি বলেছিলুম, সময় এলে আলোচনা করা যাবে। তাই এস্থলে প্রশ্ন শুধানো যায়, পৃথিবীর সব ইহুদি এই হোম চায় কি না? এই দাবির পিছনে কি তারা ঐক্যবদ্ধ? তোমার প্যারা কবি হাইনে একদা এই আন্দোলনের সঙ্গে—ঠিক ঠিক বলতে গেলে ঐ আন্দোলনের আলোচনা-চক্রের সঙ্গে—সংযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরই তিনি সে-চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেন। তার থেকে অবশ্য এটা বলা চলে না, প্যালেস্টাইনে ইহুদি হোম নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। আসলে ব্যাপারটা অন্য ধরনের; সংখ্যালঘুদের ভিতর এক রকম লোক থাকে, যারা আপন সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায় না—তারা ভাবে, বাড়িতে বাপ-ভাই তো সে-গণ্ডি বানিয়ে রেখেছেনই, বাইরে গিয়েও তাঁদেরই জাতভাইদের সঙ্গে মিশে কি লাভ? আমার মনে হয়, হাইনের বেলা হয়েছিল তাই।" তারপর হঠাৎ রাস্তার উপরই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার দেশে তুমিও তো লঘু সম্প্রদায়ের লোক। তুমি দেশে কাদের সঙ্গে মেলামেশা করো?" উত্তর দেবার পূর্বেই তিনি বললেন, "এ-বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলতে পারে, অতএব এটা এখন মুলতুবি থাক, কারণ, বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।"

বাউমশূল আলের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একখানা ছিমছাম তেতলা বাড়ি।

ল্যাচ কী দিয়ে দরজা খুলে বললেন, "স্বাগত জানাই তোমাকে। মঙ্গল হোক, জয় হোক তোমার। তোমার বংশধর যেন অসংখ্য হয়।" ॥

২১।৫।৬৬ ॥
